নবি মুহাম্মদের ২৩ বছর
আলি দস্তি
নবি
মুহাম্মদের
২৩
বছর
আলি দস্তি
ভাষান্তর
আবুল কাশেম. সৈকত চৌধুরী

নবি মুহাম্মদের ২৩ বছর

মূল: আলি দস্তি

ভাষান্তর: আবুল কাশেম ও সৈকত চৌধুরী

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা

ইসলাম, নবি মুহাম্মদ এবং ...

বিশ্ব-ইতিহাসে ইসলাম একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী ধর্ম। ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নবি মুহাম্মদ ইতিহাসের একজন অনন্য ব্যক্তিত্ব। অন্যান্য ধর্মের প্রচারকদের সাথে নবি মুহাম্মদের অন্যতম তফাৎ হচ্ছে তিনি কেবল একাধারে সফল ধর্মপ্রচারকই নন, তিনি ছিলেন একইসাথে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ এবং দক্ষ প্রশাসক। দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে বহু বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে প্রচণ্ড পরিশ্রম, ত্যাগ আর লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি কেবল বিশ্বের বুকে ইসলামের বিস্তারই ঘটাননি, একই সাথে একটি রাষ্ট্রের গোড়পত্তন ঘটিয়েছেন, আরব-জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে বহু গোত্রে বিভক্ত মরুবাসী বেদুইনদের একত্রিত করেছেন। জীবদ্দশাতেই তিনি স্থির লক্ষে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় সাড়ে তেরশ বছর পার হয়ে গেছে। আজ শুধু মরুবাসী আরব-ই নয়, বিশ্বের বহু দেশের, বহু জাতির লক্ষ-কোটি অনারব মুসলমান এই পতাকাতলে সমবেত। ফলে এদিক দিয়ে দেখলে নবি মুহাম্মদ অতুলনীয়। তিনি নিঃসন্দেহে সফল।

ইসলামের ইতিহাস, নবি মুহাম্মদের জীবনী নিয়ে প্রতি বছরই বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় প্রচুর সংখ্যক বই প্রকাশিত হয়। এই বইগুলির বেশিরভাগই হয় স্তুতিভিত্তিক-অলৌকিকতার ধূম্রজালে আবদ্ধ আবার কোনোটা হয় অযথাই নিন্দা আর সমালোচনাকে ভিত্তি করে। কিন্তু ইসলামের ইতিহাস নিয়ে নির্মোহ বিশ্লেষণে খুবই কমসংখ্যক বই প্রকাশিত হয়েছে। এটা স্বীকার করতে হবে ইসলাম আজও গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য, নবি মুহাম্মদের জীবনী আজও কোটি মানুষের চর্চার বিষয়। অনেকের কাছে এটিই একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান।

অন্য আরও সকল ধর্মের মতোই সুদূর অতীতকাল থেকে ইসলাম নিয়েও লৌকিক ভিত্তি ত্যাগ করে অলৌকিক-গায়েবি সংস্কারে নিমজ্জিত প্রচুর মানুষ। ধর্ম নিয়ে যৌক্তিক-বিশ্লেষণী আলোচনা আমাদের এই সমাজে এমনিতে বিরল। ভাববাদী-আধ্যাত্মবাদী বহু দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইসলাম আলোচিত হয়েছে বহুজনের লেখনীতে। কিন্তু ইসলামের উত্থান-বিকাশ এবং নবি মুহাম্মদের 'অসাধ্য সাধন' নিয়ে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ইসলামকে জানার ও বোঝার চেষ্টা দুর্লভ বটে। সে-হিসেবে ইরানের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী আলি দস্তি রচিত 'নবি মুহাম্মদের ২৩ বছর' গ্রন্থটি ঐতিহাসিক এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

আলি দস্তির মতে, অলৌকিকতা কোনো ঐশী নির্দেশ নয়। অলৌকিকতা কেবল দুর্বলচিত্তের জনগণের কাছে ধোঁয়াশার জালে আবদ্ধ সংস্কার নয়। কিংবা নয় কোনো ধরনের বিভ্রম। অলৌকিকতা একটি অর্থবহ বিষয়। একজন ব্যক্তি যখন তার দক্ষতা, কৌশল, বুদ্ধিমত্তা আর পরিশ্রমের সমন্বয় ঘটিয়ে আপাত 'অসাধ্য সাধন' করতে সক্ষম হন, তখন সেই কাজকে অলৌকিক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। নবি মুহাম্মদও এই অর্থে অসাধ্য সাধন করেছেন। প্রায় একা একজন মানুষ অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আর কৌশল অবলম্বন করে নিজ জাতির বিরুদ্ধে জীবন বাজি রেখে প্রচণ্ড লড়াই করে নিজস্ব ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেছেন। অসংখ্য মানুষের পূর্বতন ধর্মমতের বিলোপ ঘটিয়েছেন। নবি মুহাম্মদের এই ইতিহাস সৃষ্টিকারী বিশাল কর্মযজ্ঞ কোনো অর্থেই 'অলৌকিকতা'র মহিমা থেকে খাটো নয়। আলি দস্তি তাঁর বইয়ে ইসলাম এবং নবি মুহাম্মদের জীবন নিয়ে সকল রহস্যময় ও

আলঙ্কারিক মিথ্যে ভাষণের ঢালি সরিয়ে নির্মোহভাবে বস্তুবাদী ইতিহাস রচনা করেছেন। যার জন্য এই বইও ইতিহাসে ধ্রুপদী গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে।

আজকের এই একুশ শতকে গোটা মধ্যপ্রাচ্যসহ এশিয়া, আফ্রিকার মুসলিম-প্রধান দেশগুলিতে একদিকে পরাক্রমশালী রাষ্ট্রগুলোর অযাচিত হস্তক্ষেপ, অন্যদিকে সেখানকার স্বৈরতান্ত্রিক শাষকগোষ্ঠীর ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে অত্যাচার-নিপীড়ণে অতিষ্ঠ জনতা আবার আল কায়েদা, আইএস, বোকো হারাম, তালেবান ইত্যাদি জিহাদি গোষ্ঠীগুলোর নৃশংস কর্মকাণ্ডে বিশ্বের বুকে ‘ইসলাম’একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য। এই অবস্থায় ইসলামকে খাটো বা হেয় করে নয়, নবি মুহাম্মদকে নিন্দা বা অবহেলা করে নয়, যাবতীয় আধ্যাত্মিক ও গায়েবি দৃষ্টিভঙ্গি সরিয়ে প্রাকৃতিক জগতের নিয়মের লঙ্ঘন না ঘটিয়ে ‘মানব’ মুহাম্মদের বিশাল কীর্তি ও ইসলামের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসের পুনর্পাঠ অতি জরুরি। আর এই বিষয়টিই আলি দস্তির শক্তিশালী লেখনী থেকে ফুটে উঠেছে দ্বিধাহীনভাবে।

আলি দস্তি ও তাঁর বই

আশির দশকের কথিত ইসলামি বিপ্লবের আগে আলি দস্তি ছিলেন ইরানের হাতে গোণা কয়েকজন প্রগতিশীল, যুক্তিবাদী, রাজনীতিমনস্ক বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম। তিনি ছিলেন একাধারে তুখোড় সাংবাদিক, লেখক, সমাজ-চিন্তক সেইসাথে ছিল তাঁর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন। গেল শতাব্দীতে শুধু ইরান নয়, গোটা আরব দেশগুলোর মধ্যে অল্প যে কয়েকজন প্রখর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, সমাজ-ধর্ম বিশ্লেষক ও সংস্কারবাদী ভূমিকা রেখেছেন আলি দস্তি তাঁদের অন্যতম। যদি ইউরোপের রেনেসাঁসের মত কখনো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর যুক্তিবাদের আলোকায়নের তুলনা করা হয়, তবে সেই তালিকায় বিংশ শতাব্দীতে আলি দস্তি অবস্থান করবেন শীর্ষে। অথচ ধর্মতান্ত্রিক মতাদর্শে আবদ্ধ আয়াতুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বাধীন ইরানে আলি দস্তি আজ ব্রাত্যজন।

আলি দস্তির জন্ম ১৮৯৬ সালে পারস্য উপসাগরের উত্তরে অবস্থিত বুশেহর রাজ্যের দাস্তেস্তান জেলার একটি গ্রামে। তাঁর পিতার নাম শেখ আব্দুল হোসেন দাস্তেস্তানি। লেখাপড়ার হাতেখড়ি স্থানীয় মাদ্রাসায়। পরে উচ্চশিক্ষার জন্য তরুণ বয়সে আলি দস্তি উসমানীয় শাসনাধীন ইরাকের কারবালা শহরে আসেন।

ইরাকের কারবালা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ একটি শহর। ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে নবি মুহাম্মদের দৌহিত্র হোসেন বিন আলি শহীদ হয়েছেন এই প্রান্তরে; এবং এখান থেকে মাত্র ৭০ কিলোমিটার দক্ষিণে নাজাফ শহরে নবি মুহাম্মদের চাচাতো ভাই এবং জামাতা আলি বিন আবু তালিব (মৃত্যু ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে) শায়িত আছেন।

সময়টা তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুর দিক, আলি দস্তি কারবালা শহরের একটি মাদ্রাসায় ভর্তি হন। কারবালা ও নাজাফ উভয় শহরেই লেখাপড়া করেন। সেখানে তিনি ইসলামি ধর্মবিদ্যা, ইতিহাস, যুক্তিবিদ্যা, ধ্রুপদী সাহিত্য এবং আরবি ও ফার্সি ব্যাকরণ শিক্ষা লাভ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক আলোড়ন তীব্র হয়। একদিকে পতনোন্মুখ তুর্কি উসমানীয় ধর্মীয় শাসন-ব্যবস্থা, অন্যদিকে পরাক্রমশালী ব্রিটেনসহ ইউরোপের একাধিক দেশের উপনিবেশিক শাসন আর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থান মিশর, ইরাক, লেবানন, ইরান, সিরিয়াসহ বিভিন্ন দেশে নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। প্রবাস জীবনে দস্তির মধ্যে প্রবল দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। একই সাথে তিনি মার্কসীয় বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা আলোড়িত হন। তাঁর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা জন্ম নেয়। ১৯১৮ সালের দিকে ইরাক থেকে নিজ

মাতৃভূমিতে ফিরে এসে বসবাস করেন ফার্স রাজ্যের শিরাজ শহরে। পেশা হিসেবে তখন বেছে নেন সাংবাদিকতা। রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার পর তিনি থিতু হন ইরানের রাজধানী তেহরানে।

১৯২২ সালের পহেলা মার্চ আলি দস্তির সম্পাদনায় তেহরানে চালু হয় 'শাফাক-ই সরক'(লালের উদয়) নামের বামপন্থী পত্রিকা। পত্রিকাটি ১৯৩৫ সালের ১৮ই মার্চ পর্যন্ত চালু থাকলেও আলি দস্তি এই পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে ছিলেন প্রায় নয় বছরের মত। ১৯৩১ সালের পহেলা মার্চে তিনি সম্পাদকের দায়িত্ব ছেড়ে দেন নতুন সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হন মায়েল তুয়েসারকানি। সাংবাদিকতা পেশায় আসার পর থেকে আলি দস্তি তাঁর বস্তুনিষ্ঠ, নির্মোহ লেখনীর কারণে ক্ষমতাসীন শাসকদের বিরাগভাজনে পরিণত হন। ১৯১৯ সালে তাঁকে কারাগারে যেতে হয় ইঙ্গো-ইরানীয় চুক্তির বিরোধিতা করে কলাম লেখার কারণে। পরবর্তী দুই বছর তাঁকে একাধিকবার কারাগারে প্রেরণ করা হয় উপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর আগ্রাসী নীতির বিরোধিতা করায়। জেল থেকে বের হয়ে আলি দস্তি 'জেলখানার দিনলিপি'(আওয়ামী মাহবাস) নামে একটি বই প্রকাশ করেন। দস্তির প্রগতিশীল, কুসংস্কারমুক্ত বিপ্লবী চিন্তাধারা, সুগভীর পর্যবেক্ষণ-সমৃদ্ধ এবং কিছুটা রাজনৈতিক ব্যঙ্গার্থকধর্মী লেখনীর কারণে বইটি দ্রুতই বিশাল সংখ্যক পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে গোটা ইরানে। অসংখ্যবার বইটির সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। অল্প বয়সে রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং লেখক হিসেবে খ্যাতি অর্জনের ফলে দস্তির 'শাফাক-ই সরক্' পত্রিকাটিও দ্রুত পারস্যের শোষিত জনগণের মুখপত্র হয়ে দাঁড়ায়। এই পত্রিকায় রাশিদ ইয়াসমেনি, সাইদ নাফিসি, আব্বাস ইকবাল, মুহাম্মদ মুহিত তাবাতাবাইয়ের মত ইরানের খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী-ইতিহাসবিদরা কলাম লিখে নিজেদের গোড়পত্তন ঘটিয়েছেন।

এই সময়কালে আলি দস্তি ফরাসি, ইংরেজি, রুশভাষা সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। বিশেষ করে আধুনিক ফরাসি এবং রুশ সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প তাঁর শৈল্পিক মনে দারুন ছাপ ফেলে। তৎকালীন পারস্যে আলি দস্তি হচ্ছেন হাতে গোনা কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে একজন, যিনি আধুনিক আরবি সাহিত্য(বিশেষ করে মিশরীয় সাহিত্য) ও ইসলামি গ্রন্থগুলোকে বস্তুবাদী বীক্ষণে আত্মস্থ করেছেন। যে-সময়কালে পারস্যের কবি-সাহিত্যিকরা রূপক শব্দের মেলবন্ধন ঘটিয়ে জটিল বাক্য তৈরি করে একের পর এক দুর্বোধ্য আধ্যাত্মিক সাহিত্য-চর্চায় নিমগ্ন, সে-সময় আলি দস্তি সাহিত্য জগতে ছোটছোট বাক্য দিয়ে সাধাসিধে ভাষায় কিন্তু সুতীক্ষ্ণনির্মোহভাষায় লেখনীর নতুন ধারা তৈরি করেন, যা পাঠক-সমাজে ব্যাপক আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। ১৯২৭ সালে রুশ বিপ্লবের দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে তিনি আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে রাশিয়া ভ্রমণ করেন। এ-সময় ফ্রান্সসহ ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ পরিভ্রমণের সুযোগ হয় তাঁর।

উল্লেখ্য ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর থেকে ইরান হয়ে ওঠে যুদ্ধের এক বিরাট ময়দান। ব্রিটেনের সমাজতন্ত্র-বিরোধী শাসকগোষ্ঠী একাধিকবার ইরানকে ব্যবহার করে রাশিয়ায় প্রতিবিপ্লবের চেষ্টা করে। কিন্তু তা প্রতিবারই ব্যর্থ হয়। বিশ্বজুড়ে স্নায়ুযুদ্ধ শুরুর পূর্বে ইরানকে নিজের কব্জায় রাখার জন্য ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে এক-ধরনের 'পরোক্ষ স্নায়ুযুদ্ধ' বাধে তখন থেকেই। ফলে প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলির ভূমি দখলের তৎপরতায় ইরানের শাসকগোষ্ঠী আদতে ক্রীড়ানড়কে পরিণত হন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ইরান সোভিয়েত ব্লকে যোগদান করে। ১৯২৮ সালের দিকে দস্তি রাশিয়া ভ্রমণ শেষে দেশে ফিরে এলে বুশেহর আসন থেকে মজলিসের(পার্লামেন্ট) নির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হন(ইরানে তখন রেজা শাহ পাহলভি সরকার) এবং পরের টানা দুই মজলিশেও তিনি নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি হিসেবে জায়গা করে নেন। সাহিত্য-সাংবাদিকতার জগতে দস্তি সাহেব যেমন দক্ষ লেখনীশক্তির কারণে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন, তেমনি মজলিসে এসে সুদক্ষ বক্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। কিন্তু ১৯৩৫ সালের দিকে ইরানের নবম মজলিস ভেঙে গেলে তাঁকে চৌদ্দ মাসের জন্য গৃহবন্দী করে রাখা হয়। ১৯৩৯ সালে তিনি পুনরায় নির্বাচিত হন তেহরানের নিকটবর্তী দামাবন্দ আসন থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে (১৯৪১ সালে) ইঙ্গো-রাশিয়ীয় উপনিবেশিক বাহিনী বাদশাহ রেজা শাহ পাহলভিকে (১৮৭৮-১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ) ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদের পর আলি দস্তি একই আসন

(১৯৪১ ও ১৯৪৩ সালে) থেকে নির্বাচিত হন। ইরানের প্রগতিশীল ও সমাজ-সংস্কারবাদী রাজনৈতিক দল 'আদালত পার্টি'র নেতৃস্থানীয় ছিলেন তিনি। ১৯৪৬ সালের শুরুর দিকে ইরানে সোভিয়েত প্রভাবিত তুদেহ পার্টি ক্ষমতায়। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আহমদ কাভাম সালতানাহ (১৮৭৬-১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি ইরানে পাঁচবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। ইরানের তেল সম্পদের মালিকানা এবং খনি থেকে তেল উত্তোলনের জন্য চুক্তি করতে প্রবল আগ্রহী সোভিয়েত ইউনিয়ন। আলি দস্তি তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং দেশাত্মবোধের কারণে এই চুক্তির কতিপয় ধারা নিয়ে প্রশ্ন তুলেন মজলিসে, যা তুদেহ পার্টিকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। ফলে পুনরায় একই বছরের এপ্রিল মাসে জেলে প্রেরণ করা হয়। ছয় মাস জেল খেটে বের হবার পর তাঁকে নিরাপত্তার জন্য ফ্রান্সে আশ্রয় নিতে হয়। বছর দুয়েক সেখানে থেকে ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে তিনি পুনরায় মাতৃভূমিতে ফিরে আসেন। এরপর তিনি ধারাবাহিকভাবে মিশর ও লেবাননের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৫১ সালের মাঝামাঝি সময়ে হোসেন আলা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে (মুহাম্মদ মুসাদ্দেকের ক্ষমতা গ্রহণের আগে) সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আলি দস্তি পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৫৪ সালে তিনি ইরানের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষের সিনেটর নিযুক্ত হন। ইরানের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষে অর্ধেক সংখ্যক সিনেটর জনতার ভোটে নির্বাচিত হতেন আর বাকি অর্ধেক শাহ সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীরা নিযুক্ত হতেন। ১৯৭৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ইসলামি বিপ্লবে ইরানের শাহানশাহ মুহাম্মদ রেজা শাহ পাহলভির ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদের আগ পর্যন্ত পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষের সিনেটর ছিলেন আলি দস্তি।

রাজনৈতিক জীবনের মত দস্তির সাহিত্যিক জীবনও এরূপভাবে মুখরিত। ১৯৪৬ সালে 'সায়া' নামে প্রকাশিত প্রবন্ধ-গ্রন্থে ইরানের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ সংস্কার ঘটিয়ে আধুনিক সমাজ বিনির্মাণের আহ্বান জানিয়েছেন জোরালোভাবে। ১৯৩৬ সালের আগ পর্যন্ত ইরানে পর্দা-প্রথার প্রচলন তেমন ছিল না। ওই বছরে স্থাপিত তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়ে একত্রে লেখাপড়া করতো। ১৯৬৩ সালে ইরানে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে মেয়েদের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করা হয় এবং পার্লামেন্টে প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ানোর সুযোগ দেয়া হয়। পারিবারিক নিরাপত্তা আইন সংশোধনের মাধ্যমে নারীদের তালাক প্রদানের অধিকার দেয়া হয়, সন্তানকে মায়ের জিম্মায় দেয়ার আইনি নির্দেশ দেয়া হয়। মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৩ থেকে ১৮ নির্ধারণ করা হয় এবং ছেলেদের দ্বিতীয় বিয়ের জন্য আদালতের অনুমতির নির্দেশ বাধ্যতামূলক করা হয়। ইসলামি বিপ্লবের প্রাক্কালে ইরানের পার্লামেন্টে ২২জন নারী সাংসদ ছিলেন এবং স্থানীয় পর্যায়ে ৩৩৩ জন নারী কাউন্সিলর দায়িত্ব পালন করছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী ছিলেন নারী। সরকারি বেসামরিক পদে প্রায় ১ লক্ষ ৪৬ হাজার নারী চাকুরিজীবী কর্মরত ছিলেন। কিন্তু খোমেনির বিপ্লবের পর ইরানের অবস্থা পাল্টে যায়। সরকারি সকল পদ থেকে নারীদের অপসারণ করা হয়। স্কুল-মাদ্রাসার একদম প্রথম শ্রেণি থেকে মেয়েদের জন্য 'হিজাব' পরা বাধ্যতামূলক করা হয়। ইরানের পরিবারিক আইন সংশোধন করে নারী-অধিকার বিঘ্নিত করা হয়। পুরুষদের সুবিধা মত তালাকের সুযোগ করে দেয়া হয় এবং সন্তানকে পুরুষের জিম্মায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়। সমাজে বহুগামিতার যে আইনি বাধ্যবাধকতা ছিল সেটা তুলে দেয়া হয়। এমন কী, মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮ করা হয়েছিল সেটাকে কেটে ইসলামি শাস্ত্র মেনে ৯ বছর করা হয়। ১৯৮১ সালে ইরানের মোল্লাতান্ত্রিক সরকার পার্লামেন্টে একটি বিল পাস করেন, যেখানে বলা হয়েছে, 'ইসলামি ড্রেস কোড'কেউ ভঙ্গ করলে ব্যভিচারের শামিল বলে গণ্য করা হবে এবং এ-জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। আলি দস্তি তাঁর 'ফিৎনা' (১৯৪৩ ও ১৯৪৯), 'জাদু'(১৯৫১) এবং 'হেন্দু' (১৯৫৫) উপন্যাসগুলিতে পারস্যের সমাজের নারীর প্রতি বৈষম্য, ধর্মীয় বিধি-নিষেধ, নিপীড়ণের বর্ণনা দিয়েছেন চমৎকার ভঙ্গিমায়।

এরপর আলি দস্তি ইসলাম বিষয়ে লেখনীতে মনোনিবেশ করেন। শৈশবকালের মাদ্রাসা-শিক্ষা, আধুনিক মিশরীয় ও ইউরোপের রেনেসাঁসের প্রভাবে সমুজ্জ্বল বিশ্লেষণধর্মী যুক্তিবাদী রচনাগুলো তাঁকে প্রেরণা দান করে। ইসলামি সুফিবাদের উপর লেখা 'পর্দা-ইয়ে পিঞ্জর'(১৯৭৪), ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা ও নিয়তিবাদীর মধ্যেকার কথোপকথন নিয়ে রচিত 'জবর ইয়া এখতিয়ার'(প্রকাশনার সঠিক তারিখ জানা যায় না। সম্ভবত ১৯৭১ সালে এটি প্রকাশিত হয়), ধর্মীয় চিন্তাবিদ মুহাম্মদ আল-গাজ্জালির বক্তব্যের যৌক্তিক

সমালোচনা করে লিখিত 'আকলা বার খেলাফ-ই আকল'(প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫ এবং এরপরে আরও দুইবার পুনঃপ্রকাশিত হয়) এবং 'পর্দা-ইয়ে পিঞ্জর' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড 'দার দিয়ারে সুফিয়ান'(১৯৭৫) গ্রন্থগুলি আলি দস্তিকে ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা দান করে। তবে আলি দস্তির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে 'বিশত ও সেহ সাল'। বিষয়বস্তুর কারণে এই বইটি প্রকাশের সঠিক তারিখ ও স্থান কখনো প্রকাশ করা হয়নি। তবে ধারণা করা হয় এবং আলি দস্তির নিজস্ব বক্তব্য অনুযায়ী ১৯৭৪ সালের আগে লেবাননের বৈরুত থেকে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। নবি মুহাম্মদের নবুওতির বস্তুবাদী ইতিহাস নিয়ে ফার্সি ভাষায় রচিত এই বইটি শুধু ইরানে নয় গোটা মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দেয়।

'বিশত ও সেহ সাল' বইটি ইরানের ধর্মীয় চিন্তাবিদদের ব্যাপক ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গোটা ইরান জুড়ে ১৯৭১ সালের শুরুর দিকে মার্কসবাদী ও ইসলামপন্থীদের মধ্যেকার সংঘর্ষ যখন তীব্র হয়ে ওঠে তখন রাষ্ট্রীয় সেন্সরশিপ আরোপের বিধিবিধান কার্যকর হতে থাকে একের পর এক। আলি দস্তির বইটি বিদেশে (বৈরুতে) প্রকাশিত হলেও ইরান সরকার কোনো ধরনের নাম-প্রকাশ ব্যতিরেকে বইটি বাজেয়াপ্ত করে।

কথিত ইসলামি বিপ্লবের পরপরই ইরানের খোমেনি সরকার আশি ঊর্ধ্ব আলি দস্তিকে গ্রেফতার করে গোপন কারাগারে নিয়ে যায়। তাঁর প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা, তাঁর লেখনী বিশেষ করে 'বিশত ও সেহ সাল'বইটি প্রকাশের জন্য 'ধর্মদ্রোহিতা'র অভিযোগ তুলে রিমান্ডে নিয়ে প্রচণ্ড নির্যাতন করা হয়। প্রহারের ফলে দস্তির ঊরুর হাড় ভেঙে যায়। এরপর গণমাধ্যমে আলি দস্তি সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রকাশিত হয়নি। লোকমুখে শোনা যায় তাঁকে একসময় গোপনে ছেড়ে দেয়া হয়। বয়স বিবেচনায় হোক অথবা অসুস্থতার কারণেই হোক ঠিক কিভাবে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন তা পরিষ্কার নয়। তবে কারাগার থেকে মুক্তি পেলেও তাঁকে নিজ বাড়িতে ফিরতে দেয়া হয়নি। তেহরানের উত্তরে জারগান্ধে উপশহরে একখণ্ড বাগান নিয়ে ছিল তাঁর ছোট্ট একটি কুটির। এরপর অনেকটা আকস্মিকভাবে ইরানের পাক্ষিক পত্রিকা 'আয়ান্দা'(সংখ্যা ২২ ডিসেম্বর ১৯৮১-২০ জানুয়ারি ১৯৮২) ছোট করে আলি দস্তির মৃত্যুসংবাদ প্রচার করে। ব্যাস এতটুকুই। ইরানের সরকারের কাছ থেকে এরপর আলি দস্তি সম্পর্কে আর কোনো তথ্য কখনো প্রকাশিত হয়নি।

'বিশত ও সেহ সাল' থেকে 'টুয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স'

আলি দস্তির সাথে ইংরেজ অনুবাদক এফ. আর. সি. ব্যাগলির (F. R. C. Bagley) প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৭৫ সালের বসন্তে তেহরানে এক বন্ধুর বাড়িতে আড্ডা দেবার সময়। দস্তির প্রাণোবন্ত চেহারা আর ভরাট কণ্ঠস্বর সহজেই নজর কাড়ে অনুবাদকের। গল্প, চুটকি আর ঠাট্টার মাধ্যমে পরিচয়। আলি দস্তি এফ. আর. সি. ব্যাগলিকে 'বিশত ও সেহ সাল'বইটি উপহার দেন এবং অনুরোধ করেন সম্ভব হলে ইংরেজিতে অনুবাদ করার জন্য। তবে তাঁর মৃত্যুর আগে যেন অনুবাদটি প্রকাশিত না হয়। ১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পুনরায় সাক্ষাৎ হলে আলি দস্তি তাঁর পূর্বের অনুরোধের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। পরের বছরে জুন মাসে আলি দস্তির প্যারিস ও লন্ডনে একটি সংক্ষিপ্ত সফরের সময় অনুবাদ নিয়ে ফোনালাপ ও চিঠি চালাচালি হয়েছে দুজনের।

আলি দস্তির মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হওয়ার পরই বই প্রকাশে উদ্যোগী হন অনুবাদক এফ. আর. সি. ব্যাগলি। ১৯৮৫ সালে লন্ডন থেকে 'টুয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স: অ্যা স্টাডি অব দ্যা প্রফেটিক ক্যারিয়ার অব মুহাম্মদ' শিরোনামে বইটি হার্ডকাভারে প্রথম ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। এরপর বইটি আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার মাজদা পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে। মাজদা পাবলিশার্স থেকে বইটির ১৯৮৫ ও ১৯৯৪ সালে দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। হার্ডকাভার ও পেপারব্যাক মুদ্রণে বইটি বাজারে পাওয়া যায়।

‘টুয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স’ থেকে ‘নবি মুহাম্মদের ২৩ বছর’

আলি দস্তির বইটি বাংলায় অনুবাদের জন্য আমরা এফ. আর. সি. ব্যাগলি অনূদিত মাজদা পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত (১৯৯৪ সালের সংস্করণ) বইটির সাহায্য নিয়েছি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে সমাজ-সচেতন ও নির্মোহ হয়ে ইসলামের ইতিহাস পাঠের জন্য আলি দস্তির বই একটি অনন্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থ মূলভাব বজায় রেখে বাংলায় সহজবোধ্য ভাষায় অনুবাদের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। আলি দস্তি তাঁর বইয়ে আয়াত উদ্ধৃতির জন্য মূল আরবি কোরান ব্যবহার করেছেন। আমরা কোরানের আয়াত বাংলায় ব্যবহার করার জন্য একাধিক বাংলায় অনূদিত কোরান অনুসরণ করেছি। মাওলা ব্রাদার্স থেকে প্রয়াত সাবেক বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের ‘কোরান শরিফ: সরল বঙ্গানুবাদ’, মাসিক মদিনা’র সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দিন খান অনূদিত ‘তফসীর মারেফুল কোরআন’ এবং হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদের অনূদিত ‘কোরআন শরীফ’- এর সহায়তা নিয়েছি। ইংরেজি বইটির মূলভাব বজায় রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে। তবে কিছু জায়গায় তৃতীয় বন্ধনী ব্যবহার করে অনুবাদকের নিজস্ব মন্তব্য ও ভাবনা আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুবাদকের মন্তব্যে কিছু জায়গায় তথ্যসূত্র হিসেবে হাদিস নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। আমেরিকার সাউথদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘সেন্টার ফর মুসলিম-জিউস এনগেজমেন্ট’- এর উদ্যোগে পরিচালিত কোরান ও হাদিসের অনলাইন আর্কাইভ রয়েছে। হাদিসের জন্য এই সাইটের অনলাইন ঠিকানা : http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/। এখানে বুখারি’র হাদিস ছাড়াও রয়েছে মুসলিম শরিফ, দাউদ শরিফের বিশাল অনলাইন সংগ্রহ। ইউরোপ-আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লক্ষাধিক শিক্ষার্থী, লেখক, পাঠক, ধর্মীয়-গবেষক এই সাইট ব্যবহার করে থাকেন সহজবোধ্য ইংরেজি ও সহজে ব্যবহার-উপযোগী বলে। অনুবাদের সময় হাদিসের সূত্র ব্যবহারে আমরা এই সাইটে ব্যবহৃত ধারাবাহিকতা অনুসরণ করেছি। এছাড়া অনেক জায়গায় বাংলায় হাদিস অনুবাদের জন্য বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থ ‘বুখারী শরীফ’ এর সহায়তা নেয়া হয়েছে। আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য, আলি দস্তির ব্যবহৃত কোরানের আয়াতের নম্বরের সাথে বর্তমানে প্রচলিত কোরানের আয়াত নম্বর পুরোপুরি মিলে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আয়াতের নম্বরে দুয়েকটি সংখ্যার উপর-নিচ হতে দেখা যায়। এই ক্ষেত্রে আমরা আলি দস্তির লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করিনি। দস্তির বইয়ে উদ্ধৃত কোরানের আয়াতের সাথে বর্তমানে প্রচলিত কোরানের আয়াত মিলিয়ে নিয়ে সেই নাম্বারটি ব্যবহার করেছি। আশা করি এর ফলে মূল বিষয়ের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি।

সবশেষে বলতে চাই, আমাদের এই অনুবাদটি গ্রন্থ আকারে প্রকাশের জন্য একাধিক তরুণ অপরিসীম সহায়তা করেছেন। পাণ্ডুলিপির প্রুফ দেখা, সংশোধন, সম্পাদনা ইত্যাদি পরিশ্রমী কাজে দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের নিরলস শ্রমের বিনিময়ে পুস্তকারে প্রকাশে আলোর মুখ দেখতে পাচ্ছে, এজন্য তাঁদেরকে অশেষ ধন্যবাদ।

আবুল কাশেম ও সৈকত চৌধুরী
১০ জানুয়ারি, ২০১৫

যোগাযোগ: *laniakea1809@gmail.com*

প্রথম অধ্যায়

নবি মুহাম্মদ

জন্ম পরিচিতি

‘পথ খুঁজি আমি,   কিন্তু কাবা- মসজিদের পথ নয়। জানি ঐ কাবায় আছে একদল পৌত্তলিক আর এর মসজিদে একদল পূজারী।’- জালালুদ্দিন রুমি।

মক্কায় ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে আমিনা বিনতে ওহাব এক শিশুর জন্ম দেন। শিশুর চোখ খোলার আগে তাঁর পিতা আবদুল্লাহ মারা যান। আর শিশুর বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তাঁর মা আমিনা মারা যান। এরপর শিশুটির দেখাশোনার ভার বর্তায় তাঁর প্রভাবশালী ও উদার পিতামহ আব্দুল মোতালেবের উপর। কয়েক বছর পর শিশুর পিতামহও মারা যান। ঐ শিশুর অনেক বিত্তবান চাচা থাকা সত্ত্বেও লালন-পালনের দায়িত্ব নেন তাঁর সবচেয়ে দরিদ্র চাচা আবু তালিব। দরিদ্র অথচ সাহসী আবু তালিবের যত্নেলালিত এই শিশুই পরে বিকাশিত হন বিশ্বের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং একজন অনন্যসাধারণ মহাপুরুষ রূপে। সম্ভবত ইতিহাসে এই লব্ধপ্রতিষ্ঠিত মহামানবের দৃষ্টান্ত আর কখনো দেখা যায়নি বা যাবেও না।

এই অসাধারণ ব্যক্তির জীবন নিয়ে সহস্র পুস্তক রচিত হয়েছে। বিশেষত তাঁর জীবনের শেষ তেইশ বছরের ঘটনাপ্রবাহ, এবং সমস্ত কিছু যা তিনি বলেছেন এবং করেছেন তা নিয়ে প্রচুর লেখা রয়েছে। বিদগ্ধজন এবং গবেষকেরা এই মহাপুরুষের জীবনের উপর যত কাজ করেছেন তা আর কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তির উপর হয়নি। এতদসত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তাঁর উপর যুক্তিসিদ্ধ এবং বস্তুনিষ্ঠ কোনো পুস্তক, যার মধ্যে কোনো অতিরঞ্জিত উগ্র যুক্তিহীন এবং কাল্পনিক ব্যাপার নেই-এরকম বই বোধহয় রচিত হয়নি।

দেখা যায় যে মুসলিম এবং অন্যান্যরা যাঁরা মুহাম্মদের জীবন নিয়ে ব্যগ্র, তাঁরা ঐতিহাসিক সত্য অগ্রাহ্য করেন। তাঁরা সর্বদা মুহাম্মদকে এক কাল্পনিক অতিমানব বা ‘কাপড়ে ঢাকা দ্বিতীয় ঈশ্বর’হিসেবে পরিচিত করতে সচেষ্ট। এটা করতে গিয়ে তারা মানুষ মুহাম্মদকে বারেবারে উপেক্ষা করে গেছেন। এর ফলে তারা প্রকৃতিতে কার্যকারণের যে অমোঘ নিয়ম বিদ্যমান তা এড়িয়ে গেছেন। তাই তাঁদের বর্ণনায় শুধু দেখা যায় কাল্পনিক এবং অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ।

মুহাম্মদের জীবনের প্রথম চল্লিশ বছর, অর্থাৎ ৬১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, তেমন কিছু জানা যায় না। নবির জীবনীতে অথবা লোকপ্রবাদেও এই সময়ের কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু হঠাৎ করে তৃতীয় হিজরি বা নবম শতাব্দীতে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক এবং কোরানের তফসিরকারক আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরির আল-তাবারি‘ সুরা বাকারা’র ২৩ নম্বর আয়াতের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে মুহাম্মদের জন্ম নিয়ে এক ভিত্তিহীন দাবি করেন। এ থেকে বোঝা যায় সেই সময় সাধারণ মানুষ নবির জীবন-কাহিনী নিয়ে প্রচুর কাল্পনিক বক্তব্যে বিশ্বাস করতো। এমন কী কাল্পনিক লোককথার প্রভাব থেকে তাবারির মতো ঐতিহাসিকও মুক্ত ছিলেন না। সুরা বাকারা’র ঐ আয়াতে বলা হয়েছে : ‘আমি আমার দাসের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে

তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা তার মতো কোনো সুরা আনো। আর তোমরা যদি সত্য বল, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সব সাক্ষীকে ডাকো।'(২:২৩)। তাবারি এই আয়াতের তফসির করতে গিয়ে নিজস্ব মন্তব্য যোগ করেছেন : 'নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে মক্কায় একবার লোকমুখে কথা রটলো যে, আল্লাহ মুহাম্মদ নামে এক ব্যক্তিকে তাঁর প্রেরিত পুরুষ (রসুল) হিসেবে পাঠাবেন এবং পূর্ব ও পশ্চিমে যা কিছু আছে তার সবই ঐ ব্যক্তির আয়ত্তে আসবে। সে-সময় মক্কার চল্লিশজন নারী গর্ভবতী ছিল। গর্ভবতী প্রত্যেক মাতা চাচ্ছিলেন তার শিশু সেই প্রেরিত পুরুষ হোক। তাই শিশুর জন্মের সাথে সাথে প্রত্যেক মাতা তার পুত্রের নাম মুহাম্মদ রাখলেন।'

উপরের উক্তি যে বাস্তবতাবর্জিত তা বলা নিষ্প্রয়োজন। সে সময় মক্কায় কেউ এই ধরনের গুজব শুনেনি অথবা কেউই মুহাম্মদ নামে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ সমন্ধে অবহিত ছিল না। মুহাম্মদের অভিভাবক আবু তালিব এ-ব্যাপারে কিছু না জেনেই অথবা কিছু না শুনেই এবং ইসলামে দীক্ষিত না হয়েই মারা যান। নবুওতের স্বীকৃতি পাবার পূর্বে মুহাম্মদ কোনোদিনও ভাবতে পারেননি যে তিনি নবি হতে যাচ্ছেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় সুরা ইউনুসের ১৬ আয়াতে : 'বলো, আল্লাহর তেমন ইচ্ছা থাকলে আমি তোমাদের কাছে এটি পড়তাম না, আর তিনি তোমাদেরকে এ-বিষয়ে জানাতেন না। আমি তো এর আগে তোমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল কাটিয়ে দিলাম, তবুও কি তোমরা বুঝবে না?'(১০:১৬)। মক্কার ইতিহাসে কখনো জানা যায় না যে,৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মাত্র চল্লিশজন নারী সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন এবং প্রত্যেকেই তার শিশুর নাম রাখেন মুহাম্মদ। এটা কী বিশ্বাসযোগ্য যে, সে-সময় মুহাম্মদ তাঁর সমবয়সী ও একই নামধারী চল্লিশজন খেলার সাথী পেয়েছিলেন?

ঐতিহাসিক ওয়াকেদি[২] নবির জন্ম সম্পর্কে তাবারি থেকে ভিন্ন তথ্য দিয়েছেন। ওয়াকেদি লিখেছেন : 'মাতৃগর্ভ থেকে বের হয়েই মুহাম্মদ উচ্চারণ করেন- 'আল্লাহ সবার ঊর্ধ্বে'। এক মাস বয়সে মুহাম্মদ হামাগুড়ি দিতে থাকেন, দুই মাসে দাঁড়িয়ে যান, তিন মাসে হাঁটতে শুরু করেন, চার মাসে দৌঁড়াতে পারেনএবং নয় মাস বয়সে তীর ছুঁড়তে থাকেন।' উল্লেখ্য মির্জা জানি কাশানি (মৃত্যু ১২৬৮ হিজরি বা ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর 'নাকাত আল-কাফ'[৩] বইয়েও বাহাই মতাদর্শের প্রতিষ্ঠাতা 'সাইয়েদ আলি মুহাম্মদ সিরাজি' সম্পর্কে একই ধরনের বক্তব্য লিখেছেন। যদিও বাহাই সম্প্রদায় পরে এই ধরনের প্রচারণাকে চাপা দেবার প্রয়াস চালায়। মির্জা কাশানির বক্তব্য অনুযায়ী সাইয়েদ আলি জন্মের সাথে সাথে নাকি উচ্চারণ করেছিলেন : 'আল্লাহই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।'যা-হোক ওয়াকেদি যেমনটা বলেছেন মক্কায় এধরনের অলৌকিক কিছু হয়ে থাকলে তখনকার পৌত্তলিক মক্কাবাসীরা নিশ্চয়ই জানতেন এবং মুহাম্মদের কাছে শুরুতেই মাথা নত করতেন।

উপরে উল্লেখিত উদাহরণ থেকে সে-সময়কার মুসলমানদের মধ্যে অবাস্তব এবং ইতিহাসের নামে কাল্পনিক কাহিনী রচনার প্রবণতা দেখা যায়। আবার অনেক পাশ্চাত্য খ্রিস্টান লেখক কোনো যুক্তিপূর্ণ আলোচনা ছাড়াই মুহাম্মদকে মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, যোদ্ধা, ক্ষমতালোভী এবং লম্পট বলে প্রচার করে থাকেন। আদতে এই দুই দলের কেউই হজরত মুহাম্মদ সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে বাস্তব এবং প্রকৃত তথ্য তুলে ধরেননি। এর কারণ হতে পারে ভাবাদর্শের প্রতি গভীর আসক্তি। রাজনৈতিক, ধর্মীয় অথবা গোত্রীয় হোক, সে পুরুষ অথবা নারীই হোক অন্ধভাবাদর্শে বিভোর একজন ব্যক্তি তার পরিষ্কার বিশ্লেষণী চিন্তা করতে অক্ষম। ভাল-মন্দ সম্পর্কে তার পূর্বধারণা তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। হৃদয়ে প্রোথিত ব্যক্তিপ্রেম কিংবা ব্যক্তি-ঘৃণা এবং উগ্র মৌলবাদী চিন্তা ও সংস্কার তাকে ঘিরে রাখে সবসময়। এর ফলাফল হয় কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি কুয়াশাচ্ছন্ন এবং অবাস্তব কল্পনায় বিভোর থাকেন।

নিঃসন্দেহে হজরত মুহাম্মদ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। যেসব গুণের জন্য মুহাম্মদকে অন্যদের থেকে পৃথক করা যেতে পারে সেগুলো হচ্ছে-তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, চিন্তার গভীরতা এবং তৎকালীন সর্বপ্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আপোষহীন মনোভাব। তাঁর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি এবং কর্মশক্তি যা দিয়ে তিনি একাই পাপকার্যের বিরদ্ধে লড়ে গেছেন। প্রতারণা এবং অনৈতিকতার বিরুদ্ধে তিনি সবাইকে সাবধান করে দিয়েছেন। অন্যায়, অসত্য, স্বার্থপরায়ণতাকে তিনি প্রবলভাবে

তিরস্কার করেছেন। বঞ্চিত, নিপীড়িত এবং হতদরিদ্রের পাশে তিনি দাঁড়িয়েছেন আজীবন। স্বদেশবাসীকে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মূর্তিপূজার জন্য ভর্ৎসনা করেছেন। স্বাভাবিকভাবে মক্কাবাসী যারা তখন সম্মানিত এবং ক্ষমতাশালী ছিল তারা নবির কথায় কর্ণপাত করেননি। নবির আহ্বানে সাড়া দেয়ার অর্থ ছিল, তাদের শত বছরের লালিত সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা এবং ধর্মবিশ্বাস পরিহার করা। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধর্মীয় বিশ্বাস তাদের কাছেও ছিল একমাত্র সত্য এবং এই বিশ্বাসের বাইরে ভিন্ন কিছু তারা চিন্তা করতে পারতেন না।

তবে মক্কার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে সবচেয়ে যে বিষয়টি অসন্তুষ্টির কারণ ছিল তা হলো মুহাম্মদ তাঁদের শতাধিক বছরের সনাতন সামাজিক কাঠামো ভেঙে দিতে চাচ্ছিলেন। অথচ মুহাম্মদের সামাজিক পদমর্যাদা ছিল তাদের চেয়ে নিচুতে। মুহাম্মদ কুরাইশ গোত্রের হলেও তাঁর সামাজিক পদমর্যাদা তাদের পর্যায়ে ছিল না। এর কারণ হচ্ছে ছোটবেলা থেকেই মুহাম্মদ ছিলেন এতিম এবং লালিত-পালিত হয়েছিলেন তাঁর এক চাচার অনুগ্রহে। মুহাম্মদের শৈশব কেটেছে চাচা এবং প্রতিবেশীদের উটের রাখাল হিসেবে। জীবিকার তাগিদে অল্প বয়সে খাদিজা নামের এক বিত্তবান মহিলার কর্মচারী হিসেবে যোগ দেন তিনি। তখন মুহাম্মদের কিছুটা সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তথাপি মুহাম্মদ কুরাইশ নেতাদের কাছে একজন সাধারণ ব্যক্তি হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। এই 'অপাংক্তেয়' ব্যক্তি সহসা নিজেকে আল্লাহর এক নবি বলে ঘোষণা করে কুরাইশদের উপর কর্তৃত্ব দাবি করে তাদেরকে নতুন ধর্মীয় শিক্ষা দিতে চাইলেস্বাভাবিকভাবেই কুরাইশরা তা মানতে রাজি ছিলেন না।

ইসলাম প্রচারের শুরুর দিকে কুরাইশ নেতাদের মনোভাব বোঝা যায় ওয়ালিদ বিন আল-মুগিরার একটি দাম্ভিক উক্তিতে। মুহাম্মদের নবুওতির প্রারম্ভে ওয়ালিদ বিন আল-মুগিরা ছিলেন কুরাইশদের মাখজুম গোত্রের প্রভাবশালী নেতা। তিনি মারা যান ৬১৫ খ্রিস্টাব্দের কোনো এক সময়ে। ওয়ালিদ বিন আল-মুগিরা একবার মন্তব্য করেছিলেন : 'যখন কুরাইশরা আমার মতো নেতা পেয়েছে এবং বানু তামিমের নেতা হচ্ছে ওরওয়া বিন মাসুদ, তখন মুহাম্মদ কেমন করে নিজেকে নবি দাবি করেন?'কোরানের সুরা জুখরুফে মুগিরার বক্তব্য উঠে এসেছে এভাবে : 'আর এরা বলে কোরান কেন অবতীর্ণ হল না দুই জনপদের (মক্কা ও তায়েফের) কোনো বড়লোকের ওপর?'এরা কি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ বণ্টন করে? আমি তাদের পার্থিব জীবনে তাদের মধ্যে জীবিকা বণ্টন করি, আর এককে অপরের ওপর মর্যাদায় উন্নত করি যাতে তারা একে অপরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারে। আর তারা যা জমা করে তার চেয়ে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ অনেক ভালো।' (৪৩: ৩১-৩২)।

ঐ সময়ে মাখজুম গোত্র মক্কায় বেশ সুবিধাজনক পর্যায়ে ছিল। কুরাইশদের মধ্যে আবদে মনাফ বংশ একাধিক কয়েকটি ছোট দলে বিভাজিত হয়ে গিয়েছিল তাঁর পুত্রদের বিভাজনের ফলে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে হাশেমি বংশ এবং ধনাঢ্য আবদে শামস বংশ ও তাঁর পুত্র উমাইয়া বংশ। মুহাম্মদ জন্মেছিলেন হাশেমি বংশে। আবু জেহেল[৪] তখন মাখজুম গোত্রের পরবর্তী প্রধান হবেন ঠিক হয়েছিলেন। মুহাম্মদের নবুওতি নিয়ে আবু জেহেল আরেকটি বংশের নেতা আকনাস বিন শারিককে বলেন,'প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রে আমরা আবদে মনাফের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। সর্ববিষয়েই আমরা প্রায় তাঁদের সমকক্ষ হয়ে এসেছি। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে তাঁদের একজন নবুওতির দাবি নিয়ে হাজির হয়েছে। বানু মনাফ এইভাবেই পুনরায় আমাদের উপর তাঁদের প্রভুত্ব টিকিয়ে রাখতে চাচ্ছে।'

এই বক্তব্যগুলি থেকে মুহাম্মদের নবুওতি নিয়ে আমরা কুরাইশ নেতাদের মনোভাব বুঝতে পারি। বোঝাই যায় তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল নেতিবাচক। তারা কোনোভাবে একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করতেন না। আবার তাদের মধ্য থেকেই একজন ব্যক্তি ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদেরকে ধর্ম শিক্ষা দিতে আসছেন-এটা তারা কোনোভাবে মানতে পারছিলেন না। কোরানের বিভিন্ন আয়াতে তাদের এই প্রতিবাদ-আপত্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন সুরা আনআম : আয়াত ৮; সুরা হুদ : আয়াত ১৩-১৪; সুরা ফুরকান : আয়াত ৭-৮। কুরাইশরা বললেন, আল্লাহ যদি সত্যি পরিচালিত করতে চাইতেন তবে কোনোভাবেই তাদের মধ্য

থেকে একজন ব্যক্তিকে নিয়োগ করতেন না। তিনি কোনো ফেরেশতা বা দেবদূত পাঠিয়ে দিতেন। তাদের এই বক্তব্যের উত্তরে মুহাম্মদ কোরানের আয়াত নিয়ে আসলেন : 'বলো, ফেরেশতারা যদি নিশ্চিন্ত হয়ে পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করতে পারত তবে আমি আকাশ থেকে এক ফেরেশতাকেই ওদের কাছে রসুল করে পাঠাতাম।' (সুরা বনি-ইসরাইল : আয়াত ৯৫)।

আসল কথা হচ্ছে মক্কার নেতারা মুহাম্মদের ভিন্নধরনের চিন্তাভাবনা এবং ভাবধারা প্রসঙ্গে কোনো আলোচনা করতে চাইলেন না। তারা আগ্রহী হয়ে মুহাম্মদের কোনো কথা শুনতে রাজি ছিলেন না। মুহাম্মদের চিন্তাভাবনায় তাদের সমাজের উন্নতি হতে পারে এই মনোভাব তাদের মধ্যে কখনো ছিল না। তারা যুক্তি এবং সুসংগতভাবে মুহাম্মদের মতামতের সত্যতা যাচাইয়ে মোটেও আগ্রহী ছিলেন না। তবে যে কোনো সমাজ যতই খারাপ হোক না কেন, ঐ সমাজে সবসময়ই কোনো না কোনো সৎ মানুষ পাওয়া যায় যারা নির্মোহ এবং নির্মল চিন্তার মাধ্যমে সত্য উপলব্ধি করতে পারেন, সেই সত্য যে কেউ বলুক না কেন। মক্কাবাসীর মধ্যে হজরত আবু বকরকে ধরা যেতে পারে প্রথম ব্যক্তি, যিনি মুহাম্মদের বাণীর সত্যতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আবু বকরের উদাহরণ দেখে আরও কয়েকজন কুরাইশ ব্যক্তি, যেমন আব্দুর রহমান বিন আউফ, উসমান বিন আফফান, জুবায়ের বিন আল-আওয়াম, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ এবং সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ইসলাম গ্রহণ করেন। আবার প্রত্যেক সমাজেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হতদরিদ্র লোক থাকেন যারা সমাজের ধনী ব্যক্তির সম্পদের কোনো কিছুই পান না। ফলে এরা প্রচলিত সমাজধারার প্রতি থাকেন বিক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট। মক্কার এই দুই দল মুহাম্মদের মতবাদের প্রশংসা করে তাঁর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এই পরিস্থিতিতে সংঘাত ছিল অনিবার্য। মক্কার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক ছিল বিত্তবানদের সমর্থক এবং বিত্তবানরাও তাদের সম্পদ ও অর্থের জন্য ছিল গর্বিত। যে মুষ্টিমেয় সংখ্যালঘু জনতা মুহাম্মদের সমর্থক ছিলেন তারা ভাবলেন মুহাম্মদের নতুন মতবাদের মাধ্যমে তাদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত হবে। ফলে সমাজে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তারা সবরকম ত্যাগ এবং লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। নবি জীবিত থাকালীন সময়ে এই অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পরিমিত পর্যায়ে ছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এই আন্দোলন ক্রমশ গতিশীল হতে থাকে। ফলে জনসাধারণের মাঝে মুহাম্মদ হয়ে পড়েন একজন অতিমানব এবং তারা তাঁকে ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ হতে যে-সব গুণের দরকার সেই গুণাবলী দ্বারা আবৃত করে ফেলেন। এদিকে ঈশ্বর বা আল্লাহ হলেন সৃষ্টিকর্তা এবং পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রক।

নবি মুহাম্মদ সম্পর্কে এ-ধরনের অলীক কল্পনা কেমন করে দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল তার একটা উজ্জ্বল উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। উদাহরণটি অত্যন্ত পরিষ্কার এবং অখণ্ডনীয়। মুসলমানরা মনে করেন কোরানই হচ্ছে একমাত্র চূড়ান্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ। কোরানের মক্কি সুরা বনি-ইসরাইলের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে এক রাতে নবি স্বর্গে ভ্রমণ করেছেন। আয়াতটি খুব সরল এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যাখ্যাসাধ্য। আয়াতে বলা হয়েছে : 'পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর দাসকে তাঁর নিদর্শন দেখাবার জন্য রাত্রে সফর করিয়েছিলেন মসজিদ-উল-হারাম থেকে মসজিদ-উল-আকসায়, যেখানে পরিবেশ তাঁরই আর্শীবাদপূত। তিনি তো সব শোনেন, সব দেখেন।'(১৭:১)। আয়াতটিতে যা বলা হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে আধ্যাত্মিক ভ্রমণ হিসেবে ধরা যেতে পারে। এ-ধরনের আধ্যাত্মিক ভ্রমণ আরও অনেক ভাবতান্ত্রিক ব্যক্তিরও হয়েছে বলে শোনা যায়।

কিন্তু মুসলমানরা এই অতি সাধারণ ভ্রমণকে বিস্ময়কর, অযৌক্তিক এবং অবাস্তব বক্তব্য দ্বারা সজ্জিত করেছেন। এই আয়াত সম্পর্কে আমি তফসির আল-জালালাইনের অপেক্ষাকৃত কিছুটা সংযত ব্যাখ্যার উদ্ধৃতি দিব। তফসির আল-জালালাইন হচ্ছে কোরানের বিশ্বস্ত তফসির-বইগুলোর মধ্যে অন্যতম। কোরানের সুন্নি তফসিরগুলোর মধ্যে একে ধ্রুপদী মর্যাদা দেয়া হয়। মিশরের বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ জালালউদ্দিন আল-মাহালি এই তফসির লেখা শুরু করেন ১৪৫৯ সালে এবং তাঁর ছাত্র জালালউদ্দিন আল-সুয়ুতি লেখাটি শেষ করেন তাঁর মৃত্যুর আগে ১৫০৫ সালে। আল-মাহালি এবং আল-সুয়ুতি দুজনের নামই জালাল, তাই তাঁদের নামানুসারে এই তফসিরের নামকরণ হয় 'তফসির আল-জালালাইন', যার অর্থ হচ্ছে, 'দুইজন জালালের তফসির'।

ধারণা করা হয় তাঁরা দুজনেই ধর্মকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সমস্ত দলীয়-উপদলীয় কোন্দলের উর্ধ্বে ছিলেন। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কোরানের আয়াতের ব্যাখ্যা দেয়া এবং এর প্রসঙ্গ জানানো। তথাপি তাঁরা তফসিরে সুরা বনি-ইসরাইলের প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অপ্রমাণিত বক্তব্য নবি মুহাম্মদের মুখের উপর বসিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের কি উদ্দেশ্য ছিল-ব্যাখ্যাও প্রসঙ্গ জানানো নাকি তৎকালীন সময়ে মুসলমানদের মধ্যে যেসব কাহিনী প্রচলিত ছিল সেগুলোর সংক্ষিপ্তসার দেয়া? যাহোক নবির যেসব উদ্ধৃতি তাঁরা দিয়েছেন তফসিরে, সেগুলোর কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেননি। হাদিস সংকলনকারীরাও নবির উপর অর্পিত কথাবার্তার ব্যাপারে প্রচলিত সংবাদের প্রমাণের জন্য অনেক কষ্ট করেছেন। এই চেষ্টার পরও এটা প্রমাণ করে না যে, নবি আদৌ এ-কথাগুলো বলেছিলেন। তাই হাদিস-সংকলনকারীদের তথ্যও নির্ভরযোগ্য নয়। তফসির আল-জালালাইনের লেখকদ্বয় তাঁদের ব্যাখ্যার কোনো সূত্রও দিতে পারেননি। ফলে বোঝা যায় খুব সম্ভবত তাঁরাও হয়তো নিজেরা এই কাহিনী বিশ্বাস করতেন না।

‘তফসির আল-জালালাইন’- এ রয়েছে নবি বলেছেন : ‘ঐ রাতে জিব্রাইল আসলেন। জিব্রাইলের সাথে ছিল একটা চতুষ্পদী জন্তু যা দেখতে গাধার চেয়ে বড় আবার খচ্চরের চেয়ে ছোট। এই জন্তুর পায়ের খুর ছিল বহির্মুখী। আমি এই জন্তুর উপরে বসলাম এবং পবিত্র মসজিদের দিকে যাত্রা শুরু করলাম। সেখানে পৌঁছালে আমি বোরাকটির (সেই জন্তু) লাগাম বেঁধে দিলাম সেই আংটার সাথে যাতে নবিরা তাঁদের বাহন পশুকে বেঁধে দিতেন। সেই দূরের মসজিদে গিয়ে আমি তিনবার ভূমিতে মাথা নত করে প্রার্থনা করলাম। যখন বাইরে এলাম তখন জিব্রাইল আমাকে দুটি পাত্র দিলেন। একটি পাত্র ছিল দুধভর্তি আর আরেকটি পাত্র ভর্তি ছিল সুরায়।আমি যখন দুধ-ভর্তি পাত্র গ্রহণ করলাম তখন জিব্রাইল তা সমর্থন করলেন। তারপরে আমরা উড়ে গেলাম প্রথম স্বর্গে। আমরা প্রথম স্বর্গের ফটকে পৌঁছালে একজন রক্ষী চিৎকার করে আওয়াজ দিলেন : ‘এখানে কে?’ জিব্রাইল উত্তর দিলেন : ‘এখানে আছে জিব্রাইল।’ ফটকরক্ষী জিজ্ঞাসা করল : ‘আপনার সাথে কে?’ জিব্রাইল উত্তর দিলেন : ‘মুহাম্মদ।’রক্ষী আবারও জিজ্ঞাসা করলেন : ‘তাঁকে কী ডাকা হয়েছে?’ জিব্রাইল উত্তর দিলেন: ‘হ্যাঁ।’ এরপর রক্ষী স্বর্গের ফটক খুলে দিলেন। হজরত আদম আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলেন এবং বললেন : ‘আপনাকে স্বাগতম।’ (এভাবে নবি মুহাম্মদ সপ্তস্বর্গ ভ্রমণ করলেন এবং প্রত্যেকটি স্বর্গেই একজন নবি তাঁকে স্বাগতম জানালেন।) সপ্তম স্বর্গে পৌঁছে আমি দেখলাম হজরত ইব্রাহিম সেই জনপ্রিয় স্থানে হেলান দিয়ে বসে আছেন। এ-স্থানেই প্রতিদিন ৭০ হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করেন কিন্তু কেউ বাইরে আসেন না। এরপরে জিব্রাইল আমাকে নিয়ে যান সর্বশেষ লোট[৫] গাছের কাছে। এই গাছের এক একটি পাতা ছিল হাতির কানের মতো বড়। এরপর আমি এক দৈববাণী পেলাম যাতে আমাকে আদেশ করা হলো প্রতিদিন এবং রাতে পঞ্চাশবার নামাজ পড়ার। আমি যখন ফিরে আসছিলাম তখন নবি মুসা আমাকে বললেন : ‘পঞ্চাশবার নামাজ পড়া বেশি হয়ে যাবে। আপনি আল্লাহকে অনুরোধ করুন নামাজের সংখ্যা কমানোর জন্য। আল্লাহ নামাজের সংখ্যা কমিয়ে চল্লিশ করে দিলেন। এরপর নবি মুসা বললেন : ‘আমি আমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি এই ব্যাপারে। তারা এক দিন এবং এক রাতে চল্লিশবার নামাজ পড়তে সক্ষম নয়।’আমি আবার আল্লাহর কাছে গেলাম...।’ (সংক্ষিপ্তভাবে বলতে হয় মুহাম্মদ আল্লাহর কাছে অনুরোধ করতে থাকেন, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ নামাজের সংখ্যা পাঁচে নামিয়ে আনেন।)

নবির রাত্রি-ভ্রমণ নিয়ে তফসির আল-জালালাইন-এ যা লেখা হয়েছে তা ইরানের বিশিষ্ট এবং প্রভাবশালী সুন্নি চিন্তাবিদ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরির আল-তাবারি’র (৮৩৯-৯২৩ খ্রিস্টাব্দ) বিখ্যাত তফসির অথবা তফসিরকারক আবু বকর আতিক নিশাপুরির রচনার তুলনায় নিতান্ত নগণ্য। মুহাম্মদের রাত্রি-ভ্রমণ ঘিরে মুসলিমদের মধ্যে যে ধরনের কাহিনী প্রচারিত হয়েছে তা ঊনবিংশ শতাব্দীর ইরানের রাজা নাসের আল-দীন শাহ কাজারের লেখা জনপ্রিয় লোককাহিনী আমির আরসালানই নামদারের দুঃসাহসিক অভিযানের মতোই শোনায়। মিশরীয় রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক এবং একসময়ের শিক্ষামন্ত্রী মুহাম্মদ হোসেন হায়কল[৬] আধুনিককালের অত্যন্ত যুক্তিবাদী লেখক। তিনি নবি মুহাম্মদের জীবনী লিখেছেন ১৯৩৩ সালে। তাঁর বইয়ে সশরীরে নবির রাত্রি-

ভ্রমণকে অস্বীকার করলেও একই ধরনের বর্ণনা দিয়েছেন কিছুটা পরিবর্তিত রূপে। এই বর্ণনা তিনি পেয়েছেন ফরাসি লেখক এমিলি ডারমেনগেমের[৭] মুহাম্মদের জীবনীভিত্তিক লেখা বই থেকে।

যারা কোরানের সাথে পরিচিত তারা জানেন যে, কোরান হচ্ছে মুহাম্মদের নবি-জীবনের বিভিন্ন ঘটনা এবং অভিজ্ঞতার প্রতিফলক। কোরান থেকেই বোঝা যায় নবি কখনো এই ধরনের বর্ণনা দেননি। এ-ধরনের উপকথা সাধারণ জনগণের কাল্পনিক আবিষ্কার। গভীরভাবে বিশ্বাসী সাধারণ জনগণ মনেমনে ভাবতেন যাঁরা ওহি পেয়ে থাকেন তাঁরা শাসকদের মতো ক্ষমতাশালী এবং প্রভাবশালী। সুরা বনি-ইসরাইলের প্রথম তিনটি আয়াতে আধ্যাত্মিক ব্যাপার বলা হয়েছে। এই সুরার ৯৩ নম্বর আয়াতে নবিকে বলা হয়েছে : '. . . বলো, 'আমার প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা! আমি একজন মানুষ, সুসংবাদদাতা রসুল ছাড়া আর কী?' (১৭:৯৩)। সুরা আশ-শুরার ৫১ আয়াতে বলা হয়েছে : 'এ কোনো দেহধারী মানুষের জন্য নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন কোনো প্রত্যাদেশ ছাড়া, পর্দার অন্তরাল ছাড়া, বা আল্লাহর ইচ্ছা প্রকাশ করবে তাঁর অনুমতি নিয়ে এমন কোনো ফেরেশতা প্রেরণ না করে। তিনি তো সর্বোচ্চ জ্ঞানী।' (৪২:৫১)। আল্লাহ যেখানে নিজেই নবিকে প্রত্যাদেশ পাঠিয়ে দিচ্ছেন সেখানে নবির ভূলোক থেকে ঊর্ধ্বলোকে ভ্রমণের কোনো প্রয়োজন ছিল না। যদিও ধরে নেয়া যায় ঐ ভ্রমণের প্রয়োজন ছিল তাহলেও ডানাবিশিষ্ট চতুষ্পদ পশুর পিঠে চড়ে আকাশে উড্ডীয়মান হওয়ার কী প্রয়োজন ছিল? যাকে বলা হয়ে থাকে 'দূরের মসজিদ' সেটা কী স্বর্গে পাড়ি দেবার পথে ছিল কি? আল্লাহ যদি সর্বত্র বিদ্যমান তবে আল্লাহর কী মানুষের প্রার্থনার প্রয়োজন আছে? এবং নবি যখন স্বর্গে পৌঁছালেন তখন কেন ফটকরক্ষীদের নবির আগমনবার্তা আগে জানানো হয়নি?

সরল বিশ্বাসী মানুষ কার্যকারণ বিষয়ে বাস্তববাদী নন। তারা মনে করেন নবি বহু দূরের ভ্রমণে যাবেন, এজন্য তাঁর এক বাহন দরকার। এক ডানাবাহী পশু এই কাজে সক্ষম হবে, যা পায়রার মতো উড়ে যেতে পারবে, তাই তারা ধারণা করতেন। সৃষ্টিকর্তা চেয়েছেন তাঁর রাজকীয় দ্যুতি দিয়ে নবির চোখ ধাঁধিয়ে দিবেন। তাই স্রষ্টা জিব্রাইলকে আদেশ দিলেন নবিকে স্বর্গের বিস্ময় দেখাতে[এবং জিব্রাইলের ডানার সংখ্যা ৬০০ বলে উল্লেখ করা হয়েছে বুখারি শরীফের হাদিসে, যা জিব্রাইলকে অতি দ্রুতগামী বলে ধারণা দেয়, ভলিউম ৬, বুক ৬০, নম্বর ৩৮০] । একজন প্রতাপশালী রাজা রাজ্যের খরচ মেটানোর জন্য তাঁর কর্মচারীকে কর আদায়ের আদেশ দেন। রাজার অর্থমন্ত্রী রাজাকে সাবধান করে দেন যেন উন্নয়নের জন্যে প্রজাদের উপর অধিক কর চাপানো না হয়। এমনিভাবে আমাদের স্রষ্টা বান্দাদের কাছ থেকে তাঁর প্রার্থনা দাবি করেন। তখন নবি আর্জি করলেন দিন-রাতে পঞ্চাশবার নামাজ আদায় করা অতিরিক্ত হয়ে যাবে।

মুহাম্মদের মহানুভবতা প্রশ্নাতীত। ইতিহাসে যেসব মহামানবের উল্লেখ আমরা পাই তার মধ্যে মুহাম্মদ অতুলনীয়। তাঁর সমসায়িক সমাজ বিবেচনা করলে বোঝা যায় তিনি যে ঐতিহাসিক পরিবর্তন আনয়ন করেছেন তা অনন্যসাধারণ। আলেকজান্ডার, সিজার, নেপোলিয়ন, হিটলার, সাইরাস, চেঙ্গিস খান অথবা তৈমুর লং এদের সাথে নবি মুহাম্মদের কোনো তুলনা হয় না। এই নেতাদের পেছনে ছিল সামরিক বাহিনী এবং গণসমর্থন। কিন্তু মুহাম্মদ যা আয়ত্ত করেছেন তা সবই এক বৈরী সমাজের বিরুদ্ধে একা রিক্তহস্তে লড়াই করে।

বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে শক্তিশালী নেতা সম্ভবত ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। মুহাম্মদের সাথে হয়তো লেনিনের তুলনা করা যেতে পারে। বিশ বছর ধরে (১৯০৪-১৯২৪) লেনিন অবিশ্রান্ত কর্মশক্তি, দক্ষতা, প্রতাপ এবং একাগ্রতার সাথে তাঁর অবিচল নীতি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন, নিরলসভাবে লিখে গেছেন এবং বহুদূর থেকে নিজ দেশে বিপ্লবী কার্যক্রম সজীব রেখেছিলেন। রাশিয়ার সমাজ তখন তাঁর প্রতি ছিল অতিশয় বিরূপ। তথাপি সত্যিকারের প্রথম কমিউনিস্ট রাষ্ট্র গঠন না করা পর্যন্ত লেনিন বিশ্রাম নেননি। এটা নিশ্চিত যে সাফল্য অর্জন করতে লেনিনকে অনেক অভ্যন্তরীণ এবং বিদেশি বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। অপরপক্ষে বলা যায় লেনিনের পূর্বেই রাশিয়ায় এক বিপ্লবী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল। শতসহস্র বিপ্লবী এবং প্রচুর বিক্ষুব্ধ জনতা

লেনিনকে সমর্থন দিতে প্রস্তুত ছিল। মুহাম্মদের সাথে লেনিনের একটি পার্থক্য হচ্ছে যে মুহাম্মদ সারা জীবন কাটিয়েছেন দারিদ্রতায়, অথবা স্বেচ্ছায় অনাড়ম্বর জীবন বেছে নিয়েছিলেন।

স্বাভাবিকভাবে মহাপুরুষদের প্রস্থানের পর তাঁদের ঘিরে ভক্তবৃন্দ দ্বারা অনেক লোককাহিনী রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে তাঁদের দুর্বল দিকগুলিও চাপা পড়ে যায়। শুধু ভালো দিকগুলি প্রচার করা হয়। অনেক চিন্তাবিদ এবং শিল্পীদের নৈতিক জীবন নিখুঁত ছিল বলা যায় না। তা সত্ত্বেও তাঁদের কীর্তি বেঁচে থাকে এবং প্রশংসিত হয়। ইরানের বিশিষ্ট মুসলিম মনীষী নাসির উদ্দিন তুসি[৮] (১২০১-১২৭৪ খ্রিস্টাব্দ) কেমন করে মঙ্গোলীয় শাসক হালাকু খানের[৯] মন্ত্রী হলেন তা আমরা জানি না। নাসির উদ্দিন তুসির ব্যক্তিগত জীবনে নীতি- বহির্ভূত কার্য সত্ত্বেও দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, জীববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান ও স্থাপত্যবিদ্যার উপর তাঁর প্রচুর রচনার জন্যে পারস্যের একজন ঐতিহাসিক সম্মানিত ব্যক্তি হয়ে আছেন। আশ্চর্য হবার কিছু নেই একজন বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক নেতার মৃত্যুর পর তাঁকে প্রচুর কাল্পনিক সদগুণ এবং যোগ্যতা দিয়ে আবৃত করা হয়। সমস্যা হচ্ছে এই প্রক্রিয়া পরিমিত বোধের মধ্যে না থেকে বেশিরভাগ সময়ই অমার্জিত, বাণিজ্যিক এবং অযৌক্তিক হয়ে পড়ে।

লক্ষ লক্ষ শিশুর মতো নবি মুহাম্মদেরও জন্ম ছিল স্বাভাবিক। তাঁর জন্মের সাথে কোনো কিছু অস্বাভাবিক ছিল না। কোনো ধরনের যৌক্তিক কারণ ছাড়াই নবির এই জন্ম নিয়ে অযথাই অলৌকিক ব্যাখ্যা, উপাখ্যান দাঁড় করানো হয় এবং প্রচুর লোক তা বিশ্বাসও করে। যেমন বলা হয়ে থাকে নবির জন্মের সাথে সাথে ইরাকের প্রাচীন শহর তাসিবনের[১০] ধনুকাকৃতির খিলানে ফাটল ধরেছিল এবং পারস্যের ফার্সে রাজ্যে অবস্থিত খাজেরুন অগ্নিমন্দিরের আগুনও নিভে যায়। এ-ধরনের ঘটনা যদি ঘটেও থাকে তবে তার সাথে নবির জন্মের কী সম্পর্ক? আর এগুলি কেমন করে মহান সৃষ্টিকর্তার সতর্কবার্তা হতে পারে?

যুক্তি, পর্যবেক্ষণ এবং গণিত অনুযায়ী যে কোনো ঘটনার পিছনে কারণ থাকে। বিশ্বের সমস্ত ঘটনা তা নৈসর্গিক, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক হোক না কেন, সবকিছুর পিছনে কার্যকারণ অবশ্যই আছে। অনেক সময় এই কারণ প্রতীয়মান হয় দ্রুত। যেমন সূর্যালোক দেয় উষ্ণতা এবং আলো, অনিয়ন্ত্রিত আগুন দগ্ধ করে, পাম্প দিয়ে উত্তোলন না করলে পানি নিচের দিকে প্রবাহিত হয়। আবার দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর জানা না গেলে অনেক সময় এই নিয়ম প্রতীয়মান হয় না আমাদের কাছে। যেমন কোনো ব্যাধির উপশম কিংবা আপাত রহস্যময় অন্যকিছু।

মক্কায় এক শিশুর জন্মের সাথে পারস্যের ফার্সের অগ্নিমন্দিরের আগুন নিভে যাওয়ার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। তাসিবনের ধনুকাকৃতির খিলানে কোনো ফাটল ধরলে তা হয়তো ভূমিধ্বসের জন্য হতে পারে। পরবর্তীকালে ভক্তবৃন্দ যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা ছাড়াই এই ঘটনাগুলিকে স্রষ্টার সাবধানবাণী হিসেবে প্রচার করতে থাকেন। এই গুজব প্রচারের উদ্দেশ্য হতে পারে যে ইরাকের তাসিবনের অধিবাসীদেরকে এবং বিশেষ করে ইরানের রাজাকে জানিয়ে দেয়া যে, স্রষ্টা তাদের উপর এক মহাদুর্যোগ প্রেরণ করতে যাচ্ছেন। আর ফার্সের অগ্নিমন্দিরের রক্ষকদের এক শিশুর জন্ম সংবাদ জানিয়ে দেয়া যে, এই শিশু তাদের অগ্নিপূজা বন্ধ করে দিবেন। কিন্তু এটা কেমন করে সম্ভব যে, ইরানের রাজা কিংবা জরথুস্ত্রের পুরোহিতরা বহু দূরের মক্কার এক শিশুর জন্মের সাথে তাসিবনের খিলানের ফাটল ও অগ্নিমন্দিরের আগুন নিভে যাওয়ার সাথে সম্মিলন ঘটাবে? যেখানে নবি মুহাম্মদই তাঁর ধর্মীয় প্রচারণা শুরু করেন জন্মের চল্লিশ বছর পর। মুহাম্মদের বয়স যখন চল্লিশ বছর তখন আল্লাহ তাঁকে নতুন ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত করেন। সর্বজ্ঞানী এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন স্রষ্টা কেন ইসলাম আগমনের চল্লিশ বছর আগেই তাদের জানিয়ে দিবেন? কোরানে রয়েছে আল্লাহ যে মুহাম্মদকে ধর্মপ্রচারক হিসেবে নিয়োগ দিবেন এ-ব্যাপারে মুহাম্মদের কাছে কোনো পূর্বাভাষ ছিল না। প্রাক- ইসলামি আরবের অবস্থা থেকে কোরানের এই দাবির সমর্থন পাওয়া যায়। আল্লাহ যদি মুহাম্মদের জন্মের অসাধারণ গুরুত্ব সবাইকে জানাতে চাইতেন তবে কেন তিনি খোদ মক্কাবাসীদেরকেই ইশারা দিলেন না? সর্বশক্তিমান আল্লাহ চাইলে কাবা ঘরের মূর্তিগুলোকে ভেঙে দিতে পারতেন এবং ছাদকে ধ্বসিয়ে দিতে পারতেন নিমিষে। দূরদেশের অগ্নিমন্দিরের আগুন নেভানোর

চাইতে কাবার এই ঘটনা হতো কুরাইশদের জন্য এক শক্তিশালী সতর্কবাণী। এছাড়া প্রশ্ন থেকে যায় নবি হবার সাথে সাথে কেন আল্লাহ তাঁর নবিকে দিয়ে কোনো ব্যতিক্রমী কাজ দেখালেন না? এমনটা হলেই কুরাইশরা নবি সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে যেতেন, এবং আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষকে তেরো বছর ধরে শত্রুতা ও শত উৎপীড়ন সহ্য করতে হতো না। সত্য ধর্ম ইসলামের প্রভাবে কেন পারস্যের জরথুস্ত্র ধর্মাবলম্বী বাদশাহ খসরু পারভেজের[১১] (৫৭০-৬২৮ খ্রিস্টাব্দ) অন্তর প্রভাবিত হলো না? তাহলে তো তিনি ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে নবির লেখা চিঠি পড়ে রাগে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন না, মুহাম্মদের বার্তাবাহক আব্দুল্লাহ ইবনে হুদহাফা আস-সামিকে অপমান করে তাড়িয়ে দিতেন না; এবং ইরানিরা তাদের সম্রাটের উদাহরণ অনুসরণ করে সবাই ইসলাম গ্রহণ করে ফেলতেন। ফলে তাদেরকে আর আরব মুসলমানদের সাথে কাদেসিয়া ও নেহাবন্দের ভয়ানক লড়াইয়ে পরাজয়ের গ্লানি বহন করতে হতো না?

অনেকদিন পূর্বে আমি ফরাসি দার্শনিক জোসেফ আর্নেস্ট রেনানের (১৮২৩-১৮৯২) লেখা *'Vie de Jesus'* (যিশুর জীবনী, ১৮৬৩) বইটি পড়ি। লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সাথে যিশুর জীবনকাহিনীকে বাস্তবানুগ এবং প্রাণবন্তভাবে প্রকাশ করেছেন। এর কিছুদিন পরে আমি জার্মানির বিশিষ্ট ইতিহাস-গবেষক এমিল লুদভিগের(১৮৮১-১৯৪৮) লেখা *'The Son of Man: The Story of Jesus'* (১৯২৮) বইটা পড়ি। লুদভিগের মতে যিশুর জীবনকাহিনী নিয়ে অন্য রেফারেন্স বইয়ে যতটুকু বাস্তবসম্মত বলে মনে হয়েছে ততটুকুই তিনি লিখেছেন। কারণ তাঁর মতে এই বিষয়ে বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক দলিল দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্লভ। আমার এই ক্ষুদ্র বইয়ে আমি নবি মুহাম্মদের ৬৩ বছরের জীবনের মধ্যে ২৩ বছরের সুদীর্ঘ বিবরণ দিতে পারব না। আমি স্বীকার করে নিতে চাই আর্নেস্ট রেনানের মতো মেধা ও সংবেদনশীলতা আমার নেই। এমন কী আমার নেই এমিল লুদভিগের মতো গবেষণা করার দক্ষতা। যে নবির আধ্যাত্মিক এবং বিশাল নৈতিক শক্তি মানব-ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল, তাঁর চরিত্র পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণনার জন্য একজন লেখকের এই ধরনের গুণাবলী অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। আমার এই নাতিদীর্ঘ লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে নবির জীবন সম্বন্ধে একটা সীমিত রূপরেখা দেখানো এবং তাঁকে ঘিরে অযথাই যেসব অলীক কাহিনী এবং মিথ প্রচলিত রয়েছে দীর্ঘদিন তার অবসান ঘটানো। এই বই লেখার অনুপ্রেরণা আমি পেয়েছি কোরান অধ্যয়ন করে এবং ইসলামের জন্ম ও বিকাশ নিয়ে চিন্তাভাবনা করে।

আরও সত্যি করে বললে বলতে হয় আমার লেখার তাগিদ এসেছে এক মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া এবং পর্যবেক্ষণ থেকে। আমার পর্যবেক্ষণ এই যে, গোঁড়া, অন্ধবিশ্বাস একজন মানুষের কাণ্ডজ্ঞান বা বিশ্লেষণী চিন্তাভাবনাকে ভোঁতা করে দিতে পারে। আমরা সবাই জানি শিশুকালে সামাজিকীকরণের সময় আমাদের মনে যেসব ধারণা প্রবিষ্ট করানো হয় তা পরবর্তীতে সবসময় আমাদের চিন্তার পটভূমিতে থাকে। ফলে যেকোনো অযৌক্তিক ভাবনাও যদি আমাদের মনে আসে তবে আমাদের শিশুকালে লব্ধ ভাবধারণার সাথে মিলিয়ে তার বৈধতা দিতে চাই। স্বল্প কিছু বিরল ব্যক্তি ছাড়া অনেক বিদ্বান ব্যক্তিও এই প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন না। অযৌক্তিকতা অথবা কাল্পনিক ভাবনাকে বাস্তব বলে গ্রহণের জন্য প্রায়শ তাঁরা সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করেন না অথবা করলেও তখনই করেন যখন তা তাঁদের মনে প্রোথিত ধারণার সাথে খাপ খেয়ে যায়। মানবজাতি পর্যবেক্ষণ এবং ন্যায্য বিচার-বিবেচনার অধিকারী। মানুষ তার এই জ্ঞানের জন্য নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান করতে পারে। কিন্তু যখন ধর্ম ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী সামনে আসে তখন মানুষ তার বিচার-বুদ্ধি, বিশ্লেষণী চিন্তা এবং যৌক্তিকতাকে পদদলিত করে ফেলে।

নবির বাল্যকাল

মুহাম্মদের বাল্যকাল সম্পর্কে তথ্য অত্যন্ত অপ্রতুল। একজন পিতৃমাতৃহীন শিশু হিসাবে তিনি তাঁর চাচা আবু তালিবের গৃহে লালিত-পালিত হন। আবু তালিব ছিলেন হৃদয়বান কিন্তু বিষয়সম্পত্তিহীন। জীবিকার তাগিদে মুহাম্মদ তাঁর চাচা এবং প্রতিবেশীদের উট চরানোর কাজ করতেন। তাই মুহাম্মদের দিন কাটতো রুক্ষ মরুভূমিতে একাকী।

মুহাম্মদ ছিলেন স্পর্শকাতর ও বুদ্ধিমান। মুহাম্মদের কয়েক বছরের মরুভূমির অভিজ্ঞতা পারস্যের ভাষায় 'এক তেঁতো গাছের ডাল'চিবানোর সাথেই তুলনীয়। স্বাভাবিকভাবে তিনি চিন্তা করতে শুরু করলেন কেন এই পৃথিবীতে এসেছেন এক পিতৃহীন শিশু হিসেবে; আর তিনি যখন তাঁর মায়ের কাছে স্নেহ-ভালবাসা চেয়েছিলেন তখনই কেন তাঁর তরুণী মাতা মারা গেলেন। মুহাম্মদ আরও চিন্তা করলেন কেন নিষ্ঠুর ভাগ্য তাঁর প্রভাবশালী ও উদার পিতামহকে তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল এবং তাঁকে দরিদ্র চাচার গৃহে ফেলে দিল। মুহাম্মদের চাচা আবু তালিব ছিলেন উদার এবং উপকারী। কিন্তু আবু তালিবের ছিল বিশাল পরিবার। তাই মুহাম্মদ তাঁর চাচাতো ভাই-বোনদের মতো স্নেহ-মমতা পাননি। মুহাম্মদের অন্যান্য চাচা যেমন আব্বাস ও আব্দুল ওজ্জা (আবু লাহাব নামে পরবর্তীতে পরিচিত হন) আরাম-আয়েশে বসবাস করলেও তাঁরা মুহাম্মদকে লালন-পালনে উপেক্ষা করলেন। দীর্ঘ দুঃখকষ্টের দিনগুলিতে মুহাম্মদের মনে নিশ্চয় এইসব ঘটনা বাজতে থাকতো।

বৈচিত্র্যহীন, শুষ্ক মরুভূমিতে উটের দল তাদের গ্রীবা ঘষিয়ে চলে একগুচ্ছ তৃণলতা বা এক কঙ্কটপূর্ণ ডালপালার খোঁজে। এহেন পরিবেশে এলোমেলো চিন্তা করা ছাড়া আর কী-ই থাকতে পারে? দুর্ভাগ্য মানুষের মনকে তিক্ততায় ভরে দেয়। যখন কোনো উপায় থাকে না তখন সে দুঃখ-বেদনার প্রতি সচেতন হয়ে পড়ে। নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে বাল্যকালের এই পরিবেশ থেকে মুহাম্মদ চিন্তা করতে শুরু করলেন তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে এবং বুঝতে পারলেন যে, তাঁর জীবনের দুঃখ-কষ্টের প্রধান কারণ হচ্ছে তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থা। মুহাম্মদের সমবয়সী অন্যান্য বালকের পিতারা কাবা ঘরের পরিচর্যায় নিয়োজিত ছিল। তাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। তাই ঐ বালকেরা সুখে দিনযাপন করতো। তাদের পিতারা কাবায় যে বাৎসরিক তীর্থযাত্রীরা আগমন করতো তাদেরকে পানি, রুটি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবারহ করতেন। সিরিয়া থেকে নিয়ে আসা পণ্যসামগ্রী তারা অতি উচ্চদামে বিক্রি করতো তীর্থযাত্রীদের কাছে। আর তীর্থযাত্রীদের আনা সামগ্রী তারা অতি নিম্নমূল্যে ক্রয় করতো। এইভাবে অর্জন করতো প্রচুর মুনাফা। এই বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ ছিল তাদের ছেলে-মেয়েদের সুখের কারণ।

প্রশ্ন হতে পারে অনেকগুলো গোত্র কেন কাবায় আসতো এবং কুরাইশদের ক্ষমতা ও প্রভাবকে সহ্য করতো? এর উত্তর হচ্ছে কাবা ঘরে তখন ছিল অনেক দেবদেবীর প্রতিমা। আর ছিল একটি কৃষ্ণ পাথর যাকে আরবেরা পবিত্র বলে গণ্য করতেন। তারা মনে করতেন ঐ পাথরের চতুর্দিকে ঘুরে আসলে সুখ এবং মুক্তি পাওয়া যায়। সাফা ও মারওয়া পাহড়ের মাথায় ছিল আরও দুই মূর্তি। তাই তারা এই দুই পাহাড়ের মাঝে দৌঁড়াদৌঁড়ি করতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, এমন করলে তাদের প্রার্থনা ফলপ্রসু

হবে। প্রত্যেক দলই তাদের মূর্তির কাছে এসে চিৎকার করে অনুনয়-বিনয় করতেন, কাবাকে ঘিরে চক্রাকারে ঘুরতে এবং সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত দৌড়দৌড়ি করতেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী মুহাম্মদের বয়স যখন এগারো কি বারো তখনই তিনি চিন্তা করলেন, কৃষ্ণপাথরের কি সত্যিই কোনো গুপ্তশক্তি আছে? আরও চিন্তা করলেন, নিষ্প্রাণ মূর্তিগুলো কি কোনো কাজ করতে পারে? তাঁর এই সন্দেহের উৎপত্তি হয় ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতা থেকে। এটা হয়তো বলা যাবে না যে, দুঃখ ও আধ্যাত্মিক সংশয়ে মুহ্যমান মুহাম্মদ কখনো কাবার মূর্তিগুলোর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেননি; এবং তাঁর সাহায্য-প্রার্থনা যে, পরবর্তীতে নিষ্ফল হয়েছিল তাও বলাবাহুল্য। এই ধারণার প্রমাণ পাওয়া যায় কোরানের দুটি আয়াত থেকে। এই দুটি আয়াত মুহাম্মদের মুখে শোনা যায় ত্রিশ বছর পরে। প্রথম আয়াতটি হচ্ছে সুরা মুদ্দাসসির এর ৫ নম্বর আয়াত : 'আর অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো।'(৭৪:৫)। দ্বিতীয় আয়াতটি উল্লেখ আছে সুরা দোহা'য় : 'তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পাননি, আর তোমাকে আশ্রয় দেননি?'(৯৩:৬)।

কুরাইশ নেতাদের এ-ব্যাপারে অজানা থাকার কথা নয়। তারা কাবার উপাসনালয়ের কাছাকাছি থাকতেন এবং জানতেন পাথরের তৈরি মূর্তিগুলো না-পারে নড়াচড়া করতে, না-পারে কোনো অনুগ্রহ বা কৃপা প্রদর্শন করতে। এ-সম্পর্কে নীরবতা পালন ও লাত, মানাত এবং ওজ্জা দেবীদের পূজো করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের অর্থনৈতিক লাভ। পারস্যের একটি জনপ্রিয় প্রবাদ হচ্ছে 'একজন ঋষির পুণ্যতা নির্ভর করে তার সমাধির তত্ত্বাবধায়কের উপর।'কুরাইশরা ভালো করেই জানতেন যে, তারা যদি কাবার তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব হারিয়ে ফেলেন তাহলে তাদের বিশাল আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যাবে। আর সিরিয়ার সাথে তাদের যে বর্ধিত বাণিজ্য চলছিল তাও কমে যাবে। কারণ কোনো বেদুইন তীর্থযাত্রীরা আর কাবায় আসবে না এবং কুরাইশরাও তাদের পণ্য উচ্চমূল্যে বিক্রি করতে পারবেন না এবং তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকেও পণ্যসামগ্রী অতি অল্পমূল্যে ক্রয় করতে পারবেন না।

সূর্যস্নাত রুক্ষ মরুভূমিতে একাকী দুঃসহ অবস্থায় মুহাম্মদ দেখেছেন কত কষ্ট করে উটগুলি তাদের সামান্য খাদ্য সংগ্রহ করে। এই অবস্থা জাগিয়ে তোলে মুহাম্মদের কল্পনাবিহারী মনকে। সূর্য ডোবার সাথে মুহাম্মদ যখন উটেরপাল হাঁকিয়ে শহরে নিয়ে আসতেন তখন আবার বাস্তবে ফিরে যেতেন। উটগুলিকে বারেবারে হাঁক দিয়ে তাদেরকে সঠিকভাবে চালিত করতে হতো যাতে তারা হারিয়ে না যায়। এভাবে উটগুলিকে নিশ্চিতভাবে তাদের মালিকদের খোঁয়াড়ে দিয়ে আসতেন রাতের বেলায়। রাতে মুহাম্মদ চিন্তায় মগ্ন থাকতেন এবং তাঁর সামনে ভেসে উঠতো অনেক মানসচিত্র। প্রত্যুষে সূর্যের আলোকের পুনরাবৃত্তি ঘটলে আবার সেই বৈচিত্র্যহীন মরুভূমিতে চলে যেতেন। ধীরে ধীরে এসব বিভিন্নমুখী চিন্তাভাবনা তাঁর মানসকোঠরে দানা বাঁধতে শুরু করল।

একজন অন্তর্মুখী ব্যক্তি ভাবুক এবং স্বপ্নবিলাসী হয়ে থাকে। বাইরের কোনো শোরগোল বা স্বাভাবিক কোনো আনন্দ তাদের বিচলিত করে না, বরং সময়ের সাথে তারা আরও অন্তর্মুখী হয়ে যায়। তাই বলা যায় দীর্ঘদিন ধরে মরুভূমিতে একাকী সময় কাটানোর জন্য মুহাম্মদও একসময় অন্তর্মুখী হয়ে পড়েন। ফলে আকস্মিকভাবে অনেক সময় তাঁর ভূত দেখার অথবা সাগরের ঢেউয়ের শব্দ শোনার বিভ্রম হতো।

এভাবেই গতানুগতিক কয়েক বছর চলে গেল। মরুভূমির অভিজ্ঞতা মুহাম্মদের মনে গভীর রেখাপাত করে। এগারো বছর বয়সে মুহাম্মদ তাঁর চাচা আবু তালিবের সাথে বাণিজ্য-ভ্রমণে সিরিয়া গমণ করেন। সিরিয়াতে মুহাম্মদ অন্য এক বিশ্বের সাথে পরিচিত হন। এই বিশ্ব ছিল উজ্জ্বল, অজ্ঞানতাবিহীন এবং কুসংস্কারমুক্ত। মক্কার আরবেরা ছিল অতিশয় রূঢ় এবং অমার্জিত। সিরিয়ার জীবনযাত্রা ভিন্ন।

সিরিয়ার যেখানেই মুহাম্মদ কারো দেখা পেলেন সেই-ই তাঁর সাথে ভদ্রতা রক্ষা করল। সিরিয়ার সমাজে বিরাজমান ছিল খুশির আমেজ এবং তাদের সামাজিক রীতিনীতি ছিল অনেক উঁচুমানের। সিরিয়া-ভ্রমণ মুহাম্মদের অন্তর আলোড়িত করে। এ-অভিজ্ঞতার

দ্বারাই হয়তো তিনি উপলব্ধি করলেন তাঁর নিজের লোকেরা আদিম, অমার্জিত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তখন তাঁর মনে ভাবনা আসে তাঁর সমাজও উন্নতির পথে আসুক, সমাজে শৃঙ্খলা থাকুক, কুসংস্কারমুক্ত হোক। মক্কার সমাজ যেন আরও মানবিক হোক। তবে এটা পরিষ্কার নয় যে, এই ভ্রমণে মুহাম্মদ প্রথমবারের মতো কোনো একেশ্বরবাদীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন কি না। তখন মুহাম্মদের এ-বিষয়গুলি বুঝার জন্য খুব অল্পবয়স্ক ছিলেন। তাই এধরনের কোনো সংস্রব হলেও তাতে তাঁর চিন্তাধারায় রেখাপাত হওয়ার কথা নয়। তা সত্ত্বেও এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা মুহাম্মদের সংবেদনশীল ও চঞ্চল মনে ছাপ ফেলেছিল। হয়তো এজন্যই মুহাম্মদ দ্বিতীয়বার ভ্রমণে আগ্রহী হন। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, দ্বিতীয় ভ্রমণের সময় মুহাম্মদ অল্পবয়স্ক ছিলেন না। তখন তিনি মনোযোগ দিয়ে ধর্মের কথা শুনলেন।

মুহাম্মদের বাল্যকাল এবং তরুণ বয়স সম্পর্কে এত অপ্রতুল তথ্যের কী কারণ তা কেউ জানেন না। হয়তো বলা যেতে পারে, এক অনাথ বালক যে তার চাচার গৃহে লালিত-পালিত হয়েছে তার জীবন কারো কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। ফলে বাল্যকালে এবং যৌবনে মুহাম্মদ কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি। কেউ মুহাম্মদের স্মৃতিও মনে রাখেননি। এখানে যা লেখা হচ্ছে তার বেশির ভাগই অনুমানভিত্তিক। বলা হয় যে মরুভূমির একাকীত্ব এবং এক ঘেঁয়েমিপূর্ণ জীবন বালক-মুহাম্মদকে কল্পনাবিলাসী, অন্তর্বীক্ষণিক এবং দর্শনশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করে।

কোরানের প্রারম্ভিক আয়াতগুলো পড়লে মনে করা যেতে পারে এই আয়াতগুলো আসছে এক যুবক মুহাম্মদের নিদারুণ যন্ত্রণাক্লিষ্ট মন থেকে। এই আয়াতগুলিতে প্রকৃতি ও নৈসর্গিক বিষয়ে অনেক চিন্তাভাবনার প্রতিফলন দেখা যায়। এখানে সুরা গা'শিয়ার কয়েকটি আয়াত উদাহরণ হিসেবে দেয়া যেতে পারে : 'তবে কি ওরা লক্ষ করে না, উট কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? কীভাবে আকাশ ঊর্ধ্বে রাখা হয়েছে? পর্বতমালাকে কীভাবে শক্ত করে দাঁড় করানো হয়েছে, আর পৃথিবীকে কীভাবে সমান করা হয়েছে?'(৮৮:১৭-২০)।

কোরানের মক্কি সুরাতে দেখা যায় একজন ভাবুক মানুষের মানসচরিত্র। মনে হবে যেন এই ব্যক্তি নিজেকে সংসারের আকর্ষণ থেকে দূরে রেখে প্রকৃতির আশীর্বাদ নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন আর নিজেকে সমর্পণ করেছেন প্রকৃতির কাছে। এই সুরাগুলিতে দাম্ভিক এবং অহঙ্কারী ব্যক্তিদের প্রতি রোষ দেখানো হয়েছে। সে-সময়ে এধরনের ব্যক্তিরা হলেন আবু লাহাব[১২] এবং আবুল আসাদ[১৩]।

পরে মুহাম্মদ যখন ধর্ম প্রচারে সফল হলেন এবং সামাজিক সম্মান ও মর্যাদা বিশাল পরিমাণে বৃদ্ধি পেল, তখন তাঁর অনুগ্রাহীরা নিজস্ব কল্পনা-ভাবনা দিয়ে নবির জীবন নিয়ে অনেক কাহিনী তৈরি করেন। এই অতিমানবীয় কাহিনীগুলো লোকমুখে ছড়াতে ছড়াতে তাবারি এবং ওয়াকেদির লেখনীতেও একসময় স্থান পেয়ে যায়।

আরেকটি বিষয়ে এখানে স্বল্পপরিসরে আলোচনা করা দরকার। মুসলিম লেখকেরা হয়তো ইচ্ছে করে নবির ধর্মপ্রচারণার পূর্বের সময়ের হেজাজ (মক্কা ও মদিনা শহরকে একত্রে হেজাজ নামে অভিহিত করা হয়), বিশেষ করে মক্কাকে এক অন্ধকার যুগের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেন। কিন্তু বাস্তব তেমন ছিল না। অনেক মুসলিম লেখকের তথ্য মতে তৎকালীন মক্কার আরবেরা বর্বরতা এবং পৌত্তলিকতার অন্ধকারে চরমভাবে নিমজ্জিত ছিল। তাদের মাঝে না ছিল কোনো উচ্চ চিন্তাভাবনা, না ছিল কোনো ধর্মের পরিচর্যা। ধারণা করা যায় এই ধরনের অতিরঞ্জিত বর্ণনা দেয়া হয় মূলত নবি মুহাম্মদের উত্থান ও তাঁর শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়ার জন্য। অবশ্য আধুনিক যুগের একাধিক আরব চিন্তাবিদ যেমন আলি জায়াদ, আবদুল্লাহ সাম্মান, তাহা হোসেন[১৪], মুহাম্মদ হোসেন হায়কল, মুহাম্মদ ইজ্জাত দারওয়াজা, অধ্যাপক হাদ্দাদ প্রমুখ মতামত দেন যে, ষষ্ঠ শতাব্দীর হেজাজে কিছুটা সভ্যতা বিরাজমান ছিল এবং প্রাথমিক পর্যায়ের ধর্মবিশ্বাস ও আস্তিকতাও প্রচলিত ছিল সেখানে,যা কোনোমতেই খাটো করে দেখা উচিৎ

নয়। এছাড়া এই আধুনিক আরব চিন্তাবিদদের গবেষণা এবং আরও প্রাচীন সূত্র থেকে জানা যায় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হেজাজে একটা আন্দোলন শুরু হয়েছিল।

প্রথমদিকে হেজাজে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয় তার বিকাশ ঘটে কিছুটা ইহুদি এবং খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রভাবে। ইহুদিরা ইয়াসরিবে (পরবর্তীতে মুসলমান জয়ের পর এই শহরের নাম হয় মদিনা) খুব প্রভাবশালী ধর্মীয় সম্প্রদায় ছিল। আর খ্রিস্টানরা সিরিয়া থেকে হেজাজে এসে বসতি স্থাপন করে। এছাড়াও হেজাজে ধর্মতান্ত্রিক তবে অপ্রাতিষ্ঠানিক একটি দল ছিল যারা 'হানিফ' নামে পরিচিত। মক্কায় হানিফেরা পৌত্তলিকতা এবং বহুঈশ্বরবাদের প্রতি প্রার্থনার বিরুদ্ধে সজ্ঞবদ্ধ হয়েছিল। এ-প্রসঙ্গে নবির জীবনীকার ইবনে হিশামের[১৫] লেখা 'সিরাত রসুল আল্লাহ' থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেয়া হলো : 'একদিন কুরাইশরা দেবী ওজ্জাকে পূজা করার জন্য তায়েফের এক পাম-বাগানে সমবেত হন। ওজ্জা ছিলেন বানু সাকিফদের প্রধান দেবী। এসময় চারজন ব্যক্তি পূজারী ও ভক্তদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি শুরু করেন, 'মক্কার লোকেরা ভুল পথে আছে। তারা আমাদের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিমের ধর্ম হারিয়ে ফেলেছে।' এরপর এই চারজন অন্যান্য পূজারীদের প্রতি চিৎকার করে বলেন, 'একি হলো, তোমরা অন্য-ধর্ম পালন করছ! একটি পাথর, যা না পারে দেখতে, না পারে শুনতে, আর যা তোমাদের সাহায্যও করে না এবং অনিষ্টও করে না, তোমরা কেন তাকে বৃত্ত করে ঘুরে বেড়াও?' এই চারজন ব্যক্তি হচ্ছেন ওয়ারাকা বিন নওফল, ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাস, উসমান বিন আল-হুয়ারিস এবং জায়েদ বিন ওমর। এই ঘটনার পর থেকে এই চারজন নিজেদেরকে 'হানিফ'মতাবলম্বী হিসেবে পরিচিতি প্রদান করেন এবং তাঁরা ইব্রাহিমের ধর্মের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। তাঁদের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি (জায়েদ বিন ওমর) নিজস্ব রীতিতে প্রার্থনার সময় উচ্চারণ করতেন : 'এখানে আমি সত্যে আছি, সত্যে আছি উপাসনায় এবং বিনম্রতায়। ইব্রাহিম যেখানে আশ্রিত ছিলেন আমিও সেই আশ্রয়ে। আমি আপনার থেকে উদাসীন ছিলাম। আমার ভাগ্যে যা ঘটবে তা আমারই প্রাপ্য।' এরপর জায়েদ নতজানু হতেন এবং মাটিতে তাঁর মাথা ঠেকিয়ে দিতেন।'

সন্দেহ নাই যে, আরবে তখন অজ্ঞানতা এবং কুসংস্কার বিরাজমান ছিল। সংখাগরিষ্ঠ আরবেরা মূর্তিপূজারী ছিলেন। তবু একেশ্বরবাদ তাদের কাছে কোনো অভিনব বিষয় ছিল না। হেজাজ, বিশেষত মদিনা এবং হেজাজের উত্তরাঞ্চলে যেখানে ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা বসবাস করতেন, সেখানে একেশ্বরবাদ অনেক আগে থেকে প্রচলিত ছিল। মুহাম্মদের পূর্বেও অনেকে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়েছেন। যাদের সম্পর্কে কোরানে কিছু কিছু উল্লেখ আছে। যেমন আদ সম্প্রদায়ের হুদ নবি, সামুদ সম্প্রদায়ের সালেহ নবি, মিদিয়ান (উত্তর-পশ্চিম আরব-উপসাগরীয় অঞ্চল) সম্প্রদায়ের শুয়েব নবি। আবার আরব-ইতিহাসে একাধিক ধর্মপ্রচারক ব্যক্তির কথা জানা যায়, যেমন হানজালা বিন সাফওয়ান, খালেদ বিন সিনান, আমির বিন জারিব আল-আদওয়ানি এবং আবদুল্লাহ বিন আল-কোদাই। এছাড়া সুন্দর বাচনভঙ্গির অধিকারী এবং সুবক্তা কাসা বিন সায়িদা আল-ইয়াদি নামের একজন কবির নাম জানা যায়। ইসলাম-পূর্ব যুগে মক্কার পূর্বে নাখালা উপত্যকার পাশে বাণিজ্য নগরী 'ওকাজ'- এ বিশাল পরিসরে বার্ষিক মেলা হতো যাকে সারা আরবে ওকাজের মেলা বলতো। এই মেলার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিল বার্ষিক কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান। সারা আরব থেকে খ্যাতিমান কবিরা এসে এখানে নিজস্ব কবিতা আবৃত্তি করতেন। [জিলকদ মাসের সাতদিনব্যাপী (ভিন্নমতে বিশদিন) ওকাজে মেলার আয়োজন করা হতো। এই সময় আরববাসীর মধ্যে হত্যা-মারামারি-হানাহানি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। ওকাজের মেলা সম্পর্কে প্রচলিত প্রবাদ ছিল এরকম : 'ওকাজ আজকে যা বলে, সারা আরবে আগামীকাল তার পুনরাবৃত্তি হয়।'ওকাজের মেলা ছিল আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায়-গোত্র ও বহু ধর্মের মানুষের সমন্বয়শীল মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ, সামাজিক-সাংস্কৃতিক মিলন মেলা। মুক্ত আলোচনা, বিতর্ক, জনপ্রিয় কবিদের 'কাসিদা' (গীতিকবিতা) প্রতিযোগিতা ছিল মেলা বা সাহিত্য সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণীয় দিক। স্বাভাবিকভাবে এই সাহিত্য সম্মেলনের ফলাফল সারা আরব জাহানে মধ্যে ছড়িয়ে পড়তো। এখানে এসে কবিতা পাঠ করা কবিদের কাছে অত্যন্ত সম্মানের ও জীবনের আরাধ্য একটি বিষয় ছিল। কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠানে বিজয়ী কবিতাকে পুরস্কারস্বরূপ স্বর্ণাক্ষরে পর্দার কাপড়ে লিখে কাবা ঘরসহ

দেব-দেবীর মন্দিরের দেয়ালে টানিয়ে দেয়ার রেওয়াজ ছিল। তখন আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ইমরুল কায়েসসহ আমর ইবনে কুলসুম, তারাফা, অন্তরা, নাবিঘা, জুহাইর, আশা প্রমুখ শ্রেষ্ঠ কবিদের স্বর্ণাক্ষরে লিখিত মোয়াল্লাকাত বা ঝুলন্ত কবিতায় কাবা ঘরের দেয়াল অলংকৃত হতো।-অনুবাদক]।

ওকাজের কবিতা সম্মেলনে কবি কাসা বিন সায়িদা প্রকাশ্যেই কবিতা এবং ধর্মোপদেশ দ্বারা লোকজনকে মূর্তি পূজা পরিহার করার আহ্বান জানাতেন। তায়েফের সাকিফ গোত্রের ওমায়া বিন আবু-সালাত মুহাম্মদের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি সে-সময়ের বিখ্যাত হানিফ এবং একেশ্বরবাদের প্রবক্তা ছিলেন। ওমায়া বিন আবু-সালাত প্রায়ই সিরিয়ায় যেতেন এবং সেখানকার খ্রিস্টান সন্ন্যাসী ও ইহুদি পণ্ডিতদের সাথে সংলাপে বসতেন। একদা সিরিয়াতে অবস্থানকালে তিনি মুহাম্মদের উত্থানের সংবাদ শুনতে পান। অনেকে বলেন ওমায়া এবং মুহাম্মদের মধ্যে সাক্ষাত হয়েছিল। কিন্তু ওমায়া ইসলাম গ্রহণ করেননি, মুসলিম হননি। জানা যায় যে তায়েফ প্রত্যাবর্তনের পর ওমায়া তাঁর এক বন্ধুকে বলেছিলেন : 'অন্যান্য ধর্ম এবং প্রথার উপর আমার জ্ঞান মুহাম্মদের চাইতে অনেক বেশি। আমি আরমেনীয় এবং হিব্রুভাষাও জানি। কাজেই নবি হবার দাবি আমার অধিকতর।' বুখারির[১৬] মতে, পরবর্তীতে মুহাম্মদ একথা শুনে বলেছিলেন : 'ওমায়া বিন আবু-সালাত মুসলমান হবার কাছাকাছি এসেছিলেন।'

তৎকালীন তরুণ কবিদের লেখা কবিতায় এক জাতির সচেতনতা এবং সামাজিক রীতিনীতি প্রাণবন্তভাবে প্রকাশিত হয়। প্রাক-ইসলামি যুগের কিছু আরবি কবিতা আছে। তখনকার একটি কবিতা খুব সম্ভবত কবি জোহাইর[১৭] এর লেখা হতে পারে। এই কবিতা এখানে দেয়া হলো :

'তোমার আত্মায় যা আছে তা আল্লাহর কাছে গোপন করবে না,

কেন-না তুমি যেমনভাবেই তা ঢাকার চেষ্টা কর না কেন, আল্লাহ তা জেনে যাবেন!

হয়তো বা স্থগিত থাকবে, অথবা এক বইতে লিখিত হবে, এবং জমা হবে

হিসাবের দিন, অথবা শীঘ্রই তা পরিশোধ করা হবে।'

অথবা আবদুল্লাহ বিন আল-আবরাসের লেখা এই কবিতা :

'জনতা চায় তারই উপাসনা করতে,

কারণ ঈশ্বর-সন্ধানীরা হতাশ হবে না।

ঈশ্বরের মাধ্যমে সকল আশীর্বাদ নাগাল পাওয়া যায়;

যে কিছুর উল্লেখ করলেই বিজয় প্ররোচিতে হয়ে যায়।

ঈশ্বরের কোনো অংশীদার নাই,

এবং হৃদয়ে যা গোপন আছে তা তিনি অবগত।'

শোনা যায় একদা নবি মুহাম্মদ কবি লাবিদের[১৮] এই কবিতা উদ্ধৃত করেছিলেন :

'আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই বৃথা,

সমস্ত সাফল্য একদিন অবসান পাবে।'

লক্ষণীয় যে লাবিদসহ প্রাক-ইসলামি যুগের কবিরা স্রষ্টা বা ঈশ্বরকে 'আল্লাহ'বলেই সম্বোধন করতেন। মুহাম্মদের পিতাসহ অনেক পৌত্তলিক কুরাইশদের নাম রাখা হতো 'আবদুল্লাহ'-যার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর দাস। মুহাম্মদের অনেক পূর্বকাল থেকে মক্কাবাসীদের কাছে 'আল্লাহ' নামটি পরিচিত ছিল, তারা মনে করতেন তাদের দেবদেবী হচ্ছেন আল্লাহর সান্নিধ্য পাবার মাধ্যম। তাদের এই ধারণা কোরানের সুরা ইউনুসে বর্ণিত হয়েছে : 'ওরা আল্লাহ ছাড়া যার উপাসনা করে তা তাদের ক্ষতি করে না, উপকারও করে না। ওরা বলে, 'এগুলো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী।' বলো, 'তোমরা কি আল্লাহকে আকাশ ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দেবে যা তিনি জানেন না? তিনি পবিত্র, মহান।'আর তারা যাকে শরিক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে।' (১০:১৮)। আমর বিন ফজল নামের আরেকজন প্রাক-ইসলামি যুগের আরব কবি মূর্তিপূজাকে সরাসরি প্রত্যাখান করেছেন। তিনি লিখেছেন :

আমি তো লাত এবং ওজ্জাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছি,

যে কোনো বলিষ্ঠ এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এই রকমই করবে।

আমি কোনোমতেই ওজ্জা এবং তার দুই কন্যাকে দেখতে যাব না

অথবা বানু ঘনিমের দুটি মূর্তিকে।

আর আমি তো হুবালকেও বার বার দর্শন দিব না,

ভাগ্য প্রতিকূল হতে পারে; আমার ধৈর্য সামান্য।

কাজেই মক্কাবাসীর কাছে পৌত্তলিকতা ছেড়ে এক ঈশ্বরের উপাসনা করার আহ্বান নতুন কিছু ছিল না। যেটা অভিনব সেটা হলো এই উপাসনাকে আশু করার জন্য পীড়াপীড়ি করা। মুহাম্মদের অসামান্য কাজ ছিল, তিনি দৃঢ়ভাবেই সমস্ত অপমান, হয়রানি এবং প্রতিরোধের মোকাবেলা করে গেছেন। আরব-উপদ্বীপে ইসলাম প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত মুহাম্মদ ক্ষান্ত হননি; এবং আরবের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে একই পতাকাতলে একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আরবের বিভিন্ন গোত্রের জীবনযাপন ছিল খুব সেকেলে। তারা ছিলেন অনেকাংশে বস্তুবাদী এবং একমাত্র বাস্তব ও দৃশ্যমান বস্তু নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে তারা ছিলেন উদাসীন। তাৎক্ষণিক মুনাফার প্রতি তাদের ছিল তীব্র আকর্ষণ। অন্যের বিষয়-সম্পত্তি জব্দ করতে তারা কুণ্ঠাবোধ করতেন না। ক্ষমতা লাভের জন্য তারা যা খুশি তাই করতেন। তাদের এই মানসিকতার পরিচয় পূর্বেই আকনাস বিন শারিকের কাছে আবু জেহেলের উক্তিতে ফুটে উঠেছে। আবু জেহেলের দৃষ্টিতে মুহাম্মদ নবুওতির ভান করছিলেন আবদে মনাফ বংশের প্রাধান্যতা প্রতিষ্ঠা করতে। উমাইয়া খলিফা ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার (৬০ হিজরি বা ৬৮০ খ্রিস্টাব্দ-৬৪ হিজরি বা ৬৮৩ খ্রিস্টাব্দ) মন্তব্যে একই ধারণার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। মুহাম্মদ যেভাবে তাঁর বিরোধীপক্ষকে বদর যুদ্ধে (২ হিজরি বা ৬২৪ খ্রিস্টাব্দ) পরাজিত করেছিলেন ঠিক একইভাবে উমাইয়া বংশের সৈন্যরা বানু হাশেমি গোত্রকে পরাজিত

করে এবং কারবালার যুদ্ধে (৬১ হিজরি বা ৬৮০ খ্রিস্টাব্দ) হোসেন বিন আলিকে হত্যা করেন। লোকমুখে প্রচলিত আছে, এই ঘটনার পর ইয়াজিদ এক পঙক্তি কবিতাও লিখে ফেলেছিলেন :

'হাশেমিরা ক্ষমতার জুয়া খেলে, কিন্তু কোনো শব্দ আসলো না, কোনো দৈববাণীও নামলো না।'

পরিচ্ছেদটি শেষ করার পূর্বে এখানে না বললেই নয় যে, আধুনিক যুগের কোনো কোনো আরব পণ্ডিত প্রাক-ইসলামি যুগের কবিতা সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন। যাহোক, প্রচুর সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায়, ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরবে পৌত্তলিকতার উপর মোহমুক্ত হয়ে একাধিক ব্যক্তির হাত ধরে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন গড়ে ওঠে।

নবুওতির সমস্যা

ইদানীং প্রচুর বিদগ্ধজন ইসলামের উত্থান ও প্রসার নিয়ে সবিস্তারে অনুসন্ধান করেছেন। সেই-সাথে কোরানের আয়াতের অর্থ, বিন্যাস, প্রসঙ্গ এবং হাদিসের উদ্ভব নিয়েও হচ্ছে অনেক গবেষণা। পাশ্চাত্য পণ্ডিত যেমন জার্মান বংশোদ্ভূত প্রাচ্য-বিশেষজ্ঞ থিওদর নোলদেক(১৮৩৬-১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ), হাঙ্গেরীয় বংশোদ্ভূত ইজহাক গোল্ডজিহার (১৮৫০-১৯২১ খ্রিস্টাব্দ), অস্ট্রীয় বংশোদ্ভূত অধ্যাপক আলফ্রেড ভন ক্রেমার (১৮২৮-১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ), জার্মান বংশোদ্ভূত আরবি সাহিত্য বিশেষজ্ঞ অ্যাডাম মেজ (১৮৬৯-১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ), ফরাসি বংশোদ্ভূত প্রাচ্য-বিশেষজ্ঞ এবং কোরানের ফরাসি অনুবাদক রেগিস ব্লাশের (১৯০০-১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রমুখ এ-ব্যাপারে তাঁদের গবেষণালব্দ কর্ম দিয়ে মূল্যবান অবদান রেখেছেন। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখার মতো তাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করেছেন ইসলাম, কোরান, হাদিস, আরব-ইতিহাসসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলী। পর্যবেক্ষণ করেছেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রবণতা তাঁদের মধ্যে লক্ষ করা যায় না। বরং তাঁদের গবেষণার ভিত্তি হচ্ছে প্রকৃত ও নির্ভরযোগ্য ইসলামি-নথিপত্র।

অবশ্য কোনো কোনো ইউরোপীয় লেখক নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গবেষণার কাজকে স্থিমিত করে ফেলেছেন। তারা মুহাম্মদকে একজন স্রেফ অভিযাত্রিক ও ভণ্ড হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাদের মতে কোরান হচ্ছে ক্ষমতালাভের একটি হাতিয়ার। অবশ্য কোরানের এই পশ্চিমা-সমালোচকেরা মুসা এবং যিশুকেও যদি সমালোচনা করতেন তবে হয়তো তাদের বক্তব্য কিছুটা বিবেচনাযোগ্য হতো (যদিও বিষয়টি এই বইয়ের আলোচনার বাইরে)। কিন্তু তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, মুসা এবং যিশুকে ঈশ্বর স্বয়ং নিয়োজিত করেছিলেন, কিন্তু মুহাম্মদকে নয়। তাঁদের এই বক্তব্যের সমর্থনে যৌক্তিকভাবে স্বীকৃত কোনো প্রমাণ নাই। এরকম ধারণা যারা পোষণ করেন তাঁদেরকে শুরুতেই নৈতিক অবস্থান পরিষ্কার করা দরকার। নীতিগতভাবে তাঁদেরকে প্রথমেই নবুওতির বিষয়টি মেনে নিতে হবে। কারণ তারা একটি ক্ষেত্রে নবুওতির তত্ত্ব মানবেন, কিন্তু অন্যক্ষেত্রে মানবেন না, এটা যৌক্তিক আচরণ নয়।

আরবের প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ মুহাম্মদ বিন জাকারিয়া[১৯] এবং সিরিয়ীয় অন্ধকবি আবু আল আলা আল-মারি[২০] নবুওতির দাবিকে স্বীকার করতেন না। তাঁদের মতে ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে নবুওতি বা পয়গম্বরের দাবি অযৌক্তিক ও অবিশ্বাস্য। ধর্মবিশ্বাসীরা বলেন স্রষ্টা অনুগ্রহপূর্বক কোনো ব্যক্তিকে নিয়োজিত করেন মানুষকে বিপথ এবং পাপ থেকে বিরত রাখার জন্য। যুক্তিবাদীরা বলেন স্রষ্টা যদি সৎকর্ম এবং মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক নিয়ে এতই চিন্তিত থাকেন তবে তিনি সবাইকে নিষ্পাপ এবং উত্তম করেই তৈরি করতেন। মানুষকে ঈশ্বরের মনমতো করে সৃষ্টি করলে কোনো পয়গম্বর বা তাঁর কোনো প্রতিনিধি পাঠানোর দরকার থাকত না। ধর্মবিশ্বাসীরা উত্তর দেন ভাল ও মন্দ ঈশ্বরের সৃষ্ট নয়। ঈশ্বর নিজে থেকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হলেও ভাল এবং মন্দ মানুষের

সহজাত প্রবৃত্তি। এ-থেকেও স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন তুলেন যুক্তিবাদীরা - একজন ব্যক্তি কি ঈশ্বরের সিদ্ধান্ত বা ইচ্ছার বাইরে গিয়ে ভালো বা খারাপ গুণের অধিকারী হতে পারেন?

একজন মানুষ তার বৈশিষ্ট্য লাভ করে পিতা-মাতা থেকে, গর্ভধারণের ক্ষণে। প্রত্যেক নবজাত শিশুই জন্মগ্রহণ করে কিছু শারীরিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে। এই বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে শিশুটির শারীরিক গঠনের উপর। কেউ ইচ্ছে করলেই যেমন পছন্দ করে নিতে পারে না তার চোখের রঙ, নাকের গঠন, হৃৎপিণ্ডের রক্তচাপ, দৈহিক উচ্চতা অথবা চোখের দৃষ্টিশক্তি, তেমনি কেউ ইচ্ছে করে তার মস্তিষ্কের ক্ষমতা, স্নায়ুশক্তি এবং সহজাত প্রবৃত্তিকে বেছে নিতে পারে না। কেউ কেউ শান্ত এবং পরিমিত মেজাজের, আবার অনেকে উচ্ছৃঙ্খল, জেদি এবং চরমপন্থী। যারা সন্তোষজনক ভারসাম্যপূর্ণ চরিত্রের অধিকারী তারা অন্য কারো স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করে না। যারা আগ্রাসী তারা প্রায় হিংসাত্মক কর্মে লিপ্ত হন।

বলা হয় যে, নবিদের পাঠানো হয় মানুষের চরিত্রের পরিবর্তনের জন্য। প্রশ্ন হচ্ছে একজন ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে কী পুরোপুরি সন্তোষজনক ভারসাম্যের ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত করা যেতে পারে? মানবীয় আচরণের যে গুণাবলী বংশগত, সেগুলি কি অন্য ব্যক্তির সদুপদেশ দ্বারা পরিবর্তিত করা সম্ভব? আর তাই যদি সম্ভব হতো তবে মানব-ইতিহাসে ধর্মের আগমনের পরও কেন এতো হিংসা, নিষ্ঠুরতা, অপরাধপ্রবণতা বিরাজ করেছে এবং বিস্তার লাভ করেছে? ফলে আমরা বলতে বাধ্য হই যে, ঈশ্বর তাঁর প্রেরিত নবিদের দ্বারা মানবজাতির সকল নারী-পুরুষকে ভালো এবং সুখী বানাতে পারেননি। একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণকারী হিসেবে এই বিষয়ে মন্তব্য করা যেতে পারে যে, এর চাইতে সঠিক, সহজ এবং নিরাপদ ব্যবস্থা হতো যদি ঈশ্বর প্রথমেই সকল নারী-পুরুষকে ভালো বানাতেন।

ধর্মবিদদের কাছে এই সমালোচনার উত্তর প্রস্তুত আছে। তারা বলেন পার্থিব জীবন হচ্ছে একটা পরীক্ষা। ভালো ও মন্দ কর্তৃত্বপূর্ণভাবে নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। একজন নবি পাঠিয়ে ঈশ্বর চূড়ান্তভাবে ভালো কর্মের লোক, যারা ঈশ্বরের আদেশ পালন করবে, তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, ভবিষ্যতে তাদের জন্য রয়েছে স্বর্গের পুরস্কার। আর যারা ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করবেন ভবিষ্যতে তাদের জন্য রয়েছে নরকের কঠোর শাস্তি।

নবুওতির অস্বীকারকারীরা বলেন ইহজীবন যে একটা পরীক্ষা এই যুক্তি অসার এবং অসমর্থনযোগ্য। যদি স্রষ্টা বা ঈশ্বর বলে কেউ থাকেন তবে তার বান্দাদের মনে যেসব গোপন চিন্তা আছে তা তো ঈশ্বর ঐ ব্যক্তির চাইতেও ভালো করে জানেন বা জানার কথা। তথাপি ঈশ্বর সবকিছু জেনেশুনে কেন তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা নিবেন? তিনি কি আগে থেকেই জানেন না যে কে এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হবে আর কে অকৃতকার্য হবে? ঈশ্বরের সবকিছুই কি পরিকল্পিত কিংবা এই মহাবিশ্বে ঈশ্বরের পরিকল্পনার বাইরে বা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি কিছু ঘটতে পারে? ঈশ্বর কেনইবা তার বান্দাদের তাদের মন্দকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন? বান্দারা কখনো নিজেদের কাজকে পাপ বলে মনে করবে না। ওরা যা করে তা ওদের মেজাজের বৈশিষ্ট্য এবং চরিত্রের সাথে খাপ খায়। সবার যদি একই ধরনের সহজাত প্রবৃত্তি হতো তাহলে কেউ কেউ ঈশ্বরের আদেশ পালন করেন আর কেউ করেন না এর ব্যাখ্যা করা যায় না। সোজা ভাষায় বলা যায়, সবার মাঝে যদি ভাল মন্দ করার প্রবণতা সমানভাবে থাকতো তাহলে হয় সবাই ঈশ্বরের আদেশ পালন করবে, নয়তো সবাই ঈশ্বরের আদেশ পালন করবে না। সাধারণ এই বিবেচনার সাথে মুসলিম চিন্তাবিদদের এটাও মনে রাখা দরকার যে কোরানের একাধিক স্থানে বলা হয়েছে, মানুষের ভ্রান্তি এবং সাধুতা নির্ভর করে আল্লাহর ইচ্ছার উপর। যেমন : 'কাউকে প্রিয় মনে করলেই তুমি তাকে সৎপথে আনতে পারবে না; তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনেন, আর তিনিই ভালো জানেন কারা সৎপথ অনুসরণ করে।' (সুরা কাসাস : আয়াত ৫৬)। 'আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতাম।' (সুরা সিজদা : আয়াত ১৩)। '. . . আল্লাহ যাকে ইচ্ছা (উত্তম বাণীসংবলিত কিতাব) দিয়ে পথপ্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই।' (সুরা জুমার : আয়াত ২৩)। কোরানে

এই ধরনের আয়াত এত অধিক যে এখানে সব উদ্ধৃত করা অসম্ভব। এই আয়াতগুলো এবং মানবকুলে মৌলিক পরিবর্তনে নবিদের অক্ষমতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মজ্ঞানীদের বক্তব্য অনুযায়ী নবির প্রয়োজনীয়তার দাবি আসলে অর্থহীন।

ধর্মীয় পণ্ডিতদের অসার বক্তব্যগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে ঈশ্বরের সৃষ্টি নিয়ে। তাঁদের বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হচ্ছে যে, সৃষ্টিকর্তা এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তা নবি এবং অবতার পাঠিয়ে থাকেন। এছাড়া ধর্মীয় পণ্ডিতরা মনে করেন, সৃষ্টিকর্তা দ্বারা সৃষ্টির আগে মহাবিশ্বের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তিনি শূন্য হতে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এই ধরনের দাবি যাচাই-অযোগ্য। আমরা কেমন করে জানতে পারবো যখন ঈশ্বর অস্তিত্বশীল ছিলেন, অথচ মহাবিশ্ব, মহাকাশ কোনো কিছুই ছিল না। এটা সত্য যে, আজকের সৌরমণ্ডল ও তারকা, এবং নীহারিকার সর্বদা অবস্থিতি ছিল না। কিন্তু এগুলোর কোনো উপাদান মহাবিশ্বে বর্তমান ছিল না বরং হঠাৎ করে ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে এই মতবাদ যৌক্তিক নয়। ঈশ্বর মহাবিশ্বের সৃষ্টির উপাদানগুলো কোথা হতে কোন উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করলেন? তারচেয়ে বরং পূর্ব থেকেই পরমাণুর অস্তিত্ব ছিল মেনে নেয়া যেতে পারে। পরমাণুর সংমিশ্রণে সূর্যের উৎপত্তি ঘটে। কিন্তু এখনো আমরা পরিষ্কারভাবে জানি না, কেমন করে পরমাণুর সংমিশ্রণ ঘটে এবং বস্তুর উদ্ভব হয়। তবে এই অনুকল্পের প্রমাণ দেখা যায় মহাকাশে অবিরামভাবে তারকাদের উদ্ভবে এবং তাদের মৃত্যুতে।

তাই বলা যেতে পারে যে সৃষ্টির সূচনা পদার্থ থেকে নয় বরং এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে রূপান্তর। এই পরিস্থিতে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি দেখানো খুব কঠিন। আবার আমরা যদি ধরে নেই যে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্টির পূর্বে মহাবিশ্বের অস্তিত্ব ছিল না তাহলে সমস্যা দেখা দিবে। সেই সমস্যা হচ্ছে মহাবিশ্ব সৃষ্টির কারণ কী? আমরা চেষ্টা করেও দুটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই না। প্রশ্ন দুটি হচ্ছে : বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আগে থেকে কেন ছিল না? আর ঈশ্বর কেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিলেন? প্রশ্নগুলোর কোনো যুক্তিসঙ্গত উত্তর নেই ধর্মবিদদের কাছে। ফলে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষেও কোনো যুতসই প্রমাণ দেখানো যাবে না।

এই রকম বিভ্রান্তির মাঝে আমাদের পার্থিব মনে একটি ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যায়। আমরা মানুষেরা পৃথিবীর অন্যান্য জীবের সাথে একই শ্রেণিতে বিন্যস্ত হতে রাজি নই। মানুষ চিন্তাশীল প্রাণি এবং বহু পূর্ব থেকে মানুষ বিশ্বাস করে আসছে এই বিশ্ব-মহাবিশ্বের সবকিছু কেউ না কেউ একজন শুরু করেছেন এবং তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন সকল শুভ এবং অশুভ প্রভাব। এই ধারণা যুক্তি দিয়ে হোক বা গর্ব অনুভবের জন্য অন্য প্রাণি থেকে মানুষকে পৃথক করে দেখার মানসিকতাই হোক, ধর্মগুলির উদ্ভব ঘটিয়েছে। আদিম অথবা প্রগতিশীল, সব সমাজে আমরা দেখি ধর্মের শক্তিশালী প্রভাব বিরাজমান। আদিম সমাজে আছে কুসংস্কার এবং মোহ। আধুনিক প্রগতিশীল সমাজে চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রভাবে সভ্য এবং ন্যায়সঙ্গত সমাজব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। চিন্তাবিদরা আবির্ভূত হয়েছেন আইন প্রণয়নকারী, সমাজ সংস্কারক, অথবা দার্শনিকরূপে। যেমন হাম্মুরাবি, কনফুসিয়াস, বুদ্ধ, সক্রেটিস এবং প্লেটোসহ বিভিন্নজনের নাম উল্লেখ করা যায়। সেমিটিকদের মধ্যে সর্বদা এই ধরনের ব্যক্তিরা আবির্ভূত হয়েছেন নবি বা রসুল হিসেবে। অর্থাৎ তাঁরা স্বঘোষিতভাবে ঈশ্বরের প্রতিনিধি দাবি করেছিলেন।

মুসা সিনাই পর্বতে আরোহণ করে নিয়ে আসলেন লিপিফলক, যার ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করলেন ইসরাইলিদের সমাজব্যবস্থা সংস্কারের জন্য। যিশু দেখলেন ইহুদিরা অহংকার এবং মিথ্যা ধর্মানুরাগে নিমজ্জিত। তাই তিনি তাদেরকে উত্তম নৈতিকতা শিক্ষা দিতে উপস্থিত হলেন। তিনি ঈশ্বরকে তাঁর দয়াময় পিতা বলে প্রচার করলেন। তাই যিশু নিজস্ব বক্তব্যকে পিতা-পুত্রের বাণী হিসেবে প্রচার করলেন। অথবা যিশু এ-রকমটি না করে থাকলেও তাঁর ভক্তরা অলৌকিকতার প্রচার চালিয়ে যিশুর মহিমা প্রচার করলেন। ফলে এটা হতে পারে যে, নতুন বাইবেলের চারটি গসপেল যিশুর জন্মবৃত্তান্তকে বিকৃত করেছে অথবা তাঁর সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত গল্প সাজিয়েছে।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে মুহাম্মদের উত্থান ঘটে আরবের হেজাজে। তিনি সমাজ-সংস্কারের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানালেন। কিন্তু তিনি মুসা এবং যিশুর সাথে কীভাবে পার্থক্য সূচনা করলেন? সরলমনা ধর্মবিশ্বাসীরা অলৌকিক ঘটনার ভিত্তিতে নবুওতি বিশ্বাস করেন। এজন্য ইসলামি লেখকেরা শতাধিক অলৌকিক কাহিনী মুহাম্মদের ওপর আরোপ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে হাদাদ নামে একজন খ্রিস্টীয় আরব পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রচুর গবেষণা করে তিনি 'দ্যা কোরান অ্যান্ড দ্যা বাইবেল'নামে একটি বই রচনা করেছেন। কোরান থেকে প্রচুর উদাহরণ সংগ্রহ করে তিনি দেখিয়েছেন নবি মুহাম্মদ আসলে কোনো অলৌকিক কাজ করেননি। এরপর তিনি অর্বাচীনের মতো দাবি করেন যেহেতু অলৌকিক ঘটনা দিয়ে নবিদের মূল্যায়ন করা হয় তাই যিশু ও মুসার নবুওতি প্রমাণিত। আদতে সমস্ত অলৌকিক ঘটনাই অপ্রতিপাদনযোগ্য কল্পকাহিনী অথবা দৃষ্টিভ্রম। যিশু যদি সত্যি সত্যি কোনো মৃতব্যক্তিকে জীবিত করে ফেলতেন তবে ইহুদিদের মধ্যে একজনও থাকতো না যে যিশুর নবুওতিতে অবিশ্বাস করতো বা যিশুর প্রতি মাথা নত করতে দ্বিমত পোষণ করতো। ঈশ্বর যদি চাইতেন তাঁর প্রেরিত একজন রসুলের প্রতি সবাই বিশ্বাস আনুক এবং তাঁর শিক্ষা থেকে সবাই সুফল গ্রহণ করুক তবে ঈশ্বরের কাছে সবচেয়ে সুবিধাজনক হচ্ছে সবাইকে ভালো এবং বিশ্বাসী বানিয়ে দেয়া। অথবা ঈশ্বর এটাও করতে পারেন যে, ঐ নবিকে মানুষের মনের উপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দিয়ে দিতে পারতেন। এই প্রক্রিয়া একজন মৃতব্যক্তিকে পুনঃজীবিত করার ক্ষমতার চাইতে অনেক সহজতর। তখন সে নবির প্রয়োজন পড়তো না কোনো নদীর প্রবাহ বন্ধ করা বা আগুনকে প্রজ্জ্বলিত হতে বাধা দেয়া ইত্যাদি করতে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে নবুওতির সমস্যাকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করতে হবে। নবিকে দেখতে হবে একজন ব্যক্তি হিসেবে যাঁর রয়েছে অসাধারণ মানসিক এবং আধ্যাত্মিক প্রতিভা যা সচরাচর একজন সাধারণ ব্যক্তির মধ্যে নেই। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সামরিক নেতাদের মধ্যে আছেন সাইরাস, আলেকজান্ডার, সিজার, নাদির এবং নেপোলিয়ন। যুদ্ধ-পরিকল্পনায় এবং যুদ্ধে জয়ী হবার পদ্ধতিতে তাঁরা ছিলেন অসাধারণ কুশলী। কিন্তু জনসাধারণকে শিক্ষা দেবার মতো তাঁদের কিছুই ছিল না। শিল্পকলা এবং বিজ্ঞানে আছেন অ্যারিস্টটল, ইবনে সিনা, নাসির উদ্দিন তুসি, টমাস অ্যাডিসন, আইনস্টাইন, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, বিটোফেন, হোমার, ফেরদৌস, অন্ধকবি আবু আল আলা আল-মারি, হাফিজ, এবং আরও শতজন। তাঁদের আবিষ্কার, উদ্ভাবন, রচনা, এবং সেরা শিল্পকর্ম বিশ্বসভ্যতাকে প্রজ্জ্বলিত করেছে। ফলে আধ্যাত্মিক জগতেও এই ধরনের ব্যক্তিত্ব থাকবেন না কেন? কোনো ব্যক্তি যদি গভীর ধ্যান বা চিন্তাশক্তি দ্বারা কোনো অসীম ক্ষমতাধরের ধারণা আবিষ্কার করেন এবং জনতাকে পথ-প্রদর্শনের জন্য সে ধারণা ধীরে ধীরে প্রেরিত বাণী বলে প্রচার করেন তবে তাঁর সেই ধারণা সহজে কোনো যুক্তি দিয়ে নাকচ করা যায় না।

বাল্যকালে মুহাম্মদের মনেও একই ধরনের চিন্তা স্থান পায়। এজন্য সিরিয়া ভ্রমণকালে বাণিজ্যের কাজে ব্যস্ত না থেকে তিনি চট করে খ্রিস্টান সন্ন্যাসী এবং পাদ্রিদের সাথে আলাপে বসেন। ফেরার পথে মিদিয়ান, আদ এবং সামুদ সম্প্রদায়ের অনেক গল্প শোনেন। মক্কাতেও মুহাম্মদ প্রায়ই ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতা, সন্ন্যাসীদের সাথে আলাপ করতেন। তিনি মারওয়া পাহাড়ের নিকটে জাবর নামে এক ব্যক্তির দোকানে প্রচুর সময় কাটাতেন। সে-সময় খাদিজার চাচাতো ভাই হানিফ মতাবলম্বী ওয়ারাকা বিন নওফল নতুন বাইবেলের অংশবিশেষ আরবিতে অনুবাদ করেছিলেন। মুহাম্মদ ওয়ারাকার সাথেও প্রচুর সময় নিয়ে মতবিনিময় করতেন। এই আলোচনা-অভিজ্ঞতাগুলি মুহাম্মদের মনে দীর্ঘদিনের যে সুপ্ত চিন্তাভাবনা ছিল তা ঘূর্ণির মতো জেগে ওঠে।

জাবরের সাথে মুহাম্মদের ঘনঘন এবং দীর্ঘ আলোচনার কথা কোরানে উল্লেখ আছে। জাবর ছিলেন ভিনদেশি। তাই কুরাইশরা বলতেন, মুহাম্মদ কোরানের আয়াত পেয়েছেন এক বিদেশির কাছে। কোরানের সুরা নাহলে এ-বিষয়ে বলা হয়েছে : 'আমি অবশ্যই জানি যে ওরা বলে, 'তাকে (মুহাম্মদকে) শিক্ষা দেয় এক মানুষ।' ওরা যার প্রতি ইঙ্গিত করে তার ভাষা তো আরবি নয়, কিন্তু এ কোরান তো পরিষ্কার আরবি ভাষা।' (১৬:১০৩)। মুহাম্মদের জীবনী থেকে জানা যায়, তিনি ধর্মপ্রচার শুরু করার আগে অনেক ধর্মবিদ, সন্ন্যাসী-ঋষি এবং জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে ভাবের আদান-প্রদান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হচ্ছেন :

হুয়ারিব গোত্রের সন্ন্যাসী আয়েশ, পারস্যের সালমান আল-ফার্সি এবং আবিসিনিয়ার (বর্তমান নাম ইথিওপিয়া) অধিবাসী বেলাল। এছাড়া আবু বকরও অনেক সময় মুহাম্মদের সাথে আলোচনা করে ধর্মীয় বিষয়ে একমত হন।

মুহাম্মদের জীবনী, হাদিস এবং কোরানের বেশকিছু আয়াতের ভিত্তিতে যে-কোনো অনুসন্ধানী ব্যক্তি প্রকৃত ঘটনা বের করে নিতে পারবেন। এই আলামতগুলো থেকে প্রমাণিত হয় মুহাম্মদের ভাবুক মনের দুর্নিবার যাতনার ফলস্বরূপ তিনি এক অশরীরী আত্মা বা দেবদূতের সাক্ষাৎ পান। কোরানের সুরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াতে রয়েছে :

‘আবৃত্তি করো তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে।

আবৃত্তি করো, তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন,

শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।’(৯৬:১-৫)।

মুহাম্মদের নবুওতি প্রাপ্তির প্রথম সুরা। তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। উচ্চতায় তিনি মাঝারি, শ্বেত বর্ণের ত্বক অনেক সময় লালাভ হয়ে যেত, কৃষ্ণকায় চুল ও চোখ। মুহাম্মদ কদাচিত কৌতুক করতেন বা হাসতেন। কখনো হাসলেও হাত দিয়ে হাসি চেপে রাখতেন। তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে স্বাচ্ছন্দে হাঁটতেন এবং হাঁটার সময় এদিক-ওদিক তাকাতেন না। কিছু লোকভাষ্য থেকে জানা যায় মুহাম্মদ কয়েকটি সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কখনো কুরাইশ যুবকদের সাথে আমোদ-ফুর্তি বা লঘু কথাবার্তায় যোগদান করেননি। তিনি যৌবনে সততার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন, এমন-কী তাঁর শত্রুপক্ষ থেকেও। খাদিজাকে বিয়ের পর মুহাম্মদের আর্থিক চিন্তা দূরীভূত হয়। তখন তিনি আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনেক সময় ব্যয় করতেন। বেশিরভাগ হানিফ মতাদর্শীর মতো তিনিও নবি ইব্রাহিমকে নিখুঁতভাবে ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত মনে করতেন। আর এটা বলার অবকাশ থাকে না যে, তিনি তাঁর বংশের লোকদের পৌত্তলিকতাকে ঘৃণার চোখে দেখতেন।

আধুনিক যুগের আরবের খ্যাতিমান পণ্ডিত তাহা হোসেনের মতে তখন বেশিরভাগ কুরাইশ নেতাও কাবার মূর্তিগুলোর উপরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সম্মান দেখানোর বাহানা করতেন, কেননা বেদুইনদের মাঝে তখনও পৌত্তলিকতা শক্তভাবে বিদ্যমান ছিল। বেদুইনদের এই ধর্মীয় বিশ্বাস আর প্রথা পালন মক্কার কুরাইশদের জন্য নিয়ে আসতো আর্থিক ও সামাজিক সুবিধা।

শব্দচয়নে মুহাম্মদ ছিলেন সবসময় সুচিন্তিত এবং হুঁশিয়ার। একটি লোকভাষ্য অনুযায়ী মুহাম্মদ একসময় একজন কুমারী তরুণীর মতো লাজুক ছিলেন। তাঁর বাচনভঙ্গি ছিল সুন্দর এবং তিনি কথা বলার সময় সর্বদা অর্থহীন পুনরাবৃত্তি এবং দীর্ঘ বক্তৃতা থেকে বিরত থাকতেন। তাঁর মাথার কেশ ছিল লম্বা এবং তা কানদ্বয়কে ঢেকে রাখত। মাথায় সচরাচর তিনি সাদা পাগড়ি পরতেন। মাথা এবং দাড়িতে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন নিয়মিত। তিনি ছিলেন বিনয়ী এবং দয়ালু। করমর্দন করলে কখনোই তিনি নিজের হাত আগে ছাড়িয়ে নিতেন না। নিজেই নিজের পোশাক এবং জুতা মেরামত করতেন। তাঁর অধঃস্থ ব্যক্তিদের সাথে তিনি মেলামেশা করতে পারতেন অনায়াসে। একবার তিনি এক ক্রীতদাসের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং ক্রীতদাসের সাথে মাটিতে বসে খেজুর আহার করেন। ধর্মপ্রচারের সময় তিনি অনেকবার কণ্ঠ জোরালো করতেন বিশেষ করে যখন কোনো কাজের নিন্দা করতেন। এই সময় তাঁর চোখ দুটি এবং মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে যেত।

মুহাম্মদের চরিত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর প্রচণ্ড সাহস। একবার এক যুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি একটি ধনুকে হেলান দিয়ে মুসলমানদেরকে যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করেন। যুদ্ধের সময় যখন মুসলমান যোদ্ধারা ভীত থাকতেন তখন মুহাম্মদ সম্মুখে হেঁটে শত্রুর

একেবারে কাছাকাছি চলে যেতেন, যা অন্য কেউ করতে পারতেন না। মুহাম্মদ মাত্র একজন ব্যক্তিকে স্বহস্তে হত্যা করেছিলেন। তাও হয়েছিল যখন সেই ব্যক্তি অসিযুদ্ধে মুহাম্মদকে মারাত্মক আঘাত হানে। নবি মুহাম্মদের প্রচারিত কিছু বাণী হচ্ছে :

১. ‘কেউ যদি এক ব্যক্তিকে মন্দ জেনেও তার সাথে মেলামেশা করে এবং সে জানে যে ঐ ব্যক্তি মন্দ, তবে সে মুসলমান নয়।’

২. ‘পাশের ব্যক্তিটি ক্ষুধার্ত জেনেও যে ব্যক্তি একাকী আহার করেন তিনি মুসলমান নন।’

৩. ‘উত্তম নীতিমালা হচ্ছে ঈমানের অর্ধেক।’

৪. ‘সবচেয়ে উত্তম জিহাদ হচ্ছে একজন অনৈতিক ব্যক্তিকে সত্য জানিয়ে দেয়া।’

৫. ‘যে ব্যক্তি তার ক্রোধ সংবরণ করেন সেই-ই অধিক শক্তিশালী।’

মুহাম্মদের নবি হয়ে ওঠা

মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত হেরা পর্বত। শুষ্ক এক শিলাময় স্থান। এই পর্বতের ঢাল বেয়ে ওঠা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু পর্বতের গুহার ভেতর তৎকালীন অনেক হানিফ নিয়মিত যেতেন নির্জন আশ্রয় ও একাকী ধ্যান করার জন্য। মুহাম্মদও বেশ কিছু দিনের জন্য তাই করছিলেন। বাস্তব জীবনের কোলাহল থেকে মুক্তি পেয়ে একাকী কিছু সময় অতিবাহিত করার স্পৃহা মুহাম্মদকে অনেক বার এই স্থানে নিয়ে আসতো। কখনো কখনো মুহাম্মদ সাথে করে আহার সামগ্রী নিয়ে যেতেন এবং গুহা থেকে বের হতেন না আহার ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত। কখনো কখনো আবার খুব ভোরে তিনি চলে যেতেন আর সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আসতেন।

৬১০ খ্রিস্টাব্দে একদিন মুহাম্মদ ঘরে ফিরলেন না। কথা ছিল সেদিন সন্ধ্যায় তিনি ঘরে আসবেন। উৎকণ্ঠিত খাদিজা লোক পাঠালেন মুহাম্মদের খোঁজে। অবশ্য অল্পসময় পরে মুহাম্মদ দুয়ারে উপস্থিত হয়ে গেলেন। তাঁকে বিবর্ণ দেখাচ্ছিল এবং শরীর কাঁপছিল। তিনি বললেন : ‘আমাকে আবৃত করো!’ তখন তাঁকে চাদর দিয়ে আবৃত করা হলো। কিছু সময় পর যখন মুহাম্মদ স্বাভাবিক হলেন এবং সংবিৎ ফিরে আসলে তিনি খাদিজাকে ঘটনা বর্ণনা করেন।

নির্ভরযোগ্য হাদিস সংগ্রাহক বুখারি, মুসলিম বিন আল হাজ্জাজ, আবু দাউদ আল তায়ালিসি, ইবনে আব্দুল আল- বার, নুয়ারি এবং ইবনে সাইয়েদ আন-নাস প্রণীত হাদিস গ্রন্থে এবং বিখ্যাত ধর্মবিশারদ ইমাম আহমদ বিন হানবলের (১৬৪ হিজরি বা ৭৮০ খ্রিস্টাব্দ-২৪১ হিজরি/৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ) মুসনাদে বর্ণিত : ‘হজরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ-এর প্রতি সর্বপ্রথম যে ওহি আসে, তা ছিল ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে ভোরের আলোর ন্যায় প্রকাশ পেত। তারপর তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং তিনি হেরা-গুহায় নির্জনে থাকতেন। আপন পরিবারের কাছে ফিরে আসা এবং কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া, এভাবে সেখানে তিনি একাধারে বেশ কয়েক রাত ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন।

তারপর খাদিজা (রা)-র কাছে ফিরে এসে আবার অনুরূপ সময়ের জন্য কিছু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যেতেন। এমনিভাবে হেরা-গুহায় অবস্থানকালে একদিন তাঁর কাছে ওহি এলো। তাঁর কাছে ফেরেশতা এসে বললেন, 'পড়ুন'। রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : 'আমি বললাম, আমি পড়ি না'[২১]। [বাংলাদেশের ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত বুখারী শরীফ, প্রথম খণ্ড, হাদিস নম্বর ৩, পৃ. ৫ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।-অনুবাদক]

হাদিস অনুযায়ী মুহাম্মদ তাঁর অভিজ্ঞতা খাদিজাকে জানালেন এভাবে : 'তারপর তিনি (ফেরেশতা) আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন'। আমি বললাম আমি তো পড়ি না।' তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : 'পড়ুন।' আমি জবাব দিলাম, 'আমি তো পড়ি না।' রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তারপর তৃতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। এরপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে। পড়ুন, আর আপনার রব মহামহিমান্বিত।' (৯৬:১-৩)। এরপর ফেরেশতা উধাও হয়ে গেলেন। আমি সজাগ হলাম এবং ঘরের উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করলাম।' [হাদিসের অনুবাদটি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের 'বুখারী শরীফ' থেকে সংগৃহীত-অনুবাদক]। পরে মুহাম্মদ খাদিজাকে জানালেন যে তিনি তাঁর জীবনের জন্য ভীত ছিলেন। এ-সবের কী ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে? কেন তিনি এত ভীত হলেন? মুহাম্মদ কী ভেবেছিলেন তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন, কোনো জাদুর প্রভাবে পড়েছেন, অথবা কোনো নিরাময়-অযোগ্য রোগ তাঁকে কাবু করেছে? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা কিছুটা পাই খাদিজা যখন মুহাম্মদকে সান্ত্বনা দিয়ে উত্তর দিলেন: 'আপনি একজন অতিশয় সৎ ব্যক্তি। আপনি দরিদ্রদের প্রতি অত্যন্ত সদয়, আপনি অতিথি-বৎসল, আপনি আপনার পরিবারের প্রতি এত স্নেহশীল, পীড়িতদের প্রতি আপনি অত্যন্ত উপকারী। তাই বিধাতা কখনোই আপনাকে তাঁর যত্ন থেকে বঞ্চিত করবেন না।'

খাদিজার সাথে কথোপকথনের পর মুহাম্মদ স্বাভাবিক হলেন। তখন খাদিজা তাড়াতাড়ি গৃহ থেকে বের হলেন এ ঘটনা তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নওফলকে জানানোর জন্য। হানিফ মতাবলম্বী ওয়ারাকা মক্কাবাসীর পৌত্তলিকতাকে ঘৃণা করতেন। তাই ওয়ারাকা একদা মুহাম্মদকে উপদেশ দিয়েছিলেন কুরাইশদের এড়িয়ে চলতে। তিনি মুহাম্মদকে ধ্যান এবং আধ্যাত্মিক কর্মে অনুরক্ত হতেও উপদেশ দিয়েছিলেন। খাদিজার মুখে ঘটনাবলী শুনে ওয়ারাকা বললেন: 'খুব সম্ভবত এই ঘটনা ইঙ্গিত দিচ্ছে আল্লাহ তাঁকে তত্ত্বাবধায়ক করছেন এবং মানবতাকে পথ দেখানোর জন্য তাঁকে নির্দিষ্ট করেছেন।'

আয়েশার এই বক্তব্য থেকে অতিপ্রাকৃত কিছুই পাওয়া যায় না। তাঁর সকল বর্ণনা মনোবিজ্ঞানের সাধারণ তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে। মনের মধ্যে প্রবল ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা থাকলে কল্পনার জগতে মানুষ তার বাস্তবায়ন ঘটায় নানাকিছু ভাবনা-চিন্তা করে, নানা কাহিনীর জাল বুনে। কল্পনার জগতে বিরাজ করতে করতে মানুষ অনেক সময় কল্পনার জগত আর বাস্তব জগতের মধ্যে তফাৎ করতে পারে না। তার মধ্যে ভ্রম সৃষ্টি হতে পারে। তার মনে হয় দীর্ঘদিনের লালিত ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা যেন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। মুহাম্মদ ত্রিশ বছর ধরে চিন্তা-ভাবনায় মশগুল ছিলেন। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের সন্ন্যাসী-ঋষির সাথে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। একেশ্বরবাদের প্রতি গভীরভাবে একনিষ্ঠ হয়েছেন। এরপর হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানরত হন এবং সেখানে অনেক কঠোর তাপসদের সংস্পর্শে আসেন। তাঁদের পৌত্তলিকতা বিরোধিতা এবং একেশ্বরবাদের ভাষ্য তাঁকে আলোড়িত করে। সব মিলিয়ে স্রষ্টা-সৃষ্টি-ধর্ম সম্পর্কিত প্রশ্নে মুহাম্মদের মন প্রচণ্ড উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। তাই একসময় হেরা পর্বতের গুহায় নির্জনে ধ্যান করতে করতে তাঁর ধারণা হলো, কোনো অশরীরী আত্মা তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছে। অথবা এটা এমনও হতে পারে যে, ধ্যানরত অবস্থায় তাঁর অবচেতন মন থেকে সাড়া আসলো এখন সময় এসেছে সক্রিয় হবার। সক্রিয় হবার ভীতি তাঁর মনে এতোই প্রভাব বিস্তার করল যে, তিনি প্রণত হলেন এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এছাড়া নিজের জ্ঞান হারিয়ে ফেলার পূর্বে দেবদূত (ফেরেশতা)

তাঁকে কাবু করে ফেলার ঘটনার আর কোনো বিশ্বাসযোগ্য বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা দেয়া যায় না। এখানে দেবদূতের আবির্ভাব তাঁর মনে দীর্ঘ লালিত সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন মনে করা যেতে পারে।

এই বিশ্লেষণ পুরোটা অনুমানিক হলেও এর সমর্থন পাওয়া যায় অন্য এক ভাষ্য থেকে। এই ভাষ্য অনুযায়ী মুহাম্মদ একবার খাদিজাকে বলেছিলেন : 'আমি যখন ঘুমাচ্ছিলাম তখন তিনি (ফেরেশতা) একটা সুদৃশ্য কাপড় দিয়ে ঢাকা একটা বই নিয়ে আসলেন। ফেরেশতা বললেন, 'পড়ুন!' আমি জেগে উঠলাম এবং মনে হলো যেন আমার হৃদপিণ্ডে একটা বই স্থাপিত হয়েছে।' এই ভাষ্য থেকে মনে করা যায়, প্রগাঢ় ধ্যানের শ্রান্তি মুহাম্মদকে ক্রমেই মোহগ্রস্ত করে ফেলে। তিনি ঘুমের সময়ও তাঁর তীব্র আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখতে পান স্বপ্নে। এই স্বপ্নদর্শন তাঁর চেতনার জগতকে সন্ত্রস্ত করে দেয়। হজরত আয়েশার আরেকটি বর্ণনা আছে : 'আল্লাহর নবির তখন শরীর কাঁপছিল। তিনি খাদিজাকে বললেন, 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও!'খাদিজা তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর কাঁপুনি দূর হলো।' [আয়েশা বর্ণিত হাদিসটির বাংলা অনুবাদের সূত্র উপরে উল্লিখিত- অনুবাদক]। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে মুহাম্মদের শরীরে কাঁপুনি সৃষ্ট হয়েছিল তার নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা থেকে। ধারণা করা যায়, এই ধরনের অবস্থা হয় সেই ব্যক্তির, যে দ্বৈত জীবনযাপন করে-একদিকে সাধারণ জীবন, অন্যদিকে স্বপ্নময় অলীক অভ্যন্তর জীবন। এই দুই জীবনের মধ্যেকার তফাৎ তৈরি করতে অক্ষম সেই ব্যক্তি। এই ঘটনার পর মুহাম্মদ আরও দুইবার হেরা পর্বতের ঐ নির্জন গুহায় যান। কিন্তু এবার আর কোনো কিছু দেখলেন না; কোনো ফেরেশতা আসলেন না, বা কারো কণ্ঠস্বরও শুনতে পেলেন না। [মুহাম্মদকে লেখাপড়া না-জানা একজন মানুষ হিসাবে চিত্রিত করা হয়। তাহলে কেন মহান আল্লাহ তাকে 'ইক্বরা' অর্থাৎ 'পড়' এই আদেশ দিয়ে সুরা নাজিল করবেন?]।

মুহাম্মদের এই পুরো অভিজ্ঞতাটি স্বপ্ন বা অলীক বিশ্বাস ছাড়া কি বেশি কিছু ছিল? এটা কী নবুওতি প্রদানের কোনো আলামত ছিল কিংবা ওয়ারাকা বিন নওফলের কোনো ভবিষ্যদ্বাণী ছিল? এরপর থেকে ক্ষয়িষ্ণু সন্দেহে মুহাম্মদের মন জর্জরিত হতে থাকে। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, কয়েকবার তিনি উঁচু পাহাড়ের উপর থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যার কথা চিন্তা করলেন। কিন্তু খাদিজা ও ওয়ারাকা সর্বদা মুহাম্মদকে শান্ত করতেন এবং আশার বাণী শোনাতেন।

ইসলামের ঐতিহাসিক ভাষ্যমতে মুহাম্মদের কাছে প্রত্যাদেশ বন্ধ থাকার সময়কাল বিভিন্ন রকম। অনেকের মতে এই ফাঁকা সময় ছিল তিনদিন, কেউ বলেন তিন মাস, আবার কারো কারো মতে তিন বছর। আবার কেউ কেউ বলেন এই অবস্থা বিরাজমান থাকে যতক্ষণ না সুরা মুদ্দাসসির নাজিল হয়। এরপরে আবার প্রত্যাদেশ আসা বন্ধ হয়ে যায়।

কী কারণে প্রত্যাদেশ আসা বিঘ্নিত হয় তা বোঝা কঠিন নয়। প্রথমবার স্বপ্নবিভোর হয়ে দেবদূত দেখার পর মুহাম্মদের মনে যে দীর্ঘদিনের জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা ছিল তা প্রশমিত হয়ে যায়। ঐ দৈবদর্শনে সুদীর্ঘ সময় ধরে লালিত মনের গভীরে সঞ্চিত প্রশ্নসমূহের উত্তরের আগ্রহ মিটে যায়। স্বভাবিকভাবেই এরপর আসে সন্দেহ এবং নৈরাশ্য। মনের ভেতর গচ্ছিত আকাঙ্ক্ষাকে পুনর্বার প্রজ্জ্বলিত করার জন্য প্রয়োজন আরও একনিষ্ঠ ধ্যান এবং গভীর একাগ্রতা; যা মস্তিষ্ককে আলোড়িত করবে, এবং একসময় আবারও বাস্তব ও কল্পনাএই দুই জগতের পার্থক্য ঘুচিয়ে দেবে। ফলে অন্তর্মুখী মুহাম্মদের মানস সরোবরে যা লুকিয়ে আছে তা আবার ভেসে উঠবে এবং তাঁকে তাড়িত করবে।

উপরে হজরত আয়েশার দেয়া বিবরণ আমরা পড়েছি। মুহাম্মদের মৃত্যুর এক শতাব্দী পূরণের আগেই একেবারে ভিন্ন বক্তব্য আসতে থাকে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর জীবন নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাহিনী সত্য বক্তব্যের ভেতরে ঢুকে পড়ে। যতই দিন যেতে থাকে ততই কাল্পনিক ও অলৌকিক ঘটনার সমারোহ বৃদ্ধি পায়। এ ব্যাপারে ইবনে ইসহাকের লেখা নবির জীবনী যা ইবনে হিশামের পাণ্ডুলিপিতে এখনো পাওয়া যায়, তার কিছু কিছু উল্লেখ রয়েছে। ইবনে ইসহাক হিজরি ১৫০ (৭৬৭ খ্রিস্টাব্দ) সালে

মারা যান এবং মৃত্যুর কিছু আগে তাঁর লেখা শেষ করেন। এখানে তাঁর বই থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেয়া হলো : 'নবি হবার আগে যখন মুহাম্মদ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে মক্কার বসতবাড়ির বাইরে যেতেন এবং যখন বসতবাড়ি একটি বাঁকের পেছনে দৃষ্টিসীমার বাইরে যেত, তখন প্রত্যেক পাথরের শীলাখণ্ড যার পাশ দিয়ে হেঁটে যেতেন, এরা বলে উঠতো : 'হে আল্লাহর প্রতিনিধি! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক!' কিন্তু এদিক-সেদিক তাকালে মুহাম্মদ কাউকে দেখতে পেতেন না। তাঁর চারিদিকে শুধু দেখতেন গাছপালা এবং পাথরখণ্ড।'

একখণ্ড পাথর নিষ্প্রাণ বস্তু। আর গাছগাছালির শব্দ সৃষ্টির জন্য কণ্ঠনালী নেই, যা দ্বারা তারা তাদের চিন্তা বা অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে। যুক্তির বিচারে এই গল্প এতোই অনুপযুক্ত যে, পরবর্তীতে নবির অনেক জীবনীকারক এই গল্প সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেতে পারেননি। তাঁরা বলেন, যে কণ্ঠস্বর শোনা যেত তা হবে ফেরেশতার কণ্ঠস্বর। নবির জীবনীকারকদের ভাবনায় এই বিষয়টি আসেনি যে, মুহাম্মদ যদি এরকম ডাক কখনো শুনেও থাকেন সেটা হতে পারে নিজেরই অন্তরের ডাক। গায়েবি কিছু নয়। অনেক বছরের একাগ্র ধ্যান ও একই চিন্তায় নিমগ্নতার ফলে সে চিন্তাভাবনা বাস্তব মনে হতে পারে এবং তা অনেক সময় শ্রবণানুভূতির ভ্রম সৃষ্টি করতে পারে।

যাহোক, ধর্মবিশারদেরা উদ্বিগ্ন হলেও ইবনে হিশামের বক্তব্য নিয়ে বিরোধিতা করতে চান না। তাই তাঁরা এই রহস্যপূর্ণ কণ্ঠস্বরকে কোনো দেবদূত বা ফেরেশতার কণ্ঠস্বর বলে চালিয়ে দিতে চান। কিন্তু এর ফলে কী অনুসিদ্ধান্ত দাঁড়ায় তা বুঝতে তাঁরা ব্যর্থ। ফেরেশতা যদি মুহাম্মদকে সত্যিই সম্ভাষণ করতেন, নিশ্চয়ই তাঁরা তা করতেন প্রকাশ্যে, সবার সামনে। আড়ালে বা লুকিয়ে সম্ভাষণ করার কোনো প্রয়োজনীয় দিক বা উপযোগিতা নেই। প্রকাশ্যে করলে মক্কাবাসী সকলে একবাক্যে মুহাম্মদের কথায় বিশ্বাস করতেন, এবং আল্লাহর যে আসল অভিপ্রায় ছিল সমস্ত আরবজাতিকে ইসলামে দীক্ষিত করার, তাও পূর্ণ হয়ে যেত তাড়াতাড়ি কোনো ধরনের সমস্যা ছাড়াই। এসব ধর্মবিশারদদের নজরে আসেনি যে তথাকথিত গায়েবি আওয়াজ নবির নিজস্ব কাল্পনিক ভাবনা থেকে উৎপন্ন হতে পারে। অথবা অন্য বিষয়েও কিছু চিন্তা করা যেত। নবি শহরের বাইরে শুধুমাত্র একা গেলেই যদি সেই কণ্ঠস্বর শুনতেন তবে অন্যরা কিভাবে তা জানতে পারলেন? নবি কোনোদিন এই বিষয়ে কিছু বলেননি। এমন-কী কোনো প্রামাণিক হাদিসেও এই ঘটনার বিবরণ নেই। সুতরাং এটা পরিষ্কারভাবে এক কল্পকাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।

তবে ইবনে ইসহাক যে পরিকল্পিতভাবে মিথ্যা সংবাদ দিয়েছেন তাও বলা যায় না। তিনি নিশ্চয়ই কারো কাছ থেকে এই বক্তব্য শুনেছেন এবং কোনো প্রশ্ন ছাড়াই তা গ্রহণ করেছেন। কেননা এই বক্তব্য তাঁর নিজের অলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাসের সাথে খাপ খায়। সম্ভবত ইবনে ইসহাক নিজেকে বা সংবাদদাতাকে জিজ্ঞাসা করেননি যে, অন্য কেউ কী শুনেছে পাথরের টুকরো অথবা গাছপালা নবিকে সম্ভাষণ জানিয়েছে। তাছাড়া নবি নিজে এই ঘটনা ব্যক্ত করেছেন এই ধরনের কোনো আলামত সংবাদদাতার কাছে ছিল কী না। আল্লাহ যে মুহাম্মদকে নিজের মনোনীত দূত বানিয়েছেন তার একমাত্র দাবি হচ্ছে মুহাম্মদের স্ত্রী আয়েশার বিবৃতি, যা আগেই আমরা দেখেছি।

বেশিরভাগ মানুষই তার অর্জিত বিশ্বাসের মধ্যে বন্দী এবং শারীরিক ও সহজাত প্রবৃত্তির প্রতি অনুগত। আর এতে মানুষের যৌক্তিক ক্ষমতা হ্রাস পায়। পরিষ্কারভাবে চিন্তা-বিশ্লেষণ তারা করতে পারে না। তখন তারা আসল ঘটনাকে উপেক্ষা করে যা তাদের বিশ্বাসের সাথে সংঘাত সৃষ্টি করে। তারা যা কিছুর মধ্যে তাদের ধারণা ও বিশ্বাসের আলামত পায় তাকেই আঁকড়ে ধরে। মানুষের এই আচরণ ও মানসিকতাই হচ্ছে কুসংস্কার এবং বিভ্রম বিস্তারের কারণ।

নবুওতি অর্জনের পর

মুহাম্মদের বয়স যখন চল্লিশ, তখন এক প্রত্যাদেশ দ্বারা আল্লাহ মুহাম্মদকে প্রেরিত পুরুষ হিসেবে নিয়োজিত করেন। প্রত্যাদেশের এই বাণী সুরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াতে বর্ণিত আছে। কিন্তু ইসলামের প্রচার কবে থেকে শুরু হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না, কারণ ওহি নাজিল হওয়াতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিঘ্ন ঘটেছে একাধিকবার। প্রথম দিকে ইসলামের প্রচার হয়েছে গোপনে এবং সামান্য কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সুরা আলাকের পরে আরও সাতটি কিংবা দশটি সুরা প্রকাশ পায়। এ-থেকে প্রতীয়মান হয় যে শুরুতে ইসলামের প্রচার মক্কাবাসীর কাছে উপহাস্যবলে পরিগণিত হয় এবং প্রত্যাখাত হয়। মুহাম্মদ তখন বিমর্ষ হয়ে যান, তার মধ্যে দ্বিধাবোধ তৈরি হয়। ইসলামের জন্য এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, কোরান সম্পাদিত হয়েছে অগোছালোভাবে। কোরানের বিষয়বস্তুকে নিতান্ত এলোমেলোভাবে সাজানো হয়েছে। যারা কোরান অধ্যয়ন করবেন তারা বিস্মিত হবেন যে, কোরানের সংকলকেরা কেন সুরা বা আয়াতের আগমনের ধারা অনুযায়ী কোরানের সুরা ও আয়াতগুলোকে বিন্যস্ত করেননি। মুহাম্মদের চাচাতো ভাই হজরত আলি বিন আবু তালিব সময়ের ক্রমানুযায়ী একটি কোরান সংকলন করেছিলেন; যদিও তা পরবর্তীতে হারিয়ে যায়। সময়কাল অনুযায়ী কোরান সংকলন হলে কোরানের বিষয়বস্তু অনেক অর্থবহ ও বাস্তবসম্মত হত, এবং এর ফলে ভবিষ্যত প্রজন্ম ইসলামের উত্থান এবং এর প্রতিষ্ঠাতার অনুপ্রেরণা ও চিন্তাভাবনার সাথে সহজে পরিচিত হতে পারতো।

কোরান সংকলনের প্রথম পদক্ষেপ নেন হজরত ওমর। আবু বকর খলিফা হবার পর ওমর তাঁর সাথে দেখা করে কোরান সংকলনের পক্ষে যুক্তি দেখান। হজরত ওমর বলেন, 'নবির মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই কোরানের বিষয়বস্তু ও শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে মুসলমিদের মধ্যে মতবিরোধ তৈরি হচ্ছে। বিষয়টি খুব জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ কোরানের বাণী যেসব সাহাবি মুখস্ত রাখতেন তাদের কেউ কেউ ইয়ামামার যুদ্ধে মারা গেছেন। এছাড়া তাল গাছের পাতায় লিখিত কোরানের বাণী খেয়ে ফেলেছে পশুরা।' ওমরের বক্তব্যে হজরত আবু বকর আপত্তি জানালেন। তিনি বললেন : 'কোরানের সংকলন যদি আবশ্যিকই হতো তাহলে নবি তাঁর জীবিত থাকাকালেই এ-বিষয়ে পদক্ষেপ নিতেন।' এরপরও ওমরের দীর্ঘ অনুরোধের জন্য শেষমেশ মদিনার খাজরাজ গোত্রে জন্মগ্রহণকারী সাহাবি জায়েদ বিন সাবিতকে ডাকা হয়। জায়েদ ছিলেন মুহাম্মদের সর্বশেষ কোরান লেখক। খলিফা আবু বকর জায়েদকে কোরান সংকলনের ভার অর্পণ করেন। আবু বকরের পর ওমর খলিফা হলে কোরান সংকলনের ভার গিয়ে পৌঁছায় হজরত উসমানের উপর। উসমান তাঁর সহকর্মীদের আদেশ দিলেন কোরানের সুরার দৈর্ঘ্য অনুযায়ী কোরানের সংকলনের জন্য। এতে করে মক্কার অনেক আয়াত মদিনার সুরাতে এবং মদিনার আয়াত মক্কার অনেক সুরাতে ঢুকে পড়ে। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম ও ইউরোপের গবেষক বিশেষ করে থিওদর নোলদেক কোরানের বিষয়বস্তুর অবিচ্ছন্নতা, ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ ও ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সুরাগুলির মানে ও মোটামুটি তারিখ অনুযায়ী কোরান বিন্যস্ত করেছেন[২২]। যা-হোক, প্রারম্ভিক মক্কার সুরাগুলিতে ইসলামের প্রথম কয়েক বছরের প্রচুর সংগ্রামের বিবরণ পাওয়া যায়। সুরা দোহার প্রথম দুই আয়াতের পরই আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন :

'তোমার প্রতিপালক তোমাকে ছেড়ে যাননি ও তোমার ওপর তিনি অসন্তুষ্টও নন।

তোমার জন্য পরকাল ইহকালের চেয়ে ভালো।

তোমার প্রতিপালক তো তোমাকে অনুগ্রহ করবেনই, আর তুমিও সন্তুষ্ট হবে।

তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পাননি, আর তোমাকে আশ্রয় দেননি?

তিনি কি তোমাকে ভুল পথে পেয়ে পথের হদিস দেননি?

তিনি কি তোমাকে অভাবী দেখে অভাবমুক্ত করেননি?'(সুরা দোহা : আয়াত ৩-৮)।

মুহাম্মদের কী হয়েছিল যে আল্লাহ তাঁকে সান্ত্বনা দিবেন এবং উৎসাহিত করবেন? সুরা দোহার তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ বলছেন : 'তোমার প্রতিপালক তোমাকে ছেড়ে যাননি ও তোমার ওপর তিনি অসন্তুষ্টও নন' -এই আয়াতটা কী প্রত্যাদেশ প্রেরণের যে বিরতিটুকু চলছিলতা শেষ হবার পর 'নাজিল' হয়েছিল! [প্রত্যাদেশ প্রেরণের মধ্যবর্তী বিরতিতে মুহাম্মদ কি বা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন এই ভেবে যেতাঁর রব তাঁকে হয়ত ত্যাগ করেছেন? পরে তিনি নিজেকে যা দিয়ে প্রবোধ দেন সেটাই হয়ে দাঁড়ায় সুরা দোহা। ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় এ সুরা নিজের সাথে নিজের কথা বলা মাত্র। যদি কোরান অবতরণের উদ্দেশ্য থাকে মানব জাতিকে সঠিক পথে পরিচালনা করা তবে সেক্ষেত্রে এই সুরার কোনো উপযোগিতাই নেই, একই কথা অন্যান্য অনেক সুরা ও আয়াতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য]। তফসির আল-জালালাইনে এভাবেই লেখা হয়েছে। এই ধারণা যদি সঠিক হয় তবে কালানুক্রম অনুযায়ী সুরা দোহা কোরানের দ্বিতীয় সুরা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ধারাবাহিকতার ক্রম হিসেবে ১১তম সুরা ধরা হয় এবং বর্তমান কোরানের সংকলনে এটির অবস্থান ৯৩তম। সুরা দোহা পাঠ করলে বোঝা যায় এই সুরায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মুহাম্মদকে আল্লাহ সান্ত্বনা এবং উৎসাহ দিচ্ছেন। এই ধারণা করা যায় যখন আমরা সুরা দোহার পরবর্তী ৯৪তম সুরা ইনশিরাহ এর প্রথম দুটি আয়াত পাঠ করি। কালানুক্রমিকভাবে ইনশিরাহকে ১২তম বলে ধরা হয়। এই সুরার আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ মুহাম্মদকে বলছেন : 'আমি কি তোমার বক্ষ উন্মুক্ত করিনি? আমি হালকা করেছি তোমার ভার।'(৯৪:১-২)। এই দুই আয়াত ও অন্য আয়াতগুলি এবং এর পূর্বের সুরা দোহার বিষয়বস্তু প্রায় একই। তাই বলা যায়, এই দুই সুরায় আল্লাহ মুহাম্মদের দুশ্চিন্তা লাঘব করে তাঁর দৃঢ়সংকল্পকে শক্তিশালী করেছেন। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, আসলে এই দুইটি সুরা মুহাম্মদের মনের ভেতরে লুকায়িত ইচ্ছা ও আশার প্রতিফলন মাত্র।

ইসলাম প্রচারের শুরুর দিকে মুহাম্মদ গোপনে অল্পসংখ্যক ব্যক্তিদের মধ্যেই তাঁর কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখেন। পরে সুরা শোআরার ২১৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ নতুন এক আদেশ দিলেন : 'তুমি তোমার আত্মীয়স্বজনকে সতর্ক করে দাও।'(২৬:২১৪)। এই আয়াত প্রাপ্ত হয়ে মুহাম্মদ (৬১৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে) কুরাইশ নেতাদের সাফা পর্বতে এক সভায় ডাকলেন। তারা সমবেত হলে মুহাম্মদ তাঁদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আবেদন জানান। নেতাদের মধ্যে থেকে মুহাম্মদের চাচা আবু লাহাব উঠে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে ও ক্রুদ্ধস্বরে বললেন : 'মুহাম্মদ, তুমি ধ্বংস হও! তুমি কী এ-জন্য আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছ?' আবু লাহাবের ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণের জবাব আসলো ১১১তম সুরা লাহাব বা আল-মাসাদের মধ্য দিয়ে। এই সুরার প্রথম আয়াতে আবু লাহাবের উচ্চারিত শব্দ অর্থাৎ 'ধ্বংস হও' ব্যবহৃত হয়েছে : 'ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত! আর সে নিজে।' (১১১:১) আবু লাহাব তার সম্পদ এবং সন্তানদের জন্য গর্বিত ছিল। তাই আল্লাহ জানিয়ে দিলেন :

'তার ধনসম্পদ ও উপার্জন তার কোনো কাজে আসবে না।

সে জ্বলবে অগ্নিশিখায়' (১১১: ২-৩)।

মুহাম্মদ যে পথ দিয়ে হাঁটতেন সে পথে আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল কাঁটা বিছিয়ে রাখতেন। তিনিও আল্লাহর শাস্তি থেকে নিস্তার পেলেন না। নাজিল হলো পরবর্তী আয়াত :

'আর তার জ্বালানিভারাক্রান্ত স্ত্রীও, যার গলায় থাকবে কড়া আঁশের দড়ি।' (১১১: ৪-৫)।

নবি হবার পর তেরো বছরের ঘটনাসমূহ এবং সর্বোপরি মক্কায় নামানো সুরাগুলি পাঠ করলে মনে হয় এ-যেন একজন ব্যক্তির উপাখ্যান যিনি একা তাঁর গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন এবং তাদেরকে বোঝানোর জন্য ও তাদের বিরোধিতা অতিক্রম করার জন্য কোনো পদ্ধতিই বাদ দেননি। এমন-কী সাহায্যের জন্য আবিসিনিয়ার সম্রাট নিগাসের নিকট তিনি তাঁর কয়েকজন অনুগতকে পাঠালেন। উপহাস ও বিরোধিতার মুখে মুহাম্মদ কখনো পিছপা হননি। যখন মুহাম্মদের পুত্র কাসেম মারা যায় তখন আলাস বিন ওয়ায়েল মুহাম্মদকে উপহাস করেন উত্তরাধিকারহীন বলে। এজন্য সুরা কাউসারে বলা হলো : 'যে তোমার দুশমন, সে-ই তো নির্বংশ।' (১০৮:৩)। হজের সময় অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি তীর্থযাত্রী হতেন। যখন মুহাম্মদ প্রভাবশালী লোকদের ইসলামে দীক্ষিত হবার আমন্ত্রণ জানাতেন তখন তাঁর চাচা আবু লাহাব তাঁকে অনুসরণ করতেন এবং তীর্থযাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলতেন : 'আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্র এক পাগল। সে কী বলে তার প্রতি আপনারা কর্ণপাত করবেন না।' সুরা তুর কোরানের জীবন্ত এবং সুরেলা সুরাগুলোর মধ্যে অন্যতম মক্কি সুরা। মুহাম্মদের সাথে তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও স্বদেশবাসীর বচসার বর্ণনা এই সুরায় পাওয়া যায়। এখানে এই সুরার ২৯-৩১ এবং ৩৩-৩৪ আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়া হলো :

'অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাকো, তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি ভবিষ্যদ্বক্তা বা পাগল নও।

ওরা কি বলে, 'সে এক কবি, আমরা তার অনিশ্চিত দৈবের (মৃত্যুর) প্রতীক্ষা করছি?'

বলো, 'তোমরা প্রতীক্ষা করো, আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।'

ওরা কি বলে, 'এ (কোরান) তার নিজের রচনা?' না, তারা বিশ্বাস করে না।

তারা যদি সত্যবাদী হয়, এর মতো কোনো রচনা নিয়ে আসুক-না!' (৫২:২৯-৩১, ৩৩-৩৪)।

মুহাম্মদের সাথে তাঁর স্বদেশবাসীদের বাদানুবাদের আরও উদাহরণ পাওয়া যাবে মক্কি সুরা তাহা'য় (২০)। মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করা হয়েছিল তার বর্ণনা পাওয়া যায় সুরা ফুরকানে : 'অবিশ্বাসীরা বলে, 'এ মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়। সে (মুহাম্মদ) এ বানিয়েছে ও অন্য সম্প্রদায়ের লোক তাকে এ-ব্যাপারে সাহায্য করেছে।' ওরা তো সীমালঙ্ঘন করে ও মিথ্যা বলে। ওরা বলে, 'এগুলো তো সেকালের উপকথা যা সে লিখিয়ে নিয়েছে। এগুলো সকাল-সন্ধ্যা তাকে শেখানো হয়।' বলো, 'এ তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সব রহস্য জানেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' ওরা বলে, 'এ কেমন রসুল যে খাবার খায় ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করে! তার কাছে কেন ফেরেশতা পাঠানো হয় না যে তার সঙ্গে থাকবে ও ভয় দেখাবে, বা তাকে ধনভাণ্ডার দেওয়া হয় না কেন, বা তার একটাও বাগানও নেই কেন যেখান থেকে সে তার খাবার যোগাড় করতে পারবে?'সীমালঙ্ঘনকারীরা আরও বলে, 'তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত লোকের অনুসরণ করছ!' (সুরা ফুরকান : আয়াত ৪-৮)।

মুহাম্মদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিবরণ একাধিক মক্কি সুরাতে রয়েছে। মক্কাবাসীরা তাঁকে বলতো, উন্মাদ, জিনের প্রভাবে আক্রান্ত, একজন জাদুকর, কবি এবং শয়তানের দোসর। কোরানের আয়াতগুলোকে বলা হলো জাদুমন্ত্র। কখনো বলা হলো যে, মুহাম্মদের মুখনিঃসৃত বাক্য যা নিশ্চিতভাবে অন্যের দ্বারা লিখিত, কেননা তিনি লেখাপড়া জানতেন না। যারা তাঁর সমালোচনায় অপেক্ষাকৃত নরম ছিলেন তারা বলতেন মুহাম্মদ আসলে একজন স্বপ্নদ্রষ্টা, তিনি অলীক স্বপ্নে আচ্ছন্ন অথবা একজন কবি যিনি তাঁর কল্পনা প্রকাশ করছেন ছন্দযুক্ত গদ্যের মধ্য দিয়ে।

মক্কি সুরাতে অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলো সুরার প্রধান বাদানুবাদ থেকে বিচ্যুত। এ-থেকে বোঝা যায় মুহাম্মদ প্রবল বিরোধিতার মুখে কখনো নিরাশ হয়ে যেতেন এবং তাঁর সংকল্প দুর্বল হয়ে যেত। ফলে তাঁর মধ্যে অপোষ করার ভাবনা তৈরি হয়। তিনি মনে করলেন এই আপোষের বিনিময়ে তাঁর বিপক্ষের লোকের থেকে শত্রুতা মুক্ত হয়ে বন্ধুত্ব পেতে পারবেন। তিনি পৌত্তলিকদের সাথে সমঝোতায় আসার কথা বিবেচনা করলেন। এই বিষয়ে সুরা বনি-ইসরাইলে বর্ণিত হয়েছে : ‘আমি তোমার কাছে যে প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছি তার থেকে তোমার বিচ্যুতি ঘটানোর জন্য ওরা চেষ্টা করবে যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে কিছু মিথ্যা কথা বানাও, তা হলে, ওরা অবশ্যই বন্ধু হিসেবে তোমাকে গ্রহণ করবে। আমি তোমাকে অবিচলিত না রাখলে তুমি ওদের দিকে কিছুটা ঝুঁকেই পড়তে। তুমি ঝুঁকে পড়লে অবশ্যই আমি তোমাকে ইহজীবন ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাতাম, তখন আমার বিপক্ষে তোমাকে কেউ সাহায্য করত না।’ (১৭:৭৩-৭৫)।

উক্ত তিনটি আয়াতের বিশ্লেষণ প্রয়োজন রয়েছে। সত্যি কী একটা সময় ছিল যখন কুরাইশদের প্রবল বিরোধিতার মুখে মুহাম্মদ ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং আপোষ অথবা নিদেনপক্ষে কিছু সৌভ্রাতৃত্ব স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন? হয়তোবা এ-বিষয়টি সত্য হতে পারে। মানব-চরিত্র এমনই যে, সে সমস্যায় পড়লে অথবা যখন জয়ের সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে যায় তখন এই ধরনের পদক্ষেপ নেয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এছাড়াও কোরানের অনেক তফসিরকারক বলেছেন, এই আয়াতগুলোর পরিপ্রেক্ষিত ছিল একটা ঘটনা যাকে ‘সারসের ঘাড় বাঁকানোর ঘটনা’বলা হয়ে থাকে। এই ঘটনার বিবরণ মুহাম্মদের অনেক জীবনীকারক বর্ণনা করেছেন।

এই বর্ণনানুযায়ী একদা কাবার নিকটবর্তী এক স্থানে নবি কয়েকজন কুরাইশের কাছে সুরা নজম আবৃত্তি করে শোনান। ছন্দোবদ্ধ এই সুরায় যেমন আছে আধ্যাত্মিক অনুভূতি, তেমনি মন কেড়ে নেবার শক্তি। নবি যখন তাঁর ধর্মের সত্যতা ব্যাখ্যা করছিলেন তখনই ফেরেশতা নিয়ে আসলেন এক নতুন অনুপ্রেরণা। ফলে নবি উচ্চারণ করলেন সেই প্রসিদ্ধ আয়াতদ্বয় : ‘তোমারা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওজ্জা সম্বন্ধে, আর তৃতীয়টি মানাত সম্বন্ধে?’ (৫৩: ১৯-২০)। আয়াত দুটি উচ্চারণের সময় নবির গলার স্বর ছিল প্রায় ঘৃণাপূর্ণ, অর্থাৎ নবি বোঝাতে চেয়েছিলেন এইসব মূর্তিগুলো আসলে অসার। কিন্তু এরপর নেমে আসলো আরও দুটি আয়াত, যা পরবর্তীতে কোরান থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। কারণ হিসেবে বলা হয়ে থাকে যে, আয়াত দুটি নাকি শয়তান নবির মুখে দিয়েছিল, যার জন্য নবি পরে আক্ষেপ করেছেন। আয়াতদ্বয় ছিল : ‘এরা হচ্ছে সেই উড়ন্ত সারস। তাই এদের মধ্যস্ততা আশা করা যেতে পারে।’এ-কথা বলে নবি নতজানু হলেন। তা দেখে তাঁর সাথে কুরাইশরাও নতজানু হলেন তিন দেবীকে সম্মান দেখানোর জন্য। তারা ভাবলো এতদিন পরে মুহাম্মদ তিন দেবীর মধ্যস্থতার ক্ষমতা স্বীকার করে নিয়েছেন।

যারা মনে করেন নবি মুহাম্মদ ছিলেন ভুলভ্রান্তির উর্ধ্বে তাঁরা আসলে অস্বীকার করবেন যে, মুহাম্মদ কোনোদিনই এমন কথা বলেননি যা তাঁর নীতির সাথে সামঞ্জস্যহীন। তাই তাঁরা ঐ কাহিনীকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেন। এমনকি কোরান থেকে দুটি আয়াত মুছে ফেলতেও দ্বিধা করেননি। এরপরও অনেক প্রামাণ্য দলিল এবং কোরানের তফসিরকারকদের মন্তব্য থেকে বোঝা যায় আসলেই এ-ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। কোরানের বিখ্যাত তফসিরগ্রন্থ তফসির আল-জালালাইনে লেখা হয়েছে ঐ দুই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি হয় আরও একটি আয়াত। সুরা হজের আয়াত ৫১। ধারণা করা হয় সুরা নজমের দুটি আয়াত উচ্চারণের জন্য নবির মনে তীব্র অনুশোচনা সৃষ্টি হয় তা থেকে নিবৃত্তির জন্য এবং নবিকে সান্ত্বনা দেবার জন্য সুরা হজের এই বিশেষ আয়াত নাজিল হয়। নবিকে এই বলে আশ্বস্ত করা হয় : ‘আমি তোমার পূর্বে যেসব নবি ও রসুল পাঠিয়েছিলাম তারা যখনই কিছু আবৃত্তি করত তখনই শয়তান তাদের আবৃত্তিতে বাইরে থেকে কিছু ছুড়ে ফেলত। কিন্তু শয়তান যা বাইরে থেকে ছুড়ে ফেলে আল্লাহ তা দূর করে দেন। তারপর আল্লাহ তাঁর আয়াতগুলোকে সুসংবদ্ধ করেন। আর আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী।’ (সুরা হজ, ২২ : আয়াত ৫২)।

কোরানের অন্যত্র এই ধরনের আয়াত আরও আছে। এই (শয়তান-সংশ্লিষ্ট) আয়াতগুলি ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ থেকে এটা পরিষ্কার যে, নবি আসলে ভুলভ্রান্তির ঊর্ধ্বে ছিলেন না। ইসলামের প্রাথমিক যুগের অনেক পণ্ডিতেরাও এরকম মনে করেন-নবি শুধুমাত্র তাঁর নবুওতির নীতির ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তির ঊর্ধ্বে ছিলেন। এখন যদি স্বীকার করে নেয়া হয় যে, নবি মুহাম্মদ আসলে ব্যক্তিগত ভুলভ্রান্তির ঊর্ধ্বে ছিলেন না, তাহলে উপরে বর্ণিত ঘটনার যৌক্তিক এবং সহজ ব্যাখ্যা দেয়া যায়। প্রবল বিরোধিতার মুখে মুহাম্মদ যখন পর্যুদস্ত, তখন কিছু সহনশীলতা ও বন্ধুত্ব দেখানোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাই কুরাইশদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য কৌশলী হয়ে মিষ্টি বাক্য বললেন। এতে কুরাইশরা খুশি হলেন এবং মুহাম্মদসহ তাঁরা একসাথে নতজানু হলেন। কিন্তু পরবর্তীতে যখন এই উপাখ্যান শেষ হলো এবং সবাই ঘরে ফিরে গেল, নবি মুহাম্মদের মনের ভেতরে শুরু হলো প্রবল তোলপাড়। তিনি অনুভব করলেন কেউ যেন তাঁকে এই ধরনের সমঝোতা না করার জন্য সতর্ক করে দিচ্ছে। কারণ ত্রিশটি বছর ধরে মুহাম্মদ যে আদর্শ ধারণ করে এসেছেন, একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হয়ে কুরাইশদের পৌত্তলিকতাকে বিরোধিতা করে গিয়েছেন এর সাথে সাংঘর্ষিক। আজকের এই সমঝোতা তাঁর সারা জীবনের বিশ্বাস, আদর্শ, চিন্তা, দর্শন সবকিছুকে জলাঞ্জলি দিয়ে দেবে। এরপরে সুরা বনি-ইসরাইলের ৭৩-৭৫ আয়াতগুলি তৈরি হয়। উপরে যে যৌক্তিক বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে তা থেকে এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা প্রমাণিত হয়। আর শুধুমাত্র অন্য একটি ব্যাখ্যা হতে পারে যে, এই কাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যা। অর্থাৎ মুহাম্মদ নিজেই চেয়েছেন কুরাইশদের সাথে সমঝোতা ও বন্ধুত্ব করতে তথাপি আল্লাহ তাঁকে নিষেধ করে দেন। কিন্তু যেহেতু নবি তাঁর সততা এবং সত্যবাদিতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন তাই এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

পাদটীকা

১. আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরির আল-তাবারি (জন্ম : ২২৪ হিজরি বা ৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ-মৃত্যু ৩১০ হিজরি বা ৯২৩ খ্রিস্টাব্দ) ইরানি বংশোদ্ভূত। আরবিতে লেখার জন্য বিখ্যাত। তাঁর রচিত বই হচ্ছে : *´The Annals of the Prophets and Kings’*। কোরানের তফসিরকারকদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে প্রাচীন।

২. মুহাম্মদ আল-ওয়াকেদি (মৃত্যু ২০৭ হিজরি বা ৮২৩ খ্রিস্টাব্দ), গ্রন্থকার: *The Book of the Prophet’s Wars* (কিতাব আল-মাগহাজি)।

৩. বাহাই মতাবলম্বীদের উত্থানের ইতিহাস পুনঃমুদ্রিত হয়েছে ১৯১০ সালে Leiden থেকে। Ed. by E.G. Browne, E. J. W Gibb Memorial Series, XV. বইটির লেখক মির্জা জানি প্রথমদিককার ২৮তম বাহাই মতাবলম্বী। তিনি নিজের ধর্মীয় মতাদর্শ ত্যাগ করেননি বলে তাঁকে হত্যা করা হয় তেহরানে ১৮৫২ সালে (১২২৮ হিজরি)।

৪. কুরাইশ নেতা আবু জেহেল (অজ্ঞানতার পৃষ্ঠপোষক) নামটি মুসলমানদের প্রদত্ত। তাঁর মূল নাম আমর বিন হিশাম বিন আল-মুগিরা। তিনি মাখজুম গোত্রের প্রধান হিসাবে তাঁর চাচা ওয়ালিদ বিন আল-মুগিরার স্থলাভিষিক্ত হন। ইসলাম প্রচারের শুরুর দিক থেকেই তিনি মুহাম্মদের প্রবল বিরোধী ছিলেন এবং প্রথমদিককার মুসলমানদেরকে নানাভাবে হয়রানি করতেন। তিনি দ্বিতীয় হিজরি বা ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের পক্ষে নেতৃত্ব দেন এবং এই যুদ্ধে নিহত হন।

৫. লোট গাছ (আরবিতে একে সিদ্রা গাছ এবং ফার্সিতে কুনার গাছ বলা হয়) এক ধরনের বদরী বা কাঁটাওয়ালা গুল্ম।

৬. মুহাম্মদ হোসেন হায়কলের জন্ম ১৮৮৮ সালে। মিশরের প্রথম উপন্যাস জয়নাব-এর রচয়িতা (১৯১৪)। এছাড়া হজরত মুহাম্মদ (১৯৩৫), হজরত আবু বকর (১৯৪৩), হজরত ওমর (১৯৪৪)-এর জীবনীকারক। মিশরের শিক্ষামন্ত্রী এবং সিনেটের প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি। মৃত্যু ১৯৫৬ সালে।

৭. এমিলি ডারমেনগেম *Le vie de Mahomet* (Paris 1929) এবং *Ges Mahomet et tradition islamique* (Paris 1955) বইয়ের লেখক।

৮. পারস্যের বিশিষ্ট মুসলিম মনীষী নাসির উদ্দিন তুসি বহুমাত্রিক লেখক। তিনি গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, কালনিরুপণ বিজ্ঞান, এবং খনিজবিজ্ঞানের ওপর বই লিখেছেন। ত্রিকোণমিতির আবিষ্কারক হিসেবে পরিচিত। তাঁর জন্ম ১২০১ খ্রিস্টাব্দ (৫৯৭ হিজরি) এবং মৃত্যু ১২৭৪ সনে (৬৭২ হিজরি)। নীতিশাস্ত্রের উপর একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন। *The Nasirean Ethics* নামের বইটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন G. M. Wickens। প্রকাশিত হয়েছে লন্ডন থেকে ১৯৬৪ সালে। এই বইয়ে রাজনীতি, অর্থনীতি নিয়েও বিশদ আলোচনা করেছেন।

৯. হালাকু খান চেঙ্গিস খানের নাতি এবং কুবলাই খানের ভ্রাতা। কুবলাই খান চীনের ইউয়ন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। লিখনাদ রাজবংশের রাজা হয়ে হালাকু খান ১২৫৬ খ্রিস্টাব্দ (৬৫৪ হিজরি) থেকে ১২৬৫ খ্রিস্টাব্দ (৬৬৩ হিজরি) পর্যন্ত ইরান, ইরাক, এশিয়া মাইনরের বিশাল অঞ্চলে রাজত্ব করেন।

১০. সাসানিদ রাজবংশের রাজা খসরু-১ আনুশিরুওয়ান এর (৫০১-৫৭৯ খ্রিস্টাব্দ) জন্য নির্মিত রাজকীয় হলঘর। এর ২৬ মিটার (৮৫ ফুট) উচ্চতা বিশিষ্ট ধনুকাকৃতি খিলানের কিছু অংশ এখনও বিদ্যমান আছে তাইগ্রিসের ধ্বংসস্তূপের মাঝে। এই স্থানটি বাগদাদ থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে ভাটির দিকে।

১১. খসরু-২ পারভেজ (৫৭০-৬২৮ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন ইরানের সাসানিদ রাজবংশের বাদশাহ। তিনি বাদশাহ খসরু-১ আনুশিরুওয়ানএর দৌহিত্র। তাঁর শাসনকাল ৫৯১ থেকে ৬২৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর সামরিক বাহিনী সিরিয়া, ফিলিস্তিন, এশিয়া মাইনর এবং মিশর দখল করে ৬১১ এবং ৬১৬ সালের মাঝে। পরে পরাজিত হলে তাঁকে হত্যা করা হয়। এরপর তাঁর পুত্র শিরুয়া দখলের স্থানগুলো ছেড়ে দেন এবং প্রাচ্যের রোমানদের সাথে শান্তি স্থাপন করেন। মুহাম্মদের প্রথমদিকের জীবনী এবং ইতিহাস থেকে জানা যায় নবি পারস্যের বাদশাহ খসরু-২ পারভেজ, প্রাচ্যের রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস, মিশরের শাসনকর্তা, এবং আবিসিনিয়ার খ্রিস্টান সম্রাট নিগাসকে পত্র পাঠিয়ে ইসলামে দীক্ষিত হবার আমন্ত্রণ জানান।

১২. দ্রষ্টব্য : পাদটীকা ৬৯ দ্রষ্টব্য।

১৩. তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৪. পাদটীকা ৯৪ দ্রষ্টব্য।

১৫. ইবনে হিশাম (আব্দুল মালিক বিন হিশাম) মিশরে বসবাস করতেন এবং ৮২৮ খ্রিস্টাব্দে (২১৩ হিজরি) মারা যান। তিনি ইবনে ইসহাকের লেখা এবং হারিয়ে যাওয়া মুহাম্মদের জীবনীর এক সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইবনে ইসহাক ছিলেন মদিনার বাসিন্দা এবং বাগদাদে মারা যান আনুমানিক ৭৬৭ সালে (১৫০ হিজরি)। ইবনে হিশাম সম্পাদিত মুহাম্মদের জীবনী হচ্ছে সবচাইতে পুরনো গ্রন্থ। ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন আলফ্রেড গিয়োম *´The Life of Muhammad’* নামে প্রকাশিত হয়েছে অক্সফোর্ড থেকে ১৯৫৫ সালে।

১৬. মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আল বুখারি’র জন্ম ৮১০ খ্রিস্টাব্দে (১৯৪ হিজরি) এবং মৃত্যু ৮৭০ খ্রিস্টাব্দে (২৫৮ হিজরি)। তিনি ছিলেন বোখারার বাসিন্দা। তাঁকে হাদিসের প্রধান সংকলক বলা হয়। হাদিস নির্বাচন করতে তিনি প্রচুর পরিশ্রম করেন (৭৩৯৭ হাদিস) বিশেষত হাদিসের বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে। বুখারির হাদিসগুলোকে সুন্নি মুসলিমরা অত্যাধিক ব্যবহার করে থাকেন সহি মনে করে।

১৭. জুবায়ের বিন আবু সালমা প্রাক-ইসলামি যুগের একজন বিশিষ্ট কবি। ধারণা করা হয় মুহাম্মদের নবুওতির প্রথম দিকে তিনি জীবিত ছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেননি।

১৮. লাবিদ বিন রাবিয়া হাওয়াজেন গোষ্ঠীর একজন কবি। প্রকৃতি এবং ধর্মীয় অনুভূতি বর্ণনায় বিখ্যাত ছিলেন। মদিনায় নিজের গোত্রসহ মুহাম্মদের সাথে সাক্ষাত করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি কবিতা লেখা ছেড়ে দেন। দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার পর তিনি ৬৬১ সালে (৪১ হিজরি) মৃত্যুবরণ করেন।

১৯. মুহাম্মদ বিন জাকারিয়া ছিলেন তেহরানের নিকটবর্তী রায়ি অঞ্চলের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। জন্ম তাঁর ৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে (২৫০ হিজররি) এবং মৃত্যু ৯২৫ খ্রিস্টাব্দে (৩১৩ হিজরি)। আরবি ভাষায় তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর দুটি বিশ্বকোষ রচনা করেছেন। এগুলো পরবর্তীতে লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়, এবং ইউরোপের চিকিৎসাশাস্ত্রের জন্য ব্যবহৃত হয়। আলকেমির উপর গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তিনি। দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের উপরও বই লিখেছিলেন যদিও সেগুলো এখন আর পাওয়া যায় না। তিনি নবুওতিকে অস্বীকার করেন। কেননা তাঁর মতে স্রষ্টা সকল মানুষকেই জন্মসূত্রে যুক্তির অধিকারী করেছেন।

২০. সিরিয়ীয় কবি আবু আল আলা আল-মারি’র জন্ম আলেপ্পার নিকটবর্তী মারা অঞ্চলে, ৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে (৩৬৯ হিজরি) এবং মৃত্যু ১০৫৮ সালে (৪৫০ হিজরি)। গুটি বসন্তে আক্রান্তের জন্য শিশুকাল থেকেই তিনি অন্ধ ছিলেন। অজ্ঞেয়বাদ এবং নিরীশ্বরবাদী কবি হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর একটি লেখায় অন্যজীবনে পাড়ি দেবার কাহিনী লিখেছেন।

২১. অন্য আরেকটি বর্ণনা অনুযায়ী নবির উত্তর কিছু সামান্য ভিন্ন প্রকার। যেমন : ‘আমি আবৃত্তি করতে পারি না’অথবা ‘আমি কী আবৃত্তি করবো?

২২. দ্রষ্টব্য : Theodor Noldeke, *Geschichte der Qur'an*, 2nd ed., 2 vols ed. By F. Schwally, Leipzig 1909-19.এবং Richard Bell, *The Quran*, translated with a critical rearrangement of the surahs, 2 vols, Edinburgh 1937-39

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলাম ধর্ম

ধর্মীয় কাঠামো

ধর্ম কখনো আরব বেদুইনদের মধ্যে পরিপূর্ণ অর্থে বিস্তার লাভ করেনি। এখনো আরব বেদুইনরা বিভিন্ন ধরনের আধ্যাত্মিক, অধিবিদ্যাগত বিষয়ের প্রতি তেমন কোনো আকর্ষণ বোধ করেন না। দুর্গম ও প্রতিকূল অঞ্চলে বসবাসের কারণে তাদের মধ্যে রীতিনীতি, প্রথা বা বিধিনিষেধ ব্যতীত তেমন কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। প্রাক-ইসলামি যুগ থেকে বেদুইনরা একদিকে যেমন স্বভাবে নমনীয় আবার অন্যদিকে মেজাজে উদ্বায়ী। কোনো কবিতার সাধারণ কোনো একটি পঙক্তিতেই তারা ক্ষুব্ধ হতে পারে অথবা অতি-আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে যেতে পারে। বেদুইনদের মধ্যে অনেকে আত্মকেন্দ্রিক ও দাম্ভিক প্রকৃতির। সর্বদা নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বড়াই করার মানসিকতা তাদের মধ্যে রয়েছে। নিজেদের দুর্বল দিকগুলো, এমনকি অপরাধ ও পৈশাচিকতা নিয়েও তাদের অহঙ্কার দীর্ঘদিনের। অতীতকাল থেকে সহজে তারা বিভিন্ন কুসংস্কার ও অন্যান্য বিভ্রমের শিকার হতো। মরুভূমিতে প্রতিটি গাছ বা পাথরের নিচে কোনো না কোনো দানব লুকিয়ে আছে বলে বিশ্বাস করত। ভূমির রুক্ষতার কারণে তারা মানবসভ্যতার অন্যতম ভিত্তি কৃষিকাজ থেকে দূরে ছিল।

বেদুইনদের দৃষ্টিতে গরুর লেজ হচ্ছে অমর্যাদার প্রতীক আর ঘোড়ার মাথা হচ্ছে মর্যাদার প্রতীক। তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল নিজেদের তাৎক্ষণিক শারীরিক চাহিদা পূরণ, দেবতার প্রতি প্রার্থনার একমাত্র উদ্দেশ্যও ছিল ওই লক্ষ্য অর্জন করা। প্রতিপক্ষ অস্ত্রধারী না হলেও কিংবা আত্মরক্ষা করার মতো প্রস্তুতি না থাকলেওতাদেরআক্রমণ করা এবং আগ্রাসী মনোভাব প্রদর্শন বেদুইনদের ক্ষেত্রে সবসময় স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। সহিংস কোনো ঘটনা প্রায়-সময়ই অত্যধিক প্রশংসিত হতো এবং তা-নিয়ে বীরোচিত কবিতাও রচনা করা হতো। অন্য ব্যক্তির স্ত্রীকে বলপূর্বক তুলে নিয়ে যাওয়ার বর্ণনা দেয়ার ক্ষেত্রে বেদুইন-কবিরা 'অসভ্যতা'র পরিচয় দিতেন। হামলার শিকার হওয়া মহিলার গোপনীয়তা প্রকাশ, তার শারীরিক নিগ্রহ বা বিড়ম্বনার বর্ণনা দিতে বেদুইন-কবিরা ন্যূনতম বিবেকবোধের পরিচয় দিতেন না।

বেদুইনরা ঈশ্বরকে এক কৃত্রিম এবং গতানুগতিক সত্তা বলেই মনে করতেন। তারা স্বাধীন ও নৈর্ব্যক্তিক কোনো ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। মজার বিষয় হচ্ছে, বেদুইনরা অন্য কোনো গোষ্ঠীর সাথে প্রতিযোগিতার সময় প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর কোনো বিখ্যাত দেবতার আদলে নিজেরাও একটি দেবতা তৈরি করে উপাসনা শুরু করে দিত। ইসলাম-পূর্ব যুগে মক্কার 'কাবা' ঘরটি বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তিতে ভর্তি এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাসনালয় ছিল। বেদুইনরা এই পবিত্র স্থানে নিয়মিত আসত এবং গভীরভাবে সম্মান প্রদর্শন করত। কুরাইশদের সাথে বিরোধের জের ধরে একবার জোহায়না গোষ্ঠীর নেতা আব্দুদ্দার বিন হুদায়

তার জনগণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন হাওরা নামক স্থানে কাবার মতো আরেকটি উপাসনালয় বানানোর জন্য, যাতে বেদুইনদেরকে কাবার পরিবর্তে এই উপাসনালয়ে নিয়ে আসা যায়। কিন্তু জোহায়না গোষ্ঠীর লোকজন এ কাজ অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ বলে নেতার নির্দেশ উপেক্ষা করেছিল। এজন্য হিশাম বিন মুহাম্মদ আল-কালবি (হিজরি ১২০ বা ৭৩৭ খ্রিস্টাব্দ-হিজরি ২০৪/২০৬ বা ৮১৯/৮২১খ্রিস্টাব্দ) রচিত 'তানকিস আল আসনাম' গ্রন্থে[২৩] ব্যঙ্গধর্মী কবিতায় জোহায়না গোষ্ঠীর জনগণকে নিয়ে উপহাস করা হয়েছে। উল্লেখ্য হিশামের এই বইটি পৌত্তলিক আরবের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার স্পষ্ট চিত্র উপস্থাপনের ক্ষেত্রে একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র। ইসলাম-পূর্ব আরব পৌত্তলিকদের মানসিকতা বোঝার জন্য এই বই থেকে কিছু উক্তি তুলে দেয়া যেতে পারে : 'আব্রাহা (ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আবিসিনিয়া বিজয়ের পরে ইয়েমেনের একজন খ্রিস্টান শাসক) যখন সানায় অত্যন্ত মূল্যবান পাথর ও দামি গাছের গুঁড়ি দিয়ে কেলিস নামের গির্জা নির্মাণ করে শপথ নিয়েছিলেন তিনি তার হাতের মুঠি ততদিন পর্যন্ত আলগা করবেন না, যতদিন না আরবরা কাবাকে পরিত্যাগ করে এই গির্জায় আসা শুরু করে। এ সংবাদ শুনে আরবের একজন নেতা এক রাত্রে কিছু লোক পাঠালেন নোংরা আবর্জনা আর মলমূত্র দিয়ে গির্জাটি নষ্ট করতে।' এক ছেলে তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়ার পরিকল্পনা করে। এজন্য প্রথমে সে জুল-খালাসা নামের এক দেবতার মূর্তির কাছে যায়। রীতি অনুযায়ী ছেলেটি তীরের ফলক নিক্ষেপ করে জানতে চায় তার পিতার হত্যাকারীকে হত্যা করে বদলা নেয়া উচিত হবে কিনা। জুল-খালাসার অমত হয় তাতে। আরব ছেলেটি তখন ক্ষুব্ধ হয়ে জুল-খালাসা দেবতাকে নিজের পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শন করে বলে, 'আমার মতো আপনার পিতাও যদি খুন হতেন তবে আজ আপনি আমাকে না বলতে পারতেন না।' প্রাক-ইসলামি যুগের এক কবির ভাষায়, 'হে জুল-খালাসা! আপনার সাথেও যদি এমন অনাচার হতো, আমার মতো আপনার পিতাও যদি আজ মাটির নিচে শায়িত থাকতেন, তবে শত্রুদের হত্যা করতে আপনি আমাকে কখনোই বারণ করতেন না।'[২৪] বিশ্বজুড়ে সে-সময়ের মানুষেরা যেখানে চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রের পূজা করে বেড়িয়েছে তখন আরব বেদুইনরা আবিষ্ট ছিল পাথরের মধ্যে। পাথরকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকে ঘোরা আর পাথর পূজা করা ছিল বেদুইনদের ধর্মীয় প্রথা। পাথরকে পূজা করার আরেকটি ব্যতিক্রমী রেওয়াজও ছিল তাদের মধ্যে। যেমন মরুভূমিতে যাত্রাপথের বিরতিতে বেদুইনদের প্রথম কাজ থাকত কোথাও থেকে চারটি পাথর খুঁজে বের করা। সবচেয়ে সুন্দর পাথরটাকে মাটিতে রেখে এর চারপাশে প্রদক্ষিণ করত তারা। অন্য তিনটি পাথরকে রান্নার পাত্র রাখার জন্য ব্যবহার করা হতো। এছাড়া মেষ, ছাগল বা উট কোরবানি দেয়ার সময় কোনো পাথরের সামনে এমনভাবে কোরবানি দেয়া হতো যেন পশুর রক্তে পাথরটি লাল হয়ে যায়।

প্রাচীন আরব-বেদুইনরা উপাসনায় খুব একটা আন্তরিক ছিল না। 'তানকিস আল আসনাম' বই থেকে আরেকটি ঘটনা তুলে ধরা যায় : এক আরব তার উটগুলোকে 'সাদ' নামের এক উপাস্য-পাথরের কাছ থেকে আশীর্বাদ নিতে যায়। পশুর রক্তে রঞ্জিত লাল পাথরটি দেখে উটগুলো ভয়ে বারবার দূরে সরে যাচ্ছিল। এতে বিরক্ত হয়ে আরব ব্যক্তিটি ছোট পাথরের টুকরা নিয়ে সাদ নামের উপাস্য-পাথরটিকে ঢিল মেরে চেঁচিয়ে বলে, 'তুমিও সাধারণ জনতার ভালবাসা-সম্মান থেকে বঞ্চিত হও!' ইবনে ইসহাকের রচিত বইয়েও এই ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে[২৫] :

'সাদের কাছে আমরা আমাদের সৌভাগ্যের জন্য এসেছিলাম।

কিন্তু এই সাদ যখন তার সবই উড়িয়ে দিয়েছে, আমাদের তাই আর তার সাথে কোনো লেনদেন নাই।

আচ্ছা এই সাদ কি মাটির উপর দাঁড়িয়ে থাকা শুধুই একটি পাথর নয়?

সে কোনোভাবেই আমাদের চলার পথের সঠিক বা ভুল নির্দেশ দিতে পারে না।'

মদিনার প্রথম দিকের বছরগুলোতে মুহাম্মদের জীবনেও এই বেদুইন-আচরণের দেখা পাওয়া যায়। যেমন হিজরতের পর নবি যখন জোরেশোরে ইসলাম প্রচার শুরু করলেন তখনঅনেক বেদুইন অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে ভীত হয়ে কিংবা গনিমতের মাল লাভের আশায় মুসলমানদের দলে যোগদান করে। কিন্তু যখনই মুসলিমরা কোনোভাবে বিপাকে পড়েছিল যেমন ওহুদের যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল তখনই তারা অন্য কোনো দলে ডিগবাজি দিয়ে চলে যায়, নয়তো ভয়ে নবি বা মুসলমানদের কাছ থেকে দূরে থাকত। মুহাম্মদ বেদুইনদের এই মানসিকতা খুব ভালোভাবে জানতেন। কোরানের বিভিন্ন আয়াতে এ-ধরনের বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন সুরা তওবা। কালপঞ্জি অনুসারে এটি কোরানের সর্বশেষ সুরা এবং নবির বাণী হিসেবেও একে বিবেচনা করা হয়। এই সুরায় রয়েছে : 'অবিশ্বাস ও কপটতায় মরুবাসী আরব বেদুইনরা বড় বেশি পোক্ত। আর আল্লাহ তাঁর রসুলের ওপর যা অবতীর্ণ করেছেন তার (ন্যায়নীতির) সীমারেখা না শেখার যোগ্যতা এদের বেশি।' (৯:৯৭)। এ কারণেই তাদের আশা ছিল, 'যদি এ কোনো অনারব-এর ওপর অবতীর্ণ করা হতো' (২৬:১৯৮)। আসলে আরবের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে কুসংস্কার খুব গভীরে ছিল। যেনতেন কোনো চাহিদা পূরণে তারা মূর্তি বা প্রতিমার কাছে গিয়ে প্রার্থনার আশ্রয় নিত।

তবে হেজাজের, বিশেষ করে মক্কা বা ইয়াসরিব (পরবর্তীতে নামকরণ হয় মদিনা) এলাকার চিত্র এমন ছিল না। এই দুই শহরের মধ্যে বিশেষ করে ইয়াসরিবের অধিবাসীরা ইহুদি ও খ্রিস্ট ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত ছিল। 'ঈশ্বর'শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে 'আল্লাহ'শব্দের ব্যবহারও তাদের মধ্যে ছিল। তারা নিজেদের ইব্রাহিমের বংশধর মনে করত। ওল্ড টেস্টামেন্টের কাহিনী অনুসরণে তারা নিজেদেরকে ইসরাইলের বংশধর বলে দাবি করত। আদম ও শয়তানের কাহিনী প্রায় সবারই জানা ছিল। তারা ফেরেশতা বিশ্বাস করত এবং তাঁদেরকে আল্লাহর কন্যা হিসেবে কল্পনা করত। তাঁদের এই ধারণা সম্পর্কে কোরানে বেশ কয়েকবার পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে : 'তোমরা কি মনে কর তোমাদের জন্য পুত্রসন্তান আর আল্লাহর জন্য কন্যাসন্তান?' (সুরা নজম : আয়াত ২১)। যাহোক এই নগরবাসী বেশ কয়েকটি ইহুদি প্রথাও অনুসরণ করত। যেমন খৎনা, ওজু করা, ঋতুবতী নারীদের বর্জন করা এবং বিশ্রামের জন্য সপ্তাহের একটি দিন বরাদ্দ রাখা। এজন্য তারা পরবর্তীতে শনিবারের স্থলে শুক্রবারকে বিশ্রামের দিন হিসেবে গ্রহণ করে।

স্পষ্ট বোঝা যায় ইসলাম প্রচারের জন্য হেজাজের সামাজিক পরিবেশ একেবারে আনকোরা কিছু ছিল না। ওখানে শুধু যে পৌত্তলিকতা-বর্জনকারী কিছু আধুনিক চিন্তার মানুষ ছিলেন তাই নয়, অনেক পৌত্তলিকও সেখানে আলোর রেখার দর্শন পেয়েছিলেন। কোরানে তাঁদের কথা বেশ কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন সুরা জুখরুফ-এ বলা হয়েছে : 'যদি তুমি ওদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে ওদেরকে সৃষ্টি করেছে, ওরা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'।' (৪৩:৮৭)। আবার সুরা আনকাবুত-এ বলা হয়েছে : 'যদি তুমি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রণ করেন?'ওরা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। তাহলে ওরা কোথায় ঘুরাপাক খাচ্ছে?' (২৯:৬১)। মক্কার কুরাইশ পৌত্তলিকরা তাদের মূর্তিগুলোকে 'শক্তির প্রতীক'হিসেবে এবং এর মাধ্যমে ঈশ্বরের নিকটে যাওয়া যায় বলেও বিশ্বাস করত। কুরাইশদের এরকম ভাবনার কথা কোরানে রয়েছে : 'যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে, 'আমরা এদের পূজা এজন্যই করি যে এরা আমাদেরকে আল্লাহর কাছাকাছি পৌঁছে দেবে।' (৩৯:৩)।

এরপরও মক্কায় ইসলাম তেমন বিকশিত হতে পারে নি। ১৩ বছর ধরে নবুওতি প্রচারের পরও, এমন কী মনোমুগ্ধকর মক্কি সুরাগুলো প্রকাশের পরও সেখানে ইসলাম-গ্রহণকারীর সংখ্যা একশ ছড়ায়নি। নবি মুহাম্মদ ১৩ বছর ধরে দিনরাত পরিশ্রম করেও কুরাইশদের দৃঢ় অবস্থান ভাঙতে পারেননি। এই সময় যে কয়েকজন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আবু বকর, ওমর, উসমান, হামজা বিন আব্দুল মোতালেব, আব্দুর রহমান বিন আউফ এবং সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস। এছাড়া বাকিরা ছিলেন দরিদ্র পরিবারের অথবা নিচু শ্রেণির। মক্কার সমাজে তাদের কোনো প্রভাব ছিল না।

একেশ্বরবাদী হানিফ মতাবলম্বী ওয়ারাকা বিন-নওফল ইসলাম গ্রহণ না করলেও মুহাম্মদকে সবসময় সমর্থন দিয়ে এসেছিলেন। আবু বকরকে ইসলামে নিয়ে আসার পরামর্শ তিনিই মুহাম্মদকে দিয়েছিলেন। কারণ আবু বকর মক্কার একজন প্রভাবশালী পরিবারের সদস্য ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তার ইসলাম গ্রহণ স্বাভাবিকভাবে অন্যদের প্রভাবিত করবে। এবং তেমনটিই ঘটে। আবু বকরের ইসলাম গ্রহণের পর একে একে উসমান বিন আফফান, আব্দুর রহমান বিন আউফ, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, জুবায়ের বিন আল-আওয়াম মুসলিম হয়েছিলেন।

ইসলামের প্রসারের পেছনে এক গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে নবি মুহাম্মদের একনিষ্ঠতা এবং গভীর আত্মবিশ্বাস। যা তাঁকে অনেক সুদৃঢ় লক্ষ্য অর্জনে তাঁর আত্মবিশ্বাসকে ধরে রেখেছিল। অনেক ব্যক্তির প্ররোচনা, হুমকি-ধামকি, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ কোনো কিছুই তাঁকে টলাতে পারেনি। একই সময় মুহাম্মদেরও যথেষ্ট সম্পদ ছিল, সেগুলোকে তিনি যথাসময়ে ব্যবহার করেছেন। ইসলাম প্রচারের পঞ্চম বছরে তিনি তাঁর এক অনুসারীকে আবিসিনিয়ার খ্রিস্টান রাজা আসামা ইবনে আবজরের (নিগাস) কাছে দূত হিসেবে পাঠান, রাজা যেন তাঁর রাষ্ট্রে মক্কার পৌত্তলিকতা-বিরোধী কয়েকজন মুসলমানকে সহায়তা করেন। [প্রাচীন আবিসিনিয়ার রাজাদের 'নিগাস'নামে ডাকা হতো।-অনুবাদক]। এ-ঘটনায় মক্কার কুরাইশ-প্রধানদের টনক নড়ে। তাঁরাও নিগাসের কাছে কুরাইশ বংশের বানু শাহম গোত্রের আমর ইবনে আল-আস (৫৮৫-৬৬৪ খ্রিস্টাব্দ) এবং আব্দুল্লাহ বিন আবু রাবিয়াকে দূত হিসেবে পাঠান, যাতে সেখানকার শাসকদের বোঝানো হয় তারা যেন অভিবাসী মুসলমানদেরকে বিদ্রোহী ও অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

ইসলাম প্রচারের শুরুর দিকে কুরাইশরা মুহাম্মদকে খুব একটা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেননি। তারা তাঁকে পাগল, কবি, জ্যোতিষী, জিন বা শয়তানে ভর করা ব্যক্তি ইত্যাদি বলে সম্বোধন করত। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে মুহাম্মদের মানসিক দৃঢ়তা এবং কতিপয় উল্লেখযোগ্য সাফল্য কুরাইশদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। স্বাভাবিকভাবে কুরাইশদের সাথে নবির শত্রুতা বাড়তে থাকে। কুরাইশ-প্রধানরা বুঝতে পেরেছিলেন যদি মুহাম্মদের প্রচারণা সাফল্য পেতে শুরু করে তবে তাদের নিজেদের জীবিকা নির্বাহের পথ ধ্বংসের মুখে পড়ে যাবে। প্রতি বছর হাজারো মানুষ একত্রিত হতো মক্কার কাবা ঘরকে কেন্দ্র করে। এটা ছিল আরবের বেদুইন গোষ্ঠীগুলোর প্রধান তীর্থস্থান। আরবের সকল কবি, সাহিত্যিক, বক্তৃতাকারীদের মিলনমেলা পরিচালিত হতো কাবা ঘরকে কেন্দ্র করে। মক্কাবাসীদের রুটি-রুজি ও কুরাইশদের মানসম্মান সবই তীর্থযাত্রীদের আসা-যাওয়ার উপর নির্ভরশীল ছিল। বেদুইনরা মূর্তিসজ্জিত কাবা ঘর (উপাসনালয়) দর্শন করতে আসত। নতুন ধর্মমতে যদি এই মূর্তিগুলো ধ্বংস করে দেয়া হয়, তবে বেদুইনরা হয়ত আর কখনোই এখানে আসবে না।

পনের বছর পর ইসলামের বিজয় যখন সাধিত হয়, মক্কার মুসলিমরাও পূর্বের মতো ঠিক তেমনি তাদের জীবিকা নির্বাহ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে। ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে মক্কা শহর বিজয়ের পর নাজিল হওয়া আয়াতে পৌত্তলিকদের কাবা ঘরে গমন নিষিদ্ধ করা হয় এবং নিজেদের জীবিকা নিয়ে উদ্বিগ্নমক্কায় অবস্থানরত মুসলমানদেরকে সুরা তওবা'র ২৮ নং আয়াতের মাধ্যমে দুশ্চিন্তা দূর করা হয় : 'হে বিশ্বাসীগণ! অংশীবাদীরা তো অপবিত্র; তাই এ-বছরের পর তারা যেন মসজিদ-উল-হারামের কাছে না আসে। যদি তোমরা দারিদ্রের ভয় কর, তবে জেনে রাখো আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাঁর নিজ করুণায় তোমাদের অভাব দূর করতে পারেন।' (৯:২৮)। অর্থাৎ ব্যবসায় লোকসানের ক্ষতিপূরণ তিনিই (আল্লাহ) প্রদান করবেন।

কুরাইশ-প্রধানরা যখন মুহাম্মদের ধৈর্য, ঐকান্তিকতার প্রতি লক্ষ করলো এবং নিজেদের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারল তখন তারা তুলনামূলক ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তারা মুহাম্মদের চাচা বৃদ্ধ আবু তালিবের শরণাপন্ন হয়ে অনুরোধ জানান তিনি যেন মুহাম্মদকে ইসলাম প্রচার থামাতে বলেন এবং বিনিময়ে তাঁকে কাবা ঘর রক্ষণাবেক্ষণের এক পদে চাকুরির প্রতিশ্রুতিও দেয়া হয়। আবু তালিব অবশ্য ভাতিজাকে রাজি করাতে ব্যর্থ হলে প্রায় সব কুরাইশ-প্রধানই বানু হাশেমিকে সামাজিকভাবে একঘরে করার সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে বেশ কয়েকদিনের জন্য হাশেমি গোষ্ঠীর

সদস্যদের কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। অবশ্য হাশেমি গোষ্ঠীর দুর্দশা দেখে এক সময় অন্য আরবরা এগিয়ে এলে তাদের দুঃসময়ের অবসান হয়।

এ ঘটনার পর এবং বিশেষ করে আবু তালিবের মৃত্যুর পর নবি মুহাম্মদকে থামানোর আর কোনো আশা বাকি থাকে না। কুরাইশ-প্রধানরা এবার কঠোর অবস্থানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। প্রাথমিক আলোচনায় সম্ভাব্য তিনটি প্রস্তাব সামনে রাখা হয় : নবি মুহাম্মদকে বন্দী করা, তাঁকে নির্বাসিত করা অথবা তাঁকে হত্যা করা। অবশ্য পরে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, মুহাম্মদকে হত্যা করাটাই সবচেয়ে উপযুক্ত হবে। শুধু একটা শর্ত থাকল যে, সকলের হাতই মুহাম্মদের রক্তে রঞ্জিত করা হবে যাতে করে ভবিষ্যতে কাউকে যেন হাশেমি গোত্রের প্রতিশোধের শিকার না হতে হয়। মুহাম্মদের নবুওতির ১২-১৩ বছরের মাথায় এই পরিকল্পনা করা হয়। যা তাঁর মক্কা থেকে মদিনায় অভিবাসিত হওয়াকে প্রভাবিত করে।

অলৌকিকত্ব

অনেক ইরানি গভীরভাবে বিশ্বাস করেন, যে কোনো ইমামজাদা[২৬] প্রতি মুহূর্তেই কোনো না কোনো রকমের অলৌকিক কাজ-কারবার করতে পারেন। নবি মুহাম্মদ ও হজরত আলি ইবনে আবু তালিবের কোনো বংশধর কিংবা ইরানের স্থানীয় কোনো সন্ন্যাসীকে ‘ইমামজাদা’বলে সম্বোধন করা হয়। অবশ্য তাদের যদি কোরান পড়ার সাধ্য থাকত তবে সেখানে আদৌ অলৌকিক কিছু নেই দেখে সত্যিই অবাক হয়ে যেত।

কোরানে বিশটিরও অধিক আয়াতে উল্লেখ রয়েছে, সংশয়বাদীরা যখনই নবিকে কোনো অলৌকিক কাজ করে দেখাতে বলেছে, ততবারই তিনি হয় নীরব থেকেছেন, নয়তো বলেছেন তিনি আর দশজনের মতই সাধারণ মানুষ, শুধুমাত্র আল্লাহর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে সুসংবাদ ও সতর্কবাণী নিয়ে আসা ছাড়া তাঁর পক্ষে অন্য কিছু করা সম্ভব নয়। এই আয়াতে এই বিষয়টি স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে : ‘আর ওরা বলে, ‘আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না তুমি মাটি ফাটিয়ে একটি ঝরনা ফোটাবে, বা তোমার খেজুরের বা আঙুরের বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে অজস্র নদীনালা বইবে, বা তুমি যেমন বল, আকাশকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলবে আমাদের ওপর, বা আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে নিয়ে আসবে আমাদের সামনে বা তোমার জন্য একটা সোনার বাড়ি হবে, বা তুমি আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু তোমার আকাশে আরোহণ আমরা কখনও বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না আমাদের পড়ার জন্য তুমি আমাদের ওপর এক কিতাব অবতীর্ণ করবে।’বলো, ‘আমার প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা! আমি একজন মানুষ, একজন সুসংবাদদাতা রসুল ছাড়া আর কী?’ (সুরাবনি-ইসরাইল : আয়াত ৯০-৯৩)।

পরের দুই আয়াতে সংশয়বাদীদের বিস্ময় প্রকাশিত হয়েছে এভাবে : ‘আল্লাহ কি মানুষকে রসুল করে পাঠিয়েছেন?’ ওদের এই কথাই লোকদেরকে বিশ্বাস করতে বাধা দেয় যখন ওদের কাছে আসে পথের নির্দেশ। বলো, ‘ফেরেশতারা যদি নিশ্চিন্ত হয়ে পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করতে পারত তবে আমি আকাশ থেকে এক ফেরেশতাকেই ওদের কাছে রসুল করে পাঠাতাম।’ (১৭:৯৪-৯৫)। এই দুটি আয়াত অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও সহজবোধ্য। নবি হলেন সাধারণ লোকজনের মধ্যেকার এমন একজন মানুষ, যিনি অন্যদের থেকে তুলনামূলক বেশি দূরদর্শী ও চিন্তাশীল, এবং তিনি প্রচলিত কুসংস্কারের অসারতা ও অযৌক্তিকতা সবাইকে দেখাতে পারেন। এমন কী, সমাজে প্রচলিত নিষ্ঠুর ও ক্ষতিকর প্রথা থেকে লোকজনকে দূরে রাখতে পারেন। মুহাম্মদের বক্তব্যের স্বচ্ছতা, সহজবোধ্যতা ও গভীরতা নিয়ে কখনো প্রশ্ন উঠেনি। তাই তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের উঠেপড়ে লাগার কারণও পরিষ্কার। বেশিরভাগ মানুষ ঐ ধরনের হিংসামূলক আচার-আচরণে অভ্যস্ত ছিল। শৈশবকাল থেকে তারা এগুলো অনুসরণ করত। আজকের

এই আধুনিক বিংশ শতাব্দীতেও একই দৃশ্য দেখা যায়। তাই সহজে বোঝা যায় আরবের তখনকার মানুষেরা এমন কোনো লোকের কথা সহজে মেনে নেবে না যিনি তাদের পূর্বসূরিদের ঐতিহ্যের বিরোধিতা করবেন। মুহাম্মদ যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে কথা বলার দাবি করলেন, তখন খুব স্বাভাবিকভাবে অন্যরা তার প্রমাণ দেখতে চাইল। মুহাম্মদ নিজেও পূর্বের বিভিন্ন নবির অলৌকিক কর্মকাণ্ডের কথা নানা সময় স্বীকার করেছেন এবং বিভিন্ন ধর্মের নবি সম্পর্কে বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়েছেন। পারস্যে একটি কথা প্রচলিত আছে এরকম : 'যে অন্যের বেশি প্রশংসা করে পরোক্ষভাবে সে নিজের অক্ষমতাই প্রকাশ করে।' এই কথার প্রভাব তখনও পড়েছিল। কুরাইশরা ভেবেছিল সময় এলে মুহাম্মদ নিজেও দৃশ্যমান কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে দেখাবেন। তাই তারা অন্য কোনো বিকল্প মানতে রাজি ছিল না। এজন্য তারা জিজ্ঞাসা করেছিল এভাবে: 'ওরা বলে, 'এ কেমন রসুল যে খাবার খায় ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করে! তার কাছে কেন ফেরেশতা পাঠানো হয় না যে তার সঙ্গে থাকবে ও ভয় দেখাবে, বা তাকে ধনভাণ্ডার দেওয়া হয় না কেন, বা তার একটা বাগানও নেই কেন যেখান থেকে সে তার খাবার যোগাড় করতে পারবে?' জালেমরা আরও বলে, তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত লোকের অনুসরণ করছ!' (সুরা ফুরকান : আয়াত ৭-৮)।

কুরাইশদের এ-ধরনের দাবি কিংবা তীব্র অসন্তোষমূলক সমালোচনারও কোনো উত্তর দেননি নবি। অলৌকিক কিছু ঘটানোর গণদাবির মুখেও তিনি নীরব থেকেছেন। আল্লাহর তরফ থেকে প্রত্যাদেশ এলে তিনি পরে বলেন : 'তোমার পূর্বে আমি যেসব রসুল পাঠিয়েছি, তারা সকলেই তো খাওয়া-দাওয়া করত ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করত।'(২৫:২০)। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়: 'তারা বলে, 'ওহে, যার ওপর এই উপদেশবাণী অবতীর্ণ হয়েছে, তুমি তো পাগল! তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের সামনে ফেরেশতাদের নিয়ে আসছ না কেন?' (সুরা হিজর : আয়াত ৬-৭)। আবার সুরা আম্বিয়াতে রয়েছে একই কথা : 'সীমালঙ্ঘনকারীরা গোপনে পরার্শ করে, 'এ তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ, তবুও কি তোমরা দেখেশুনে জাদুর খপ্পরে পড়বে?'. . . 'ওরা বলল, 'অলীক স্বপ্ন! না, সে এ বানিয়েছে। না, সে তো এক কবি। সুতরাং সে আমাদের কাছে এক নিদর্শন আনুক, যেমন নিদর্শন দিয়ে পূর্বসূরিদের পাঠানো হয়েছিল।'(২১:৩, ৫)। একই সুরার পরবর্তী আয়াতে একটা উত্তর দেয়া হয়েছিল যেখানে আল্লাহ মুহাম্মদকে বলেন: 'তোমার পূর্বে আমি প্রত্যাদেশ দিয়ে মানুষই পাঠিয়েছিলাম।'পরবর্তী বাক্যে মুহাম্মদকে সংশয়বাদীদের উপদেশ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, 'তোমরা যদি না জান, তবে উপদেশপ্রাপ্ত সম্প্রদায়দেরকে জিজ্ঞাসা করো।'(২১:৭)। আবারও পূর্বের নবিদের প্রসঙ্গ উঠলে বলা হয় : 'আর আমি তাদেরকে এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যে তাদের খাবার খেতে হত না; তারা চিরস্থায়ীও ছিল না।' (২১:৮)।

সব মিলিয়ে মক্কি সুরাগুলোর মধ্যে ২৫টিরও বেশি আয়াতে দেখা যায়মুহাম্মদকে অনুরোধ করা হচ্ছে তিনি যদি একজন নবি হয়ে থাকেন, তবে এমন কোনো অলৌকিক কাজ করে দেখাতে যা সাধারণ মানুষ পারে না। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে মুহাম্মদ ছিলেন হয় নীরব, নয়তো নিজেকে অন্য সাধারণ মানুষের মতোই বলে স্বীকার করেছেন। যদিও তিনি স্বয়ং আল্লাহর কাছ থেকে ওহি পেয়েছেন, তথাপি তিনি আর দশজনের মতোই মরণশীল ছিলেন। একটা কথা পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে সুরা ইউনুসে : 'ওরা বলে, 'তার কাছে তার প্রতিপালকের কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?' বলো, 'অদৃশ্যের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহরই। অতএব তোমরা প্রতীক্ষা করো, আমি তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।'(১০:২০)। অন্যসব মানুষের মতো মুহাম্মদেরও আল্লাহর গায়েবি উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। সুরা রা'দ-এ মুহাম্মদের নবুওতি ও অলৌকিক কিছু করার অক্ষমতা সম্পর্কে প্রশ্নগুলির উত্তর এভাবে দেয়া হয়েছে, তাঁর একমাত্র কাজ হল আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। 'যারা অবিশ্বাস করেছে তারা বলে, '(মুহাম্মদের) প্রতিপালকের কাছ থেকে তার কাছে কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?' তুমি তো কেবল সতর্ককারী, আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য তো পথপ্রদর্শক আছে।'[২৭] (১৩:৭)। এ-বক্তব্য থেকে বোঝা যায় কোনো প্রকার অলৌকিক কিছু করা একজন নবির কাজের মধ্যে পড়ে না।

একই ধরনের বক্তব্য দেখা যায় আরও একটি আয়াতেযেখানেপৌত্তলিকদের করা প্রশ্নের জবাবে মুহাম্মদ বলেন, তিনি একজন সতর্ককারী মাত্র, অলৌকিকতা কেবল আল্লাহই দেখাতে পারেন আর কেউ না। যদিও বর্তমানকালে কোরান নাজিল হওয়াকে অনেকে অলৌকিক ঘটনা বলেই বিশ্বাস করেন। সুরা আনকাবুত-এ অবিশ্বাসীদের প্রশ্নের উত্তর মুহাম্মদকে এভাবে দিতে দেখা যায়: 'ওরা বলে, 'তার প্রতিপালকের কাছ থেকে তার কাছে নিদর্শন পাঠানো হয় না কেন?' বলো, 'নিদর্শন আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে, আর 'আমি তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।' (২৯:৫০)। আবার পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'এ কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, যে-কিতাব তাদের কাছে আবৃত্তি করা হয় আমিই তা পাঠিয়েছি তোমার কাছে? এতে অবশ্যই বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে।'(২৯:৫১)। সুরা মুলক-এ পৌত্তলিকদের জিজ্ঞাসার জবাবে বলা হয়েছে: 'ওরা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বলো এ-প্রতিশ্রুতি কবে পালন করা হবে?' পরের আয়াতে মুহাম্মদ জবাব দেন : 'এর জ্ঞান কেবল আল্লাহরই আছে, আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'(৬৭:২৬-২৭)। সুরা নাজিআত-এ পুনরুত্থান দিবস ও নবুওতি জ্ঞানের অলৌকিকত্ব সম্পর্কে অস্বীকার করতে দেখা যায় মুহাম্মদকে : 'ওরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'কেয়ামত কখন ঘটবে?' তোমাকে কী বলা আছে এ-ব্যাপারে? এর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তো কেবল তোমার প্রতিপালকের কাছে। তুমি তো একজন সতর্ককারী-তার জন্য যে একে ভয় করে।'(৭৯:৪২-৪৫)।

পৌত্তলিকদের জেদের মুখে এবং তাদের দেয়া বক্তব্য অনুযায়ী অলৌকিক কাজ দেখালেই তারা বিশ্বাস করে ফেলবে মুহাম্মদ ও আল্লাহকে এমনটা ভেবে মুসলমান, এবং এমন কী মুহাম্মদের ভেতরেও আশা জন্মাতে থাকে যে আল্লাহ হয়তো সত্যিই একদিন তাঁকে দিয়ে অলৌকিক কিছু করে দেখাবেন, যাতে সব অবিশ্বাসীই 'বিশ্বাসী' হয়ে যায়। সুরা আনআম-এ এই বিষয়টির সুরাহা হয় এভাবে : 'আর তারা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করে বলে, তাদের কাছে যদি কোনো নিদর্শন আসত তবে অবশ্যই তারা বিশ্বাস করত। বলো, 'নিদর্শন তো আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত।'আর তাদের কাছে নিদর্শন এলেও তারা যে বিশ্বাস করবে না, এ কীভাবে তোমাদেরকে বোঝানো যাবে?'(৬:১০৯)। আল্লাহ এরপর নবিকে বলেন : 'আর তারা যেমন প্রথমবারে ওতে বিশ্বাস করেনি তেমনি আমিও তাদের অন্তরে ও নয়নে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করব আর অবাধ্যতায় তাদেরকে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে দেব। তাদের কাছে ফেরেশতা পাঠালেও এবং মৃত ব্যক্তিরা তাদের সাথে কথা বললেও এবং সব জিনিস তাদের সামনে হাজির করলেও তারা বিশ্বাস করবে না, যদি না আল্লাহ চান, কারণ তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ।'(৬:১১০-১১১)।

সুরা আনআম-এর এই ৩টি আয়াত নিয়ে মন্তব্য করা প্রয়োজন : (১) আরবের পৌত্তলিকরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল মুহাম্মদ যদি কোনো ধরনের অলৌকিক ঘটনা দেখাতে পারেন তবে তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ মুহাম্মদকে জবাব দিতে বলেন যে, অলৌকিক ঘটনা একমাত্র আল্লাহই করতে পারেন, তিনি বা অন্য কেউ নন। একজন মানুষের (হতে পারেন তিনি 'নবি') এই ধরনের পরিষ্কার স্বীকারোক্তি থেকে বোঝা যায়, প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। কারো পক্ষেই প্রাকৃতিক কোনো নিয়মের ব্যত্যয় ঘটানো সম্ভব নয়। যেমন আগুন কখনো তার পোড়ানোর ক্ষমতা হারাতে পারে না। (২) নবি মুহাম্মদ নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেছিলেন, ভবিষ্যতে যদি কখনো অলৌকিক ঘটনা হয় আর অন্যরা যদি এতে বিশ্বাস না করে, তবে তিনি তা কিভাবে জানতে পারবেন? এখানে একটি পাল্টা প্রশ্নের উদ্ভব হয়, এটা কী নিশ্চিতভাবে বলা যায়, একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটলেই পৌত্তলিকরা তা বিশ্বাস করে ফেলবে? মানুষের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, অস্বাভাবিক কিছু দেখলে মানুষ বিস্মিত হয় এবং যে ব্যক্তি এই কাজ করে অনেকেই তার অনুগত হয়ে পড়ে। কোরানের তফসিরকারকদের বর্ণনায় বুঝা যায়, স্বয়ং আল্লাহ তাঁর ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিক্ষমতার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন, কোনো ধরনের অলৌকিক ঘটনা না-ঘটলে অবিশ্বাসীরা কখনোই মুহাম্মদ বা কোরানের বাণী স্বীকার করবে না। ৩) আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দেন, তাঁর 'পূর্বে পাঠানো নিদর্শন' কে অবিশ্বাস করলে তিনি অবিশ্বাসীদের দৃষ্টি ও হৃদয়কে ভুলপথে নিয়ে যাবেন। এখানে প্রশ্ন দেখা দেয়, সর্বশক্তিমান আল্লাহ নিজেই কী সাধারণ মানুষের সত্য নির্ধারণের ক্ষমতা নষ্ট করে দিচ্ছেন? যদি তাই হয়, তবে মানবজাতির কাছে কী আশা করা যেতে পারে আর, কিংবা তাহলে তাদের কাছে

বারেবারে নবি পাঠানোর প্রয়োজনটা কী? আর এটা পরিষ্কার নয়, 'পূর্বে পাঠানো নিদর্শন'বলতে কি বোঝানো হয়েছে? পূর্বের নবিদের কিছু ঘটনা আছে, তেমনি মুহাম্মদেরও কিছু ঘটনা রয়েছে, হয়তো এগুলোর কোনো কিছুই হতে পারে। অবশ্য পূর্বের নবিদের সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে খুব কমই জানা যায়। কিন্তু কোরান অনুসারে, যখনই পৌত্তলিকরা মুহাম্মদের কাছে অলৌকিক কিছু করে দেখানোর দাবি জানিয়েছে, তখনই তিনি নিজেকে শুধু আল্লাহর তরফ থেকে একজন সুসংবাদদাতা ও সর্তককারী বলে দাবি করেছেন। হতে পারে, 'পূর্বে পাঠানো নিদর্শনের প্রতি অবিশ্বাস' বলতে কোরানের অন্য আয়াতগুলোর কথা বোঝানো হয়েছে। তাই যদি হয়ে থাকে তবে এটা কখনো উপযুক্ত জবাব নয়। কারণ পৌত্তলিকরা কোরানের অলৌকিক বাণীকে বিশ্বাস করতে চাইত না। মুহাম্মদের প্রতি তাদের দাবি ছিল - যিশু, মুসা, সালেহ বা অন্যান্য নবিদের যে রকম অলৌকিক ঘটনার কথা কোরানে বলা হয়েছে, সেরকম যেন মুহাম্মদও কিছু করে দেখান। ৪) সুরা আনআম-এর ১১১নম্বর আয়াতে আল্লাহ স্বয়ং জানিয়ে দিলেন, ফেরেশতা পাঠালেও অবিশ্বাসীরা (পৌত্তলিকরা) 'বিশ্বাস'করবে না। এমনকি মৃত মানুষ জীবিত হয়ে উঠে এসে তাদের সাথে কথা বললেও নাকি তারা বিশ্বাস করবে না। তারা মুহাম্মদকে বারবার বলতো বেহেশত থেকে কোনো ফেরেশতা এনে দেখাতে বা যিশুর মতো কোনো মৃতকে জীবিত করে দেখাতে। মুহাম্মদ নিজেও সবসময় এমন কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটার আশায় ছিলেন। এরপর আল্লাহ নবিকে বলেন যে, তেমনটা ঘটলেও নাকি ওরা বিশ্বাস করবে না। ৫) এখন কিছু প্রশ্ন তৈরি হয়। এসব পৌত্তলিক লোকের ভবিষ্যৎ-অবিশ্বাস ও অনমনীয় চিন্তাধারা যদি পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহর তরফ থেকে তাদেরকে সঠিক পথে আনতে নবি প্রেরণের কি দরকার? আল্লাহর মতো একজন সর্বজ্ঞানী, সবজান্তা এবং অব্যর্থ কেন এই ধরনের অর্থহীন কাজ করবেন? সনাতনপন্থীরা, ধর্মীয় ব্যাপারে যারা যুক্তি প্রয়োগ করতে রাজি নন, তারা এই বক্তব্যের একটা ব্যাখ্যা দিতে চান এভাবে : যেসব মানুষ অসৎ পথে চলে তাদেরকে মৃত্যুর পরের শাস্তি সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত সতর্কবাণী দেয়ার জন্য এমনটা করা। কিন্তু সনাতনপন্থীদের এই ব্যাখ্যা এক্ষেত্রে খাটে না। কারণ ১১১ নম্বর আয়াতের পরের বাক্যে রয়েছে, 'যদি না আল্লাহ চান'। বোঝা যায় এই পৌত্তলিক মানুষেরা কখনোই বিশ্বাস করতে পারবে না কারণ আল্লাহই চান না তারা বিশ্বাস করুক কোরানের বাণীতে। এই বক্তব্যে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় একই সুরার ১১০ নম্বর আয়াত থেকে : 'তারা যেমন প্রথমবারে ওতে বিশ্বাস করেনি তেমনি আমিও তাদের অন্তরে ও নয়নে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করব আর অবাধ্যতায় তাদেরকে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে দেব।'একই সুরার ১০৭নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : 'যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে তারা শরিক করত না।'(৬:১০৭)। অর্থাৎ আল্লাহই নিজে চান তারা পৌত্তলিক থেকে যাক। তাই স্বাভাবিকভাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহর নগণ্য সৃষ্টি মানুষেরা তো আল্লাহর ইচ্ছাকে পরিবর্তন করতে পারে না। এমন কী মুহাম্মদও পৌত্তলিকদেরকে তাদের 'অবিশ্বাস' থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন না, যদি তাদের এই অবিশ্বাস আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে 'কোরানের প্রতি অবিশ্বাসে'পৌত্তলিকদের কোনো দোষ দেয়া যায় না। তাদেরকে কেন মৃত্যুর পরের শাস্তির ভয় দেখানো হবে? একজনের ধর্মীয় বিশ্বাস যদি কোনো ঐশ্বরিক নির্দেশেই হয়ে থাকে তবে যুক্তি আমাদের বলে যে, সেই ঐশ্বরিক নির্দেশ ওই ব্যক্তির নিয়তি, ভবিষ্যৎ সুখ-দুঃখ নিয়ন্ত্রণ করবে। আর সেক্ষেত্রে কোনো নবি প্রেরণেরও প্রয়োজন থাকবে না, কোনো অলৌকিকতা দেখানোর দাবিও থাকবে না এবং অলৌকিকতা না দেখানোর কোনো অজুহাত খোঁজারও প্রয়োজন হবে না।

উপরের সব বিষয় বিবেচনা করে বোঝা যায় পৌত্তলিকদের অলৌকিকত্ব দেখানোর দাবি সম্পর্কে নবি মুহাম্মদ সবসময় নীরব থেকেছেন কিংবা পাশ কাটিয়ে গেছেন। মক্কি সুরাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কাব্যিক সুরা তাকভির-এ আমরা নবুওতি সম্পর্কে উজ্জ্বল বাগ্মিতার প্রকাশ দেখতে পাই। সেখানে নবি মুহাম্মদ অবিশ্বাসীদের প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিতে অনীহা প্রকাশ করেন। আকারে ইঙ্গিতে আল্লাহর হয়ে কথা বলার দাবি জানিয়েছেন। সুরা তাকভির-এর প্রথম ১৮ আয়াত নাজিলকালে যেসব পৌত্তলিক-অবিশ্বাসীরা মুহাম্মদের নবুওতিকে 'মৃগীরোগীর বিভ্রম' কিংবা জ্যোতিষীর কাজকারবার বলে উড়িয়ে দিয়েছে তাদের এভাবে জবাব দেয়া হয় : 'সত্যই একথা এক সম্মানিত বার্তাবাহকের, যে শক্তিধর, আরশের অধিপতির নিকট মর্যাদাসম্পন্ন; যার

আজ্ঞা সেখানে মান্য করা হয় এবং যে বিশ্বাসভাজন। আর (হে মক্কাবাসী!) তোমাদের সঙ্গী তো পাগল নয়। সে তো ওকে (ফেরেশতাকে) স্বচ্ছ দিগন্তে দেখেছে। সে অদৃশ্য প্রকাশ করতে কার্পণ্য করে না। আর এ তো অভিশপ্ত শয়তানের কথা নয়!(৮১:১৯-২৫)।

মক্কার বেশিরভাগ অধিবাসীর চিন্তা ছিল মুহাম্মদ অলৌকিক কোনো কর্মকাণ্ড করে দেখালে তারা তখন ইসলাম গ্রহণ করার কথা ভাববে। সেখানে আল্লাহ জানিয়ে দেন, সাক্ষাৎ ফেরেশতা পাঠিয়ে দিলেও বা মরা-মানুষকে জীবিত করে তুললেও তারা বিশ্বাস করবে না। দশ-বারো বছর পর যখন নবির তরবারি ও অনুসারীরা অনেক শক্তিশালী হয়ে ওঠেন তখন তারা -'দলে দলে আল্লাহর ধর্ম গ্রহণ করেন।'(১১০:২)। নবির অন্যতম কট্টর প্রতিপক্ষ এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আবু সুফিয়ান পর্যন্ত ৬৩১ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম গ্রহণ করেন।

মক্কা বিজয়ের পর হাজার মানুষের পক্ষ থেকে আব্বাস বিন আব্দুল মোতালেব আবু সুফিয়ানকে নবির নিকট নিয়ে যান। নবি আবু সুফিয়ানকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'এখন নিশ্চয় আপনি বুঝতে পারছেন এক সর্বশক্তিমান ছাড়া আর কোনো ঈশ্বর নাই? এবং তিনিই সর্বজ্ঞ।'আবু সুফিয়ান জবাব দেন, 'হ্যাঁ, আমি সেই বিশ্বাসের দিকেই এগোচ্ছি, তবে এ নিয়ে আমাকে আরও ভাবতে হবে।'আব্বাস তখন বলেন, 'আবু সুফিয়ান, তুমি এখনই মুসলমান হয়ে যাও, নয়তো নবিজি এই মুহূর্তে তোমার মাথা কেটে ফেলার নির্দেশ দিবেন।'মুসলিম যোদ্ধা দ্বারা আবদ্ধ অবস্থায় আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করেন। আব্বাস বিন আব্দুল মোতালেবের পরামর্শে নবি আবু সুফিয়ানকে এই আশ্বাস দেন, 'তার গৃহ কাবার মতই নিরাপদ থাকবে, তার ঘরে যেই প্রবেশ করবে সেই নিরাপদ থাকবে।'একই বছরের শেষের দিকে মুসলমানরা যখন হাওয়াজেন গোত্রকে পরাজিত করে বিপুল পরিমাণ সম্পদ লাভ করেন তখন আবু সুফিয়ানসহ অন্য কুরাইশ নেতাদের মুহাম্মদ এতো বেশি উপহার প্রদান করেন যে, আনসাররা (নবির মদিনাবাসী অনুসারীরা) অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল (আবিসিনিয়া থেকে আগত ক্রীতদাস) ওয়াশির ইসলাম গ্রহণ। ওয়াশি ৬২৫ সালের মার্চে ওহুদের যুদ্ধে হামজা বিন আব্দুল মোতালেবকে হত্যা করে তাঁর লাশ ছিড়ে টুকরো করে ফেলেন। এ-ঘটনায় নবি এতোই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি এর প্রতিশোধ নিতে দৃঢ় শপথ নিয়েছিলেন। কিন্তু ওয়াশি বন্দী অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করলে মুহাম্মদ তা মেনে নেন।

বোঝা যায় এই ধর্মান্তরের পিছনের প্রধান কারণ ছিল ভয়। শত্রুভীত হলে নবি তাদেকে ক্ষমা করতেন। সুরা আনআমের আয়াত তিনটি (১০৯-১১১) নিছক কোনো অনুমান বা প্রকল্পিত ছিল না। এগুলো কোরানের অন্যান্য আয়াতের সারমর্ম। এখান থেকে দেখা যায়, যখন আল্লাহর কোনো সাহায্য নবির লক্ষ্যকে এগিয়ে নিতে আসছিল না তখন মুহাম্মদ ভীষণ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। এটা স্পষ্ট হয় সুরা ইউনুসের এই আয়াতদ্বয় থেকে : 'আমি তোমার কাছে যা অবতীর্ণ করেছি তাতে যদি সন্দেহ হয় তবে তোমার আগের কিতাব যারা পড়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো। তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার কাছে সত্য এসেছে। তুমি কখনও সন্দিহানদের শামিল হয়ো না। আর যারা আল্লাহর নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না; হলে, তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবে।' (১০:৯৪-৯৫)।

আয়াতগুলো ব্যাখ্যা করতে নাজিলের দৃশ্য কল্পনা করার কোনো প্রয়োজন হয় না। সংশয়বাদী এবং দ্বিধাচিত্তের মানুষদের বিশ্বাস করাতে গিয়ে নবি নিজেও সন্দেহের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। পরে আল্লাহই তা দূর করে দেন। আরও ব্যাখ্যা দেয়া যায় যে, যখন কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটার আশা প্রায় শেষের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল তখন মুহাম্মদ মনে মনে নিজের সাথে কিভাবে কথা বলতেন তা এই আয়াতগুলোতে পাওয়া যায়।

মক্কার সুরাগুলোর অন্যান্য আয়াতে দেখা যায় মুহাম্মদ নিজেও কিছুটা আধ্যাত্মিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। সুরা হুদ-এ নবির প্রতি আল্লাহর বাণীকে এভাবে দেখা যায়: 'ওরা যখন বলে, 'তার কাছে ধনভাণ্ডার পাঠানো হয় না কেন, বা তার সাথে ফেরেশতারা আসে না কেন?' তখন তুমি যেন তোমার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার কিছু বর্জন না কর এবং এর জন্য তোমার হৃদয় যেন দমে না যায়। তুমি তো কেবল সতর্ককারী, আর আল্লাহ সকল বিষয়ের কর্মবিধায়ক।'(১১:১২)। অর্থাৎ লোকে যাই বলুক না কেন, নবির একমাত্র কাজ ছিল ধর্ম প্রচার করা। সুরা আনআমে মুহাম্মদ আরেকটি দাবি খণ্ডনের দায় ঘাড়ে নেন : 'তাদের (কাফেরদের) মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই যদি তোমার কাছে বড় মনে হয়, পারলে মাটির নিচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বা আকাশে সিঁড়ি লাগিয়ে তাদের জন্য নিদর্শন নিয়ে এসো। আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয় সকলকে একসঙ্গে সৎপথে আনতেন। সুতরাং তুমি মূর্খদের মতো হয়ো না।'(৬:৩৫)। সুরা নিসায় একই ঘটনা আবার দেখা যায়। সম্ভবত ইহুদিরাও মুহাম্মদের কাছে মোজেজার দাবি জানিয়েছিল। তাদের সন্তুষ্ট করতেই এই আয়াত নাজেল করা হয়: 'কিতাবিরা তোমাকে তাদের জন্য আকাশ থেকে কিতাব অবতীর্ণ করতে বলে, কিন্তু মুসার কাছে তারা এর চেয়েও বড় দাবি করেছিল। তারা বলেছিল, 'আমাদেরকে আল্লাহকে সাক্ষাৎ দেখাও।'তাদের সীমালজ্ঘনের জন্য তারা বজ্রাহত হয়েছিল। তারপর স্পষ্ট প্রমাণ তাদের কাছে প্রকাশ হওয়ার পরও তারা গোবৎসকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করেছিল। আমি এও ক্ষমা করেছিলাম। আর আমি মুসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দান করেছিলাম।(৪:১৫৩)। সুরা বনি-ইসরাইলে অলৌকিকত্বের অনুপস্থিতিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে : 'পূর্ববর্তীরা নিদর্শন অস্বীকার করার ফলে আমি নিদর্শন প্রেরণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখি। আমি স্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে সামুদের কাছে এক মাদি উট পাঠিয়েছিলাম। তারা ওর ওপর জুলুম করেছিল। আমি ভয় প্রদর্শনের জন্য নিদর্শন প্রেরণ করি।'(১৭:৫৯)। এই আয়াত সম্বন্ধে তফসির আল-জালালাইনের মন্তব্য হচ্ছে : 'নবি সালেহকে প্রাচীন আরবের অবিশ্বাসী গোষ্ঠী সামুদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। তাদের মধ্যে বিশ্বাস আনার জন্য আল্লাহ সালেহর মাধ্যমে একটি অলৌকিক ঘটনা দেখান। একটা পাথরখণ্ড থেকে একটা মাদি উট সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু সামুদরা উটটিকে মেরে নিজেদের অবিশ্বাসকেই আঁকড়ে রাখে। এতে আল্লাহ রেগে গিয়ে বজ্রপাতের মাধ্যমে তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেন। এখন আল্লাহ যদি মুহাম্মদের হয়েও কোনো অলৌকিক-বিস্ময়কর ঘটনা দেখাতেন আর সবাই যদি নিজেদের অবিশ্বাসকেই ধরে রাখত তবে তাদেরও ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু নবির লক্ষ্যের কথা বিবেচনা করে আল্লাহ তাদের ধ্বংসের আদেশ মুলতবি করে রাখেন।'

ঠিক পরের আয়াতটিও বেশ আকর্ষণীয় এবং চিন্তা-উদ্রেককর : 'স্মরণ করো, আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, তোমার প্রতিপালক মানুষকে ঘিরে রয়েছেন। আমি যে-দৃশ্য তোমাকে (মিরাজে) দেখিয়েছি তা এবং কোরানে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল মানুষের জন্য। আমি তাদেরকে ভয় দেখাই, কিন্তু তা তাদের উগ্র অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।'(১৭:৬০)। এর অর্থ হল যেহেতু আল্লাহ সকলকেই নিয়ন্ত্রণ করেন, নবির তাই ভয় পাওয়ার কিছু নেই, তিনি সতর্কবাণী প্রদান করে যাবেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের পরীক্ষা নেয়ার জন্য বলা হচ্ছে, কারণ তাঁরা মুহাম্মদকে অবজ্ঞা করেছিল।

জাহান্নামের অভিশপ্ত জাক্কুম বৃক্ষের কথা কোরানের তিন জায়গায় (৩৭:৬২, ৪৪:৪৩এবং ৫৬:৫৩) উল্লেখ করার মাধ্যমেও জনগণকে ভয় দেখানো হয়েছিল। কিন্তু এটা তাদের কাছে আরও বেশি হাস্যকর মনে হয়। উপহাসের সুরে আরবরা তখন জিজ্ঞাসা করতে থাকে, 'জাহান্নামের আগুনের মধ্যে একটা গাছ কিভাবে জন্মাতে বা বেঁচে থাকতে পারে।' শেষ পর্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা প্রদর্শনের দায় থেকে সরে গিয়ে নবি সবাইকে কেয়ামত এবং জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করে বলেন: 'এমন কোনো জনপদ নেই যা আমি কেয়ামতের দিনের পূর্বে ধ্বংস করব না বা যাকে কঠোর শাস্তি দেব না। এ তো কিতাবে লেখা আছে।'(১৭:৫৮)। এটা সত্যিই বিস্ময়কর যে, আল্লাহ যিনি পরম দয়ালু, পরম করুণাময়তিনি সুরা সিজদা-তে দাবি করেছেন, 'আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতাম (৩২:১৩), তিনি আবার সবাইকে মৃত্যুর পরের গুরুতর শাস্তির হুমকি

দিয়ে চলেছেন। এ-ধরনের বক্তব্য প্রদানের বদলে সামান্য মোজেজা প্রদর্শন করে দিলেই কি বেশি ভালো হতো না? বিপুল সংখ্যক মানুষ তখন সহজেই ইসলাম গ্রহণ করত এবং সেই সাথে প্রচুর যুদ্ধ আর রক্তপাত এড়ানো সম্ভব হতো।

মোজেজার অনুপস্থিতির পৃথক একটি ব্যাখ্যা আমরা সুরা আনআম-এর ৩৭ নম্বর আয়াতে দেখতে পাই: 'তারা বলে, 'তার প্রতিপালকের নিকট হতে তার কাছে কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?' বলো, 'নিদর্শন অবতারণ করতে নিশ্চয় আল্লাহ সক্ষম।' কিন্তু তাদের অনেকেই (এ) জানে না।'আয়াতটির শব্দগুলোর মধ্যে যুক্তির অভাব সহজেই দৃশ্যমান। অবিশ্বাসীরা অন্তত একটি অলৌকিক ঘটনা দেখার জন্য বারেবারে অনুরোধ করে যাচ্ছে অথচ তাদেরকে বারবার বলা হচ্ছে, আল্লাহ অলৌকিক-বিস্ময়কর ব্যাপার দেখাতে পারেন কিন্তু দেখাচ্ছেন না। আল্লাহ সর্বশক্তিমান হলে অলৌকিকতা দেখানো খুব স্বাভাবিক একটা বিষয় কিন্তু তারপরও কোনো অলৌকিক কিছু ঘটেনি। আর ঘটলেও সুরা আনআমের এই আয়াত অনুসারে তাদের কেউই জানতে পারেনি। তাহলে সেটা কী ছিলযা তারা জানত না? তারা অবশ্যই বিশ্বাস করতযে আল্লাহ সর্বশক্তিমান, না-হলে তারা কখনোই অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শনের দাবি তুলত না। হেজাজের জনতার এই দাবির জবাব নিয়ে ধোঁয়াশা রয়ে গেছে। এক্ষেত্রে তফসির আল-জালালাইনের বক্তব্য হচ্ছে, 'অলৌকিক ঘটনা দেখার বাসনাকারী বেশিরভাগই জানত না যে, বিস্ময়কর ঘটনা ঘটার পরও তারা অবিশ্বাস করলেধ্বংস হয়ে যাবে। এখান থেকে দুটি প্রশ্ন উঠে : প্রথমত, অলৌকিক ঘটনা ঘটার পরও কেন তারা অবিশ্বাস করবে? দ্বিতীয়ত, নির্বোধ এবং একরোখা মানুষ যারা আলৌকিক ঘটনা ঘটার পরও অবিশ্বাস করে যাবে তাদেরকে ধ্বংস করাটা কতটা যৌক্তিক?

কোরানের অলৌকিকতা

পূর্বে বলা হয়েছে একটি দৃষ্টিগ্রাহ্য অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের জন্য মক্কার পৌত্তলিকদের পক্ষ থেকে মুহাম্মদের প্রতি যে বারবার দাবি করা হয়েছিল, তিনি সে দাবি পূরণে আগ্রহী ছিলেন না। মুহাম্মদের ভাষ্যমতে তিনি শুধুমাত্র শুভসংবাদ এবং সতর্কবাণী পৌঁছে দিতে এসেছেন। অপরদিকে কোরানের অলৌকিকতার ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন মনোভাব পোষণ করতেন। মুহাম্মদ নিজে কোরান তৈরি করেছেন কিংবা অন্য ব্যক্তিরা তার মুখ দিয়ে কোরানের বাণী প্রচার করছে, মক্কার সংশয়বাদীদের এমন দাবির প্রত্যুত্তরে তাদের প্রতি কোরানে একটি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া হয় : 'তারা কি বলে, 'সে (মুহাম্মদ) এ বানিয়েছে?' বলো, 'তোমরা যদি সত্য কথা বল তবে তোমরা এ-ধরনের দশটি সুরা আনো আর আল্লাহ ছাড়া অন্য যাকে পার ডেকে আনো।'(১১ সুরা হুদ : আয়াত ১৩)। [একই ধরনের দাবি সুরা বাকারা'র ২৩ নং আয়াতে রয়েছে : 'আমি আমার দাসের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা তার মতো কোনো সুরা আনো।' এবং সুরা ইউনুসের ৩৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : 'তারা কি বলে, সে (মুহাম্মদ) এ রচনা করেছে? বলো, তবে তোমরা এর মতো এক সুরা আনো, আর যদি তোমরা সত্য কথা বল তবে আল্লাহ ছাড়া অন্য যাকে পারো ডাকো।'এ-ধরনের চ্যালেঞ্জ এক ধরণের বালখিল্যতা, এবং তা যুক্তির হেত্বাভাসের মধ্যে পড়ে। প্রথমত, কোরানের মতো সুরা যাচাই করার পন্থা বা বৈশিষ্ট্যাবলী কি হবে, এ-বিষয়ে কোরানে কিছু বলা হয়নি। কেউ যদি কোরানের মতো সুরা রচনা করতে চান, তবে কোন কোন নির্দেশক দিয়ে পরিমাপন করা হবে ঐ সুরা আদৌ কোরানের মতো বা এর সমতুল্য হয়েছে কি-না, বা তার শ্রেষ্ঠত্ব কিভাবে নির্ধারণ করা হবে? কোরানে এ-বিষয়ের কোনো

উত্তর পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, কোরান গদ্যছন্দে রচিত অনন্য গ্রন্থ। কোরানের মতো সুরা বলতে আসলে কী বোঝানো হয়েছে? কোরানের মতো সুরা যদি কেউ লিখেন সেটা স্বাভাবিকভাবে কোরান হবে না। সেটা ভিন্ন হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ওমর খৈয়ামের বিশ্ববিখ্যাত কবিতা বা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যের ভাষাজ্ঞান, রচনাশৈলীকে অনুকরণে কেউ কোনো কিছু রচনা করলেও এগুলো মোটেও খৈয়াম বা রবীন্দ্রের সাহিত্য বলে গণ্য হবে না। কারণ তাঁদের রচনা সাহিত্যের জগতে সর্বজনস্বীকৃত অনন্য সৃষ্টি। তেমনি কোরান, তৌরাত, জবুর, ইঞ্জিল, গীতাও এরকম একেকটি অনন্য গ্রন্থ। এগুলোর সাহিত্যমান নিয়ে তুলনা করা, শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করা জটিল ও দুঃসাধ্য। তৃতীয়, সাহিত্যের দুটি বিষয়ের তুলনা অনেকাংশে আপেক্ষিক। একেক জনের কাছে একেক রকম মনে হতে পারে। হতে পারে বাংলাভাষী কোনো ব্যক্তির দৃষ্টিতে রবীন্দ্র-সাহিত্য হচ্ছে সাহিত্যের মানদণ্ড। একে মাপকাঠি ধরে অন্য সাহিত্য বিচার করা হয়। আবার অন্যের কাছে রবীন্দ্র-সাহিত্য সনাতন-ঘরানার মনে হতে পারে। আধুনিক, উত্তর-আধুনিক সাহিত্যগুলোর বৈশিষ্ট্যগুলোকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক মনে করতে পারেন তুলনামূলক বিচারের জন্য। আবার কারো কাছে গ্রিক কবি হোমারের ইলিয়ড, ওডিসি হচ্ছে অসাধারণ মহাকাব্য আবার কারো কাছে সেকেলে ধরনের লোকগাঁথা মনে হতে পারে। ইংরেজ সাহিত্যিক শেক্সপিয়ের, শেলির সাহিত্য সম্পর্কেও এরকম মূল্যায়ন হতে পারে। এ-অবস্থায় অত্যন্ত স্পর্শকাতর 'ধর্মগ্রন্থ' এর বাণীকে সাহিত্যমান অনুযায়ী বিচার করাটা আপেক্ষিক ও জটিল বিষয়। পঞ্চমত, সময়ের সাথে সাথে ভাষার পরিবর্তন ঘটে। বাক্য গঠন, ভাবের প্রকাশ, শব্দসম্ভার, শব্দের বানান, ব্যবহার, উচ্চারণসহ একাধিক রূপ এবং ব্যাকরণগত পরিবর্তন ঘটে থাকে। এই পরিবর্তন কোনো ভাষার জীবনীশক্তি এবং প্রবহমানতার বহিঃপ্রকাশ। একবিংশ শতকের কোনো ব্যক্তির পক্ষে চাইলে চর্যাপদ-যুগের সাহিত্য রচনা করা সম্ভব নয়। তেমনি হাজার ধরে আরবি ভাষাতেও পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধিত হয়ে চলছে। তাই বর্তমানকালে রচিত কোনো সুরা ও কোরানের সুরার মধ্যে ভাষাগত, সাহিত্যমানগত পার্থক্য থাকবেই। ফলে এই দুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের তুলনা করা বা এরূপ কোনো মূল্যায়ন অনর্থক।-অনুবাদক]। মক্কার পৌত্তলিকদের তরফ থেকে কোরান কাল্পনিক কাহিনীতে পরিপূর্ণ বলে আরেকটি অভিযোগ ছিল। 'আর কেউ যখন তাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে, 'আমরা তো শুনলাম, ইচ্ছা করলে আমরাও এরকম বলতে পারি, এ তো শুধু সেকালের উপকথা।'(সুরা আনফাল : আয়াত ৩১)। আল-তাবারি'র 'দ্যা হিস্ট্রি অব আল-তাবারি' (ভলিউম ৭) গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী, পারস্য দেশ ভ্রমণকারী কুরাইশ গোত্রের বিখ্যাত কবি নদর বিন আল-হারিস (আল-হিরার লাখমিদ রাজার দরবারের রাজকবি ছিলেন একসময়) নবির এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। তিনি 'ফেরদৌসি' নামে সুন্দর একটি কবিতা লিখে গণজমায়েতে পাঠ করে শুনালেন এবং দাবি করেন কোরানে যেভাবে আদ, সামুদ, লুত, নুহ, সাবা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কাহিনী বলা হয়েছে, তার থেকে অনেক সুন্দর করে পারস্যের বিখ্যাত রুস্তম-ইসফানদার এররাজকীয়ও বীরত্বপূর্ণ কাহিনী-গাথা বলতে পারেন।। কবি নদর বিন আল-হারিসকে পরবর্তীতে বদরের যুদ্ধে বন্দী করা হয় এবং নবির আদেশক্রমে আলি বিন আবু তালিব তাঁকে শিরোচ্ছেদ করেন। সুরা বনি-ইসরাইলের ৮৮ নম্বর আয়াতে কবি নদরের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে : 'বলো, 'যদি এ-কোরানের মতো কোরান আনার জন্য মানুষ ও জিন একযোগে পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর মতো আনতে পারবে না।'(১৭:৮৮)।

মুহাম্মদ কোরানকে নিজের নবুওতির সনদপত্র হিসেবে বিবেচনা করতেন। এই কিতাব যে মুহাম্মদ ঐশীগুণে লাভ করেছেন, সে-সম্পর্কে মুসলিম পণ্ডিতগণ একমত। যদিও বাগ্মিতা ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে কোরান কতটুকু অলৌকিক, এ-বিষয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। মুসলিম পণ্ডিতগণ সাধারণভাবে উভয়দিক দিয়ে একে অলৌকিক বলে মনে করেন। কোনো নিরপেক্ষ পর্যালোচনা নয়, বরং কোরানের প্রতি আবেগপূর্ণ গভীর বিশ্বাসই এই মতামতের প্রধান অবলম্বন। এক্ষেত্রে অমুসলিম পণ্ডিতেরা এমন অনেক শক্ত ভিত্তি খুঁজে পেয়েছেন, যেগুলোর উপর দাঁড়িয়ে কোরানের বোধগম্যতা ও বাগ্মিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। কোরানের বক্তব্যের যে ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে সে ব্যাপারে মুসলিম পণ্ডিতেরা আগেই ঐক্যমতে পৌঁছেছেন। বিশিষ্ট তফসিরকারক জালাল উদ্দিন আল-সুয়ুতি (১৪৪৫-১৫০৫ খ্রিস্টাব্দ) রচিত 'কিতাব আল ইতকান ফি উলুম আল-কোরান'[২৮] এর একটি পুরো অধ্যায় এই বিষয়ে

রচিত। শুধুমাত্র উসমানীয় যুগের সংকলিত-সম্পাদিত কোরানের মূল অংশের সমালোচনামূলক সংশোধনের মাধ্যমে পাঠ্যাংশের ক্রমান্বয়িকতার ভুল বিন্যাসই নয়, কোরানের ভাষারীতিও অনেক ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করে।

মুসলিম পণ্ডিতদের মাঝে ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং অত্যুক্তি চেপে বসার আগে ইব্রাহিম আন-নাজ্জামের[২৯] (৭৭৫-৮৪৫ খ্রিস্টাব্দ) মতো অনেক মুতাজিলা দার্শনিক প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন কোরানের বিন্যাস ও বাক্যগঠন অলৌকিক কিছু নয় এবং অন্য কোনো খোদাভীরু মানুষের পক্ষে একই ধরনের কাজ কিংবা এর থেকেও বেশি সাহিত্যমানসমৃদ্ধ কাজ করা সম্ভব। নাজ্জাম বলেন, 'ভাগ্যগণনাকারীদের ভবিষ্যদ্বাণীকে যে অর্থে অলৌকিক হিসেবে বলা হয়, কোরান সে অর্থে অলৌকিক নয়। তবে পূর্বে সংঘটিত ঘটনাসমূহের সঠিক পরিণামদর্শী হিসেবে কোরানকে অলৌকিক বলা যেতে পারে। পারস্যের ধর্মতাত্ত্বিক এবং একসময়ের মুতাজিলাপন্থী ইবনে ইসহাক আল-রাওয়ানদি'র[৩০] (৮২৭-৯১১ খ্রিস্টাব্দ) মতে, নাজ্জামের এই উক্তিগুলো প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী। আব্দুল কাদের আল-বাগদাদি (মৃত্যু ৪২৯ হিজরি বা ১০৩৭ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর 'কিতাবুল-ফারক্ বায়নাল-ফিরাক' বইয়ে (এখানে বিভিন্ন ধর্মীয়-সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে) নাজ্জামকে দোষারোপ করার জন্য 'ধর্মদ্রোহিতাকে' অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আল-বাগদাদির মতে নাজ্জামের বক্তব্য কোরানের সুরা বনি-ইসরাইলের ৮৮ নম্বর আয়াতের সুস্পষ্ট বিরোধী, যেখানে বলা হয়েছে, 'কোরান সর্বদাই অ-অনুকরণীয়, মানুষ এবং জিনেরা যৌথভাবে চেষ্টা করলেও একে অনুকরণ করতে পারবে না।'

নাজ্জামের শিষ্য ও মৃত্যুপরবর্তী গুণগ্রাহীরা, যেমন ইবনে হাজম[৩১] এবং আল-খাইয়াত[৩২] নাজ্জামকে সমর্থন করে কলম ধরেছেন। শীর্ষস্থানীয় মুতাজিলাপন্থী অনেক ইসলামি চিন্তাবিদ নাজ্জামের যুক্তিগুলো প্রচার করেছেন। তারা নাজ্জামের দর্শনের সাথে কোরানের বক্তব্যের কোনো বিরোধ খুঁজে পাননি। তাদের অনেকগুলো যুক্তির মাঝে একটি ছিল, আল্লাহ নবি মুহাম্মদকে কোরানের অনুরূপ আয়াত তৈরির ক্ষমতা দেননি, তবে অন্য যেকোনো সময়ে এবং স্থানে কোরানের আয়াতের অনুরূপ শব্দাবলি তৈরি করা সম্ভব এবং তা এমন কোনো কঠিন কাজ নয়। ধারণা করা হয় সিরিয়ার প্রখ্যাত অন্ধকবি আবু আল আলা আল-মারি (৯৭৩-১০৫৮ খ্রিস্টাব্দ) 'আল-ফুসুল ওয়া আল-গায়াত' নামের ছড়াধর্মী ধর্মব্যাখ্যানটি (যার একটি অংশ আজও অবশিষ্ট আছে) কোরানের ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণে রচনা করেছেন।

কোরানের বাক্যসমূহ অসম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণভাবে বোধগম্য হবার ক্ষেত্রে এগুলির ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। এতে অনেক বিদেশি শব্দ, অপ্রচলিত আরবি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং অনেক শব্দ রয়েছে যেগুলোকে স্বীয় সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। লিঙ্গ এবং সংখ্যার অন্বয়সাধন না করে বিশেষণ এবং ক্রিয়াপদের ধাতুরূপ করা হয়েছে। অনেক সময় সংশ্লিষ্টতা নেই এমন অপ্রয়োজনীয় ও ব্যাকরণগতভাবে ভুল সর্বনাম পদ ব্যবহার করা হয়েছে এবং ছন্দবদ্ধ অনুচ্ছেদসমূহে এমন অনেক বিধেয় পদ ব্যবহার করা হয়েছে যার সাথে সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে আলোচ্য মূল বিষয়ের সাথে এগুলোর কোনো মিল নেই। ফলে ভাষাগত এমন অনেক অগ্রহণযোগ্য বিষয়াদি কোরানের সমালোচকদের (যারা কোরানের বোধগম্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেন) সমালোচনার সুযোগ করে দিয়েছে। এই সমস্যাগুলো নিষ্ঠাবান মুসলমানদের মনেও যথেষ্ট প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। ফলে কোরানের তফসিরকারকরা কোরানের বক্তব্যের ব্যাখ্যা খুঁজতে বাধ্য হয়েছেন। কোরান অধ্যয়নের ক্ষেত্রে মতভিন্নতার পিছনে যেসব কারণ রয়েছে, এ বিষয়টি তাদের মধ্যে অন্যতম।

যেমন সুরা মুদদাসসির-এর প্রথম আয়াতের কথা উল্লেখ করা যায় : 'ওহে, তুমি যে কিনা নিজেকে চাদরে ডেকে রেখেছ।' এখানে 'চাদরে ডেকে রাখা' বা 'চাদরাবৃত'- এর গ্রহণযোগ্য আরবি শব্দ হচ্ছে 'মুদদাসসির'। কিন্তু বহুল প্রচলিত একটি মতানুযায়ী এটি হওয়া উচিত 'মুতাদাসসের'। তেমনি সুরা মুজ্জাম্মিলের প্রথম আয়াত : 'ওহে, তুমি যে কিনা নিজেকে চাদরে জড়িয়ে রেখেছ!' এই 'চাদরাবৃত' বা 'চাদরে জড়িয়ে থাকা' শব্দটি আরবি কোরানে 'মুজ্জাম্মিল' পাঠ করা হয়, কিন্তু প্রচলিত

মতানুযায় এটি হওয়া উচিৎ 'মুতাজাম্মিল'। সুরা নিসা'র ১৬২ নম্বর আয়াত: 'কিন্তু তাদের মধ্যে যারা স্থিতপ্রজ্ঞ তারা ও বিশ্বাসীরা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও বিশ্বাস করে এবং যারা নামাজ পালনকারী, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে আমি তাদেরকে বড় পুরস্কার দেব।' এখানে 'পালনকারী' শব্দটি কোরানের এই আয়াতে কর্মকারকে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু আস্থা-স্থাপনকারী, বিশ্বাসী, ঋণপরিশোধকারী শব্দগুলো যে 'নিয়মাত্মক' রূপে ব্যবহার করা হয়, তা সেই অর্থে ব্যবহার করা ব্যাকরণসম্মত। সুরা হুজুরাত-এর ৯ নম্বর আয়াত : 'বিশ্বাসীদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তুমি তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবে...।' কোরানের এই আয়াতটিতে উল্লেখিত 'দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে' ক্রিয়াপদটি বহুবচন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু এটি বক্তব্য অনুযায়ী শুধুমাত্র 'দ্বিপক্ষীয়' অর্থে ব্যবহার করা উচিত ছিল। সুরা বাকারা-এর ১৭৭ নম্বর আয়াত : 'পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোনো পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, সব কিতাব ও নবিদের উপর বিশ্বাস করলে...।' এই আয়াতটিতে জেরুজালেম থেকে মক্কার দিকে প্রার্থনার দিক পরিবর্তন করার ফলে ইহুদিদের কাছ থেকে যে প্রশ্ন উঠেছিল সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। ভাষাশৈলীর দিক দিয়ে অসাধারণ হলেও আয়াতটিতে আভিধানিক জটিলতা রয়েছে। তফসির আল-জালালাইনের মন্তব্য হচ্ছে আয়াতের দ্বিতীয় অংশে 'পুণ্য'(বা সৎকর্ম, ন্যায়নিষ্ঠা)-এর আরবি শব্দ হিসেবে 'বের'ব্যবহৃত হয়েছে, যার আসল অর্থ হচ্ছে 'পুণ্যবান ব্যক্তি'। বিশিষ্ট ব্যাকরণবিদ মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদ আল-মুবাররাদের (মৃত্যু : হিজরি ২৮৫ বা ৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ) মতে, এই আয়াতে ব্যবহৃত 'বের'শব্দটি আসলে 'বার' (ধার্মিক বা পুণ্যবান ব্যক্তি) হিসেবে উচ্চারণ করা উচিত। এটি 'বের' শব্দের গ্রহণযোগ্য একটি প্রকরণ। মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদের এই মন্তব্যের কারণে তৎকালীন কট্টরপন্থীরা তাঁর ধর্মবিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং কোরান-বিরোধিতার অভিযোগ তুলে কুৎসা প্রচার করেছিলেন।

সুরা তাহা-এর ৬৩ নম্বর আয়াতটিতে নবি মুসা ও তাঁর ভাই হারুন সম্পর্কে ফেরাউনের লোকদের মন্তব্য প্রকাশ পেয়েছে : 'ওরা বলল, 'এরা দুজন নিশ্চয় জাদুকর, তারা জাদুবলে তোমাদেরকে দেশ থেকে তাড়াতে চায়। এবং তোমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে একেবারে নস্যাৎ করতে চায়।' (২০:৬৩)। 'এরা দুজন জাদুকর' বলতে ফেরাউনের লোকেরা নবি মুসা ও তাঁর ভাই হারুনকে বুঝিয়েছে। এক্ষেত্রে 'এরা দুজন'শব্দ দুটির ক্ষেত্রে কোরানে আরবি 'হাদানে' শব্দটি নিয়মাত্মকরূপে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু এটা এখানে কর্মকারকে (হাদায়নে) হওয়া উচিত ছিল। কারণ তা একটি পরিচিতিমূলক বর্ণনা অংশের পর এসেছে। কথিত আছে যে খলিফা উসমান এবং নবির বিবি আয়েশা এই আয়াতে 'হাদানে' না বলে 'হাদায়নে' পাঠ করতেন। কট্টরপন্থীদের মত অনুযায়ী, 'কোরান আল্লাহর বাণী। এখানে কোনো ভুল থাকতে পারে না। এখানে মুসলমানদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ আছে। খলিফা উসমান এবং বিবি আয়েশা 'হাদানের' স্থলে 'হাদায়নে' ব্যবহার করতেন তা মিথ্যে এবং দূরভিসন্ধিমূলক।' তফসির আল-জালালাইনের মন্তব্য হচ্ছে, 'আয়াতটিতে এই দ্বৈতবিভক্তি তিনটি ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়েছে। নিয়মাত্মক ও কর্মকারক উভয় ক্ষেত্রেই 'আয়ন' হিসেবে উচ্চারিত হবার প্রয়োজন নেই।' যদিও বিশিষ্ট ভাষাবিদ এবং কোরান-বিশেষজ্ঞ আবু আমর বিন আল-আলা (মৃত্যু হিজরি ১৫৪ বা ৭৭০ খ্রিস্টাব্দ) খলিফা উসমান এবং বিবি আয়েশার মতোই এই আয়াতে 'হাদায়নে' উচ্চারণ করতেন।

সুরা নুর-এর ৩৩ নম্বর আয়াতের একটি মনুষ্যোচিত এবং অভিবাদনীয় নির্দেশ থেকে তৎকালীন সময়ে প্রচলিত নির্দয় এবং অমানবিক একটি আচরণের পরিচয় মেলে : '. . . তোমাদের দাসীরা সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে, পার্থিব জীবনের টাকা-পয়সার লোভে তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করো না। তবে কেউ যদি তাদেরকে বাধ্য করে, তাদের ওপর সেই জবরদস্তির জন্য আল্লাহ তো তাদেরকে ক্ষমা করবেন, দয়া করবেন।'তৎকালীন আরব-সমাজে দাসী-মালিক যারা নিজেদের দাসীদেরকে দিয়ে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করত এবং উপার্জিত অর্থ নিজেদের পকেটে রাখত, এই আয়াতে সুস্পষ্টভাবে তাদেরকে এ-কাজ থেকে নিবৃত্ত হতে বলা হয়েছে। আয়াতের প্রথম বাক্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক এই কাজে প্রবৃত্ত

হওয়ার কারণে আল্লাহ এই দাসীদের ক্ষমা করে দেবেন। তবে আয়াতের উপসংহারের বাক্য থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যেসব ব্যক্তি নিজেদের দাসীদের পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করে, আল্লাহ সেই ব্যক্তিদের প্রতি দয়া ও করুণা করেছেন। এই প্রচ্ছন্ন বাক্যটি থেকে প্রকৃত অর্থে মহানুভবতার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। কোরান সম্পর্কে মুতাজিলা দার্শনিক ইব্রাহিম আন-নাজ্জামের মতামত পূর্বে বলা হয়েছে। তিনি শুধু একা নন, মুতাজিলা দার্শনিক হিশান বিন আমর আল-ফুয়াতি (মৃত্যু হিজরি ২১৮ বা ৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ) এবং আব্বাস বিন সোলায়মানের (মৃত্যু হিজরি ২৫০ বা ৮৬৪ খ্রিস্টাব্দ) মতো আরও অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি রয়েছেন যারা একইমত পোষণ করতেন। তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন নিষ্ঠাবান ধার্মিক। তারা নিজেদের যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং একনিষ্ঠ বিশ্বাসের মধ্যে কোনো পার্থক্য তৈরি করতেন না।

প্রভাবশালী আরব মনীষী আবুল-আলা আল-মারি তাঁর নিজের কিছু লেখাকে কোরানের সমতুল্য বলে মনে করতেন। সারকথা হচ্ছে, কোরানে আরবি ভাষার সাধারণ নিয়মাবলী ও গঠনশৈলী থেকে অন্তত একশটি বিচ্যুতি লক্ষ করা যায়। বলা বাহুল্য, কোরানের তফসিরকারকদের এই অসংলগ্নতাগুলোকে ব্যাখ্যা এবং সমর্থনীয় করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। তাঁদেরই একজন হচ্ছেন পারস্যের বিখ্যাত ইসলামি পণ্ডিত ও ভাষাবিদ এবং 'জার-আল্লাহ' (আল্লাহর প্রতিবেশি) খেতাবে ভূষিত আল-জামাখশারি, পুরো নাম আবু আল-কাশিম মাহমুদ ইবনে উমর আল-জামাখশারি (জন্ম হিজরি ৪৬৭ বা ১০৭৫ খ্রিস্টাব্দ-মৃত্যু হিজরি ৫৩৮ বা ১১৪৪ খ্রিস্টাব্দ) যার সম্পর্কে একজন মুরীয় (উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার আরব মুসলমান) লেখক বলেছেন, 'ব্যাকরণ-অনুরাগী এই তাত্ত্বিক একটি গুরুতর ভুল করেছেন। আরবি ব্যাকরণের সাথে মিল রেখে কোরান পড়ানো আমাদের দায়িত্ব নয়। বরং আমাদের উচিত সম্পূর্ণ কোরান যেভাবে আছে সেভাবে একে গ্রহণ করা এবং আরবি ব্যাকরণকে এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা।'

একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত দাবিটি সমর্থনযোগ্য। একটি জাতির শ্রেষ্ঠ বক্তা এবং লেখকেরা মাতৃভাষার ব্যাকরণগত নিয়মাবলীকে সম্মান করেন এবং ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে জনসাধারণের কাছে দুর্বোধ্য এবং অগ্রহণযোগ্য শব্দাবলী ব্যবহার থেকে বিরত থাকেন। যদিও অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে শব্দচয়ন তাদের জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। প্রাক-ইসলামি যুগে আরবে যথেষ্ট পুঁথিশাস্ত্র-কাব্য-লোকগাঁথা রচিত হয়েছে এবং ব্যাকরণের কাঠামোও দাঁড়িয়ে ছিল। মুসলমানদের কাছে ইসলাম-পূর্ববর্তী সকল সাহিত্য-রচয়িতার সৃষ্টিকর্ম থেকে উৎকৃষ্ট যে কোরান, একে অবশ্যই ব্যাকরণের সাথে সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

তথাপি ওই মুরীয় লেখক কর্তৃক জামাখশারি'র নিন্দা, লেখকের বক্তব্যকেই পাল্টা সমালোচনার একটি ভিত্তি করে দিয়েছে। কারণ লেখকের বক্তব্য প্রচলিত দাবিকেই উল্টিয়ে দেয়। আর এই দাবিটি হচ্ছে কোরান আল্লাহর বাণী। কোরানের একটি ভক্তি সৃষ্টিকারী মাধুর্যপূর্ণ বাগ্মিতা রয়েছে, যা সকল মানুষের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। যে ব্যক্তির মাধ্যমে কোরান অবতীর্ণ হয়েছে, সঙ্গত কারণেই তিনি একজন নবি। মুরীয় লেখকের মতে, কোরান ভুলভ্রান্তিহীন যেহেতু তা আল্লাহর বাণী এবং এতে ব্যাকরণগত যেসব ভুল রয়েছে সেগুলো আরবি ব্যাকরণের নিয়মাবলী পরিবর্তনের মাধ্যমেই সংশোধন করতে হবে। অন্যকথায়, সংশয়ী বা অবিশ্বাসীদের প্রশ্নের উত্তরে মুহাম্মদের নবুওতিকে প্রমাণ করতে যেখানে অধিকাংশ মুসলিম কোরানের বাগ্মিতাকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন, মুরীয় লেখক সেখানে কোরানের স্বর্গীয় উৎপত্তি ও মুহাম্মদের নবুওতিকে স্বীকার করে সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে, কোরানের বিষয়বস্তু এবং শব্দাবলী সম্পর্কিত আলোচনা গ্রহণযোগ্য নয়।

একই সাথে বলা যায়, কোরান আসলেই স্বতন্ত্র এবং অসাধারণ। প্রাচীন আরবের প্রথমদিকের সাহিত্যে এর মতো কোনো দৃষ্টান্ত চোখে পড়েনি। মক্কায় অবতীর্ণ সুরাগুলোয় আমরা অনেক আগ্রহোদ্দীপক এবং চিত্তাকর্ষক কাব্যিক অনুচ্ছেদ দেখতে পাই। এগুলো থেকে নবির চিন্তাশক্তি এবং বক্তৃতা দেবার সহজাত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাঁর মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। একটি চমৎকার উদাহরণ হতে পারে সুরা নজম। যদি আমরা এখান থেকে ৩২ নম্বর আয়াতটি উহ্য

রাখি যা মদিনায় অবতীর্ণ হলেও কোনো এক অজানা কারণে খলিফা ওসমান এবং তার সংগ্রাহকগণ এই আয়াতকে মক্কি সুরার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

জেরুজালেমের বালিকাগণ, যাদের স্তন গিলিয়াদ পর্বতের ছাগলের ন্যায় শুভ্র, তাদের সাথে কাটানো সময়ের উল্লেখ ব্যতিরেকে সলোমনের গানের একটি চিত্রকল্পীয় হৃদয়গ্রাহী স্মৃতিচারণের মাধ্যমে সুরা নজম উল্লাসের সাথে প্রচারক হিসেবে মুহাম্মদের ভূমিকা ও তাঁর পয়গম্বরীয় ঔজ্জ্বল্য এবং দূরদৃষ্টি ব্যাখ্যা করেছে। যদিও আরবি ভাষার এই শব্দের ঐক্যতান, ছন্দ এবং সৌন্দর্য্য স্বাভাবিকভাবেই অন্য ভাষায় প্রকাশ করা যথেষ্ট কঠিন, তারপরও সুরা নজমের প্রথম ১৮টি আয়াত নিম্নে উল্লেখিত অনুবাদের মাধ্যমে মুহাম্মদের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিসত্তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার খানিকটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় :

শপথ অস্তমিত নক্ষত্রের, তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, পথভ্রষ্টও নয়,

আর সে নিজের ইচ্ছেমতো কোনো কথা বলে না।

এ প্রত্যাদেশ, যা (তার ওপর) অবতীর্ণ হয়।

তাকে শিক্ষা দেয় এক মহাশক্তিধর[৩৩]*।*

বুদ্ধিধর (জিবরাইল) আবির্ভূত হল, ঊর্ধ্বে দিগন্তে।

তারপর সে তার কাছে এলো খুব কাছে

যার ফলে তাদের দুজনের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল।

তখন তিনি তাঁর দাসের প্রতি যা প্রত্যাদেশ করার তা প্রত্যাদেশ করলেন।

সে যা দেখছিল তার হৃদয় তা অস্বীকার করেনি।

সে যা দেখেছিল তারা কি সে-সম্বন্ধে তর্ক করবে?

নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার দেখেছিল,

শেষ সীমান্তে অবস্থিত সিদরা গাছের নিকট

যার কাছেই ছিল জান্নাতুল মাওয়া।

তখন সিদরা গাছটা ছেয়ে ছিল যা দিয়ে ছেয়ে থাকে।

তার দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি বা দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি।

সে তার মহান প্রতিপালকের নিদর্শনগুলো নিশ্চয় দেখেছিল। (৫৩:১-১৮)।

পরামর্শ গ্রহণের জন্য মানুষের কাছে অনেক পথই খোলা রয়েছে এবং সুরা নজমে পরবর্তীতে আল্লাহ নবিকে এ বিষয়টির সাথে পরিচয় করিয়ে দেন: 'অতএব যে আমাকে স্মরণ করতে বিমুখ তাকে উপেক্ষা করে চলো; সে তো কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে। ওদের জ্ঞানের দৌড় তো ঐ পর্যন্ত। তোমার প্রতিপালক নিশ্চয় ভালো জানেন কে তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট; আর তিনিই ভালো জানেন কে সৎপথ পেয়েছে।'(৫৩: ২৯-৩০)।

শোনা যায়, মুহাম্মদের চাচা আবু লাহাবের পত্নী উম্মে জামিল একদিন নবির কাছে গিয়ে বিদ্রুপ করে বললেন, 'আমরা আশা করছি তোমার ভেতরের শয়তান তোমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে।'এটি ছিল বাণী নাজিলে বিঘ্ন হবার সময়কালীন ঘটনা। সে-সময় নবি এতোটাই নিরাশ এবং মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ছিলেন যে, পাহাড়চূড়া থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যার কথা পর্যন্ত ভেবেছিলেন। ধারণা করা হয় সুরা দোহা নাজিলের সময়ও এই বিঘ্ন ঘটেছিল, তবে এই সুরাটিও খুবই শ্রুতিমধুর :

শপথ দিনের প্রথম প্রহরের! আর শপথ রাত্রির যখন তা আচ্ছন্ন করে!

তোমার প্রতিপালক তোমাকে ছেড়ে যাননি ও তোমার ওপর তিনি অসন্তুষ্ট নন।

তোমার জন্য পরকাল ইহকালের চেয়ে ভালো।

তোমার প্রতিপালক তো তোমাকে অনুগ্রহ করবেনই, আর তুমিও সন্তুষ্ট হবে।

তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পাননি, আর তোমাকে আশ্রয় দেননি?

তিনি কি তোমাকে ভুল পথে পেয়ে পথের হদিস দেননি?

তিনি তোমাকে কি অভাবী দেখে অভাবমুক্ত করেননি?

সুতরাং তুমি পিতৃহীনদের প্রতি কঠোর হয়ো না;

আর যে সাহায্য চায় তাকে ভর্ৎসনা করো না,

আর তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করো। (৯৩:১-৯)।

কোরানের প্রতি সুবিচার করলে স্বীকার করতে হবে এটা অবশ্যই বিস্ময়কর। মক্কায় নাজিলকৃত অপেক্ষাকৃত ছোট সুরাগুলোর কাব্যিক ভাব ব্যক্ত করার জাদুকরি ক্ষমতা রয়েছে এবং সেই সাথে বিশ্বাসের প্রেরণাদায়ক। সুরায় ব্যবহৃত ভাষাশৈলীর কোনো নজির আরবি ভাষায় এর পূর্বে দেখা যায়নি। একজন মানুষ যিনি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেননি, তার মুখ থেকে ভাবের এমন বহিঃপ্রকাশ সত্যিই বিস্ময়কর। এদিক থেকে বিবেচনা করলে, কোরানকে অলৌকিক হিসেবে গণ্য করা সমর্থনযোগ্য।

তবে অনেক বিশেষজ্ঞ মুহাম্মদকে 'নিরক্ষর' মানতে রাজি নন। তাঁদের মতে কোরানে ব্যবহৃত 'উম্মি' শব্দটির অর্থ আসলে নিরক্ষর নয়, বরং 'ইহুদি নয় এমন ব্যক্তি'র কথাই বুঝানো হয়েছে। তাঁরা বক্তব্যের সপক্ষে কোরানে উল্লেখিত পৌত্তলিক, অ-ইহুদি, এবং অ-খ্রিস্টান আরবদের উদাহরণ দেখিয়েছেন। এই 'অ-ইহুদি'শব্দটি কোরানের সুরা জুম্‌আ'র আয়াত ২-এ ব্যবহৃত হয়েছে এভাবে: 'ইনিই সেই ব্যক্তি যাকে অ-ইহুদিদের মধ্য থেকে নবি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।' এরকম উদাহরণ কোরানের আরও কয়েকটি আয়াতে দেখতে পাওয়া যায়, যেমন : সুরা বাকারা : আয়াত ৭৫; সুরা ইমরান : আয়াত ২০ ও ৭০;

সুরা আ'রাফ : আয়াত ১৫৭-১৫৮। তথাপি প্রচলিত ধারণা, তথ্য এবং সে যুগের প্রথাসমূহের উপর নির্ভর করে সাধারণভাবে এটা বিশ্বাস করা হয় যে, মুহাম্মদ লিখতে জানতেন না, যদিও শেষ জীবনে হয়তো দু'একটি শব্দ পড়তে পারতেন। কোরানে যেমন বলা হয়েছে: 'তুমি তো এর পূর্বে কোনো কিতাব পড়নি, বা নিজ হাতে কোনো কিতাব লেখনি যে মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ করবে!' (সুরা আনকাবুত : আয়াত ৪৮)। 'ওরা বলে, 'এগুলো তো সেকালের উপকথা যা সে লিখিয়ে নিয়েছে। এগুলো সকাল-সন্ধ্যা তাঁর কাছে পাঠ করা হয়।'(সুরা ফুরকান : আয়াত ৫)। কোরানের এই আয়াতগুলো থেকে বিশ্বাস করা হয় যে, নবি মুহাম্মদ লিখতে-পড়তে জানতেন না, এটা পৌত্তলিকরা ধারণা করত। [নবি মুহাম্মদ লিখতে-পড়তে জানতেন না, এ-বিষয়ে ইসলামের ইতিহাস ও হাদিসে প্রচুর ভিন্নতথ্য রয়েছে। পশ্চিমের অনেক ইসলাম-বিশেষজ্ঞ যেমন ফরাসি মার্কসবাদী ইতিহাসবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্সিম রডিনসন এবং স্কটিস ইতিহাসবিদ উইলিয়াম মন্টোগমেরি'র মতে নবি মুহাম্মদ নিরক্ষর ছিলেন না। তাঁদের মতে, কোরানে নবিকে একেবারে নিরক্ষর বা লিখতে-পড়তে জানেন না বলে বোঝানো হয়নি বরং শুধু বোঝানো হয়েছে নবি ইতিপূর্বে ইহুদি-খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ (তৌরাত, ইঞ্জিল) পাঠ করেননি। পশ্চিমা পণ্ডিতরা তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে সুরা আনকাবুতের ৪৮ নম্বর আয়াত হাজির করেন। তাঁদের মতে এই আয়াতে কিতাব বলতে ইহুদি-খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থের কথা বোঝানো হয়েছে। আবার নবি মুহাম্মদের জীবনীকারক সকলেই জানিয়েছেন, ইসলামের পূর্ব থেকে মক্কা ছিল বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি এবং নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে ছোটবেলা থেকে একাধিকবার নবি বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে মক্কার বাইরে গিয়েছেন। সেই বহির্বাণিজ্যে তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার ছাপ রেখেছিলেন। একজন বণিকের যদি সামান্য অক্ষর জ্ঞান না থাকে এবং হিসাব-নিকাশ চালানোর মতো গণনা দক্ষতা না থাকে তাহলে বাণিজ্যে দক্ষতা অর্জন করা কঠিন। লেখা- পড়া জানা বিবি খাদিজা প্রথমে মুহাম্মদকে বাণিজ্যে দক্ষতার কারণে মুগ্ধ হয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিচালকরূপে নিয়োগ দিয়েছিলেন, যা পরবর্তীতে তাঁদের মধ্যে পরিণয়ের দিকে সম্পর্ক গড়ায়। খাদিজার মতো একজন ব্যবসায় সফল-অভিজ্ঞ রমণী তাঁর ব্যবসার বৈদেশিক দায়িত্ব একজন নিরক্ষর ব্যক্তির ওপর ছেড়ে দিবেন কেন? এছাড়া প্রচুর হাদিসেও রয়েছে : (১) উসরা হতে বর্ণিত, ছয় বছরের আয়েশার সাথে বিয়ের কাবিন রসুল মুহাম্মদ নিজেই লিখেছেন। (দ্রষ্টব্য : বুখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬২, নম্বর ৮৮)। (২) ইয়াজিদ ইবনে আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, একটি লোকের হাতে লাল চামড়ায় আল্লাহর রসুলের পক্ষ থেকে কিছু বক্তব্য লেখা ছিল বানু জুহাইর ইবনে উকাইশের জন্য। বক্তব্য হচ্ছে : 'তোমরা যদি অন্য কোনো ঈশ্বর বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহকে মেনে নাও, মুহাম্মদকে আল্লাহর রসুল বলে স্বীকার করো, জাকাত দাও, নামাজ পড়ো তবে আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের কাছ থেকে নিরাপত্তা পাবে।' এরপর লোকটিকে জিজ্ঞেস করা হল, এই বার্তা কে লিখে দিয়েছে? লোকটি উত্তর দিল 'আল্লাহর রসুল'। (দ্রষ্টব্য : আবু দাউদ শরিফ, বুক ১৯, নম্বর ২৯৯৩)। (৩) আল বারা হতে বর্ণিত, নবি ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গেলে তাঁকে ঢুকতে দেয়া হয়নি, যতক্ষণ না তিনি রাজি হন মক্কাবাসীর সাথে একটি চুক্তি করতে। তিন দিন অপেক্ষার পর তিনি শান্তি চুক্তি করতে রাজি হলেন। চুক্তিতে লেখা হলো 'আল্লাহর নবি মুহাম্মদের (দঃ) পক্ষ হতে...।'মক্কার লোকেরা প্রতিবাদ করে উঠলেন। তারা মুহাম্মদকে 'আল্লাহর নবি'বলে স্বীকার করতে চাইলেন না। বললেন, মুহাম্মদ, আব্দুল্লাহর পুত্র, এটাই লেখা হোক। এ নিয়ে দ্বন্দ্বে যখন চুক্তি প্রায় ভেঙ্গে যাবার উপক্রম তখন মুহাম্মদ হজরত আলিকে নির্দেশ দিলেন, চুক্তিপত্র হতে 'আল্লাহর নবি'শব্দ কেটে দিতে। কিন্তু আলি রাজি না হওয়ায় মুহাম্মদ চুক্তিপত্র হাতে নিয়ে নিজ হাতে কেটে দিলেন এবং 'আল্লাহর নবি' শব্দটির বদলে যোগ করলেন 'আব্দুল্লাহর পুত্র'। (দ্রষ্টব্য : বুখারি শরিফ, ভলিউম ৫, বুক ৫৯, নম্বর ৫৫৩)।-অনুবাদক]।

কোরানকে বিষয়বস্তুগত কারণে অনেকে অলৌকিক মনে করেন। এক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে এতে এমন কোনো নতুন ধারণা নেই যা পূর্বে অন্যদের দ্বারা ব্যক্ত হয়নি। কোরানের সকল বক্তব্যই স্বীয়-প্রতিষ্ঠিত এবং সর্বজনস্বীকৃত। কোরানে বর্ণিত কাহিনীসমূহ ইহুদি-খ্রিস্টানদের ধর্মীয় লোক-কাহিনীর অবিকল কিংবা সামান্য পরিবর্তিত রূপ। সিরিয়ার ভ্রমণের সময় মুহাম্মদ এই দুই সম্প্রদায়ের

রাব্বি এবং সন্ন্যাসীদের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের সাথে আলাপচারিতাও করেছিলেন। এছাড়া আদ এবং সামুদ অধিবাসীর বংশানুক্রমে প্রাপ্ত কিছু কাহিনীর সাথে কোরানে বর্ণিত কাহিনীগুলোরও মিল পাওয়া যায়।

নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে নবি মুহাম্মদের মহত্ত্বকে কোনোভাবেই খাটো করা যায় না। একটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অনৈতিক, নিন্দনীয় সমাজ, যেখানে পেশিশক্তি ছাড়া অন্য কোনো আইন কাজ করে না এবং নির্দয়তার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত সেই সমাজের একজন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-বঞ্চিত মুহাম্মদ সাহসিকতার সাথে অসংখ্য মন্দকাজ ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। সেই সাথে অন্যান্য সম্প্রদায়ের পূর্ব-অভিজ্ঞতাসমূহকে পুনঃপুনঃ ব্যক্ত করার মাধ্যমে উচ্চতর আদর্শ প্রচার করেছিলেন।

মুহাম্মদের এই উদ্যোগ তাঁর সহজাত প্রতিভা, আধ্যাত্মিক শক্তি, নৈতিক জ্ঞান ও ভক্তিভাবের পরিচায়ক। একজন কথিত 'নিরক্ষর'ব্যক্তির মুখ থেকে নিঃসৃত সুরা আ'বাসা যেন তাঁরই ব্যাকুল হৃদয়ের স্পন্দন। সুরা আ'বাসা খুবই গীতিময়, সুরালায়িত এবং প্রবল আধ্যাত্মিক, যা হাফিজের[৩৪] কবিতা ছাড়া প্রকাশ করা অসম্ভব। তবে সুরা আ'বাসা এর ১৭-৩৩ আয়াতগুলোয় অসম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে :

মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ।

তিনি তাকে কী থেকে সৃষ্টি করেছেন

তিনি তাকে শুক্র থেকে সৃষ্টি করেন

তারপর তার জন্য পথ সহজ করে দেন, তারপর তার মৃত্যু ঘটান ও তাকে কবরস্থ করেন।

এরপর যখন ইচ্ছা তিনি তাকে পুনর্জীবিত করবেন।

না তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন সে তা পালন করে নি।

মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ করুক,

আমি প্রচুর বারিবর্ষণ করি,

তারপর ভূমিকে বিদীর্ণ করি

এবং তার মধ্যে উৎপন্ন করি

শস্য, আঙুর, শাকসবজি, জয়তুন, খেজুর,

গাছগাছালির বাগান, ফল ও গবাদি খাদ্য।

এ তোমাদের ও তোমাদের আনআমের (চতুষ্পদ প্রাণী) ভোগের জন্য।

যেদিন মহানাদ (কেয়ামত) আসবে, (৮০:১৭-৩৩)।

মূলত অসাধারণ এবং নান্দনিক আধ্যাত্মিক উপদেশের মাধ্যমে মুহাম্মদ তাঁর চারপাশের মানুষকে একটি অপেক্ষাকৃত ভালোপথে চালিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নৈতিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কোরানকে অলৌকিক বলে বিবেচনা করা যাবে না। মুহাম্মদ সেই সকল মূল্যবোধের পুনরাবৃত্তি করেছেন, যেগুলো পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলোয় বিশ্বজুড়ের মানবসমাজের বিভিন্ন স্থানেই উদ্ধৃত হয়েছে। কনফুসিয়াস, বুদ্ধ, জরথ্রুস্ত, সক্রেটিস, মুসা, এবং যিশুও একই ধরনের বা কাছাকাছি মূল্যবোধ প্রচার করেছেন।

কোরানে অনেক আইন ও বিধি রয়েছে যা মুহাম্মদকে ইসলামের আইনপ্রণেতা হিসেবে তুলে ধরে। যে বিষয়টি অবশ্যই মনে রাখা দরকার তা হলো, কোরানে বর্ণিত আইন-কানুন তৈরি হয়েছিল বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর নিমিত্তে এবং নির্যাতিত মানুষের আবেদনের প্রেক্ষিতে। ফলে এই আইনগুলোর মাঝে কিছু অসঙ্গতি রয়েছে এবং বাতিলকারী এবং বাতিলকৃত উভয় বিধিই কোরানে রয়ে গিয়েছে। একথাও ভুললে চলবে না যেইসলামিক আইন-বিধিবিধানগুলো মুসলমান বিশেষজ্ঞদের দীর্ঘকালীন প্রচেষ্টার ফসল, যা ইসলামি যুগের প্রথম তিন শতাব্দীতে তৈরি হয়েছে। কোরানে বর্ণিত আইনগুলো সংক্ষিপ্ত এবং মুহাম্মদের জন্মের দেড়শ বছর পর তৈরি হওয়া বিশাল সংখ্যক মুসলমান জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন মেটানোর জন্য এগুলো পর্যাপ্ত ছিল না।

ইসলামে ‘সিয়াম’(রোজা বা উপবাস) পালনের প্রথা এসেছে ইহুদিদের ধর্ম থেকে। ইসলাম-পূর্ব আরবে আরবি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মহরম মাসের (হিব্রু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ‘তিশরি’ মাস) দশম দিনে ইহুদিরা রোজা রাখতেন। আরবি ভাষায় ‘আশুরার দিন’(হিব্রুভাষায় ‘আশর’) নামে এ-দিবস পরিচিত। ইহুদিদের তৌরাতের ভাষ্যানুযায়ী এ-দিনে ঈশ্বরের আর্শীবাদ নিয়ে নবি মুসা ইসরাইলের সন্তানদের ফেরাউনের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। ইহুদিদের ধর্মে এ-দিনের অনুষ্ঠানের নাম ‘জম কিপার’। ইহুদিরা জম কিপারের সময় প্রায় ২৫ ঘণ্টা উপবাস পালন করেন এবং সিনাগগে গিয়ে প্রার্থনা করেন, দান-খয়রাত করেন। নবি মুহাম্মদের মদিনায় গমনের পরে এবং প্রার্থনার দিক যখন জেরুজালেম থেকে মক্কার দিকে পরিবর্তিত হল, রোজার সময়সীমা তখন একদিন থেকে বেড়ে দাঁড়ালো দশ দিনে, অর্থাৎ মহরম মাসের দশ দিন নামে পরিচিত হলো। পরবর্তীতে মুসলমান ও ইহুদিদের মাঝে যখন চূড়ান্ত বিচ্ছেদ হয় তখন পুরো রমজান মাসকে রোজা পালনের জন্য সংরক্ষণ করা হলো।

প্রতিটি ধর্মে প্রার্থনা প্রচলিত রয়েছে। এক বা একাধিক দেবতার প্রতি ভক্তি নিবেদন এবং বিচার কামনা প্রতিটি ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলাম ধর্মে একজন মুসলমানের সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো প্রার্থনা করা; এবং এই প্রার্থনা ব্যতিক্রমী ইসলামি-পদ্ধতি অনুযায়ী পালন করা হয়। তবে কোরানে গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ে কোনো প্রকার বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া হয়নি। নবি মুহাম্মদের ত্রিশ বছরে মক্কায় অবস্থানকালে এবং মদিনায় হিজরতের প্রথম দেড় বছরে মুসলমানরা ইহুদিদের মতো একই দিক বা অভিমুখে (কিবলা) প্রার্থনা করতেন। যা মূলত জেরুজালেমে অবস্থিত ‘সবচেয়ে দূরের মসজিদ’(বা প্রার্থনাস্থান) হিসেবে পরিচিত ছিল।

মক্কায় মুসলমানদের তীর্থযাত্রা ‘হজ’ প্রতিষ্ঠিত হবার পর আরবের বিভিন্ন জাতীয় প্রথাও প্রতিষ্ঠিত ও চিরস্থায়ী রূপ লাভ করে। হজের (জুলহজ মাসে তীর্থযাত্রা) এবং ‘ওমরা’র সকল অনুষ্ঠানাদি, যেমন সেলাইবিহীন ঢিলেঢালা বস্ত্র পরিধান, কালো পাথরকে চুমু খাওয়া কিংবা স্পর্শ করা, সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে দৌড়ানো, আরাফাতে অবস্থান এবং শয়তানের প্রতি পাথর নিক্ষেপের প্রথা ইসলাম-পূর্ব যুগেও আরবে পৌত্তলিকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং সামান্য কিছু পরিবর্তন সাপেক্ষে এগুলো ইসলামে বজায় থেকেছে।

পৌত্তলিক আরবরা কাবা ঘরকে প্রদক্ষিণকালে লাত, ওজ্জা, মানাতসহ আরও অনেক গোত্র দেবতার নাম উচ্চারণ করত। যেমন ‘হে মানাত, আমি তোমার আদেশ পালন করতে প্রস্তুত’(লাব্বায়েকা) এবং দেবদেবীদের নাম ধরেও উচ্চারিত হতো। ইসলামে এই ধরনের সম্মোধনের রীতি আল্লাহকে সম্বোধন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তা পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায়, ‘লাব্বায়েকা আল্লাহুম্মা লাব্বায়েকা!’

পৌত্তলিক আরবেরা তীর্থযাত্রার মাসে শিকার করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু নবি মুহাম্মদ তীর্থযাত্রার (হজ) যে দিনগুলোতে (ইহরাম) হাজিরা নিজেদেরকে উৎসর্গের জন্য ব্যয় করেন শুধুমাত্র সেই দিনগুলোর জন্য এই নিষেধাজ্ঞাকে বহাল রাখলেন। পৌত্তলিক আরবরা অনেক সময় নগ্ন হয়ে কাবা ঘরকে প্রদক্ষিণ করত। ইসলাম তা নিষিদ্ধ করে সেলাইবিহীন বস্ত্র পরিধানের রীতি প্রচলন করে। পৌত্তলিক আরবদের কোনো কোনো গোত্রে উৎসর্গকৃত প্রাণীর মাংস খাওয়ায় বিধি-নিষেধ ছিল। কিন্তু নবি এই নিষেধাজ্ঞা তুলে দেন।

মক্কা বিজয়ের পর কাবা ঘরে রক্ষিত কুরাইশদের মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করা হয় নবি মুহাম্মদের নির্দেশে এবং মুসলমানরা সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে দৌড়ানোর যে প্রথা প্রচলিত ছিল তা থেকে বিরত থাকেন। কারণ পূর্ববর্তীকালে এই দুই পাহাড়ের চূড়ায় দুজন দেবীর পাথরের প্রতিমা ছিল এবং পৌত্তলিকরা দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তীস্থানে দৌড়ার মাধ্যমে এবং প্রতিমাগুলোকে চুমু দিয়ে কিংবা স্পর্শ করে সৌভাগ্য অর্জনের চেষ্টা করত। যা হোক, এ-বিষয়ে একটি ঐশী বাণী নাজিল হয় : 'নিশ্চয় দুটি পাহাড় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে আল্লাহর ঘরে হজ বা ওমরা করে, তার জন্য এই দুটি প্রদক্ষিণ করলে কোনো পাপ নেই।' (২:১৫৮)। অর্থাৎ কোরানের এই আয়াত সাফা-মারওয়া পাহাড়ের দৌড়কে শুধুমাত্র পাপমুক্তই করল না, একই সাথে এই দুই পাহাড়কে আল্লাহর নিদর্শনকারী হিসেবে ঘোষণা দিল।[কাবা সম্পর্কে পূর্ববর্তি আব্রাহামিক ধর্মীয় কিতাবসমূহে কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। এমনকি উপাস্য 'আল্লাহ' সম্পর্কেও না। এগুলো যদি কেবলমাত্র পৌত্তলিকদের পবিত্র তীর্থস্থান ও উপাস্য না হত তবে পূর্ববর্তী ইসা বা মুসার কিতাবে অবশ্যই কোনো না কোনো উল্লেখ থাকত। কাবার সাথে ইব্রাহিমের যে যোগসূত্র দাবি করা হয় সেটা অপ্রমাণিত এবং অত্যন্ত অস্বাভাবিক -অনুবাদক] ।

পারস্যের খোরাসান প্রদেশে জন্মগ্রহণকারী বিশিষ্ট মনীষী, ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক আবু আল-ফাথ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল করিম আল-শাহরাস্তানি (১০৮৬-১১৫৩ খ্রিস্টাব্দ) ধর্ম ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ইতিহাস নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত 'কিতাব আল-মিলওয়াল ওয়া আল-নিহাল'কে ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনবিদ্যার প্রথমদিককার সুশৃঙ্খল 'ধ্রুপদী গ্রন্থ' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। [ইউনেস্কোর অর্থায়নে বইটির সর্বপ্রথম ফরাসি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৬ সালে এবং পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালে।-অনুবাদক]। আল-শাহরাস্তানি তাঁর ওই 'ধ্রুপদী' বইয়ে লিখেছেন, ইসলামের অনেক পালনীয় বিধি এবং রীতিসমূহ পৌত্তলিক আরবদের প্রথাসমূহের ধারাবাহিক রূপ, যা তারা ইহুদিদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন।

ইসলাম-পূর্ব যুগে মা, মেয়েকে এবং পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ ছিল এবং একই সাথে দুই সহোদরাকে বিয়ে করাও সামাজিকভাবে গ্রহণ করা হতো না। মৃতদেহকে স্পর্শ করার পর পুণ্যস্নান, পরিষ্কার পানি দিয়ে মুখ ধোয়া, জোরে শ্বাস টেনে পানিকে নাসারন্ধ্র পর্যন্ত তুলে ফেলা, মাথার চুলে তেল মাখা, মেসওয়াক বা দাঁত খিলাল ব্যবহার করা, মলত্যাগের পর ধৌতকরণ, বগল এবং শ্রোণিদেশের চুল কামানো, খৎনাকরণ এবং চোরের ডান হাত কেটে ফেলা ইত্যাদি রীতি ইসলাম আসার পূর্বে তৎকালীন আরবের পৌত্তলিক অধিবাসীরা পালন করত, যেগুলোর বেশিরভাগ তাঁরা ইহুদিদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল।

পৌত্তলিক আরবদের আইন থেকে ইসলামের যে দুটি আইন ব্যতিক্রমী, সেগুলো হলো পবিত্র যুদ্ধে (জিহাদ) অংশগ্রহণ এবং জাকাত প্রদান করা। অন্য যেকোনো আইনি-কাঠামোতে তুলনামূলক কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ না করার কারণ হল, অন্যান্য আইনপ্রণেতাদের থেকে নবি মুহাম্মদের উদ্দেশ্য ভিন্ন ছিল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একটি রাষ্ট্র গঠন। আর নবি বুঝতে পেরেছিলেন একটি রাষ্ট্র কখনোই সেনাবাহিনী ও আর্থিক উৎস ব্যতীত গঠিত হতে পারে না। জিহাদে অংশগ্রহণের এই ব্যতিক্রমী ও নজিরবিহীন ইসলামি আইনটিকে মুহাম্মদের দূরদৃষ্টি এবং বাস্তবতাবোধের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। মক্কায় প্রণীত অসাধারণ আধ্যাত্মিক সুরাগুলো যখন অকার্যকরী প্রমাণিত হলো, তখন যে একমাত্র সমাধানটি তিনি খুঁজে পেলেন তা হল, যুদ্ধের মাধ্যমে ফয়সালা করা।

যুদ্ধ করতে সক্ষম একটি সেনাবাহিনী, যেখানে প্রতিটি সৈনিকই যুদ্ধ করতে বাধ্য, এমন একটি সেনাবাহিনীকে ভরণ-পোষণ করা ব্যয়সাপেক্ষ। গনিমতের মাল এবং সম্পত্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা হয়তো সৈন্যদের যুদ্ধে আগ্রহী করে তুলতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অধিক নিরাপদ এবং স্থায়ী একটি আয়ের উৎসের প্রয়োজন রয়েছে যা কিনা ইসলামি আইনে জাকাতের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে।

নবসৃষ্ট সমাজের সীমাবদ্ধতা এবং প্রয়োজনীয় দিকগুলো মুহাম্মদের গঠনমূলক চিন্তাধারায় স্থান পেয়েছে। তাঁর সকল উদ্যোগই এই সমাজের মঙ্গলের জন্য গ্রহণ করেছেন। যেমন নেশাজাতীয় দ্রব্য নিষিদ্ধকরণ। এটি আরেকটি ব্যতিক্রমী ইসলামি-আইন যা প্রাথমিকভাবে সামাজিক পরিস্থিতিকে বিবেচনা করে প্রণীত হয়েছিল। আরবরা আবহাওয়াগত কারণে উষ্ণ রক্তের, সহজে উত্তেজিত হয়ে যায় এবং উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির হবার কারণে অবাধ-লভ্য নেশাজাতীয় পানীয় পান করে তারা বিভিন্ন অশোভন আচরণ করত এবং সমাজে বিশৃংখল পরিস্থিতি তৈরি করত। এই নিষেধাজ্ঞা তিনটি ধাপে জারি হল : প্রথমত, সুরা বাকারা'র এই আয়াত :'লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বলো, 'দুয়ের মধ্যেই মহাদোষ, মানুষের জন্য উপকারও আছে, কিন্তু উপকারের চেয়ে ওদের দোষই বেশি।'(২:২১৯)। পরবর্তীতে সুরা নিসার এই আয়াত যা মদিনায় একজন লোক মাতাল অবস্থায় নামাজে হাজির হলে আয়াতটি নাজিল হয়েছিল : 'হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজের কাছে যেয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা কী বলছ তা বুঝতে পার...।'(৪:৪৩)। সবশেষে সুরা মায়িদা'র দুটি আয়াতে এই নিষেধাজ্ঞা চিরস্থায়ী রূপ লাভ করে : 'হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি ও ভাগ্যপরীক্ষার তীর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো যাতে তোমরা সফল হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে এবং আল্লাহর ধ্যানে ও নামাজে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়! তা হলে তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না?'(৫:৯০-৯১)। সুরা বাকারা'র ২১৯ নম্বর আয়াত এবং সুরা মায়িদা'র ৯০ নম্বর আয়াতের উভয়টিতেই মদ্যপানকে জুয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং শেষ আয়াতে মূর্তিপূজা এবং তীরের মাধ্যমে ভাগ্যপরীক্ষা করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে; যেগুলো ইসলাম-পূর্ব আরবে পৌত্তলিকরা সাহায্য লাভের আশায় করত। সুরা মায়িদার ৯১ নম্বর আয়াতে মদ ও জুয়াকে এগুলোর বিষয়গত কারণে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল একটি বিশ্রী ঘটনা ঘটার পর। এই আয়াতের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মদ্যপান ও জুয়া খেলা আরবদের মধ্যে অশান্তি এবং বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছে।

বহুগামিতা, বিবাহবিচ্ছেদ, ব্যভিচার, অবৈধযৌনসম্পর্ক, পায়ুসঙ্গম এবং আরও অনেক বিষয়ে কোরানের প্রত্যাদেশগুলো রচিত হয়েছে মূলত ইহুদি-আইনের সংশোধিত রূপ হিসেবে এবং আরবে প্রচলিত পূর্ববর্তী প্রথাগুলোর অনুসরণে। অলৌকিকতা আসলে শতাব্দীকাল ধরে ধোঁয়াশার জালে ঘেরা নয় এবং একমাত্র দুর্বল চিত্তের নিকট গ্রহণীয় সংস্কার নয়। বরং এটি জীবন্ত এবং অর্থবহ বিষয়। কোরানের বাগ্মিতা কিংবা এর নৈতিক এবং আইনি-দৃষ্টিভঙ্গির কোনোটিই অলৌকিক নয়। একজন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-বঞ্চিত এবং দরিদ্র ব্যক্তি মুহাম্মদ প্রায় একা নিজ জাতির তীব্র বাধা অতিক্রম করে একটি স্থায়ী ধর্ম প্রতিষ্ঠায় সফলকাম হয়েছেন। গোত্র-প্রথায় বিভক্ত বিচ্ছিন্ন জাতিগুলোকে একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে পেরেছেন। এর ফলে বেপরোয়া মানুষগুলোকে অনুগত লোকে পরিণত করে নবি নিজস্ব ইচ্ছায় চালিত করতে পেরেছেন।

নবি কোরানকে নিয়ে গর্ব প্রকাশ করেছেন এবং একে নিজের নবুওতির প্রত্যয়নপত্র রূপে দাবি করেছেন। তাঁর মতে কোরান আল্লাহর প্রেরিত বাণী এবং জনতার কাছে বার্তা প্রেরণের মাধ্যম হচ্ছেন মুহাম্মদ। আরবি 'ওহি'শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রত্যাদেশ কিংবা উন্মোচিত করা; কোরানে এটি ষাটবার ব্যবহৃত হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা একজন ব্যক্তির মনে কোনো কিছু ঢুকিয়ে দেয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে এটি আবার দ্রুত সঞ্চারণশীল ইঙ্গিতার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ-কারণে প্রতিটি প্রত্যাদেশের পর নবি উদ্বিগ্ন থাকতেন যাতে একজন হস্তলিপিকর তা তৎক্ষণাৎ লিখে ফেলেন। নবির এই তাড়াহুড়া করার প্রবণতার প্রমাণ কোরানে

পাওয়া যায়। যেমন সুরা তাহা'য় বর্ণিত হয়েছে: 'তোমার ওপর আল্লাহর প্রত্যাদেশ সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কোরান পড়তে তুমি তাড়াতাড়ি করো না আর বলো, হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।' (২০:১১৪)। এবং সুরা কিয়ামা'য় বর্ণিত হয়েছে : 'এ (প্রত্যাদেশ) তাড়াতাড়ি (আয়ত্ত) করার জন্য তুমি এর সঙ্গে তোমার জিব নেড়ো না। এ-সংরক্ষণ ও আবৃত্তি করানোর (ভার) আমারই। সুতরাং যখন আমি পড়ি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ করো। তারপর এর বিশদ ব্যাখ্যার (দায়িত্ব) আমারই।' (৭৫:১৬-১৯)।

নবি মুহাম্মদের এই তাড়াহুড়া করার প্রবণতা থেকে 'ওহি'নাজিলের সময় তাঁর মানসিক অবস্থার পরোক্ষ-পরিচয় পাওয়া যায়। তার অন্তরাত্মা সেই সময় যে আলোয় আলোকিত হত, তা কোনো স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা ছিল না। আবু সাইদ আল-কাদরি (মৃত্যু হিজরি ২৬১ হিজরি বা ৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ) মদিনাবাসী সাহাবি। তিনি প্রচুরসংখ্যক হাদিসের বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে, 'নবি মুহাম্মদ অনুরোধ করেছেন, কোরান ব্যতীত আমার অন্য কোনো ভাষ্য লিখে রেখ না! কেউ যদি কোরান ছাড়া আমার কোনো ভাষ্য লিখে রাখে, তাহলে সে যেন সে-গুলো মুছে ফেলে।' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ওহি নাজিলের সময়ে নবি মুহাম্মদ অসংলগ্ন হয়ে পড়তেন। সম্ভবত একটি তীব্র আভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টার প্রয়োজন হতো। সহি বুখারির একটি হাদিস রয়েছে, নবির স্ত্রী আয়েশা থেকে বর্ণিত : 'হারেস বিন হিশাম একবার নবিকে প্রশ্ন করেছিলেন, (ওহি নাজিল হওয়ার) 'এই অনুভূতিগুলো কেমন?' নবি জবাব দিলেন, 'সবচাইতে তীব্র হলো ঘণ্টাধ্বনির মতো যেগুলো বন্ধ হবার পরেও আমার মনে বেজে যায়। কোনো কোনো সময় একজন ফেরেশতা মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হন এবং আমি বিষয়টি অনুধাবন করা মাত্র তিনি অদৃশ্য হয়ে যান।'

বিবি আয়েশার বক্তব্য অনুযায়ী, 'ওহি লাভের সময় নবির ভ্রুথেকে ঘাম নির্গত হতো, এমনকি শীতের দিনেও।আয়েশার বক্তব্যের সমর্থনে বুখারি, সাফওয়ান বিন বালি'র (মক্কা বিজয়ের পর তাঁর পিতা ইসলাম গ্রহণ করেন) প্রসঙ্গ উপস্থাপন করে বলেন : 'ওহি নাজিলের সময়কালে বালি মুহাম্মদকে পর্যবেক্ষণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। একদিন একজন ব্যক্তি সুগন্ধি-মাখা একটি আলখাল্লা পরে এসে নবির কাছে জানতে চাইল সে এই কাপড় পরে 'ওমরা'পালনকালে উৎসর্গের ভাবাবস্থা অর্জন করতে পারবে কিনা। মুহাম্মদের উপর তখন ওহি নাজিল হয়। হজরত ওমর বালিকে সামনে আসার সংকেত দিলেন। বালি ভেতরে প্রবেশ করে দেখলেন নবি প্রায় ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছেন, তিনি নাক ডাকছিলেন এবং তাঁর ওপর আল্লাহ-প্রদত্ত গায়ের রঙ ঠিকরে পড়ছিল। কিছুক্ষণ পর নবি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসলেন এবং প্রশ্নকারীকে আহ্বান করলেন। নবি তাঁকে বললেন, 'সে যেন প্রথমে ওই আলখাল্লাটি পরিষ্কার পানি দিয়ে তিনবার ধুয়ে একে সুগন্ধিমুক্ত করে এবং তারপর হজের বিধানের মতোই নিজেকে ওমরা পালনে উৎসর্গ করে।'

মুহাম্মদের মানবিকতা

‘নবিরা আর দশজনের মতোই সাধারণ মানুষ ছিলেন। তবে তাঁদের উপস্থিতির জন্য তোমার এলাকায় পরশমণি বর্ষিত হয়েছে।’- জালালুদ্দিন রুমি (১২০৭-১২৭৩ খ্রিস্টাব্দ)[৩৫]

প্রাথমিক যুগের অধিকাংশ ইসলাম-বিশেষজ্ঞ স্বীকার করেছেন আধ্যাত্মিক স্বতন্ত্রতা ব্যতীত নবি মুহাম্মদ আসলেই একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন। এই সত্যটি কোরানের সুরা কাহাফে রয়েছে : ‘বলো, আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ; আমার ওপর প্রত্যাদেশ হয় যে আল্লাহই তোমাদের একমাত্র উপাস্য।’ (১৮:১১০)। সুন্নি বিশেষজ্ঞদের অনেকে মুহাম্মদকে পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং দোষত্রুটির ঊর্ধ্বে বিবেচনা করেননি। তারা নবির নবুওতিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ উপহার হিসেবে দেখতেন। তাঁরা মনে করতেন আল্লাহ নবির দায়িত্ব পালনের জন্য এমন একজন মানুষকে নির্বাচন করেন যার জ্ঞান, দূরদৃষ্টি এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের মানবীয় গুণাবলী রয়েছে কিংবা যাকে মানুষের দিক-নির্দেশের দায়িত্ব অর্পণকালে এসব অনন্য গুণাবলী উপহার দেয়া হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, ‘আমরা একজন মানুষের ওপর তখনই নবুওতির বিশ্বাস করি যখন আমরা তাঁকে স্রষ্টার বার্তাবাহক হিসেবে মনে করি।’ওই বিশেষজ্ঞরা এমন কোনো যুক্তি দেখাননি যাতে মনে হয়, আমরা একজন মানুষকে বিশ্বাস করি কারণ স্রষ্টা তাঁকে আমাদের থেকে অধিকতর জ্ঞান এবং নৈতিক গুণাবলী দিয়ে পাঠিয়েছেন। তাদের এই মতামত কোরানের বিভিন্ন আয়াতের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যেমন সুরা শুরা’র এই আয়াত : ‘এভাবে আমি আমার আদেশক্রমে তোমার কাছে এক আত্মা (ফেরেশতা) প্রেরণ করেছি যখন তুমি জানতে না কিতাব কী, বিশ্বাস কী। কিন্তু আমি একে করেছি আলো যা দিয়ে আমি আমার দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করি; তুমি তো কেবল সরল পথই প্রদর্শন কর।’ (৪২:৫২)। এই একই বিষয় পূর্ববর্তী আয়াতেও আলোচিত হয়েছে। এবং সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে এবং সুস্পষ্টরূপে আলোচিত হয়েছে সুরা আন’আমে, যেখানে মুহাম্মদকে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য লোকেদের জবাব দেওয়া হয়েছে : বলো, ‘আমি তোমাদেরকে বলি না যে আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে। অদৃশ্য সম্পর্কেও আমি জানি না। তোমাদের এ-ও বলি না যে আমি ফেরেশতা। আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় আমি শুধু তা-ই অনুসরণ করি।’বলো, ‘অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? তোমরা কি চিন্তাভাবনা কর না? (৬:৫০)। সুরা আ’রাফে মুহাম্মদকে এই বলে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে : ‘বলো, আল্লাহর ইচ্ছা আমার নিজের ভালোমন্দের ওপরও আমার কোনো অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম তবে তো আমার অনেক ভালো হতো আর মন্দ কোনোকিছু আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা মাত্র।’(৭:১৮৮)। সুরা আ’রাফের আয়াতটি হেজাজের পৌত্তলিকদের প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে। তাঁরা প্রশ্ন করেছিল, মুহাম্মদ যদি সত্যই অলৌকিক জগতের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, তাহলে তিনি কেন ব্যবসায় নিয়োজিত হয়ে বিশাল মুনাফা অর্জন করছেন না।

এ-বিষয়ে কোরানের আয়াত সুস্পষ্ট এবং পরিষ্কার। হাদিস ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য নবির জীবনবৃত্তান্ত প্রমাণ করে মুহাম্মদ কখনোই নিজেকে দোষত্রুটির ঊর্ধ্বে এবং গায়েবি বিষয় নিয়ে জ্ঞান আছে, এমন দাবি করেননি। একটি নির্ভরযোগ্য হাদিস অনুযায়ী, ‘তিনি একবার পৌত্তলিকদের অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নবাণে বিব্রত হয়ে বলেছিলেন, তারা আমার কাছে কি চায়? আমি আল্লাহর এক বান্দা। আল্লাহ আমাকে যা শেখান তাই আমি জানি।’মুহাম্মদের সত্যবাদিতা এবং সততাকে প্রশংসা করা হয়েছে সুরা আ’বাসা’র ১-১১ নম্বর আয়াতে যেখানে তার প্রতি সুস্পষ্ট একটি দৈব-তিরস্কার রয়েছে :

সে (মুহাম্মদ) ভ্রুকুঁচকে মুখ ফিরিয়ে নিল,

কারণ তার কাছে এক অন্ধ এসেছিল।

তুমি ওর সম্বন্ধে কী জান?

সে হয়তো পরিশুদ্ধ হ' ত

বা উপদেশ নিত ও উপদেশ থেকে উপকার পেত?

যে নিজেকে বড় ভাবে

বরং তার প্রতি তোমার মনোযোগ!

যদি সে নিজেকে পরিশুদ্ধ না করে, তবে তাতে তোমার কোনো দোষ হতো না!

অথচ যে কিনা তোমার কাছে ছুটে এল

আর এল ভয়ে-ভয়ে,

তাকে তুমি অবজ্ঞা করলে!

কক্ষনো (তুমি এমন করবে) না, এ এক উপদেশবাণী। (৮০:১-১১)।

নবি মুহাম্মদ কিছু ধনী এবং প্রভাবশালী লোককে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে সৎপন্থা অবলম্বন করেছিলেন। এটা সমর্থনযোগ্য একটি উদ্যোগ। কারণ পৌত্তলিকরা প্রশ্ন তুলেছিল : দু-দলের মধ্যে কোনটি মর্যাদায় শ্রেয় আর সমাজ হিসেবে কোনটা উত্তম। (১৯:৭৩)। যে কোনো অবস্থাতে গণ্যমান্যদের সমর্থন অর্জন করা মুহাম্মদের জন্য খুবই স্বাভাবিক। একদিন তিনি যখন হেজাজের একজন প্রভাবশালী লোকের সাথে কথা বলছিলেন এবং তাঁকে ইসলামে বিশ্বাস করানোর জন্য একাগ্রতায় নিমজ্জিত ছিলেন, তখন আব্দুল্লাহ বিন ওম মাকতুম নামের একজন সদ্য ইসলাম-গ্রহণকারী অন্ধব্যক্তি মুহাম্মদকে জিজ্ঞেস করলেন : 'আল্লাহ আপনাকে যা কিছু শিখিয়েছেন তার কিছুটা আমাকেও শেখান।'নবি ওই অন্ধব্যক্তির কথায় কর্ণপাত না করে বাড়ি চলে গেলেন। এরপরই এই মহৎ সুরা আ'বাসার আয়াতগুলো নাজিল হয়, যেখানে নবিকে পরিষ্কারভাবেই তিরষ্কার করা হয়েছে। পরবর্তীতে যখনই আব্দুল্লাহ বিন ওম মাকতুমের সাথে নবির দেখা হত, তিনি তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতেন। সুরা মুমিনের একটি আয়াতে নবিকে ধৈর্যশীল হতে বলা হয়েছে : 'অতএব তুমি ধৈর্য ধরো, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। তুমি তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা ঘোষণা করো।' (৪০:৫৫)। এই আয়াতে নবির চরিত্রে দোষ দেখিয়ে তাঁকে নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। সুতরাং মুহাম্মদের কোনো দোষত্রুটি নেই বলে পরবর্তীকালের মুসলমানদের মনে যে গভীর অন্ধবিশ্বাস জন্ম নিয়েছে তা কোরানের এই ভাষ্যের বিরোধী।

একই বিষয়টি সুরা ইনশিরাহ এর প্রথম তিন আয়াতে ভিন্নভাবে ফুটে ওঠেছে : 'আমি কি তোমার বক্ষ উন্মুক্ত করিনি? আমি হালকা করেছি তোমার ভার, যা ছিল তোমার জন্য খুব কষ্টকর।' (৯৪:১-৩)। আরবি কোরানে ব্যবহৃত 'ওয়েজর'শব্দটি (বাংলা অর্থ 'ভার'বা 'বোঝা') সুরা ফাতহ এর প্রথম দুটি আয়াতে 'ধানব্'শব্দ (বাংলা অর্থ 'পাপ') দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে : 'আল্লাহ তোমার জন্য সুস্পষ্ট বিজয় অবধারিত করেছেন। এ এজন্য যে, তিনি তোমার অতীত ও ভবিষ্যতের ত্রুটিগুলো মাফ করবেন, তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন এবং তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করবেন।(৪৮:১-২)। অতএব কোরানের এই

স্পষ্টভাবে বর্ণিত এবং অপরিবর্তনযোগ্য আয়াতগুলো প্রমাণ করে, নবি মুহাম্মদ যাকে পরবর্তীতে মুসলমানরা সকল দোষক্রুটির ঊর্ধ্বে এবং অলৌকিক ব্যক্তিত্বের মর্যাদা দিয়েছিলেন, তিনি কিন্তু নিজেকে মোটেও সেরকম মনে করতেন না এবং কোরানেও সেভাবে ফুটে ওঠেনি। যৌক্তিক চিন্তা এবং জ্ঞানচর্চায় আগ্রহী যে কারো কাছে মুহাম্মদের এই আধ্যাত্মিক উৎকৃষ্টতা এবং সততা আরও স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়।

ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিশ্বাস, সামাজিক প্রথাসমূহ যেগুলো গণিতশাস্ত্রের নিশ্চয়তা এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রায়োগিক প্রমাণের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, সে-সব বিষয়ে মানুষ নিজের যুক্তির কর্মদক্ষতা দেখাতে সবসময়ই অনিচ্ছা পোষণ করে এসেছে। পক্ষান্তরে তারা প্রথমেই বিশ্বাস অর্জন করেছে এবং নিজেদের বিশ্বাসের পক্ষের বক্তব্য দিয়ে মস্তিষ্ক পূর্ণ করেছে। স্বীকার করতে হবে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মতো ইসলামের ওলামা'রাও এই বৈশিষ্ট্যের বাইরে নন। নবি মুহাম্মদ সকল দোষক্রুটির ঊর্ধ্বে-নিজেদের এই বিশ্বাসের প্রতি অন্ধ হয়ে এবং তা প্রমাণের আশায় তারা কোরানের স্পষ্ট আয়াতগুলো পর্যন্ত ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

নবি মুহাম্মদের মানবীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনায় এ-প্রসঙ্গে একটি গল্পের কথা মনে পড়ে যায়। ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিমের রাজ্য খোজেস্তানের সুস্তান শহরে একজন খ্যাতিমান সুফি সাধক ছিলেন, তাঁর নাম শাহ আল-তুস্তারি (৮১৮-৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ)। একদিন এই সাধকের কাছে তাঁর অনুসারীগণ গিয়ে বললেন, 'লোকজন বলাবলি করছে, আপনি নাকি পানির উপর দিয়ে হাঁটতে পারেন।' আল-তুস্তারি বললেন, 'মুয়াজ্জিনকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, তিনি একজন সৎ ব্যক্তি।' অনুসারীগণ মুয়াজ্জিনকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে জবাব দিলেন : 'আমি এ-বিষয়ে কিছু জানি না। তাঁকে কখনো আমি পানির উপর দিয়ে হাঁটতে দেখিনি। তবে আমার মনে আছে তিনি একদিন পুণ্যস্নানের জন্য সাঁকোর উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি পা পিছলে পানিতে পড়ে যান। ডুবেও যেতেন, যদি না আমি তাঁকে টেনে তুলতাম।' এ-ঘটনার একটি দিক যা কোনো নিরপেক্ষ সত্যসন্ধানী অস্বীকার করতে পারবেন না তা হলো, প্রমাণের প্রাচুর্য।

হাঙ্গেরীয় বংশোদ্ভূত ইসলাম-বিশেষজ্ঞ ইজহাক গোল্ডজিহার[৩৬] মনে করেন হাদিসের সংকলন এবং মুহাম্মদের প্রথম দিককার জীবনীকারকগণ ইসলামের প্রতিষ্ঠাতাকে যেভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এবং স্বচ্ছতার সাথে চিত্রায়িত করেছেন তা বিশ্বের অন্যান্য ধর্মের ঐতিহাসিক নথিপত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না; এবং কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই এগুলো মুহাম্মদকে মানবীয় নৈতিক, ভালো-মন্দ, দোষ-গুণের অধিকারী হিসেবে ফুটিয়ে তুলেছে।

এই তথ্যগুলো উপস্থাপনের মাধ্যমে নবি মুহাম্মদকে 'অলৌকিক ক্ষমতাধর অতিমানব'বানাবার কোনো চেষ্টা করা হয়নি। বরং দেখানো হয়েছে তিনি তাঁর সাহাবি এবং সহযোগীদের নিয়ে একটি সমতাস্থলে অবস্থান করতেন। তাৎক্ষণিক উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ৫ম হিজরিতে (৬২৭ খ্রিস্টাব্দ) মদিনায় পরিখার যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষের আর সবার মতো নবিও একইভাবে খননকাজ করেন। প্রচলিত আছে জীবনের প্রশান্তি সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, 'আমি পৃথিবীতে তিনটি জিনিস পছন্দ করি: সুগন্ধি, নারী এবং সবার উপরে নামাজ।' মুহাম্মদের জীবনাচরণে কঠোর এবং বিশ্বজনীন নয় এমন বিষয়াবলী খুব কমই খুঁজে পাওয়া যায়। নবিকে মানবীয় সীমাবদ্ধতার বাইরে রাখার চেষ্টা কোরান, হাদিস এবং নবির জীবন চরিতের সাথে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। নবি মারা যাবার পর থেকে এই প্রচেষ্টা শুরু হয়। তাঁর মৃত্যুর একদিন পর হজরত ওমর (অথবা অন্য কোনো শীর্ষস্থানীয় সাহাবি) খোলা তরবারি নিয়ে হুমকি দিলেন, মুহাম্মদের মৃত্যুখবর যে প্রচার করবে, তিনি তার গলা কেটে ফেলবেন। তখন হজরত আবু বকর কোরানের আয়াত উদ্ধৃত করে প্রতিবাদ করলেন: 'তোমার মৃত্যু হবে, এবং তাদেরও।' (সুরা জুমার : আয়াত ৩০)। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য ওমর নয়, আবু বকরই সঠিক ছিলেন। হিজরি ১১ সালে (৬৩২ খ্রিস্টাব্দ) মুহাম্মদের মৃত্যুর পর মদিনা থেকে যত সময় এবং স্থানের দূরত্ব বাড়তে থাকল মুসলমানরাও তাদের কল্পনাগুলোকে ততটাই প্রসারিত করতে লাগলেন।

মুসলমানরা অতিরঞ্জন আর কাব্যিকতাকে এতোটাই প্রসারিত করলেন যে দুটি প্রধান ভিত্তিমূল, যেগুলো প্রতিদিনের পাঁচবার নামাজের সময় বলা হয় এবং কোরানের বিভিন্ন আয়াতেও উদ্ধৃত আছে, সেগুলো তাঁরা ভুলে গেলেন : মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা এবং বার্তাবাহক। তাঁরা মুহাম্মদকে সৃষ্টির 'আদি কারণ' হিসেবে চিহ্নিত করলেন এই বলে যে : 'আপনি না থাকলে এই মহাবিশ্ব তৈরি হতো না।'পারস্যের সুফিবাদী শায়েখ নজম আল-দিন দায়া রাজি (মৃত্যু হিজরি ৬৫৪ বা ১২৫৬ খ্রিস্টাব্দ) নামের গভীর বিশ্বাসী লেখক তাঁর 'মেরসাদ আল-ইবাদ' বইয়ে কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন: 'সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা, যিনি শুধুমাত্র 'হও'উচ্চারণ করেই সবকিছু সৃষ্টি করতে পারতেন, সেই আল্লাহই সর্বপ্রথম মুহাম্মদকে আলো হিসেবে তৈরি করেছিলেন এবং মুহাম্মদ যখন আলোর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তখন সেই আলো লজ্জায় ঘামতে শুরু করল এবং সেই ঘামের ফোঁটা দিয়ে আল্লাহতায়ালা অন্য নবি ও ফেরেশতাদের আত্মা তৈরি করলেন।'

মুহাম্মদের আধুনিক জীবনীকারক মিশরীয় বংশোদ্ভূত মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ওস-সামান লিখেছেন : 'মুহাম্মদ আসলেই অন্যান্য নবির মতোই মানুষ ছিলেন। তাঁর জন্ম, মৃত্যু আর সকল মানুষের মতোই হয়েছিল। মুহাম্মদের নবুওতি তাঁর মানুষ পরিচয়ের জন্য কখনো কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। আর সকলের মতোই তিনিও রাগতেন, সন্তুষ্ট, বিমর্ষ এবং উল্লসিত হতেন। তিনি একবার আসওয়াদ ইবনে আব্দুল মোতালেব ইবনে আসাদের প্রতি এতোটাই ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন যে, তাঁকে অভিশাপ দেন এই বলে- 'আল্লাহ যেন তাঁকে অন্ধ করে দেন এবং তাঁর পুত্রকে পিতৃহারা করেন।'

মুহাম্মদ ইজ্জত দারওয়াজা (১৮৮৮-১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ) ফিলিস্তিনি রাজনীতিবিদ-ইতিহাসবিদ, তিনি নবি মুহাম্মদের ওপর একটি জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর বইয়ে কোরানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন কোনো নিজস্ব বক্তব্য প্রদানে বিরত থেকেছেন। মুহাম্মদ এবং ইসলামের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠতা এবং ভক্তির উজ্জ্বল প্রমাণ পাওয়া যায় দুই খণ্ডে রচিত এই বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠায়। তিনি পরিতাপের সাথে শেষ পর্যন্ত উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, মধ্যযুগের বিশিষ্ট হাদিস-ভাষ্যকারক আল-কাসতালিনি[৩৭] (জন্ম হিজরি ৮৫১ বা ১৪৪৮ খ্রিস্টাব্দ-মৃত্যু হিজরি ৯২৩ বা ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ) ইসলামি গ্রন্থ রচনায় সম্পূর্ণ উচ্ছন্নে গিয়েছিলেন এবং নিজের মনগড়া কাহিনী একের পর এক আরোপণ করেছিলেন তাঁর গ্রন্থে যেগুলোর কোনো ভিত্তি দারওয়াজা নিজে কোরান এবং বিশ্বাসযোগ্য হাদিস ও অন্যান্য তথ্যবিবরণে খুঁজে পাননি। কাসতালিনির মতো অন্ধবিশ্বাসীরা কোনো প্রমাণ ছাড়াই বিশ্বাস করতেন, আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন কারণ নবি মুহাম্মদ যেন মানবজাতিতে জন্মগ্রহণ করতে পারেন; এবং এই কারণে মুহাম্মদ হলেন মানবজাতি সৃষ্টির প্রাধন কারণ। কাসতালিনি আরও মনে করতেন লওহ, কলম, আরশ বা সিংহাসন, কুরসি বা চেয়ার থেকে শুরু করে আকাশ, পৃথিবী, জিন, মানুষ, বেহেশত, দোজখ সবকিছুই নবি মুহাম্মদের নুর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। তাঁরা সুরা আন'আমের এই আয়াতের বক্তব্য ভুলে গেলেন : 'রিসালাতের দায়িত্ব আল্লাহ কার ওপর অর্পণ করবেন তা তিনিই ভালো জানেন।'(৬:১২৪)। একই সাথে তাঁরা ইসলামের মৌলিক মূলনীতিও ভুলে গেলেন, যেখানে বলা হয়েছে কেবল আল্লাহই অস্তিত্বশীল জগতের চূড়ান্ত কারণ।

ফিলিস্তিনি লেখক দারওয়াজা আরও লিখেছেন যে, কোরানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে সকল নবিকে মরণশীল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ মানবজাতিকে দিক-নির্দেশনা দেবার জন্য পাঠিয়েছেন। সুরা আম্বিয়া'র ৭-৮ আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে : 'তোমার পূর্বে আমি প্রত্যাদেশ দিয়ে মানুষই পাঠিয়েছিলাম; তোমরা যদি না জান তবে উপদেশপ্রাপ্ত সম্প্রদায়দেরকে জিজ্ঞাসা করো। আর তাদেরকে এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যে তাদের খাবার খেতে হতো না; তারা চিরস্থায়ীও ছিল না।'(২১:৭-৮)। অর্থাৎ আল্লাহর বাণী প্রচারের জন্য নির্বাচিত হওয়া ছাড়া মুহাম্মদ আর কোনো ক্ষেত্রেই মানবজাতির বাইরের কেউ নন। কোরানে এই বক্তব্য বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যেগুলো ফিলিস্তিনি লেখক ইজ্জত দারওয়াজা তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন। প্রাসঙ্গিক আরও আয়াত আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি : 'বলো, 'আমার প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা! আমি এক সুসংবাদদাতা রসুল ছাড়া

আর কী?’‘আল্লাহ কি মানুষকে রসুল করে পাঠিয়েছেন?’ওদের এই কথাই লোকদেরকে বিশ্বাস করতে বাধা দেয় যখন ওদের কাছে পথের নির্দেশ।(১৭:৯৩-৯৪)। ‘ওরা বলে, এ কেমন রসুল যে খাবার খায় হাটে-বাজারে চলাফেরা করে! তার কাছে ফেরেশতা পাঠানো হয় না যে তার সঙ্গে থাকবে ও ভয় দেখাবে।’ (২৫:৭)। ‘প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তোমার কাছে এ-কোরান প্রেরণ করে আমি তোমার কাছে সবচেয়ে ভালো কাহিনী বর্ণনা করেছি, যদিও এর পূর্বে তুমি ছিলে অসতর্কদের অন্তর্ভুক্ত।’(১২:৩)। ‘আমি তোমার পূর্বেও কোনো মানুষকে অমরত্ব দান করিনি। সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে ওরা কি চিরকাল বেঁচে থাকবে?’ (২১:৩৪)। ‘মুহাম্মদ রসুল ছাড়া আর কিছুই নয়, তার পূর্বে বহু রসুল গত হয়েছে।’(৩:১৪৪)। ‘যখন তুমি জানতে না কিতাব কী, বিশ্বাস কী।’(৪২:৫২)। ‘বলো, আমি তো রসুলদের মধ্যে এমন নতুন কিছু নই। আর আমাকে ও তোমাদেরকে নিয়ে কী করা হবে আমি তা জানি না। আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় আমি তা-ই অনুসরণ করি। আমি এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।’(৪৬:৯)।

নবি মুহাম্মদের মনুষ্যত্ব, তাঁর মানবীয় গুণাবলী এবং ত্রুটির ইঙ্গিত ইসলামের ইতিহাসের অনেকগুলো সমর্থিত সূত্র থেকে পাওয়া যায়। হিজরি ৪ সালে মাওনার বানু আমির ও বানু সেলিম গোত্রের সাথে লড়াইয়ে নবির পক্ষের প্রায় ৭০জন সাহাবি নিহত হন। এ-ঘটনায় নবি অসম্ভব বেদনার্ত হয়ে পড়েন। তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন, ‘হে আল্লাহ! মোদারদেরকে (উত্তর-আরবীয় গোত্রসমূহ) পদদলিত করুন।’৬২৫ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত ওহুদের যুদ্ধে নবি পরাজিত হন এবং সেই যুদ্ধে নবির চাচা হামজা বিন আব্দুল মোতালেব মারা যান। আবিসিনিয়া থেকে আগত এক ক্রীতদাস ওয়াশি ইবনে হার্ব কুরাইশদের পক্ষ হয়ে লড়াইয়ে হামজার নাক-কান কেটে ফেলেন এবং তরবারি দিয়ে পেট ফুটো করে দেন। কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবা বদর যুদ্ধে নিহত তাঁর পিতা উতবা ইবনে রাবিয়া হত্যার প্রতিশোধ নিতে হামজার পাকস্থলি চিরে ফেলেন এবং মুখ দিয়ে রক্তমাখা যকৃত চুষেন। হামজা’র ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহ দেখে নবি এতোটা রাগান্বিত হন যে, তিনি চিৎকার করে বলেন, ‘আল্লাহর নামে শপথ নিয়ে বলছি, পঞ্চাশ জন কুরাইশকে আমি ছিন্নভিন্ন করে দেব।’ এ-রকম আরও অসংখ্য ঘটনাবলীর মাধ্যমে তৎকালীন আরবদের মনের নির্দয়তা ও প্রতিহিংসার পরিচয় মেলে। তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ এমনই ছিল যে একজন অভিজাতবংশীয় নারী যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে মৃতব্যক্তির পাকস্থলী চিরে ফেলত এবং যকৃত চুষে ছুড়ে ফেলত। যুদ্ধের সময় হিন্দ বিনতে উতবাসহ আরও অনেক সম্ভ্রান্ত কুরাইশ নারী মক্কার যোদ্ধাদের মাঝে গিয়ে মেয়েলি আকর্ষণ এবং বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদেরকে উৎসাহিত করতেন।

ইবনে হিশামের নবি মুহাম্মদের জীবনচরিত[৩৮] থেকে জানা যায়, বাজিলা গোত্রের কিছু লোক মদিনায় এসে অসুস্থ হয়ে পড়লে মুহাম্মদের কাছে গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেন। মুহাম্মদ তাঁদেরকে বললেন, উটের দুধ পান করলে তাঁরা সুস্থ হয়ে যাবে। তিনি তাঁদেরকে মদিনার বাইরে অবস্থিত তাঁর পশুপাল রক্ষণাবেক্ষণকারীর নিকট পাঠালেন। উটের দুধ খাওয়ার পর তাঁরা সুস্থ হয়ে ওঠে কিন্তু কোনো কারণে তাঁরা নবির সেই পশু রক্ষণাবেক্ষণকারীকে হত্যা করে। তাঁরা ওই ব্যক্তির চোখে ফলক ঢুকিয়ে উটের সাথে বেঁধে ছেড়ে দেয়। মর্মান্তিক এই খবরটি শোনার পর নবি খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে কর্জ ইবনে জাবেরকে প্রেরণ করেন তাঁদেরকে ধরে নিয়ে আসার জন্য। এরা ধরা পড়ার পর নবির নিকট নিয়ে আসা হলো। নবি তাঁদের হাত-পা কাটার জন্য এবং চোখ উপড়ে ফেলার নির্দেশ দিলে তা বাস্তবায়িত হয়।

বুখারি হাদিসে উল্লেখ আছে নবি বলেছিলেন, ‘আমি একজন মানুষ, আমি রাগ, দুঃখ, কষ্ট অনুভব করি। ঠিক যেমনি অন্য সব মানুষ রেগে যায়।’ অন্যান্য সূত্র থেকে এই হাদিসের সত্যতা নিশ্চিত হওয়া যায়। সাহাবি আবু রহম আল-গিফারি বলেছেন, একবার এক অভিযানে তিনি যখন নবির পাশে চলছিলেন, তখন তাঁর বাহক পশুটি আকস্মিকভাবে তাঁকে এমনভাবে নবির কাছাকাছি নিয়ে যায় যে, তাঁর প্রশস্ত পা নবির হাঁটুর নিচে আঘাত করে এবং নবি এতে মারাত্মক ব্যথা পান। নবি তখন রেগে গিয়ে আবু রহমকে নিজের চাবুক দিয়ে আঘাত করেন। আবু রহম খুবই বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন এই ঘটনায়, কারণ তিনি মনে

করেছিলেন তাঁর এই অশোভন আচরণের জন্য তাঁর সম্পর্কে একটি আয়াত নাজিল হতে পারে। জীবনের শেষ দিনগুলোতে নবি সিরিয়া অভিযানকারী সৈন্যদলের নেতৃত্ব তরুণ বয়সী ওসামা বিন জায়েদকে প্রদান করেন। আবু বকরের মতো বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবি আছেন এমন একটি সৈন্যদলের দায়িত্ব একজন বিশ বছর বয়সী ব্যক্তিকে প্রদানের ফলে সৈন্যদলের মাঝে অসন্তোষ ও অসম্মতির ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। অসন্তুষ্টির তালিকায় নবির কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সাহাবিও ছিলেন। অসন্তোষের কথা শুনে নবি প্রচণ্ড বিরক্ত হলেন, তিনি অসুস্থ অবস্থায় শয্যাত্যাগ করে মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করেন। তারপর ঘোষণামঞ্চে দাঁড়িয়ে রাগান্বিত অবস্থায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি ওসামাকে নিযুক্ত করায় কার কি অভিযোগ রয়েছে?'নবির শেষ সময়ের অসুস্থতায় তাঁর একজন স্ত্রী মায়মুনা আবিসিনিয়ায় থাকাকালীন সময়ে শেখা জ্ঞান দিয়ে একটি ওষুধ তৈরি করেন। এ-ওষুধ অজ্ঞান থাকা অবস্থায় নবিকে খাওয়ানো হয়। তিনি হঠাৎ জেগে উঠেন এবং রাগান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কে এই কাজটি করেছে?' উপস্থিত সবাই জানালেন, 'মায়মুনা ওষুধটি তৈরি করেছেন এবং আপনার চাচা আব্বাসকে দিয়ে ওষুধটি খাওয়ানো হয়েছে?' নবি তখন নির্দেশ দিলেন ওষুধটি আব্বাস ব্যতীত উপস্থিত সবাইকে খাওয়ানো হোক। রোজা রাখা সত্ত্বেও সে-সময় মায়মুনা ওষুধটি পান করেছিলেন।

নবুওতির ২৩ বছর ধরে মুহাম্মদের বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে মানসিক প্রতিক্রিয়া এবং মানবিক অনুভূতির প্রকাশ প্রচুর ঘটনার বিবরণ থেকে জানতে পারা যায়। বিশেষ করে মদিনায় ১০ বছর অবস্থানকালীন সময়ের ঘটনাবলী। আয়েশা সম্পর্কিত মিথ্যা কথা বলার ঘটনা, মারিয়াকে স্বীয় আরোপিত অবজ্ঞা, জয়নাবকে বিয়ে করার জন্য তাড়াহুড়ো করা এবং বিচ্ছেদের সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে জয়নাবকে নিজের ঘরে নিয়ে আসা ইত্যাদি ঘটনার প্রেক্ষিতে মুহাম্মদের মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। এতোসব সাক্ষ্যপ্রমাণের উপস্থিতি এবং কোরানে অসংখ্যবার মুহাম্মদকে কোনো প্রকার অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি স্পষ্টভাবে বলার পরও তিনি মারা যাওয়ার সাথে সাথে অতিধার্মিক এবং অলৌকিকতায় বিশ্বাসীরা বলতে শুরু করলেন, নবি সব-ধরনের অলৌকিক এবং বিস্ময়কর কাজ করে গিয়েছেন। সময় ও স্থান যতোই প্রসারিত হতে লাগল ততোই কল্পকথার পরিধি বৃদ্ধি পেতে লাগল।

যদিও অনেক ইসলামি পণ্ডিত এই ধরনের কল্পকাহিনীকে অসম্ভব ও অযোগ্য বলে মনে করতেন। তার কিছু উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যায়। কাজি আয়াদ ইবনে মুসা (১০৮৩-১১৪৯ খ্রিস্টাব্দ) একজন আন্দালুসীয় বিচারক, ধর্মতাত্ত্বিক। তিনি নবি মুহাম্মদকে প্রশংসা করে 'কিতাব আস-শিফা বি তারিফ হোকুক আল-মুস্তফা' নামে একটি বই রচনা করেছেন। প্রত্যাশার বিপরীতে বইটি মুহাম্মদের আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি নিয়ে রচিত নয়। বইটি পড়ে পাঠক আশ্চার্যন্বিনিত হয়েছেন এই ভেবে যে, লেখকের মতো একজন শিক্ষিত, সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং সম্ভবত নির্বোধ নন, এমন ব্যক্তি কিভাবে নবি মুহাম্মদ সম্পর্কে এ-রকম লেখার কথা চিন্তা করতে পারেন। নবি মুহাম্মদের দাস এবং প্রসিদ্ধ হাদিস বর্ণনাকারী আনাস বিন মালেককে[৩৯] উদ্ধৃত করে কাজি আয়াদ তাঁর বইয়ে নবি মুহাম্মদকে অলৌকিক যৌনক্ষমতার অধিকারী বলে মন্তব্য করেছেন। নবি নাকি প্রত্যহ নিজের এগারো জন স্ত্রী'র সাথে দৈহিক মিলন করতে পারতেন। নবির যৌনক্ষমতাকে কাজি আয়াদ ত্রিশজন সাধারণ পুরুষের যৌনক্ষমতার সমতুল্য বলে অ্যাখ্যায়িত করেছেন। এমন কী, আনাসকে সাক্ষী করে কাজি আয়াদ তাঁর বইয়ে নবি মুহাম্মদের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করিয়েছেন: 'সাধারণ মানুষ থেকে চারটি ক্ষেত্রে আমি শ্রেষ্ঠ। এগুলো হচ্ছে উদারতা, সাহস, সঙ্গম এবং ঘন ঘন 'বালশ্'(আরবি এই শব্দের অর্থ শত্রু নিপাত করা)। এই বক্তব্যটি যদি আনাস বিন মালেকের মুখ থেকেও নিঃসৃত হয় তবু একজন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি তা বিশ্বাস করতে পারেন না। সত্য ঘটনা হচ্ছে, ইসলাম ধর্মের নবি মুহাম্মদ কখনো আত্মপ্রচারে নিমগ্ন ছিলেন না। আর কোরানে কোথাও মুহাম্মদের দয়ালু মনোভাব এবং সাহসের উল্লেখ নেই। শুধু সুরা কলমে উল্লেখ আছে : 'তুমি অবশ্যই সুমহান চরিত্রের সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছ।' (৬৮:৪)।

যদি কাজি আয়াদ নিজের দানশীলতা এবং নির্ভীকতার জন্য আত্মপ্রচারণা করতেন তাহলেও তা বিচারযোগ্য ছিল। কিন্তু অপর ব্যক্তির মুখ দিয়ে এমন এক ব্যক্তিকে যৌন ক্ষমতা এবং মানুষ হত্যা নিয়ে গর্ব করানোর কোনো অধিকার কাজি সাহেবের নেই। বিশেষ করে এই ব্যক্তিটি নবি মুহাম্মদ, তিনি কখনো এ-ধরনের কথা বলেন নি। আসল কথা হচ্ছে, সত্যকে পাশ কাটিয়ে কাজি আয়াদ নিজস্ব যৌনবাসনার উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করতে চেয়েছেন। নবিকে মানুষের উর্ধ্বে স্থান দেয়ার অভিপ্রায় থেকে তিনি এতো দূর পর্যন্ত অগ্রসর হলেন যে, তিনি তাঁর বইয়ে নবির মলমূত্র ও থুথুকে দিয়েও কথা বলিয়েছেন। তিনি বইয়ে উল্লেখ করেছেন, কিছু ওলামার বক্তব্য অনুযায়ী, এগুলো নাকি সম্পূর্ণ পবিত্র। নিজস্ব কাণ্ডজ্ঞানহীনতাকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে তিনি গল্প ফাঁদলেন, 'নবির ব্যক্তিগত এক দাসী উম্মে আয়মান একদা নবির মূত্র পান করে শোথরোগ (শরীরে পানি সঞ্চারের ফলে ফোলারোগ) থেকে আরোগ্য লাভ করেন। নবি নাকি ওই দাসীকে বলেছেন, তাঁর মূত্রপানের ফলে সে আর কোনোদিন পেটের পীড়ায় ভুগবে না।' উদ্ভট আরেকটি বিষয় হচ্ছে কাজি আয়াদ তাঁর বইয়ে এও দাবি করেছেন, 'নবি যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ঘর থেকে বের হতেন তখন পাথর এবং গাছগাছালি তাঁর চারপাশে এসে বেড়া দিত, যাতে লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়ে প্রাকৃতিক কর্ম সারতে পারেন। একজন পাঠক এই ধরনের আজগুবি বক্তব্য পড়ে সহজেই বুঝতে পারবেন, মুহাম্মদকে মানুষের উপরে স্থান দিতে গিয়ে কাজি আয়াদ অন্ধবিশ্বাসে আপ্লুত হয়ে কতটুকু সীমা অতিক্রম করেছিলেন। কাজি সাহেবের এই ধরনের কষ্টকল্পনা রচনার চেয়ে তিনি বরং সহজে বলতেই পারতেন, নবি মুহাম্মদকে আর দশজন সাধারণ মানুষের মতো খাওয়া-দাওয়া ও প্রাকৃতিক কর্ম করতে হতো না। তাহলে অন্তত তাঁকে হাঁটাচলা করা পাথর ও গাছগাছালির গল্প তৈরি করতে হতো না।

এ-ধরনের প্রলাপবাক্য শুধু কাজি আয়াদ একা উচ্চারণ করেননি। পূর্বে উল্লেখিত হাদিস-ভাষ্যকারক আল-কাসতালিনি'র মতো আরও ডজন খানেক লেখক রয়েছেন যারা শতাধিক অযৌক্তিক হাস্যকর কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করেছেন, যার ফলে ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে নবি মুহাম্মদকে অকারণেই স্বতন্ত্র সমালোচনা ও বিদ্রুপের সম্মুখীন হতে হয়। নবিকে দিয়ে এটাও বলানো হয়েছে যে, 'আদমকে সৃষ্টি করার সময় আল্লাহ আমাকে আদমের কোমরে স্থাপন করেছিলেন, পরবর্তীতে নুহ, ইব্রাহিমের কোমরেও আমাকে তিনি প্রতিস্থাপন করেন। মাতৃগর্ভ থেকে জন্মলাভের আগ পর্যন্ত আমি তাঁদের পবিত্র কোমর ও গর্ভে অবস্থান করেছি।' তার মানে কি এই যে, প্রতিটি মানুষ ঝোপ ঝাড়ের ভেতর থেকে হঠাৎ করেই অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠেছে। স্বাভাবিকভাবে মাতৃগর্ভ থেকে জন্মলাভের আগে যদি মানুষের অস্তিত্বশীল হবার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে এই ঝোপঝাড়ের যুক্তির মাঝেও কোনো অসংগতি থাকার কথা নয়।

কাজি আয়াদ আরও বলেছেন, নবি মুহাম্মদ যখন কোনো জায়গা দিয়ে অতিক্রম করে যেতেন, তখন সেখানকার পাথর, গাছগাছালি তাঁর কাছে হেঁটে চলে এসে বলত : 'হে আল্লাহর দূত! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।'চলাচল করতে সক্ষম, কণ্ঠ-স্বরযন্ত্র এবং জিহ্বাসম্পন্ন প্রাণীরাও যদি এসে একথা বলত তাহলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু মস্তিষ্ক, স্নায়ু, দৃষ্টি ও ইচ্ছাশক্তিহীন অজৈব পদার্থ কিভাবে নবিকে চিনতে পারল! সম্ভাষণ জানানো তো দূরের কথা। কেউ কেউ বলবেন এটা সম্পূর্ণ অলৌকিক বিষয়। তাই যদি হয় তাহলে মুহাম্মদের বাণীকে বিশ্বাস করার শর্ত হিসেবে কুরাইশরা যখন অলৌকিক কার্যাবলী দেখানোর দাবি তুলেছিল, সে-সময় কেন তা প্রদর্শিত হয়নি? কুরাইশরা যে-ধরনের অলৌকিকতা দেখতে চেয়েছিল তা আহামরি কিছু নয়। তাঁরা দাবি করেছিল মুহাম্মদ যেন পাথর থেকে পানি নির্গত করেন কিংবা পাথরকে সোনায় পরিণত করেন। যদি পাথর মুহাম্মদকে সম্ভাষণ জানাতে পারে তবে ওহুদের যুদ্ধে একটি পাথর কিভাবে মুহাম্মদের শরীরে আঘাত করে তাঁকে আহত করল? অলৌকিকতার-পূজারীরা এই পাথরকে 'নাস্তিক' বলে চিহ্নিত করবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই!

সুন্নি এবং শিয়া লেখকদের অসংখ্য বইয়ে বলা হয়েছে নবি মুহাম্মদের কোনো প্রতিবিম্ব ছিল না। তিনি সামনে-পিছনে সমানভাবে দেখতে পেতেন। শাহরানি[৪০] (মৃত্যু হিজরি ৯৭২ বা ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর বই 'কাশফ্ আল-ঘোম্মা'য় লিখেছেন : 'নবি মুহাম্মদ

চতুর্দিকে সমানভাবে দেখতে পেতেন এবং রাতের বেলাতেও তিনি দিনের মতো পরিষ্কার দেখতে পেতেন। তিনি যখন একজন লম্বা মানুষের সাথে হাঁটতেন, তখন তাঁকে লম্বা দেখাত এবং তিনি যখন বসতেন তখন তাঁর কাঁধ অন্যদের চেয়ে উঁচু থাকত।'

এই ধরনের বক্তব্যপ্রদানকারী মুসলমান লেখকেরা আসলে মুহাম্মদের মহানুভবতা, নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলী, দক্ষতা নির্ণয়ে একেবারেই অক্ষম। তাঁদের চিন্তাভাবনা পুরোপুরি সেকেলে। যে কারণে তাঁরা বাহ্যিক অবয়ব, শারীরিক সক্ষমতাকে কেবলমাত্র 'শ্রেষ্ঠত্বের'প্রতীক হিসেবে মনে করেছেন। একজন মানুষকে অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর করতে যে আধ্যাত্মিক, বৌদ্ধিক এবং নৈতিক সক্ষমতাই বিচার্য, এগুলি তাঁদের স্থুলচিন্তাধারায় স্থান পায়নি। শুধু তাই নয় তাঁদের মনে কখনো এই প্রশ্ন আসেনি কোনো অলৌকিক ঘটনা কেন মুহাম্মদকে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করেনি। তারা এও প্রশ্ন তুলেননি, মুহাম্মদ কেন কথিত দাবি অনুযায়ী 'লিখতে-পড়তে' পারতেন না? নবিকে প্রতিবিম্বহীন এবং মাথা ও কাঁধের দিক দিয়ে অন্যদের তুলনায় উচ্চতর করার পরিবর্তে তারা দাবি করলেই পারতেন, একজন ইহুদি হস্তলিপিকারককে ভাড়া করার পরিবর্তে নবি কেন নিজের আশীর্বাদপুষ্ট হাত দিয়ে কোরান লিখলেন না? সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই অলৌকিকতা-সন্ধানকারীরা নিজেরা মুসলিম ছিলেন, তাঁরা কোরান পড়েছেন এবং কোরানের অর্থ বোঝার জন্য যথেষ্ট আরবি জানতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা বিভ্রমের শিকার হয়ে সেগুলোকে ব্যাকুলভাবে 'সত্য' হিসেবে প্রচার করেছেন, যেগুলো কিনা সরাসরিভাবে কোরানের বক্তব্যের পরিপন্থী।

কোরানের যেসব আয়াত মুহাম্মদকে সকল মানবীয় গুণসম্পন্ন একজন মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করে সেইসব আয়াত নিখুঁতভাবে পরিষ্কার এবং এগুলোকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করার কোনো সুযোগ নেই। মক্কায় অবতীর্ণ সুরা তাহা এর ১৩১ নম্বর আয়াতে নবিকে বলা হয়েছে : 'আমি অবিশ্বাসীদের কাউকে-কাউকে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য হিসেবে ভোগবিলাসের যে-উপকরণ দিয়েছি তার দিকে তুমি কখনও লক্ষ্য কোরো না। তোমার প্রতিপালকের দেয়া জীবনের উপকরণ আরও ভালো ও আরও স্থায়ী।'(২০:১৩১)। একইভাবে মক্কায় অবতীর্ণ সুরা হিজরে বলা হয়েছে : 'আমি তাদের (অবিশ্বাসীদের) কতককে ভোগবিলাসের যে-উপকরণ দিয়েছি তার দিকে তুমি কখনও চোখ দিয়ো না। আর (ওরা বিশ্বাসী না হওয়ার জন্য) তুমি দুঃখ করো না। তুমি বিশ্বাসীদের প্রতি বিনয়ী হও।'(১৫:৮৮)। এই আয়াতগুলোর বক্তব্য থেকে এটা স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায়, নবি মুহাম্মদের মনে কোনো ধরনের উচ্চাশা ভর করেছিল। হয়তো তিনি আশা করছিলেন কুরাইশ নেতাদের মতো তিনিও বিপুল ধনসম্পদ এবং পুত্রসন্তানের অধিকারী হবেন।

মুহাম্মদের বেশিরভাগ প্রতিপক্ষ ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। ফলে স্বাভাবিকভাবে তাঁরা পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন এবং তাঁদের অবস্থানকে টলাতে সক্ষম যে কোনো ধরনের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে দাবিয়ে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। একইভাবে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর মুহাম্মদের অনুগামী হওয়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার। তাঁদের মধ্যেও দাবি আদায় ও বৈষম্য দূরীকরণের জন্য আকাঙ্ক্ষা ছিল। এই পরিস্থিতিতে নবি বিমর্ষবোধ করলেন এবং কিছু ধনাঢ্য ব্যক্তিকে পক্ষে টানার আশা করলেন। তাঁদের উপরেই ইসলামের ভবিষ্যত নির্ভর করছে বলে তিনি স্থির করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে এই পথে যেতে নিষেধ করলেন। সুরা সাবা'য় এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে : 'যখনই আমি কোনো জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি সেখানকার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছে, 'তুমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ আমরা তা অবিশ্বাস করি।'আর ওরা আরও বলত, আমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি বেশি, সুতরাং আমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না।'(৩৪:৩৪-৩৫)।

সুরা আন'আমের ৫২ নম্বর আয়াতে নবিকে যেভাবে সম্বোধন করার হয়েছে তাতে একজন চিন্তাশীল পাঠক চমকিত না হয়ে পারেন না : 'যারা তাদের প্রতিপালককে সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ডাকে তাদেরকে তুমি তাড়িয়ে দিয়ো না। তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয়, আর তোমার কোনো কর্মের জবাবদিহির দায়িত্বও তাদের নয় যে তুমি তাদের তাড়িয়ে দেবে, তাড়িয়ে দিলে তুমি সীমালঙ্ঘনকারীদের শামিল হবে।' (৬:৫২)। এই আয়াতে পরোক্ষভাবে তিরষ্কারমূলক মনোভাব

প্রকাশ পেয়েছে যা মুহাম্মদের মানবিক চরিত্র ও আচরণের গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রমাণ। পৌত্তলিকরা বলে আসছিল যে তাঁরা মুহাম্মদের দলে যোগ দিবেন না। কারণ তাঁর অনুসারীদের কোনো গুরুত্ব নেই। এ-কারণে সম্ভবত তিনি সমাজের প্রভাবশালী ও ধনীদের দলে টানতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং নিজের হতদরিদ্র অনুসারীদের দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন। এই অনুমানটি সুরা কাহাফের ২৭-২৮ আয়াতদ্বয় দ্বারা সমর্থিত হয়েছে : 'তুমি তোমার কাছে তোমার প্রতিপালক যে-কিতাব পাঠিয়েছেন তার থেকে আবৃত্তি করো। তাঁর বাণী পরিবর্তন করার কেউ নেই। তুমি কখনোই তাঁকে ছাড়া অন্য কোনো আশ্রয় পাবে না। তুমি তাদের সঙ্গে থাকবে যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডাকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশায়, আর তাদের ওপর থেকে মুখ চোখ ফিরিয়ে নিয়ো না পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে। আর যার হৃদয়কে আমি অমনোযোগী করেছি আমাকে স্মরণ করার ব্যাপারে, যে তার খেয়ালখুশির অনুসরণ করে আর যার কাজকর্ম সীমা ছাড়িয়ে যায় তাকে তুমি অনুসরণ করো না। (১৮:২৭-২৮)।

তফসির আল-জালালাইনের মতে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল সেই মুহূর্তে যখন ওয়ানা বিন হোসেন নামের একজন উপজাতীয় নেতা এবং তাঁর অনুসারীরা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল -যতক্ষণ পর্যন্ত না মুহাম্মদ তাঁর সহায়-সম্বলহীন দরিদ্র অনুসারীদের ত্যাগ করছেন। নবির ভ্রান্তি এবং সর্বোপরি একজন স্বাভাবিক মানুষের মতো তাঁর আচরণের পরিচয় পাওয়া যায় সুরা বনি-ইসরাইলের ৭৩-৭৫ নম্বর আয়াতত্রয়ে। যদিও আয়াতগুলো ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে নাজিল হয়েছিল, তথাপি এগুলোর প্রত্যেকটির অর্থ একই: 'আমি তোমার কাছে যে-প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছি তার থেকে তোমার বিচ্যুতি ঘটানোর জন্য ওরা চেষ্টা করবে যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে কিছু মিথ্যা কথা বানাও, তা হলে, ওরা অবশ্যই বন্ধু হিসেবে তোমাকে গ্রহণ করবে। আমি তোমাকে অবিচলিত না রাখলে তুমি ওদের দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকেই পড়তে। তুমি ঝুঁকে পড়লে অবশ্যই আমি তোমাকে ইহজীবন ও পরবীজনে দ্বিগুণ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাতাম, তখন আমার বিপক্ষে তোমাকে কেউ সাহায্য করত না।' (১৭:৭৩-৭৫)। কিছু তফসিরকারকের মতে এই আয়াতগুলো নাজিল হয়েছিল যখন মুহাম্মদ কয়েকজন কুরাইশ নেতার সাথে (প্রথম অধ্যায়ের 'নবুওতি অর্জনের পর' অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) আলোচনা করেছিলেন। সে সময় তিনি সুরা নজম উচ্চারণ করেছিলেন এবং স্বীয় বক্তব্যের জন্য পরবর্তীতে নিজে অনুশোচনা করেছিলেন : 'এরাই হচ্ছে সেই উড়ন্ত সারস। তাই এদের মধ্যস্থতা আশা করা যেতে পারে।' (স্যাটানিক ভার্সেস বা শয়তানের আয়াত নামে পরবর্তীতে প্রচারিত)।

আবু হুরায়রা[৪১] এবং কাতাদা'র[৪২] বক্তব্য অনুযায়ী এই তিনটি আয়াত মুহাম্মদ ও কুরাইশ নেতাদের মধ্যে আলোচনার পর নাজিল হয়েছিল যেখানে কুরাইশ নেতারা মুহাম্মদকে তাঁদের উপাস্য দেবতাদের সম্মান করতে কিংবা অন্তত অসম্মান না করার দাবি জানিয়েছিলেন। বিনিময়ে তাঁরা মুহাম্মদকে শান্তিতে বসবাসের আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং তাঁর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনেও আগ্রহ জ্ঞাপন করেছিলেন। এছাড়া তাঁরা গরীব, গৃহহীন মুসলমানদেরকে নির্যাতন, প্রহার ও রৌদ্রতপ্ত পাথর নিক্ষেপ বন্ধেরও আশ্বাস দিয়েছিলেন। নবি স্বাভাবিকভাবে প্রথমে এই প্রস্তাবের প্রতি নমনীয়ভাব প্রদর্শন করেছিলেন। যদিও তা প্রয়োগের সময়ে সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেন। তিনি চিন্তা করে দেখলেন, পৌত্তলিকতা এবং মূর্তিপূজা বিলোপের কুরাইশদের প্রস্তাবিত মীমাংসায় পৌঁছালে তাঁর এতোদিনের ধর্মপ্রচারের ফলাফল বিলোপ হয়ে যাবে। হয়তো তাঁকে ওমরের মতো নিষ্ঠাপ্রাণ, মাথা নত না করা অসীম সাহসী আলি এবং হামজার মতো বিশ্বাসী যোদ্ধারা বুঝিয়েছেন, যেকোনো প্রকার আপোস গুরুতর ভুল কিংবা পরাজয়ে রূপ নেবে। যেকোনো পরিস্থিতিতেই হোক, এই তিনটি আয়াত প্রমাণ করে নবি মুহাম্মদের চরিত্রে আবেগময়তা এবং প্রলুব্ধ হবার মতো মানবীয় গুণাবলী বিদ্যমান ছিল।

কোরানের অন্য আয়াত থেকেও এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। সুরা ইউনুসের ৯৪-৯৫ আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে : 'আমি তোমার কাছে যা অবতীর্ণ করেছি তাতে যদি সন্দেহ হয় তবে তোমার আগের কিতাব যারা পড়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো। তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার কাছে সত্য এসেছে। তুমি কখনও সন্দিহানদের শামিল হয়ো না। আর যারা আল্লাহর নির্দেশ

প্রত্যাখ্যান করেছে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না; হলে, তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবে।(১০:৯৪-৯৫)। একইভাবে সুরা মায়িদাতে বলা হয়েছে : 'হে রসুল! তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করো, যদি না কর তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।'(৫:৬৭)। একজন বিশ্বাসী মুসলমান, যিনি কোরানকে আল্লাহর বাণী হিসেবেই গ্রহণ করেছেন, তিনি এই আয়াতগুলো কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? নবিকে এভাবে ভর্ৎসনা করার মানে কি?

নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, এর একমাত্র ব্যাখ্যা হচ্ছে মানবিক দুর্বলতা এবং নৈতিক ক্রুটি নবির শুভসত্তাকে গ্রাস করতে শুরু করেছিল। তিনি মানুষকে ভয় করতে শুরু করেছিলেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তাঁকে অভয় দিলেন -যেকোনো প্রকার নিষ্পেষণ থেকে তিনি তাকে রক্ষা করবেন। কুরাইশ নেতা ওয়ালিদ বিন আল-মুগিরা, আলাস বিন ওয়ায়েল, আদি বিন কায়েস, আসওয়াদ বিন আব্দুল মোতালেব এবং আসওয়াদ বিন আবদে ইয়াগুস প্রমুখ মুহাম্মদের চরিত্র ও ধর্মপ্রচারকে ব্যঙ্গ করে গভীর কষ্ট দিয়েছিলেন। হয়তো তিনি বিরক্ত হয়ে ধর্মপ্রচার নিয়ে অনুতপ্ত হতে শুরু করেছিলেন কিংবা হয়তো মানুষকে তাদের মতো চলতে দিয়ে নিজের ধর্মপ্রচারকার্য পরিত্যাগ করার চিন্তাভাবনাও শুরু করেছিলেন। তা না-হলে সুরা হিজরের ৯৪-৯৫ নম্বর আয়াতদ্বয় তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হতো না : 'অতএব তোমাকে যে বিষয়ে আদেশ করা হয়েছে তা প্রকাশ্যে প্রচার করো আর অংশীবাদীদেরকে উপেক্ষা করো। যারা বিদ্রুপ করে তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আমিই যথেষ্ট।' (১৫: ৯৪-৯৫)। এই সুরার পরবর্তী তিন আয়াতও প্রস্তাবিত ব্যাখ্যা সমর্থন করে : 'আমি তো জানি ওরা যা বলে তাতে তোমার মন ছোট হয়ে যায়। তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা করে তাঁর মহিমাকীর্তন করো আর সিজদাকারীদের শামিল হও। তোমার কাছে নিশ্চিত বিশ্বাস (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের উপাসনা করো।'(১৫:৯৭-৯৯)। কোরানের কয়েকজন তফসিরকারক সুরা হিজরের ৯৯ নম্বর আয়াতে ব্যবহৃত 'ইয়াকিন' শব্দটি 'মৃত্যুর অনিবার্যতা'কে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে বলে ধরে নিয়েছেন। মুহাম্মদকে নৈতিক ক্রুটির ঊর্ধ্বে বিবেচনা করার কারণে তাঁরা নবির দুর্বলতাকে স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে কোরানের ভাষ্যের বিপরীত ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেছেন। সুরা হিজরের তিনটি আয়াতের অর্থ সুস্পষ্ট। মুহাম্মদ ব্যাপকভাবে নিরাশায় ভুগছিলেন। যে-কারণে তাঁর মাঝে দ্বিধাবোধ তৈরি হয়েছিল। এমন কী নিজের যোগ্যতা নিয়েও তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল। যদিও আল্লাহকে প্রার্থনা ও প্রশংসার মাধ্যমে শেষপর্যন্ত তাঁর মনে নিশ্চয়তা ফিরে এসেছিল, তিনি তাঁর গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবেন। সুরা আহজাবের প্রথম আয়াতে মুহাম্মদকে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে : 'হে নবি! তুমি আল্লাহকে ভয় করো। এবং তুমি অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না। আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী।'(৩৩:১)। তফসির আল-জালালাইন গ্রন্থে এই আয়াতের প্রথম ক্রিয়াপদকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'ভয় করতে থাক'হিসেবে। আরেকটি তফসির অনুযায়ী যদিও উভয় আদেশই মুহাম্মদের উদ্দেশ্যে নাজিল হয়েছে, তারপরও তা মূলত সমগ্র মুসলিম জাতির জন্যই অবতীর্ণ হয়েছিল। এই তফসিরকারকদের মোহগ্রস্ততা তাদের সত্যতা থেকে অনেক বেশি। কারণ এই সুরার পরের আয়াতেই আল্লাহ মুহাম্মদকে বলেছেন : 'তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তুমি তার অনুসরণ করো।'(৩৩:২)।

উপরোক্ত আয়াতগুলো সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে নবি স্বাভাবিক ও মানবিকভাবে তাঁর হতাশা ব্যক্ত করেছিলেন এবং প্রতিপক্ষের দাবি মেনে নিবেন কিনা ভেবে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন। আল্লাহ তাঁকে এ-কাজে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। বিজ্ঞানসম্মতভাবে বলা যায়: বিরোধী পক্ষের তীব্র আপত্তি, প্রতিবাদ, প্রতিরোধের মুখে নবি যখন নিঃশেষিত, হতোদ্যম হয়ে গিয়েছিলেন, তখন নিজেকে পুনরায় আল্লাহর প্রতি সমর্পণের মাধ্যমে ও নিজের অভ্যন্তরীণ ইচ্ছাশক্তিতে বলীয়ান হয়ে পুনরায় নিজ কক্ষপথে ফিরে আসেন।

এই ব্যাখ্যাকে যদি অস্বীকার করাও হয় তাহলে অবশিষ্ট একমাত্র ব্যাখ্যা থাকতে পারে তা হলো, নবি মক্কার প্রতিকূল পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য প্রতিপক্ষের দাবির সাথে আপোষ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তাঁকে এ কাজে নিষেধ করেন। মুহাম্মদের রাজনৈতিক বিচক্ষণতার কথা বিবেচনায় নিলে এই ধারণা বিতর্কযুক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু আমরা যদি নবির সত্যনিষ্ঠতা, একাগ্রতা এবং নৈতিক শক্তির কথা বিবেচনা করি তাহলে তা আদৌ সম্ভব নয়। মুহাম্মদ যা বলতেন তিনি তা বিশ্বাস করেই বলতেন এবং তিনি নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত দূত বলেই বিশ্বাস করতেন।

এই অধ্যায়ের শেষে প্রাসঙ্গিক হওয়ায় ক্যামব্রিজ তফসির[৪৩] (কোরানের একটি প্রাচীন ফার্সি ভাষ্য) থেকে একটি গল্প উল্লেখ করা যেতে পারে। এখান থেকে কোরান নাজিল হওয়ার ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে ইসলামের প্রথম কয়েকশ বছরে মুসলমানদের চিন্তাভাবনার একটি বিশদ চিত্র পাওয়া যাবে। এই গল্পটি ওই তফসিরের (পৃষ্ঠা ২৯৫, ভলিউম ২, তেহরান সংস্করণ) রয়েছে এভাবে : সুরা নজম শুরু হয়েছে, ‘শপথ অস্তমিত নক্ষত্রের’ শব্দগুলো দ্বারা। সুরা নজম পাঠ করার পর চাচা আবু লাহাবের ছেলে ওতাইবা নবিকে বললেন, তিনি কোরানে বর্ণিত নক্ষত্রে বিশ্বাস করেন না। নবি বিরক্ত বোধ করে তাকে অভিশাপ দিলেন। আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে বললেন: ‘হে আল্লাহ! তোমার শিকারী কোনো পশু দ্বারা যেন সে পরাজিত হয়।’ ওতাইবা এ-কথা শোনার পর ভয় পেয়ে গেলেন। কিছুদিন পর ওতাইবা একটি মরুযাত্রীদলের সাথে ভ্রমণ করছিলেন। ওই দলটি হারানে পৌঁছে যাত্রাবিরতি করে। ওতাইবা নিজের বন্ধুদের মাঝে শুয়ে পড়েন। আল্লাহ একটি সিংহ পাঠালেন, ওতাইবাকে তাঁর বন্ধুদের মধ্য থেকে তুলে নিয়ে গেল এবং তাঁর দেহ ছিন্নভিন্ন করে দিলেও অভিশপ্ত দেহাবশেষ ভক্ষণ করল না। ফলে সকল মানুষ জেনে গেল সিংহটি তাঁকে আহারের জন্য ধরে নিয়ে যায়নি, বরং নবির প্রার্থনা পূর্ণ করতে গিয়েছে।’এই গল্পের রচয়িতাদের মনে এই কথা একবারো আসেনি, ওতাইবাকে অভিশাপ দেবার পরিবর্তে নবি বরং তাঁকে ক্ষমা করে দেবার জন্য এবং তাঁকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে পারতেন। এতে বরং ইসলামের মহানুভবতা অনেক বেশি প্রচারিত হতো। ইসলাম কী পরম করুণাময়, দয়াময়, জগতের কর্তার প্রতি বিশ্বাস নয়?

হিজরতের পর মদিনাতে ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় বিশ্বাস হিসেবে সীমাবদ্ধ ছিল না। একটি নতুন আইনি কাঠামো এবং আরব রাষ্ট্রের ভিত্তিতে পরিণত হয়। নবুওতির শেষ দশ বছরে মুহাম্মদ যখন মদিনায় অবস্থান করছিলেন তখন ইসলামের সকল আদেশ এবং বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। প্রথম পদক্ষেপটি ছিল প্রার্থনা বা কিবলার দিক জেরুজালেম থেকে মক্কার দিকে পরিবর্তন করা। এই ঘটনার ফল দাঁড়াল মুসলমানদের চেয়ে ইহুদিদের থেকে আলাদাভাবে কর আদায় করা হতে লাগল। আরেকটি ঘটনা ঘটল মদিনার আরবরা তাদের দীর্ঘদিনের হীনমন্যতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয় এবং আরব বেদুইনদের মধ্যে জাতীয়তাবোধেরও উন্মেষ ঘটে। কাবা ঘরকে যেসব গোত্র তাঁদের উপাস্য-দেবতার মন্দির হিসেবে ব্যবহার করত তা সকল আরবদের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম ও ইসমাইলের গৃহ হিসেবে পরিগণিত হয়। একইভাবে উপবাসের ক্ষেত্রেও ইহুদিদের অনুকরণ করা বর্জিত হল। ইহুদিরা মহরম মাসের দশম দিন উপবাস পালন করত, যা আরও কয়েকদিন বর্ধিত করা হলো। পরবর্তীতে পুরো রমজান মাসকেই উপবাসের জন্য বরাদ্দ দেয়া হলো।

তবে বিবাহ, বিচ্ছেদ, রজঃস্রাব, উত্তরাধিকার, বহুগামিতা, অবৈধ যৌনসংগম, পরকীয়া ও চুরির ক্ষেত্রে জরিমানা, প্রতিশোধ, রক্তের দামও অন্যান্য অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে এবং নাগরিক বিষয়াদি যেমন অপরিচ্ছন্নতা, খাদ্যাভাসে নিষেধাজ্ঞা, খৎনার ক্ষেত্রে প্রধানত ইহুদি আইনগুলো ও বৃহত্তর আরব-ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে তা মদিনায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নাগরিক ও অন্যান্য ব্যক্তিগত বিষয়ক ইহুদি ও পৌত্তলিক আরবীয় চিন্তাধারা, রীতিনীতি প্রভাবিত আইনসমূহ সামাজিক-অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে বিনা-প্রশ্নে ব্যবহার করা হয়েছে।

পাদটীকা

২৩. হিশাম বিন মুহাম্মদ আল-কালবি রচিত ‘তানকিস আল আসনাম’ বইটি ১৯১২ সালে আহমদ জাকির সম্পাদনায় কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬৯ সালে ডব্লিউ. আতাউল্লাহ কর্তৃক সম্পাদনায় প্যারিস থেকে ফরাসি অনুবাদে প্রকাশিত হয়েছে। সত্তর দশকের শুরুর দিকে ইরানের তেহরান থেকে ফার্সি অনুবাদ করেছেন সাঈদ মোহাম্মদ রেজা জালিলি নাইনি। ‘*The Book of Idols*’ শিরোনামে ইংরেজি অনুবাদ করেছেন নাবিহ আমিন ফারিস। প্রকাশিত হয়েছে প্রিন্সটন থেকে ১৯৫২ সালে।

২৪. অনেকের মতে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর এবং কবিতা রচয়িতা একই ব্যক্তি। তাঁর নাম ইমরুল কায়েস, যাকে প্রাক-ইসলামি কবিদের ‘রাজকুমার’হিসেবে অভিহিত করা হয়। দ্রষ্টব্য : R A Nicholson, *A Literary History of the Arabs*, London, 1907, reprint in Cambridge 1953, pp. 103-105 এবং *Encyclopaedia of Islam*, 2nd ed., articles Dhu'l-Khalasa and Imru' al-Kays.

২৫. ইবনে ইসহাক রচিত ‘*Life of Mohammad*’(অনুবাদ : A. Guillaume), Oxford 1955, p.37-এ উদ্ধৃত রয়েছে।

২৬. ইরানের অনেক স্থানে ইমামজাদাদের মাজার পাওয়া যায়। ভক্তরা এখানে এসে মৌখিকভাবে অথবা কাগজে বা দাখিল নামক এক টুকরা কাপড়ে লিখে সাহায্যের আকুতি জানায়। কবরগুলোর অনেকগুলোর উপর গম্বুজ বানিয়ে রাখা হয়েছে যার কতগুলো আবার অনেক পুরনো। এদের মধ্যে কতগুলো কবর হল স্থানীয় সাধকদের। এদের বেশিভাগেরই জীবনী সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। তারপরও এদেরকে ইমামদের বংশধর হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে আসছে।

২৭. আলি দস্তি এই অনুবাদটিকে গ্রহণ করেছেন। আরেকটি অনুবাদে পাওয়া যায় ‘and a guide to every nation’ ব্যাকরণগতভাবে উভয়ই সঠিক।

২৮. জালালউদ্দিন আল-সুয়ুতি মিশরীয় বংশোদ্ভূত কোরানের তফসিরকারক। কোরানের ‘তফসির আল-জালালাইনে’র সহলেখক।

২৯. ইব্রাহিম আন-নাজ্জাম নেতৃস্থানীয় মুতাজিলা দার্শনিক। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের স্বাধীন চিন্তার ফলেই কোরান রচিত হয়েছে। যদিও তাঁর বেশ কিছু লেখা ইতিমধ্যে হারিয়ে গেছে কালের পরিক্রমায়, তবে তাঁর কিছু উদ্ধৃতি অন্যান্য মুতাজিলা দার্শনিকদের (যেমন আল-জাহেজ) লেখায় পাওয়া যায়।

৩০. নবম শতাব্দীর দিককার আবু আল-হাসান আহমেদ ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে ইশহাক আল-রাওয়ানদি সংশয়বাদী মুতাজিলা দার্শনিক হিসেবে প্রখ্যাত। তাঁর অনেক লেখনী সমসাময়িক গোঁড়া মুসলমান ধর্মতাত্ত্বিক দ্বারা ‘ধর্মদ্রোহী’হিসেবে সমালোচিত হয়েছে।

৩১. আবু মুহাম্মদ আলি বিন আহমেদ বিন হাজম (জন্ম হিজরি ৩৮৪ বা ৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ-মৃত্যু হিজরি ৪৫৬ বা ১০৬৪ খ্রিস্টাব্দ) প্রভাবশালী মুরীয় ধর্মতাত্ত্বিক এবং ইতিহাসবিদ। ধর্ম ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ইতিহাস নিয়ে তাঁর বই 'আল-মেলাল ওয়ান-নিহাল'মুসলিম দর্শন ও ধর্মের ইতিহাসের শিক্ষার্থীদের কাছে পরিচিত।

৩২. আবুল হোসেন আব্দুর রহিম বিন মুহাম্মদ আল-খাইয়াত (৮৩৫-৯১৩ খ্রিস্টাব্দ) বাগদাদ নিবাসী খ্যাতিমান মুতাজিলা দার্শনিক। তাঁর অনেক লেখা হারিয়ে গেলেও অবশিষ্ট এখনো কিছু বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায়।

৩৩. আলি দস্তি তাঁর বইয়ের মূল ফার্সি সংস্করণে 'ফেরেশতা'শব্দ ব্যবহার করলেও সাধারণভাবে 'জিব্রাইল ফেরেশতা'র কথা প্রচলিত আছে।

৩৪. শামসুদ্দিন মুহাম্মদ হাফিজ (১৩২৫-১৩৯০ খ্রিস্টাব্দ) পারস্যের খ্যাতিমান কবি।

৩৫. জালালউদ্দিন রুমি পারস্যের সুফিবাদি মৌলভি হিসেবে পরিচিত হলেও তাঁর আরেকটি পরিচয় হচ্ছে তিনি একই সাথে প্রখ্যাত কবি। এশিয়া মাইনর অঞ্চলের কনিয়া অঞ্চলে তিনি বাস করতেন। কাব্যচর্চা ছাড়াও আলকেমির প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল।

৩৬. ইজহাক গোল্ডজিহার (খ্রিস্টাব্দ ১৯২১-১৮৫০)বুদাপেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যাপক। ইসলামের ইতিহাস, মুহাম্মদের জীবনী নিয়ে তাঁর অনেকগুলো গবেষণাগ্রন্থ রয়েছে। যেমন :*Muhammadanische Studien,* 2 vols, Halle 1889-90, 1£. by C. R, Barber and S. M. Stern, *Muslim Studies,* 2 vols, London 1967-71; *Vorlesungen aber den Islam,* Heidelberg 1910, 2nd ed. 1923,1£. by Felix Arin, *Le dogme et la loi de l'lslam,* Paris 1920, 2nd ed. 1958, and by A. and R. Hamori, *Introduction to Islamic theolegy and law,* Princeton 1981; and *Die Richtungen der Islamischen Koranauslegung,* Leiden 1920.

৩৭. আবুল আব্বাস আহমেদ বিন মুহাম্মদ আল-কাসতালিনি মিশরের কায়রো নিবাসী লেখক। তিনি মুহাম্মদের জীবনী ও হাদিসের ভাষ্য নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন।

৩৮. দ্রষ্টব্য : পাদটীকা ১৫। আলফ্রেড গিয়োমের অনুবাদের ৬৭৭-৬৭৮ পৃষ্ঠায় সংযোজিত।

৩৯. হিজরতের কিছু পরে নবি মুহাম্মদ আনাস বিন মালেককে দাস হিসেবে গ্রহণ করেন। নবির মৃত্যু পর্যন্ত সাথেই ছিলেন। উমাইয়াদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেছেন। ৯১ বছর বয়সে তিনি বসরাতে মৃত্যুবরণ করেন।

৪০. আব্দুল ওয়াহাব আস-শাহরানি মিশরের একজন প্রসিদ্ধ ধর্মীয় নেতা এবং লেখক।

৪১. আবু হুরায়রা (মৃত্যু হিজরি ৫৮ বা ৬৭৮ খ্রিস্টাব্দ) ইয়েমেন থেকে মদিনায় এসে বসবাস করেন। মুহাম্মদের মৃত্যুর প্রায় চার বছর আগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। হাদিস ভাষ্যকার হিসেবে পরিচিত।

৪২. কাতাদা ইরাকের বসরাতে বসবাসকারী একজন অন্ধ বেদুইন। হাদিস-ভাষ্যকার হিসেবে পরিচিত।

৪৩. কোরানের দুর্লভ ফার্সি ভাষার একটি তফসির প্রকাশ করেছে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি। এক হাজার খ্রিস্টাব্দের দিকে রচিত ফার্সি তফসিরটির মূল লেখক কে জানা যায় না। ধারণা করা হয় ১২৩১ খ্রিস্টাব্দের দিকে এর প্রতিলিপিকরণ করা হয়েছে। 'ক্যামব্রিজ তফসির'- এ কোরানের ১৯ নম্বর সুরা মরিয়ম থেকে ১১৪ নম্বর সুরা নাস-এর তফসির পাওয়া গেলেও আগের

সুরাগুলোর তফসির পাওয়া যায় নাই। ফার্সি ভাষায় এই তফসিরকে সবচেয়ে প্রাচীন দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৯৭০ সালের দিকে পুনরায় তেহরান থেকে দুই খণ্ডে তফসিরটি প্রকাশিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

রাজনীতি

দেশান্তর

ইতিহাস চলমান। তবে এর পাতায় পাতায় আমরা এমন অনেক তারিখ খুঁজে পাই যা বিরাট কোনো পরিবর্তনের সূচনা হিসেবে আমাদের মনে গেঁথে থাকে। এমনই একটি দিন ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর বা ১২ রবিউল আউয়াল। এই দিন নবি মুহাম্মদ ইয়াসরিব শহরে পদার্পণ করেন। স্রেফ ধর্মীয় কারণে মুসলমানরা নবির এই দেশান্তরকে (হিজরত) একটি নতুন যুগের সূচনা হিসেবে দেখে থাকেন। প্রাচীন আরবীয়রা নির্দিষ্ট কোনো যুগের অন্তর্গত ছিল না। খুব সম্ভবত ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের দিকে আব্রাহার নেতৃত্বে আবিসিনীয় বাহিনী মক্কা আক্রমণ করে পৌত্তলিকতার তীর্থভূমি কাবাঘর ধ্বংস করে ফেলতে চান। এটি হাতির বছর নামেও পরিচিত[৪৪]। কারণ আবিসিনীয় বাহিনী এই যুদ্ধে শতাধিক হাতি ব্যবহার করেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত আবিসিনীয় বাহিনী মক্কাবাসীর সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়। অনেকে সেদিন হতে নতুন দিনপঞ্জি গণনা করতে শুরু করেন। হিজরতের সময় হতে মুসলমানদের নতুন যুগের সূচনার দাবির পিছনে আরেকটি কারণ চিহ্নিত করা যায়। হিজরতের পর থেকে নবির প্রতি আনুগত্যের কারণে মুসলমানদের সাহস অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁরা ক্ষমতা পেয়েছেন এই হিজরতের পর। মদিনার আউস ও খাজরাজ গোত্রের সদস্যরাও এ-সময় নবিকে নিরাপত্তাদানের গুরুত্ব অনুধাবন করেন। তাদের পরিচিতি হয় 'আনসার' হিসেবে।

তবে ইসলামের নতুন যুগের গণনা শুরু রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ থেকে শুরু হয়নি। একই বছরের প্রথম মাস মহরমের প্রথম তারিখ (১৬ জুলাই, ৬২২ খ্রিস্টাব্দ) থেকে গণনা করা হয়। স্বাভাবিকভাবে তৎকালীন আরবদের মনে এমন কোনো চিন্তা আসেনি যে, ওই বছরের ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখটিই পরবর্তীতে তাদের জীবনধারায় এক বড় ধরনের পরিবর্তনের সূচনা হয়ে দাঁড়াবে। সমসাময়িক বিশ্বেরও কেউ ভাবতে পারেনি যে একদল মরুবাসী, যারা সভ্যতার ইতিহাসে কখনো কোনো অবদান রাখেনি, যারা উন্নততর গোষ্ঠী রোমান রাজা সিজার ও ইরানি বাদশাহ খসরু-১'র অনুগত হয়ে নিজেদের গর্বিত মনে করত, তারা দ্রুতই প্রাচীন সভ্যতার এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূখণ্ডের সর্বেসর্বা হয়ে উঠবে। (পারস্যের জরথুস্ত্র ধর্মাবলম্বী এই রাজার নাম 'খসরু-১ আনুশিরুওয়ান', যার অর্থ 'অমর আত্মা খসরু'। তিনি ৫৩১ থেকে ৫৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সাসানিদ রাজবংশের শাসক ছিলেন। তার জন্ম ৫০১ খ্রিস্টাব্দে। পারস্যের ইতিহাসে শিল্পকলার একজন মহান সংস্কারক ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বিবেচিত হন।)

এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে স্থানান্তরিত হওয়া আরবদের নিকট নতুন কিছু ছিল না। একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে, ষষ্ঠ শতাব্দীর দিকে ইয়েমেনের প্রাচীন মারিব[৪৫] বাঁধ ভাঙার পর দক্ষিণ আরবীয় গোষ্ঠীগুলোর উত্তর সীমান্তের দিকে অভিবাসিত

হওয়া। সে তুলনায় মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীদের এবং কুরাইশ পৌত্তলিকদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে কিছু অভিবাসীর মক্কা থেকে ইয়াসরিবে স্থানান্তরকে ইতিহাসের আলোকে অগুরুত্বপূর্ণ বলা যায়। তবে অগুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই এক দশকের মাথায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে। দশ বছরের মাথায় যে সকল ব্যক্তি মুহাম্মদের সাথে মক্কা ত্যাগ করেছিলেন, তারাই মক্কার শাসক হয়ে ওঠেন এবং তাদের প্রতিপক্ষকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন। প্রতিপক্ষের উপাস্য সকল মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়। কুরাইশদের পরিচালিত কাবার চিরাচরিত নিয়মকানুন সব বাদ দেয়া হয়। আবু লাহাব ও আবু জেহেলের উত্তরসূরি আবু সুফিয়ান প্রাণভয়ে আত্মসমর্পণ করেন। এছাড়া অন্যান্য সকলে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ব্যক্ত করেন। ছোট ছোট ঘটনার সমন্বয়ে একটি বড় ঘটনার সৃষ্টি হওয়া ইতিহাসে বিরল নয়। উদাহরণ হিসেবে আছে ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব এবং ইরানে মঙ্গলীয় আগ্রাসন।

মুহাম্মদকে ধর্ম প্রচারকালের শুরু থেকে কুরাইশ প্রধানদের সাথে লড়াই করতে হয়েছে। সম্ভবত তিনি প্রথমে আশা করেননি যে, তার প্রচারিত ধর্ম প্রাথমিকভাবে যৌক্তিক ও অন্যান্য দুই সেমিটিক ধর্মের সাথে সদৃশ হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে এমন বিরোধের সম্মুখীন হতে হবে। তিনি খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে এটা ভেবে দেখেননি যে, তার দীক্ষা গ্রহণের কারণে কুরাইশদের প্রাধান্য, ক্ষমতা, অর্থ, বিত্তকে খাটো করে দেবে। তাদের শত্রুভাবাপন্নতা যখন বেড়ে যায় তখন নবি তা প্রতিরোধ করার উপায় বের করার পরিকল্পনা করতে বাধ্য হন। ইয়াসরিবে চলে যাওয়ার আগে তিনি এ ব্যাপারে আগেই দুটি পদক্ষেপ নিয়ে রেখেছিলেন। প্রথম পদক্ষেপটি ছিল আবিসিনিয়ায় কিছু মুসলমানকে পর পর দুই দলে বিভক্ত করে পাঠানো। গরিব, অসহায় ও কুরাইশ কর্তৃক নির্যাতিত মুসলমানরা নবির কাছ থেকে আবিসিনিয়ায় যাওয়ার পরামর্শ পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় দলের সদস্যের (যাদের মধ্যে নবির চাচাত ভাই এবং হজরত আলির আপন বড়ভাই জাফর বিন আবু তালেবও ছিলেন) পরিচয় লাভের মাধ্যমে এ বিষয়ে কিছু সিদ্ধান্তে আসা যায়। নিগাসের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশাও মুহাম্মদের মনে এসেছিল। আবিসিনিয়ার একজন খ্রিস্টান শাসক হিসেবে নিগাস স্বাভাবিকভাবে পৌত্তলিকতার বিরোধী হবেন। যখন তিনি জানতে পারবেন মক্কায় একদল একেশ্বরবাদী জোট হয়ে পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের চেষ্টা করছেন এবং তাঁরা সেখানে নিগৃহীত হচ্ছে, তখন তিনি তাদের সহায়তা করার জন্য একটি বাহিনী হয়তো পাঠিয়ে দিতে পারেন। নিগ্রহের শিকার না হওয়া ও তুলনামূলক সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে আসা জাফর বিন আবু তালিবের অংশগ্রহণের কারণ এ থেকে বোঝা যায়। একই সময়ে কুরাইশরা আমর ইবনে আল-আস ও আব্দুল্লাহ বিন আবু রাবিয়াকে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নিগাসের কাছে কিছু উপহারসহ পাঠিয়ে দেন। তাদের আশা ছিল এতে করে মুসলমানদের প্রস্তাবিত কোনো বিষয়ে নিগাস যেন রাজি না হন এবং সম্ভব হলে তাদের ঐতিহ্য রক্ষার্থেও তিনি যেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। দ্বিতীয় পদক্ষেপটি ছিল ৬২০ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদের তায়েফের[৪৬] উদ্দেশ্যে যাত্রা। নিজের চাচা ও আশ্রয়দাতা আবু তালিব এবং বিবি খাদিজাকে হারানোর পর তাঁকে আগের চেয়ে অনেক বেশি শত্রুভাবাপন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। তিনি তায়েফ-নিবাসী বানু সাকিফ গোষ্ঠীর নিকট থেকে সাহায্য আশা করেছিলেন, যাদের সাথে তার মাতৃবংশীয় সম্পর্ক ছিল। তায়েফে অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে বানু সাকিফদের অবস্থান সম্মানের দিক থেকে অনেক উঁচুতে ছিল। তায়েফের জনগণ মক্কার অবস্থান ও বেদুইনদের মাঝে কুরাইশদের সম্মানকে ঈর্ষার চোখে দেখত। কুরাইশদের আধিপত্য এড়ানোর জন্য তাঁরা স্বাভাবিকভাবে নিজেদের শহরকে আরবীয়দের মিলনমেলায় পরিণত করতে চাইত। এটা কোনো কল্পনা নয় বরং প্রমাণিত সত্য। কারণ নবিকে সাকিফ-প্রধানদের সাথে একটি সাক্ষাতের কথা স্মরণ করতে দেখা গেছে। সাকিফ-প্রধানরা বলেছিলেন, তায়েফকে নতুন ধর্মের কেন্দ্র ও পবিত্র ভূমি ঘোষণা করা হয় তবে তায়েফের জনগণ অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করবে। এর আগে তায়েফের আরেকটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী বানু আমেরও নবির কাছে এরকম একটি প্রস্তাব দিয়েছিল। তাঁরা অনুরোধ করেছিল তাদের সাহায্যে যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করে তবে কুরাইশদের স্থলে তাদেরকেই যেন আরবের সবচেয়ে প্রভাবশালী গোষ্ঠী বানিয়ে দেয়া হয়। পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে নবির তায়েফ যাত্রার মূল উদ্দেশ্য ছিল নিজের রাস্তা পরিষ্কার করা। তাঁকে সাহায্য করার ইচ্ছা যদি বানু সাকিফদের মধ্যে থাকত তবে কুরাইশদের পরাস্ত করা সম্ভব ছিল। এ-কারণে তিনি গোপনে তার মুক্ত ক্রীতদাস ও পালিত পুত্র জায়েদ বিন হারিসকে

নিয়ে অন্য কোনো সঙ্গী ছাড়াই তায়েফ সফরে গিয়েছিলেন। তবে তার আশা অবশ্য ভঙ্গ হয়েছিল, কারণ বানু সাকিফ-প্রধানরা তাঁকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে।

আরব বেদুইনদের মাঝে আধ্যাত্মিক বিষয়ে কখনো তেমন আগ্রহ ছিল না। এমনকি আজও মুহাম্মদের চৌদ্দ শতক পরেও তারা ধর্মকে পার্থিব অর্জন হিসেবে দেখে। বানু সাকিফরা ভবিষ্যতের মুক্তির কথা ভেবে নিজেদের জীবিকার প্রতি অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন। তায়েফ মূলত গ্রীষ্মকালে ব্যস্ত হয়ে উঠত। তায়েফের জনগণ মক্কার পর্যটকদের কাছ থেকে এবং বাণিজ্যিক লেনদেনের মাধ্যমে আয়-উপার্জন করতেন। কুরাইশরা মুহাম্মদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল এবং তাঁকে কোনোরূপ সাহায্য দিতে দেখলে আরও বেশি শত্রভাবাপন্ন হয়ে উঠতে পারে। কাজেই নবির অপ্রমাণিত প্রতিশ্রুতির তুলনায় তায়েফের জনগণের নিরাপত্তা ও উন্নয়নের দিকে নজর দেয়াটাকে বানু সাকিফদের যৌক্তিক মন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। লাভ ক্ষতির এমন সমীকরণের সামনে থেকে তায়েফের-প্রধানরা মুহাম্মদকে সাহায্য করতে শুধু অস্বীকৃতিই জানাননি, তার প্রতি বিদ্বেষও সৃষ্টি করেছিল। তাঁরা নবিকে আঘাত করেছিল, অপমানিত করেছিল, এমনকি নবির শেষ অনুরোধটিও পর্যন্ত তাঁরা রাখেননি। যা ছিল তার এই অসফল সফর প্রসঙ্গে কুরাইশদেরকে কিছু না জানানো। কিন্তু কুরাইশরা ঠিকই বার্তা পেলেন। ফলে মক্কায় নবির বিরোধীরা আরও বেশি সহিংস হয়ে উঠেন। শেষে পৌত্তলিকদের কিছু নেতা মুহাম্মদের নবুওতি ভাবনার (যা তাদের অবস্থান ও বিত্তের প্রতি হুমকি হয়ে উঠেছিল) সমাপ্তি টানার উপায় বের করার জন্য সমাবেশে মিলিত হন। যে তিনটি প্রস্তাব উঠে এসেছিল সেগুলো ছিল নবিকে নির্বাসিত করা, কারাবন্দী করা অথবা হত্যা করা। এক্ষেত্রে তাঁরা শেষ প্রস্তাবটিই বেছে নেন।

তায়েফের পাশাপাশি হেজাজের আরেকটি শহরও অর্থনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্বের দিক থেকে মক্কার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল। সেটি ছিল ইয়াসরিব, যা মদিনা (স্থানীয় ইহুদিদের দ্বারা প্রবর্তিত একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ 'নগর') [৪৭] নামে পরিচিত। আরবের জনপ্রিয় মূর্তিগুলোর সুসজ্জিত উপাসনালয়গুলোর কারণে মক্কা শহরটি আরবদের কাছে, বিশেষ করে বেদুইন ও কুরাইশদের কাছে ধর্মীয় তীর্থভূমি বলে বিবেচিত হতো। কাবার রক্ষণাবেক্ষণ ও এর পরিদর্শকদের প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্বে নিয়োজিত থাকায় কুরাইশরা নিজেদের আরবের শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠী হিসেবে দাবি করতেন। কিন্তু উর্বর ভূমির ইয়াসরিব শহর ছিল কৃষিক্ষেত্রের প্রাচুর্য, যা মক্কায় একেবারে ছিল না। সেইসাথে বাণিজ্যিক উন্নয়ন ও তিনটি ইহুদি গোত্রের কারণে অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার হারের সন্তোষজনক অবস্থানের ফলে ইয়াসরিবের সাংস্কৃতিক-সামাজিক মান মক্কার তুলনায় উচ্চতর অবস্থায় ছিল। তারপরও হেজাজের শহরগুলোর মধ্যে ইয়াসরিবকে মক্কার পরে দ্বিতীয় স্থানে গণ্য করা হতো।

ইয়াসরিবের অধিবাসীদের মধ্যে কুরাইশদের সাথে শত্রভাবাপন্ন দুটি আরবীয় গোষ্ঠী বসবাস করত। এরা হচ্ছে আউস এবং খাজরাজ। দুই গোষ্ঠীরই আবার ইয়াসরিবের দুই-একটি ইহুদি গোষ্ঠীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আউস এবং খাজরাজ ছিল কাহতানি আরব, অর্থাৎ ইয়েমেন-বংশোদ্ভূত। আদনানি বা উত্তর আরবীয় বংশোদ্ভূত কুরাইশদের সাথে তাদের বিরোধ বহু প্রাচীন। কৃষি ও বাণিজ্যে অদক্ষতা ও অনভিজ্ঞতার কারণে আউস এবং খাজরাজ গোত্র তাদের ইহুদি প্রতিবেশীদের মতো অগ্রসর ছিলেন না। তাদের অনেকে ইহুদিদের অধীনে কাজ করতেন। ফলে কিছু নির্দিষ্ট ইহুদি গোষ্ঠীর সাথে মিত্রতা থাকলেও যেসব ইহুদিদেরকে তাঁরা প্রভু মানতেন, তাদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতাকে সহজভাবে নেননি। মক্কায় নবি মুহাম্মদের উত্থান ও ইসলামের প্রচার এবং কুরাইশদের সাথে তার বিরোধের সংবাদ হেজাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ইয়াসরিবের অনেকেই এ-বিষয়ে অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন। মক্কা থেকে আগত ইয়াসরিবের পর্যটকদের বর্ণনা শুনে কিছু সংখ্যক আউস এবং খাজরাজ গোত্রের লোক ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার কথা ভাবতে থাকেন। নবি মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীদের যদি এখানে আনা যায় এবং কোনোভাবে যদি মুহাম্মদের সাথে জোট বাঁধা যায়, তবে হয়তো অনেক সমস্যারই সমাধান হতে পারে। যেহেতু মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীরাও কুরাইশ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, তাই এতে করে কুরাইশদের সংহতির দেয়ালও ভেঙে ফেলা যেতে পারে। মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীদের সাথে গড়ে তোলা

জোটের সাহায্যে আউস এবং খাজরাজের মধ্যেকার দীর্ঘদিনের জাতিগত বিদ্বেষও মিটিয়ে ফেলা যেতে পারে। তাছাড়া মুহাম্মদ একটি নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছেন। এই ধর্ম যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তবে ইহুদিরা আর তাদের উপর অবস্থান করতে পারবে না। মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীদের সাথে সমঝোতার ফলে ইয়াসরিবের তিন ইহুদি গোষ্ঠীর সাথে আউস ও খাজরাজের সম্পর্ক আরও জোরদার করতে পারে।

৬২০ খ্রিস্টাব্দের হজ মৌসুমে ইয়াসরিবের ছয়জন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি মুহাম্মদের সাথে দেখা করেন এবং মুহাম্মদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনেন। পরের বছর একই সময়ে মক্কার বাইরে আল-আকাবায় বারো সদস্যের একটি দল নবির সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা দেখলেন নবির শিক্ষার একটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে এবং নবির চাওয়াও খুব বেশি কিছু নয়। সবাইকে ব্যাভিচার, সুদের ব্যবসা, মিথ্যাচার পরিহার করতে হবে এবং মানব নির্মিত মূর্তির পরিবর্তে এক আল্লাহ- তে বিশ্বাস করতে হবে। সেই বারো জন ব্যক্তি মুহাম্মদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে ইয়াসরিবে ফিরে আসেন ও তাদের আত্মীয়স্বজনদের জানান যে, তাঁরা মুসলমান হয়ে গিয়েছেন এবং মুহাম্মদের সাথে তাদের চুক্তিও হয়েছে। তাদের কাজ ও প্রস্তাবনা ইয়াসরিবের অনেক স্থানে স্বীকৃতি লাভ করে। পরের বছর ৬২২ খ্রিস্টাব্দে ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন নারীর একটি বড় প্রতিনিধিদল মুহাম্মদের সাথে একই স্থানে দেখা করতে যান এবং দ্বিতীয় চুক্তি সম্পন্ন করেন।

দেশান্তরের বিষয়টি মুহাম্মদের মনে হঠাৎ করে জেগে ওঠেনি। যে-সব মুসলমান আবিসিনিয়ায় গিয়েছিলেন তাদের সূত্রে বিষয়টা স্পষ্ট হয়। সুরা জুমার'র এই আয়াতে রয়েছে: 'বলো, হে বিশ্বাসী দাসগণ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো। যারা এ-পৃথিবীতে ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত।'(৩৯:১০)। আল-আকাবা চুক্তিতে অবশ্যই মুহাম্মদের আশার প্রতিফলন ঘটেছিল। তের বছর ধরে মক্কায় তেমন সফলতা অর্জন করতে পারেননি। কিছু সদ্য ধর্মান্তরিত মুসলমান তাদের আরব-চরিত্রের কারণে ইসলাম ত্যাগ করে পুনরায় পূর্বের ধর্মে ফিরে গিয়েছিলেন। বিশেষ করে যখন তাঁরা দেখলেন মুহাম্মদের আদর্শ খুব একটা বিস্তার লাভ করছে না এবং মুসলমান বলে তাদেরকে লাঞ্ছনার শিকার হতে হচ্ছে। ধনী ও প্রভাবশালী পৌত্তলিকরা তাদের অনেককে ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করেছিল। তায়েফের বানু সাকিফদের সাথে নবির যোগাযোগ শুধু ব্যর্থই হয়নি, এতে করে কুরাইশদের সাথে তার শত্রুতা তীব্রতর হয়ে গিয়েছিল। যদিও নিজ গোষ্ঠী বানু হাশেমি তাঁকে রক্ষা করে আসছিল, তবে তাঁরা শুধু শারীরিকভাবে আহত হওয়া থেকে রক্ষা করতেন। তাঁরা কুরাইশদের বিপক্ষে যুদ্ধে অংশ নেবে এমনটা আশা করা সম্ভব ছিল না। আউস এবং খাজরাজদের সাথে স্থাপিত মিত্রতা অবশ্য এই আশা পূরণ করতে পারত। তাদের সমর্থন থাকলে কুরাইশদের বিপক্ষে যুদ্ধ করা সম্ভব ছিল। মক্কায় ইসলাম দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি তবে ইয়াসরিবে সেটা সম্ভব ছিল। এর প্রধান কারণ হচ্ছে কুরাইশদের সাথে আউস এবং খাজরাজ গোষ্ঠীর ঈর্ষাকাতরতা। এছাড়া ইয়াসরিবের উন্নত বাণিজ্য ও কৃষিব্যবস্থার কারণে মুসলমানরা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজও খুঁজে নিতে পারবেন।

আল-আকাবায় নবি এবং আউস ও খাজরাজদের মধ্যে আলাপকালে আব্বাস বিন আব্দুল মোতালেব (তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি, তবে নিজের ভাতিজাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন) হাজির হন। তিনি অন্যদেরকে তাদের অবস্থান ও ইচ্ছার ব্যাপারে স্পষ্ট হতে বলেন। ইয়াসরিবের প্রতিনিধিদের আব্বাস সরাসরি বলেন: 'তাঁরা এবং মুহাম্মদ কুরাইশদের হামলার শিকার হতে পারে; এবং এ ক্ষেত্রে তাদের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে তাঁরা মুহাম্মদকে ততটাই প্রতিরক্ষা দিবে যতটা তাঁরা নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের দিয়ে থাকে এবং তাঁরা যেন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুহাম্মদকে বিভ্রান্ত না করেন।' এ-সময় খাজরাজ গোত্রের প্রতিনিধির মধ্য থেকে আল-বারা বিন আল-মারুর উত্তেজনার বশে বলেন, 'তাঁরা সবাই নির্ভীক, লড়াকু যোদ্ধা এবং তাঁরা সকল প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে প্রস্তুত আছেন।' একজন বয়োজ্যষ্ঠ ও অভিজ্ঞ আউস প্রতিনিধি আবুল হাসিম বিন তায়েহান নবিকে বলেন: 'ইহুদিদের সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে যা আপনার ও আপনার সঙ্গীদের সাথে করা চুক্তির কারণে ভেঙে যেতে পারে।

হয়তো আপনার আদর্শ আরও এগিয়ে যাবে। তখন আপনি কি আমাদের ছেড়ে দিয়ে আপনার নিজ গোষ্ঠীর সাথে সমঝোতা করে ফেলবেন?' প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালিক বিন হিশাম (মৃত্যু হিজরি ২১২/২১৮ বা ৮২৮/৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ) , যিনি ইবনে হিশাম নামে বেশি পরিচিত, তার সম্পাদিত 'দ্যা লাইফ অব দ্যা প্রফেট' গ্রন্থ অনুসারে নবি তখন হেসে উত্তর দিয়েছিলেন: 'রক্তের জন্য রক্ত, ধ্বংসের জন্য ধ্বংস। আমি আপনাদের সাথে থাকব, আপনারা আমার সাথে থাকবেন। আপনাদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করবে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব আর যারা আপনাদের সাথে শান্তি বজায় রাখবে আমিও তাদের সাথে শান্তি বজায় রাখব।'

এখানে 'রক্ত', 'ধ্বংস' শব্দগুলোর উল্লেখ বিখ্যাত ফরাসি বিপ্লবী জ্যাঁ পল মারাতের উক্তি 'আমি রক্ত চাই'- এর কথা মনে করিয়ে দেয়। উল্লেখ্য আবুল হাসিম বিন তায়েহানের প্রশ্নের উত্তরে আরেকটি কথা নবি বলেছিলেন বলে জানা যায়, 'লাল ও কালোদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।' সম্ভবত এর দ্বারা তিনি সকল বর্ণের সাথে যুদ্ধের কথা বুঝিয়েছিলেন; আরবীয় হোক আর অনারবীয় হোক। এ-বক্তব্য নবি মুহাম্মদের ভবিষ্যত চিন্তা ও গোপন অভীপ্সার কথা জানান দেয়। আবুল হাসিমকে দেয়া উত্তর নির্দেশ করে, এটা ছিল নবি হৃদয় থেকে বের হয়ে আসা আর্তনাদ, দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। আউস ও খাজরাজদের সমর্থন সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দুয়ার খুলে দিতে পারে। এতে করে নবি ইসলামের প্রসারে আরও চাপ সৃষ্টি করতে পারবেন, বিরোধী কুরাইশদের বিরোধিতার জবাব দিতে পারবেন এবং দীর্ঘদিনের নিজস্ব চিন্তাও প্রকাশ করতে পারবেন। মক্কায় গত তের বছর ধরে তার প্রচার খুবই ক্ষীণ প্রভাব ফেলেছে, সমগ্র আরবের সামনে এখন ইসলামকে আনা সম্ভব হবে।

মুহাম্মদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন

আমাদের চারপাশে অনেক ঘটনাই আছে যা আপাতদৃষ্টিতে অগুরুত্বপূর্ণ মনে হলেও পরবর্তীতে তা পৃথিবীর ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। নেপোলিয়ন বা হিটলারের কাহিনী এক্ষেত্রে উপযুক্ত উদাহরণ হিসেবে আসতে পারে। নবি মুহাম্মদের ইয়াসরিব-যাত্রাকে দেখলে হয়তো একটি সাধারণ অভিবাসন ছাড়া কিছুই মনে হয় না, কিন্তু আরবের নিয়তি ও বিশ্ব-ইতিহাসের এক বিশাল পরিবর্তনের শুরু আসলে এর মাধ্যমেই হয়েছিল। নবির অভিবাসন-পরবর্তী ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলির কারণ, পরিপ্রেক্ষিত ও সামাজিক প্রেক্ষাপট উদ্ধারে নিয়োজিত গবেষকদের গবেষণার দুয়ারও খুলে দিয়েছিল।

এই সকল বিষয়ের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং নিশ্চিতভাবে সবচেয়ে বেশি প্রভাব রেখেছিল, অন্যতম এই ঐতিহাসিক চরিত্রের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন। যদিও ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনের বিষয়টি অনেকের কাছে সন্তোষজনক নাও মনে হতে পারে। তাই একে মুহাম্মদের অন্তঃপুরুষের প্রস্ফুটন হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। হিজরত তাই ঐতিহাসিক এক পটপরিবর্তনের সূচনা হয়তো করেছিল, তবে সেটা নবি মুহাম্মদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনকে অনুসরণ করে হয়েছিল, যা নিবিড়ভাবে তুলনামূলক মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

তখন পর্যন্ত নবি মুহাম্মদ ধর্মানুগত ছিলেন এবং তার সময়ের অনৈতিক কাজকর্ম থেকে বিরত থাকতেন। তিনি ইহজগতের শেষসীমা এবং শেষ বিচারের দিনের চিত্রকে হাতের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। মক্কায় থাকাকালে মৃত্যু পরবর্তী জীবনের উপর তার ধারণাকে ভিত্তি করে তিনি সঙ্গীদের মহাবিশ্বের স্রষ্টার বশে আনতে, সহিংসতা, অবিচার ও গরিবদের প্রতি অনাচার থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে গেছেন। আর মদিনায় (ইয়াসরিব) যাওয়ার পর তিনি দূরদর্শী রাজনীতিবিদ এবং সুদক্ষ এক যোদ্ধার রূপ ধারণ করেছেন। যিনি তরবারি দিয়ে লড়াই করে সকল প্রতিরোধ ভেঙে নিজস্ব ধর্মের বিস্তার ঘটিয়েছেন এবং একটি রাষ্ট্রের প্রধান হয়েছেন। সময়ের আবর্তে একজন ত্রাণকর্তা 'মসিহ' ডেভিডে (নবি দাউদ) পরিণত হতে পারেন। একজন মানুষ যিনি বিশ বছরেরও অধিক সময় একজন স্ত্রীর সঙ্গেই জীবনযাপন করেছেন, তিনিই পরে অধিক নারীসঙ্গ লাভ করেছেন।

ইংরেজ ঔপন্যাসিক এইচ জি ওয়েলসের মতে, মানুষ সর্বদাই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। কিন্তু এই পরিবর্তনের ধীর গতি এবং সহজে ঠাহর করতে না পারার কারণে আমরা একজন পঞ্চাশ বছর বয়স্ক মানুষের থেকে তেমনটাই আশা করি যেমনটা তিনি বিশের কোঠায় থাকতে করতেন। যেখানে ওই ব্যক্তি ধীরে লয়ে কিন্তু প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়েছেন। বয়স বাড়লে তার শারীরিক সক্ষমতা যেমন হ্রাস পায় তেমনি তার মানসিকতা, সক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার মাধ্যমে পরিপক্ক হয়ে ওঠে। একজন বিশ বছরের তরুণ আর একজন পঞ্চাশ বছরের ব্যক্তির মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল প্রথমজনের থাকে প্রচণ্ড শারীরিক ও আবেগময় আকাঙ্ক্ষা আর দ্বিতীয়জনের থাকে অভিজ্ঞতা অর্জন ও চিন্তা করার মতো সময়। উপযুক্ত মনে হলেও এই ধারণটি সবসময় সত্যি হয় না এবং নবি মুহাম্মদের ক্ষেত্রেও তা ভুল ছিল। মদিনায় যাওয়ার পর যে বয়সে অধিকাংশ মানুষের শারীরিক ও মানসিক কর্মতৎপরতা কমতির দিকে থাকে, সেই ৫৩ বছর বয়সে এক নতুন মুহাম্মদকে দেখা যায়। মক্কায় তের বছর ধরে তিনি যেভাবে মানবতার বাণী প্রচার করে গেছেন, মদিনায় কাটানো জীবনের শেষ দশ বছরে তিনি আর তেমনটি ছিলেন না। আল্লাহর প্রতি অনুগত নবি এরপর তার নিজের গোষ্ঠীকে বশে আনতে ও অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোর ওপর (যারা এতদিন তাঁকে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করে আসছিল) কর্তৃত্ব স্থাপনে শক্তিমান এক নবির রূপধারণ করেন। সুরা শোআরা-তে বলা হয়েছে : 'তুমি তোমার আত্মীয়স্বজনকে সতর্ক করে দাও।'(২৬:২১৪)। সুরা শুরা-তে বলা হয়েছে 'তুমি সতর্ক করতে পার নগরমাতার (মক্কার) অধিবাসীদেরকে ও তার আশেপাশে যারা বাস করে তাদেরকে...' (৪২:৭)। মদিনায় তিনি সতর্ককারী রূপ ত্যাগ করেন, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের বর্ম পরিধান করেন, ইয়েমেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত সমস্ত আরবকে এক পতাকা তলে নিয়ে আসার লক্ষ স্থির করেন।

যিশু এবং জেরেমিয়া'র আধ্যাত্মিক ধর্মপ্রচারের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার মতো এবং আত্মাকে জাগরিত করবার মতো মূর্ছনা ও কাব্য আমরা মক্কি সুরাগুলোর মধ্যে খুঁজে পাই। যার ছিটেফোঁটা দেখা গিয়েছে মদিনার সুরাগুলোর মধ্যে। কাব্যিক ও ছন্দময় সুরগুলো সেখানে আদেশমূলক নিয়ম-নির্দেশনার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। মদিনায় সকল নিয়ম ও নির্দেশনা একজন সেনাপতির মাধ্যমে প্রদান করা হত যিনি বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ক্ষমা করতেন না। আদেশ অমান্য, নিয়ম ভাঙা বা অবহেলার জন্য গুরুতর শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছিল।

পশ্চিমা বিশেষজ্ঞ ইজহাক গোল্ডজিহার[৪৮] নবির এই আকস্মিক পরিবর্তনকে অভ্যন্তরীণ তাড়না হিসেবে চিহ্নিত করেছেন আর অ্যাডলফ হারন্যাক একে অতিমানবের মনোকষ্ট এবং তার অসাধারণ শক্তিমত্তার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ-ধরনের তাড়না মহান ব্যক্তিদেরকে সকল দ্বিধাবোধ, অবসাদ এবং নৈরাশ্য প্রতিরোধে সক্ষম করে তোলে। বাধা যতোই মৃত্যুসম হোক না কেন তা প্রতিরোধে তাদেরকে ভয়শূন্য করে তোলে। অন্য কোনো কিছু দ্বারা তাদের এই সাধারণ মানুষের চেয়ে অধিক অর্জনের কৃতিত্বকে ব্যাখ্যা করা যায় না। হিজরতের পরবর্তী সময়কালে নবি মুহাম্মদের মধ্যে আমরা যে পরিবর্তনসমূহ লক্ষ করি তা শুধুমাত্র সে সময়কার ঘটনাবলীর মাধ্যমেই নয়, মক্কা ও মদিনায় অবতীর্ণ বিভিন্ন সুরার মাধ্যমেও তা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। মক্কি সুরা মুজ্জামিল-এ নবিকে নিষেধ করা হয়েছে এই বলে যে: 'লোকে যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধরো, আর সৌজন্য সহকারে ওদেরকে

এড়িয়ে চলো। বিলাসবস্তুর অধিকারী অবিশ্বাসীদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। আমার কাছে শিকল, জ্বলন্ত আগুন...' (৭৩:১০-১২)। তফসির আল-জালালাইনে বলা হয়েছে, অবিশ্বাসীদের প্রতি লড়াই এবং তাদেরকে হত্যা করার যে নির্দেশনা কোরানে দেয়া হয়েছে, তার পূর্বে 'অবিশ্বাসীদের সাথে শিষ্টাচার বজায় রেখে দূরত্ব মেপে চলা'র নির্দেশনা কোরানে নাজিল হয়েছে। এই বক্তব্যটি আরও বাস্তবসম্মতভাবে সত্য হবে, যদি বলা হয়ে থাকে নবি আউস ও খাজরাজ গোত্রের সহায়তা নিয়ে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করার পূর্বে সুরা মুজাম্মিলের উক্ত আয়াতগুলি তৈরি হয়েছে। যখন নবি এবং তার সাহাবির কাছে তরবারি ভিন্ন আর কোনো কিছুই ভরসা করার মতো ছিল না, তখনই সুরা বাকারা'র (মাদানি সুরা) এই নির্দেশটি আসে: 'আর যেখানেতাদেরকে তোমরা পাবে সেখানেই তাদেরকে হত্যা করবে আর যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে, তোমরাও সেখান থেকে তাদেরকে বের করে দেবে। ফিৎনা হত্যার চেয়ে মারাত্মক।'(২:১৯১)। অথচ মক্কি সুরা আনআম-এ আমরা দেখি উল্লেখ করা হয়েছে: 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে ডাকে, তাদেরকে তোমরা গাল দেবে না, তা হলে, তারা অজ্ঞানতাবশত আল্লাহকেও গাল দেবে। এভাবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের চোখে তাদের কার্যকলাপ শোভন করেছি। তারপর তাদের প্রতিপালকের কাছে তারা ফিরে যাবে। তখন তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকার্য সম্বন্ধে জানিয়ে দেবেন।' (৬:১০৮)।

বহুবচন অর্থে প্রেরিত এই উপদেশ বাণীটি নবি এবং তার স্পষ্টবাক সাহাবি ওমর ইবনে আল-খাত্তাব কিংবা হামজা বিন আব্দুল মোতালেব, কার প্রতি প্রেরিত হয়েছিল তা স্পষ্ট নয়। যা হোক, মুসলমানদের ক্ষমতা যখন বৃদ্ধি পেল কুরাইশদের উপাস্য দেবতাদেরকে অভিশাপ দেয়াটা আর আটকে থাকল না। অবিশ্বাসীদের প্রতি শান্তিপূর্ণ ও আন্তরিকভাবে যোগাযোগকে নিষেধ করা হলো। মদিনায় অবতীর্ণ সুরা মুহাম্মদ-এর বক্তব্য অনুযায়ী 'তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না, তোমরাই প্রবল, আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন, তিনি তোমাদের কর্মফল ক্ষুণ্ন করবেন না।'(৪৭:৩৫)।

কোরানের একই সুরায় কখনো কখনো দুটি অসঙ্গতিপূর্ণ আয়াতের উপস্থিতি রয়েছে । সুরা বাকারা কালপঞ্জি অনুসারে নবির হিজরতের পর প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিল, তবে এর দৈর্ঘ্য দেখে অনুমান করা যায় সম্পূর্ণ সুরাটি একসঙ্গে অবতীর্ণ হয়নি। এক বা দুই বছরের বেশি সময় ধরে খণ্ডিত আকারে এটি অবতীর্ণ হয়েছে। সেই সময়ের প্রথমদিকে অবতীর্ণ হওয়ার উপাত্ত আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে: 'ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই। সৎপথ ভ্রান্তপথ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে। সুতরাং যে অসত্য দেবতাকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করবে সে এমন এক শক্ত হাতল ধরবে যা কখনও ভাঙবে না।' (২:২৫৭)। অপরদিকে একই সুরার ১৯৩ নম্বর আয়াত, যা সম্ভবত মুসলমান সম্প্রদায় শক্তিশালী হবার পরে অথবা তাদের শক্তিশালী হবার সাথে সম্পর্কিত কোনো ঘটনার পরে অবতীর্ণ হয়েছিল, যেখানে শক্তি প্রয়োগের আদেশ দেয়া হয় এভাবে: 'তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ না ফিৎনা দূর হয় ও আল্লাহর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তারা যদি বিরত হয়, তবে জুলুমকারীদের ছাড়া কারও ওপর হস্তক্ষেপ করবে না। (২:১৯৩)। সুরা তওবা (সুরা আল-বারা নামেও পরিচিত) কালপঞ্জি অনুসারে কোরানের সর্বশেষ সুরা, এখানে শক্তিপ্রয়োগের আদেশকে অনস্বীকার্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে : (১) 'যাদের ওপর কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ- তে বিশ্বাস করে না ও পরকালেও বিশ্বাস করে না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে...।' (৯:২৯) । (২) 'আত্মীয়স্বজন হলেও অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবি ও বিশ্বাসীদের জন্য সংগত নয়।' (৯:১১৩) । (৩) 'হে নবি! অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো ও ওদের প্রতি কঠোর হও। ওদের বাসস্থান জাহান্নাম। আর কী সে মন্দ পরিণাম!' (৯:৭৩)। (৪) 'হে বিশ্বাসিগণ! অবিশ্বাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে যুদ্ধ করো। আর তারা তোমাদের কঠোরতা দেখুক...।(৯:১২৩)।

মদিনায় অবতীর্ণ সুরা তাহরিম-এর ৯ নম্বর আয়াতে একই ভাষায় বলা হয়েছে: 'হে নবি! অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো ও তাদের প্রতি কঠোর হও। ওদের আশ্রয়স্থান জাহান্নাম।'(৬৬:৯)। প্রাথমিকভাবে কোথাও কোথাও শক্তিপ্রয়োগ কিংবা রূঢ় আচরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। যেমন মদিনায় অবতীর্ণ সুরা হজ-এ অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমোদন দেয়া হলেও এতে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদটি আদেশসূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি: 'যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে।'(২২:৩৯) একই সুরার পরবর্তী আয়াতে মুসলমানদের প্রতি অন্যায় আচরণকে সুনির্দিষ্টভাবে দেখানো হয়েছে: 'তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের করা হয়েছে শুধু এজন্য যে তারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ।'(২২:৪০)। পারস্যের ইসলামি পণ্ডিত আল-জামাখশারি'র মতে পৌত্তলিক বা ইসলামে অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধ করার প্রথম অনুমোদনটি আসে ৭০টিরও বেশি কোরানের আয়াতের পরে এবং ওই আয়াতগুলোতে সহিংসতার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা ছিল। যুদ্ধ অনুমোদনের যথার্থতা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে নবি মুহাম্মদ মানব চরিত্রকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করেছেন। মক্কা থেকে বিতাড়িত হবার স্মৃতিচারণে মুসলমানদের হয়তো কুরাইশদের ওপর প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা তাড়িত করত। কোরানেও এই অকাট্য চিন্তার অলঙ্কারময় বর্ণনা অন্য একটি প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত হয়েছে ইজরাইলের সন্তানদের নাম করে, কিন্তু বক্তব্যটি প্রযোজ্য ছিল মুসলমানদের জন্য: 'তারা বলল, যখন নিজেদের ঘরবাড়ি ও সন্তানসন্ততি থেকে দূরে পড়ে আছি তখন কেন আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবো না?'(২:২৪৬)। যদি কোরানের বর্ণনায় এই যুদ্ধটি ছিল বনি-ইসরাইলের সন্তানদের কিন্তু ব্যক্তিগত দুঃখজনক স্মৃতিও মুসলমানদেরকে প্রতিশোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উদ্দীপ্ত করে থাকতে পারে।

নবি যখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন তখন যুদ্ধের কোনো প্রশ্নই ছিল না। সুরা আনআম-এর ৬৮ নম্বর আয়াতে দেখা যায়, নবি তখন পৌত্তলিকদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন এবং তারা নবির সাথে অভদ্র আচরণ ও কোরানের আয়াত নিয়ে উপহাস করত: 'তুমি যখন দেখ তারা আমার নিদর্শন (কোরানের আয়াত) নিয়ে নিরর্থক আলোচনায় মেতে আছে তখন তুমি দূরে সরে যাবে যে-পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে যোগ দেয়। আর শয়তান যদি তোমাকে ভুল করায়, তবে খেয়াল হওয়ার পরে সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসবে না।'(৬:৬৮)। মক্কায় অবতীর্ণ সুরা আনকাবুত-এ কিতাবিদের মর্যাদা দিয়ে নির্দেশনা

দেয়া হয়েছে : 'তোমরা কিতাবিদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করবে, কিন্তু সৌজন্যের সাথে, তবে ওদের মধ্যে যারা সীমালঙ্ঘন করে তাদের সাথে নয়। আর বলো, 'আমাদের ওপর ও তোমাদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য তো একই, আর তারই কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করি।'(২৯:৪৬) সুরা আনকাবুতের এই নির্দেশনাটি কেবল নবি মুহাম্মদের জন্য নয়, বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে বিধায় তা সমগ্র মুসলমান জাতির জন্যই জারি করা হয়েছে। মক্কা ও মদিনায় অবতীর্ণ (প্রথম দিকের) বিভিন্ন আয়াতে অমুসলমান কিতাবিদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন আচরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেমন সুরা আল-ই-ইমরান-এ বলা হয়েছে: 'বলো, আমি ও আমার অনুসারীরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তুমি তাদেরকে ও সাধারণ জনতাকে[৪৯] বলো, তোমরা কি আত্মসমর্পণ করেছ?' (৩:২০)। 'যারা বিশ্বাস করে ও যারা ইহুদি হয়েছে এবং যারা খ্রিস্টান ও সাবেয়ি (ইসলাম-পূর্ব যুগের দক্ষিণ আরবের বাসিন্দা, বাইবেলীয় বর্ণনায় সাবা রাজ্যের অধিবাসী), যারা আল্লাহ ও শেষদিবসে বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার আছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।'(২:৬২)। প্রায় একই বক্তব্য দেখা যায় সুরা মায়িদার ৭৭ নম্বর আয়াতে। প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে বোঝা যায় এই আয়াতগুলো সম্ভবত হিজরতের পরবর্তীকালে এক বা দুই বছরের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

মদিনায় এক দশক অতিক্রান্ত হবার পর, বিশেষ করে মক্কা বিজয়ের পর সুরা তওবা যেন অমুসলিম কিতাবিদের (খ্রিস্টান, ইহুদিদের) ওপর বজ্রাঘাত হানে। যে মানুষগুলোর সাথে এতোদিন আল্লাহর আদেশে মুসলমানরা নম্রভাবে ভাব বিনিময় করতেন, কোনো ধরনের হুমকি প্রদান করতেন না তাদেরকে এই সুরার আয়াতগুলিতে ইসলামকে স্বীকার না করলে ভবিষ্যত শাস্তির বার্তা প্রদান করা হয়। এতোদিন কেবল নবির কাজ ছিল জনতার কাছে সতর্কবার্তা পাঠানো, উপদেশ প্রদান করা, দশ বছর পর নবিই তাদের ধর্মের বিকল্প হিসেবে ইসলামকে বেছে নিতে অথবাবশ্যতা স্বীকার- পূর্বক জিজিয়া কর প্রদান করতেঅন্যথায় মৃত্যুদণ্ডের ভীতি প্রদর্শনের বার্তা দিলেন। সুরা তওবার এই আয়াতে নির্দেশ দেয়া হলো : 'যাদের ওপর কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না ও পরকালেও বিশ্বাস করে না এবং আল্লাহ ও তার রসুল যা হারাম করেছেন তা হারাম করে না ও সত্যধর্ম অনুসরণ করে না তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যে-পর্যন্ত না তারা বশ্যতা স্বীকার করে আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ স্বেচ্ছায় জিজিয়া দেয়।'(৯:২৯)। সুরা বাইয়িনা-তে বলা হলো, বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হবার পর কিতাবি ও অংশীবাদীরা 'সৃষ্টির অধম'প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। (৯৮:৬)। মদিনার ইহুদিদের উচ্ছেদ, খায়বার ও ফাদাক ইহুদি-গ্রাম দখল এবং মক্কা বিজয়ের পর নবি মুহাম্মদ এই ঐশ্বরিক নির্দেশের কথা প্রদান করেন। এ-ইতিহাস থেকে বোঝা যায়, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবার পর ভিন্নমতাবলম্বীদের সাথে পূর্বের মতো নম্র ও যৌক্তিক বাক্য ব্যবহার করে কথোপকথনের প্রয়োজন নেই। ভবিষ্যতে যুদ্ধের ময়দানে তরবারির ভাষায় ফয়সালা হবে সবকিছুর।

একটি সুগঠিত অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা

ইয়াসরিবে গমনের পর নবি মুহাম্মদ তার স্থানীয় সমর্থক (আনসার) আউস ও খাজরাজ গোত্রের লোক এবং অভিবাসী মুসলমানদের (মুহাজির) সাথে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন। আনসাররা মুহাজিরদের 'পালক ভ্রাতা' হিসেবে নিজেদের ঘরে আশ্রয় দেন। মুহাজিররা কর্মঠ ছিলেন। তাঁরা ইয়াসরিবে এসে কৃষি-শ্রমিক এবং বাজারে দোকানের কাজ জুটিয়ে নেন। তথাপি এখানে তাদের অবস্থান সহজ কিংবা নিরাপদ, কোনোটাই ছিল না। মক্কায় থাকাকালীন সময়ে কুরাইশদের সাথে পেরে উঠতে না পেরে তাঁরা নির্ভরযোগ্য জীবিকার অন্বেষণ করছিলেন,যা তাদেরকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করতে পারবে। নবি মুহাম্মদ নিজে কোনো পেশা গ্রহণ করেননি। মুহাজির ও আনসারদের অনুদানের ওপর নির্ভর করতেন। তিনি এ-সময় কঠোর সময়কাল অতিক্রম করছিলেন। তাঁকে প্রায়শ রাত্রিকালীন আহার না করে শয্যায় যেতে হতো কিংবা কয়েক দিনের ক্ষুধা এক দিনে উপশম করতে হত। ফলে ইয়াসরিবে এসে সংখ্যালঘু মুসলমান জনগোষ্ঠীকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হলো। বেঁচে থাকার জন্য তাদেরকে একটি কম বিপজ্জনক এবং স্বনির্ভর অর্থনৈতিক ভিত্তি খুঁজে নিতে হবে। এ-সমস্যার সমাধানে নবির গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ নিচে আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলাম-পূর্ব সময় থেকে আরব গোত্রগুলোর সম্পদ বৃদ্ধির একটি ঐতিহ্যগত প্রথা হচ্ছে এক গোত্র কর্তৃক অন্য গোত্রকে আক্রমণ, অপরের গবাদিপশু ও অন্যান্য সম্পদ দখলে নেয়া। কৃষিভিত্তিক স্থায়ী পেশা বা জীবিকা অর্জনের পথ খুব দুরূহ থাকায় তৎকালীন আরবের বেশিরভাগ গোত্র এভাবে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতেন। ইয়াসরিব-অভিবাসী মুসলমানদেরও নিজেদের

অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য অন্য কোনো উপায় ছিল না। ফলে তাঁরা বিদেশ যাত্রী, বাণিজ্যিক কাফেলা কিংবা শত্রুগোত্রের ওপর 'হঠাৎ আক্রমণের' পন্থা বেছে নিলেন। আরবি 'গাজওয়া' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'আকস্মিক আক্রমণ'। এই শব্দটি ব্যবহৃত হয় কোনো বাণিজ্যিক কাফেলা কিংবা গোত্রের ওপর আকস্মিক আক্রমণ করে তাদের সম্পদ ও নারীদের ছিনিয়ে নেয়া। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লড়াই করে এভাবে অর্জিত সম্পদ আরব অঞ্চলের শুষ্ক রুক্ষ পরিবেশে জীবনযাপনকে তাৎক্ষণিকভাবে সহজ করে দিত।

একবার নবির কাছে সংবাদ পৌঁছাল কুরাইশদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলা আমর বিন আল-হাদরামির নেতৃত্বে বিশাল মালামালের বহর নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। নবি আব্দুল্লাহ বিন জাহেশ এর নেতৃত্বে মুহাজিরদের একটি দলকে ওই কাফেলার সম্পদ দখলের জন্য প্রেরণ করেন। মুহাজিররা নাখলা নামক একটি যাত্রাবিরতির স্থানে আকস্মিক আক্রমণ করে কাফেলাকে হকচকিয়ে দিলেন। তাদের দলনেতাকে হত্যা করে সমস্ত মালামাল অধিকার করে সফলভাবে মদিনায় ফিলে এলেন মুহাজিররা। সাথে দুইজনকে জিম্মি করেও নিয়ে আসা হলো। ইসলামের ইতিহাসে এই সফল অভিযানকে 'নাখলার অভিযান'নামে অভিহিত করা হয়।

মুহাজিরদের নাখলা-অভিযানের ঘটনা তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে মক্কায় এবং ইয়াসরিবে। কারণ এটি ছিল মুসলমানদের প্রথম আক্রমণ এবং যা রজব মাসের প্রথম দিনে সংঘটিত হয়েছিল। প্রাচীন আরব-রীতি অনুযায়ী চারটি মাসে (মহরম, রজব, জিলক্বদ ও জিলহজ) আক্রমণ করা নিষিদ্ধ, যার মধ্যে রজব মাস একটি। স্বাভাবিকভাবে এই আক্রমণের পর কুরাইশরা তীব্র ঘৃণা প্রদর্শন করল মুহাজিরদের প্রতি। অন্যান্য গোত্র থেকেও তেমনি প্রতিক্রিয়া নির্গত হলো। ইতিহাস-পাঠে মনে হয় এই প্রতিকূল প্রেক্ষাপট নবিকেও শঙ্কার মধ্যে ফেলে দেয়। তিনি আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ও তার লোকজনের প্রতি শীতল আচরণ করলেন। ভবিষ্যতপন্থা নির্ধারণেও কিছুটা সংশয়ী মনোভাব প্রকাশ করলেন। আব্দুল্লাহ বিন জাহশ দাবি করলেন এই আক্রমণ জুমাদা আস-সানি মাসের শেষ দিনে করা হয়েছে। এক্ষেত্রে একটি সমাধানের পথ পাওয়া গেল। কিন্তু যুদ্ধে লব্ধ মাল নিয়ে সমস্যা রয়ে গেল, যা মুহাজিরদের প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানে প্রয়োজনীয় ছিল। এ-কারণে কুরাইশদের দাবির মুখে মালগুলো ফিরিয়ে দেবার কোনো সুযোগ ছিল না। হয়তো কয়েকজন সাহাবি নবিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যা ঘটে গেছে তা আর বদলানো যাবে না এবং কোনো প্রকারের অস্বীকারমূলক বক্তব্য মুহাজিরদের অপরাধী এবং শত্রুকে নির্দোষ বানাবে। মুহাজিরদের অর্থনৈতিক অবস্থার মুক্তির জন্য গনিমতের মালের প্রয়োজনীয়তার কথা নিশ্চিতভাবে তাদের মনে কাজ করছিল।

একটি সুস্পষ্ট এবং দৃষ্টান্ত- স্থাপনকারী সমাধান আসে সুরা বাকারার এই আয়াতে: 'পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, বলো, সেই সময় যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর কাছে তার চেয়েও বড় অন্যায় আল্লাহর পথে বাধা দেয়া, আল্লাহকে অস্বীকার করা, কাবাশরিফে উপাসনায় বাধা দেয়া ও সেখানকার অধিবাসীদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়া। ফিৎনা[৫০] হত্যার চেয়েও ভীষণ অন্যায়।'পারলে তারা সব সময় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যে-পর্যন্ত না তারা তোমাদের ধর্ম থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়'(২:২১৭)। নাখলা অভিযানের পর কুরাইশ এবং আরও কয়েকটি শত্রুভাবাপন্ন গোত্রের ওপর সফল 'গাজওয়া' পরিচালিত হলে মুহাজিরদের আর্থিক অবস্থানে পরিবর্তন আসে। এ-অভিযানগুলো নবি এবং সাহাবিদের ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছানোর রাস্তা করে দেয় এবং সমগ্র আরবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছিল চূড়ান্ত রূপ। তবে তাৎক্ষণিকভাবে যে পদক্ষেপটি মুসলমানদের মর্যাদা ও আর্থিকভিত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিল তা হচ্ছে ইয়াসরিবের ইহুদি সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ।

ইয়াসরিবে তিনটি ইহুদি গোত্র বাস করত। এরা হচ্ছে বানু কায়নোকা, বানু-নাজির ও বানু কুরাইজা। এই ইহুদি গোত্রগুলি ইয়াসরিবে কৃষি ও শিল্পে নিজস্ব দক্ষতা কাজে লাগিয়ে ব্যাপক উন্নতি করেছিল। ধর্মীয় শিক্ষা ও সাহিত্যের চর্চার মাধ্যমে তারা ইয়াসরিবের অন্য দুটি গোত্র আউস ও খাজরাজের চেয়ে উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী হয়ে ওঠে। ইহুদিরা অনেক আউস ও খাজরাজ গোত্রের লোককে কৃষিশ্রমিক ও দোকান-গুদামের বিক্রময়কর্মী ও প্রহরী হিসেবে নিযুক্ত করে। আউস ও খাজরাজ গোত্রের লোকেরা

এ-জন্য প্রতিনিয়ত হীনমন্যতায় ভুগতেন এবং ইহুদি গোত্র তিনটির প্রতি ঈর্ষা অনুভব করতেন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে আউস ও খাজরাজ গোত্রের লোকেরা নবি মুহাম্মদের সাথে আল-আকাবা চুক্তি সম্পাদন করার মূল কারণ ছিল ইয়াসরিবে ইহুদি-আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে নিজেদের হীনমন্যতা থেকে মুক্ত করা। ইয়াসরিবে আগমনের পর নবির মধ্যে প্রথমে একটি বিচক্ষণ পরিণামদর্শিতা বজায় ছিল। তিনি ইহুদিদের সাথে যে কোনো প্রকার বিতর্ক এড়িয়ে চলতেন। ইহুদিরা ছিল শক্তিশালী ও বিত্তশালী। তিনি তাদের সাথে অনাক্রমণমূলক একটি চুক্তিও (আহদ আল-মুয়ারা) করেছিলেন, যা উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি করে। চুক্তিতে ঠিক হল মুসলমান ও ইহুদিরা নিজস্ব ধর্মীয় সমাজে বসবাস করবে এবং কুরাইশ ও অন্য যে কোনো গোত্র থেকে আক্রমণ করা হলে উভয় ধর্মাবলম্বী যৌথভাবে ইয়াসরিবকে রক্ষা করবেন। একই সাথে উভয় পক্ষই শত্রুগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামরিক অভিযানের খরচ নিজেরা বহন করবেন। ইয়াসরিবে বসবাসকারী মুসলমান ও ইহুদিদের মধ্যে একটি সাধারণ সম্পর্কের যোগসূত্র হচ্ছে উভয় গোষ্ঠী পৌত্তলিকতা ও মূর্তিপূজা পরিহার করেছিলেন এবং প্রার্থনার সময় উভয় গোষ্ঠীই একই দিকে তাদের মাথা নত করতেন।

ইয়াসরিবে মুসলমানরা যখন দুর্বল ছিলেন তখন উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটেনি। এমন-কি ইয়াসরিবে অভিবাসনের দেড় বছর ধরে নবি প্রার্থনার জন্য কিবলার দিক দূরতম মসজিদকে (জেরুজালেমে অবস্থিত) অনুসরণ করতেন তখনও কোনো বিরোধ বাধেনি। কিন্তু পরে কিবলার দিক পরিবর্তন করে মক্কার কাবাঘরের দিকে করা হয়। এই পদক্ষেপের পর থেকে ইহুদিরা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেন। তাদের প্রশ্নের জবাব আসে সুরা বাকারা-এর এই আয়াতে: ‘পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোনো পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, সব কিতাব ও নবিদের ওপর বিশ্বাস করলে আর আল্লাহর ভালোবাসায় আত্মীয়স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও দাসমুক্তির জন্য অর্থদান করলে...।’ (২:১৭৭)। এই নির্দেশনাটি আসলে ইহুদিদের জন্য ছিল একটি সতর্কবার্তা। তাদের উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে গেল যখন ছোটোখাট আকস্মিক অভিযান ও মক্কার বাণিজ্যিক কাফেলার ওপর ‘গাজওয়া’র সাফল্য আসতে লাগল। ইহুদিদের উৎকণ্ঠার চূড়ান্ত পরিণতি দেখা গেল বদরের ময়দানে। ৬২৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে কুরাইশদের বিপক্ষে নবি এবং সাহাবিদের বিজয়ের মাধ্যমে। এবার ইয়াসরিবের ইহুদিরা মুখোমুখি হলেন আউস ও খাজরাজ গোত্রের সাথে। যাদের একদা কিছুই ছিল না, তারপরও ইহুদি মালিকদের অধীনে তাঁরা কাজ করতে উৎসাহী ছিলেন না। ইহুদিরা দেখলেন মুহাজির আর আনসাররা নবি মুহাম্মদের পতাকাতলে মিলিত হয়ে একটি শক্তিশালী জোটবদ্ধ সংগঠন গড়ে তুলেছেন, যার আসল নাম ‘ইসলাম’। ইসলামের উত্থানে আতঙ্কিত হয়ে ইয়াসরিবের বানু-নাজির গোত্রের কবি কাব বিন আল-আশরাফের মতো কয়েকজন ইহুদি নেতা বদর যুদ্ধের পর মক্কায় গিয়ে পরাজিত কুরাইশদের প্রতি সহমর্মিতা জানালেন। কুরাইশদেরকে মুহাম্মদ এবং তার অনুসারীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তাগিদ দিলেন। এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় সুরা নিসা-এর এই আয়াতে: ‘তুমি কি তাদেরকে দেখনি যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেয়া হয়েছিল? তারা প্রতিমা ও অসত্য দেবতার ওপর বিশ্বাস করে। তারা অবিশ্বাসীদের সম্বন্ধে বলে যে, ‘বিশ্বাসীদের চেয়ে এদের পথই ভালো।’(৪:৫১)। এই আয়াতে পৌত্তলিকতা ও মূর্তিপূজা নিষেধকারী ধর্মশাস্ত্রের অধিকারী বলে দাবি করা লোকদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে যারা কিনা আবার পৌত্তলিকদের সাথেই ঐক্য গড়ে তোলে এবং নবি মুহাম্মদের একেশ্বরবাদী অনুসারীগণের তুলনায় সেই সব পৌত্তলিকদের বড় দেখানোর চেষ্টা করে।

এ-সন্ধিক্ষণে ইয়াসরিবের বাজারে একটি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে বানু কায়নোকার গোত্রের সাথে সংঘর্ষ বাধে। এর সমাপ্তি ঘটে মুসলমানদের দ্বারা কায়নোকা গোত্রের রাস্তা দখলের মাধ্যমে। ইয়াসরিব নিবাসী একজন আনসার নারী কায়নোকা গোত্রের একজন স্বর্ণকারের দোকানে গিয়েছিলেন। স্বর্ণকার নারীকে দেখে কৃত্রিম ভালোবাসা দেখাতে শুরু করে এবং ওই নারী তা প্রত্যাখ্যান করেন। প্রতিশোধ স্পৃহার বশবর্তী হয়ে স্বর্ণাকার তখন নারীকে হয়রানি করেন এবং চেয়ারের সাথে ওই নারীর ঘাগরা ও ব্লাউজ পিন মেরে আটকে দেয়। নারীটি যখন ওঠে দাঁড়ান তখন পোশাকের নিম্নভাগ উন্মোচিত হয়ে যায় এবং উপস্থিত লোকজন

হাসিতে ফেটে পড়ে। ওই নারী উচ্চস্বরে প্রতিবাদ জানালে একজন মুসলমান তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। ক্রুদ্ধ মুসলমান ওই স্বর্ণকারকে হত্যা করেন। এ-খবর শোনা মাত্র অন্য ইহুদিরা স্বর্ণাকারের সাহায্যে এগিয়ে আসেন এবং ওই মুসলমান ব্যক্তিকে তারা হত্যা করেন। গোটা ঘটনাটিই দ্রুত দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটায়। মুসলমানরা নবির কাছে বিচারের দাবি জানান। তাঁরা নবির অনুমতিক্রমে বানু কায়নোকা গোত্রের বসতিতে প্রবেশের রাস্তা জোরপূর্বক দখলে নিলেন এবং কায়নোকা গোত্রের খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হল। পনের দিন পর প্রস্তাবিত কিছু শর্ত মেনে বানু কায়নোকা গোত্র আত্মসমর্পণ করে। শর্তগুলো হল তাদের জীবন রক্ষা পাবে তবে ইয়াসরিব ছেড়ে চলে যেতে হবে। যাবার আগে তারা সমস্ত সম্পদ একত্রে জমা করবে, সেখান থেকে ভারবাহী পশু বহনে সক্ষম সম্পদগুলো বাদ দিয়ে বাকিগুলো ওই স্থানে রেখে যাবে যা ইয়াসরিবের গৃহহীন, দরিদ্র মুহাজিরদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

এ-ঘটনার পর ইয়াসরিবে মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা যথেষ্ট সুসংহত হয়। আর স্বাভাবিকভাবে ইহুদি গোত্রগুলো আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। মক্কায় গিয়ে ষড়যন্ত্র করার জন্য বানু-নাজির গোত্রের নেতা কাব বিন আল-আশরাফকে নবির আদেশে হত্যা করেন মুহাম্মদ বিন মাসলামা। বানু-নাজির গোত্রের কাব বিন আল-আশরাফের রক্তের দাম নির্ণয়ে নবি এবং তার অনুসারীদের সাথে বিতর্ক হয়। এ-সময় সুযোগ বুঝে নবিকে হত্যা করতে গেলে মুসলমানদের সাথে লড়াই বেধে যায় বানু-নাজির গোত্রের। নবির আদেশে যুদ্ধ শুরু হলে মুসলমানরা বানু-নাজির গোত্রের বসতিতে প্রবেশের রাস্তা অবরোধ করে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দিলেন। বানু-নাজির পূর্ব থেকেই যুদ্ধের কৌশল কিছুটা আন্দাজ করায় তারা বানু কায়নোকা থেকে তীব্রভাবে পাল্টা আক্রমণ করে। মুসলমানরাও সাহসিকতার সাথে লড়াই করছিলেন। বানু-নাজিরের লড়াকু প্রতিক্রিয়া দেখে নবি আশঙ্কা করলেন মুসলমানরা হয়তো যুদ্ধের ময়দানে টিকে থাকতে পারবেন না, তারা আরবের ঐতিহ্যগত পরিবর্তশীলতায় বশীভূত হয়ে নিজেদের ঘরে ফিরে যাবে। তিনি দ্রুত আদেশ দিলেন বানু-নাজির গোত্রের খেজুরগাছগুলো যেন পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

উট এবং ভেড়ার মতো খেজুরগাছও আরবের অন্যতম খাদ্য ও সম্পদের উৎস। বানু-নাজির এ-ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানায়। তারা নবিকে প্রশ্ন করে: 'কিভাবে এই কাজটি করা সম্ভব হল?', 'তাহলে কিভাবে আপনি নিজেকে সতর্ককারী হিসেবে এবং মন্দ ও ধ্বংসের বিরোধী হিসেবে দাবি করেন, যেখানে আপনি নিজেই একটি উৎপাদনশীল উৎসভাণ্ডার ধ্বংস করে দিয়েছেন।'এই প্রশ্নবাণে নবি পশ্চাৎপদ হননি। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নাজিল হলো সুরা হাশর-এর এই আয়াতগুলো: 'আল্লাহ ওদেরকে নির্বাসন দেয়ার সিদ্ধান্ত না করলে পৃথিবীতে অন্য শাস্তি দিতেন; আর পরকালে ওদের জন্য রয়েছে আগুনের শাস্তি। উহা এজন্য যে ওরা আল্লাহ ও তার রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। আর কেউ আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করলে, আল্লাহ তো শাস্তিদানে কঠোর। তোমরা যে কত খেজুরগাছ কেটেছ আর কতক না-কেটে রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে। উহা এজন্য যে, এ দিয়ে আল্লাহ সত্যত্যাগীদেরকে অপদস্থ করবেন।'(৫৯:৩-৫)। এই আয়াতত্রয়ের গূঢ় অর্থ হচ্ছে শেষ পরিণতি দ্বারাই যুদ্ধজয়ের পদক্ষেপগুলো নির্ধারিত হয়। অমানবিক হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধের এই কৌশল তৎকালীন আরব গোত্রগুলোর কাছে গৃহীত হয়েছে। অষ্টম হিজরিতে (৬৩০ খ্রিস্টাব্দ) সাকিফ গোত্রের সাথে লড়াইয়ে এবং তায়েফ দখলের সময়েও নবি এই আয়াতগুলো ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে (৬১ হিজরি) নবির দৌহিত্র এবং হজরত আলির পুত্র হোসেন বিন আলিকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার জন্য উমাইয়া সেনারাও প্রাসাদে নারী-শিশুসহ সকলের জন্য খাদ্য-পানি সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। যা হোক, বানু-নাজির গোত্র শেষ পর্যন্ত বিশ দিন পর আত্মসমর্পণ করে। খাজরাজ গোত্রের কয়েকজন নেতার মধ্যস্থতায় এই মতৈক্যে পৌঁছানো হলো বহনযোগ্য সকল সম্পদ একটি নির্দিষ্ট জায়গায় মুসলমানদের মধ্যে বিতরণের জন্য জমা রেখে তারা নিরাপদে ইয়াসরিব ত্যাগ করবে।

ইয়াসরিবে অবস্থানকারী বাকি একমাত্র ইহুদি গোত্র ছিল বানু কুরাইজা। ৬২৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে (হিজরি ৫ম বর্ষে) তাদের অবস্থা খারাপ হয়। অভিযোগ পাওয়া গেল 'তারা ইয়াসরিবে থেকে মক্কার কুরাইশদের সাথে যোগাযোগ করছে এবং কুরাইশদেরকে

সাহায্য করতেও রাজি হয়েছে। নবি কৌশলে কুরাইজার মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করেছেন, ফলে তারা শেষ পর্যন্ত আবু সুফিয়ান বাহিনীকে সহায়তা করেনি।' কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান যখন মদিনা দখলের আশা ত্যাগ করে অবরোধ তুলে নিলেন মুসলমানরা তখন বানু কুরাইজার রাস্তা পঁচিশ দিন ধরে অবরোধ করে রাখেন। কুরাইজা গোত্র তখন তাৎক্ষণিকভাবে অন্য গোত্রের ন্যায় আত্মসমর্পণের চুক্তি করে সহায়সম্পত্তি জমা দিয়ে নিরাপদে স্থান ত্যাগ করার জন্য রাজি ছিল। কিন্তু আবু সুফিয়ানের সাথে সম্পর্ক রাখার কারণে নবি তাদের উপর খুব রুষ্ট ছিলেন। ফলে তিনি তাদেরকে এই সুযোগ দিলেন না। তিনি হয়তো আরও চিন্তা করেছিলেন ইসলামের গরিমা বৃদ্ধির জন্য এবং প্রতিপক্ষের প্রতি ভীতিপ্রদ সতর্কবার্তার জন্য ধ্বংসও প্রয়োজন আছে। পূর্বের দুইটি ইহুদি গোত্র খাজরাজ গোত্রের নেতাদের হস্তক্ষেপে মুক্তি পেয়েছিল। কুরাইজা গোত্র এবার আউস গোত্রের সাহায্য কামনা করলেন। নবিও মুসলমানদের পক্ষে আউস গোত্রের একজনকে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ দিলেন। তার নাম সাদ ইবনে মুয়াজ। তিনি পূর্ব থেকেই কুরাইজা গোত্রের ওপর ক্ষিপ্ত এবং কুরাইজা গোত্রের বিরুদ্ধে অবরোধ চলার সময় তিনি লড়াইয়ে আহত হয়েছিলেন। ক্ষুব্ধ সাদ ইবনে মুয়াজ রায় দিলেন কুরাইজা গোত্রের সকল পুরুষকে হত্যা করা হবে, তাদের নারী-শিশুকে দাস হিসেবে বিক্রি করা হবে এবং তাদের সম্পত্তি মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

এই সিদ্ধান্ত অন্যায্য হওয়া সত্ত্বেও তা পরিবর্তনের সুযোগ ছিল না। কারণ আউস গোত্রের লোকেরা সাদ ইবনে মুয়াজের রায় মেনে নিয়েছিলেন। একটি টেকসই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক সময় অনেক নির্দয় সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কুরাইজা গোত্রের বিরুদ্ধেও তাই এ-রকম সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ইয়াসরিবের বাজারে কিছু পরিখা খনন করা হয়েছিল যাতে যুদ্ধের সময় নিরাপদে স্থান ত্যাগ করা যায়। ওই পরিখাগুলো কুরাইজা গোত্রের আত্মসমর্পণকৃত সাতশজন (ভিন্নসূত্র মতে এক হাজার সংখ্যক) পুরুষ ইহুদির শিরোচ্ছেদকৃত দেহ দাফন করা হয়। অবশ্য সাদ ইবনে মুয়াজের নির্দেশ অমান্য করে একজন ইহুদি নারীকেও হত্যা করা হয়েছিল। তিনি ছিলেন কুরাইজা গোত্রের হাসান আল-কুরাইজির স্ত্রী। তিনি বিবি আয়েশার বান্ধবী ছিলেন। মৃত্যুর আগ মুহূর্তে তিনি বিবি আয়েশার সাথে কথা বলছিলেন। পরে তিনি সহাস্যে এবং উৎফুল্ল চিত্তে শিরোচ্ছেদের স্থানে হেঁটে গেলেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল বানু কুরাইজা গোত্রের বিরুদ্ধে অবরোধের সময় তিনি মুসলমানদের ওপর পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলেন। ওই নারী সম্পর্কে বিবি আয়েশার বক্তব্য ছিল: 'আমি তার মতো সুন্দরী, ভদ্র এবং দয়ালু মহিলা কখনো দেখিনি। তিনি যখন শিরোচ্ছেদের স্থানে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন, আমি তাকে বললাম, আপনাকে নির্ঘাৎ হত্যা করা হবে। তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন, বেঁচে থাকাটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নয়।'

ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ

হিজরতের পর প্রথম দশকে আমরা ইয়াসরিবে নতুন একটি রাষ্ট্রের সূচনা দেখতে পাই। মক্কায় তের বছর ধরে নবি মুহাম্মদের লক্ষ ছিল মানুষের নিকট ইসলাম প্রচার করা, উপদেশ দেয়া ও শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা। ইয়াসরিবে এসে তার নবুওতের উদ্দেশ্য প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করে। মানুষকে প্রভাবিত করে তাদেরকে নতুন ধর্মীয় বিধি গ্রহণ করানো মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এ-পর্যায়ে এসে সকল ধরনের কৌশলই প্রয়োগের বিবেচনা করা হয়েছিল। আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতার যেসব ধারা শেখানো হয়েছিল তা এখানে গুরুত্ব রাখেনি।

সেসময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে ছিল রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, বিনা উস্কানিতে হামলা এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট উপগোষ্ঠীর উপর আক্রমণ যারা মোটেও আগ্রাসী মনোভাবের ছিল না। গুপ্তচরেরা জানিয়েছিল এরা মুসলমানদের প্রতি অসহিষ্ণু হতে পারে। তাই রাষ্ট্রের প্রয়োজনেই এধরনের সব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। কুরাইশদের বাণিজ্যিক গাড়িবহরে হামলার মাধ্যমে মুহাজিররা অনেক দিন থেকে লাভবান হয়েছিলেন। এতে যেমন কুরাইশরা আহত হয়েছিল, তাদের পণ্য দখল করা গিয়েছিল তেমনি মুহাজিরদের

সামরিক দক্ষতা ও মর্যাদা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল; এবং সর্বোপরি সম্ভাব্য প্রতিপক্ষকেও ভয় দেখানো সম্ভব হয়েছিল। ওই একই সময়ে ইসলামের বেশিরভাগ আইন ও বিধিবিধান প্রকাশ করা হয়েছিল এবং ইসলামি অর্থনৈতিক ও সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল।

নবি মক্কায় থাকাকালে কোনো আইন প্রয়োগ করা হয়নি। ইসলাম-বিশেষজ্ঞ ইজহাক গোল্ডজিহার এ-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : 'মক্কায় যা নাজিল হয়েছে তা একটি নতুন ধর্মের সূচনা করে না। মক্কায় নাজিল হওয়া কোরানের আয়াতগুলোর বেশিরভাগই ধর্মপ্রাণ হওয়ার, একমাত্র আল্লাহর উপাসনা ও প্রশংসা করা, অন্যদের প্রতি খেয়াল রাখা এবং পানাহারের ক্ষেত্রে পরিমিত পরিমাণ বজায় রাখার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। মক্কায় শুধু পাঁচটি ফরজ পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। যেমন : (এক) এক আল্লাহর অস্তিত্বে এবং নবিদের কাজে বিশ্বাস রাখা, (দুই) নামাজ পড়া, (তিন) জাকাত প্রদান করা। তখন স্বেচ্ছায় মুক্তহস্তে দানের মাধ্যমে এটা করা হতো। (চার) রোজা রাখা। তখন ইহুদিদের মতো করে পালন করা হতো। (পাঁচ) হজ। তখনকার কাবা ঘর পরিদর্শনের কথা বোঝানো হয়েছে।

বিশিষ্ট তফসিরকারক জালালউদ্দিন সুয়ুতির মতে মক্কায় থাকাকালীন সময়ে ইসলামি আইনে কোনো শাস্তির নির্দেশ ছিল না। কারণটা স্বাভাবিক। কোনো আইন তখনো কার্যকর হয়নি। আল-তাবারির মতে যে সুরাগুলোতে কোনো ধরনের আইনগত বাধ্যবাধকতা করে দেয়া হয়েছে সেগুলো নিঃসন্দেহে মদিনায় নাজিল হয়েছে। বিবি আয়েশাকেও বলতে শোনা গিয়েছে, 'মক্কার কোরানের একমাত্র বিষয় ছিল বেহেশত আর দোজখ। হালাল আর হারামের নীতিমালা ইসলামের প্রসারের পর সৃষ্টি করা হয়েছে।'

নবির জীবনের শেষ দশকে যে আইন ও নীতিমালা প্রণিত হয়েছে তা ইসলামকে শুধু যে আইনগত অনুমোদন দিয়েছে তাই নয় একটি আরব রাষ্ট্র গঠনের রাস্তাও তৈরি করে দিয়েছে। নবির প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল নামাজের জন্য কিবলাকে জেরুজালেমের সবচেয়ে দূরের মসজিদ (আল-আকসা মসজিদ) থেকে সরিয়ে মক্কার কাবা শরিফের দিকে নিয়ে আসা। ফলে ইহুদিদের থেকে পৃথকভাবে ধর্মাচরণ করা সম্ভব হয়। এতে করে ইসলাম ধর্মের স্বতন্ত্রতা তৈরি হওয়ার ফলে মদিনার মুসলমানরা হীনমন্যতা কাটিয়ে উঠতে পারে। আরবের প্রায় সকল গোষ্ঠী কাবা শরিফকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করত। পৌত্তলিক উপাসনালয় থেকে কাবা একসময় সকল আরবীয়দের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম ও ইসমাইলের ঘরে পরিণত হয়। রোজা রাখার ক্ষেত্রেও নবি ইহুদিদের নিয়ম অনুসরণ থেকে সরে আসেন। মহরম মাসের দশম দিন থেকে রোজা রাখার নিয়ম পরিবর্তন করে রমজান মাসের নির্দিষ্ট কিছু দিন রোজা রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পরে পুরো রমজান মাসই রোজা রাখা হবে বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

মদিনায় থাকতে বিবাহ, আত্মীয়তা, বহুগামিতা, বিবাহ-বিচ্ছেদ, ঋতুস্রাব, উত্তরাধিকার, ব্যভিচার ও চুরির শাস্তি, হত্যা ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছনার শাস্তি ও ক্ষতিপূরণসহ আরও বিভিন্ন ফৌজদারি আইন প্রণয়ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। নাপাক, খৎনা এবং খাদ্য ও পানীয়ের উপর নিষেধাজ্ঞার আইনগুলোও এসময় প্রণীত হয়। যদিও এসব আইনের বেশিরভাগই ইহুদি বা অন্যান্য পৌত্তলিক আরবীয় আইন থেকেই নেয়া হয়েছিল তবুও স্বতন্ত্রতা রক্ষার জন্য বেশ কিছু পরিবর্তন-পরিবর্ধন এখানে আনা হয়েছিল। ইহুদি ও পৌত্তলিকতার ছোঁয়া থাকলেও এ-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে এসবের উদ্দেশ্য ছিল সমাজে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং গোত্র-সম্প্রদায়ের সবার মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করা। প্রত্যেক সম্প্রদায় বা জাতির সভ্যতার মধ্যেই অন্য সম্প্রদায়ের সভ্যতার ছাপ খুঁজে পাওয়া যায়। প্রতিটি ধর্মেই বেশকিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান থাকে যা সম্পাদনের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। এগুলোর সংগঠনের প্রক্রিয়ার মধ্যে কিছুটা হলেও কোনো ধরনের গুরুত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তিই মক্কার উদ্দেশ্যে হজযাত্রা এবং সেখানে গিয়ে হাজিদের পালন করা আচার-আচরণের পিছনে কোনো দার্শনিক যুক্তি খুঁজে পান না।

৬২৮ খ্রিস্টাব্দে নবি মুহাম্মদের কাবার উদ্দেশ্যে যাত্রার সিদ্ধান্তটি বেশ আশ্চর্যজনক ছিল। তিনি কি সত্যিই কাবাকে 'আল্লাহর ঘর'বলে বিশ্বাস করতেন? না-কি তার যেসব অনুসারীর কাছে কাবা দর্শন করা প্রাচীনকাল থেকে মেনে চলা এক ঐতিহ্য ছিল, তাদের জন্যই এমন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন? এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল কুরাইশদের সাথে হতাশাজনক হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে। সেই কুরাইশদের সাথে যারা মুসলমানদেরকে কাবা শরিফে প্রবেশে বাধা দিতো। তাহলে ওই সিদ্ধান্ত কি মুসলমানদের সামরিক শক্তি দিয়ে কুরাইশদের মোড়লিপনা থামাতে এবং সাধারণ মক্কাবাসীকে নিজের নতুন ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য নেয়া হয়েছিল? যে ব্যক্তি নিজের নতুন ধর্ম ও আইনকে আরব জনগণের সামনে তুলে ধরেছিলেন এবং নিজের কাছের মানুষদের সকল ভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস ও কুসংস্কারকে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন, তিনিই আবার কিভাবে পুরানো ধর্মের প্রধান অংশটিকে নতুন মোড়কে তার নিজের ধর্মে যোগ করলেন? ইসলামের প্রধান স্থপতি ও আইনপ্রণেতা নিরাকার বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদকে সবার উপরে প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন, মানুষকে বলে এসেছেন যে, এক আল্লাহের ওপর বিশ্বাসই সফলকাম হওয়ার একমাত্র পথ। তিনি বলেছেন : '. . . তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহর কাছে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন যে বেশি সাবধানি।'(৪৯:১৩)। তবে কি নবি জাতিগত অনুভূতিতে বশীভূত হয়ে পড়েছিলেন? কাবা ঘরের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনকে কি তিনি আরবের জাতীয় পরিচিতির প্রতীক বানাতে চেয়েছিলেন? যাই হোক না কেন, এই সিদ্ধান্তটি এতটাই বিস্ময়কর ও ইসলামি নিয়ম-নীতি হতে বিচ্যুত ছিল যে মুসলমানদের অনেকেই কিছুটা মনোক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। অনেকেই সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে চলাচলের নিয়মের বিরোধিতা করেছিলেন, কারণ এটা আরবীয় পৌত্তলিকদের ধর্মাচার ছিল। কিন্তু সুরা বাকারা-এর এই আয়াতের মাধ্যমে ইসলামে স্থায়ীভাবে স্থান দেয়া হয়েছিল : 'নিশ্চয় দুটি পাহাড় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম।'(২:১৫৮)।

হজের সময় 'হজরে আসওয়াদ'বা কালো পাথরে চুমু খাওয়া সম্পর্কে একটা বহুল প্রচলিত হাদিস আছে। নবির সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান সাহাবিদের অন্যতম হজরত ওমর বিন আল-খাত্তাব ওই কালো পাথরকে উদ্দেশ্য করে একদা বলেছিলেন : 'আমি জানি তুমি একটা পাথর ছাড়া কিছুই নও, মানুষকে সাহায্য করা বা ক্ষতি করার তোমার কোনো ক্ষমতা নেই। যদি আমি আল্লাহর রসুলকে তোমায় চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে কখনো চুম্বন করতাম না। বরং কাবাঘর হতে বহিষ্কৃত করে তোমাকে দূরে নিক্ষেপ করতাম।' [সূত্র : বুখারি শরিফ, ভলিউম ২, বুক ২৬, নম্বর ৬৬৭- অনুবাদক]। প্রভাবশালী ইসলামি দার্শনিক ইমাম গাজ্জালি[৫১] হজ সম্পর্কে বলেছেন, তিনি হজের আনুষ্ঠানিকতার কোনো ব্যাখ্যাই খুঁজে পাননি, কিন্তু তারপরও তা করেছেন, কারণ এটা একটি প্রতিপাদিত ঘটনা। [ইরাকের বসরায় জন্মগ্রহণকারী সুফি সন্ন্যাসী রাবেয়া বসরি (৭১৭-৮০১ খ্রিস্টাব্দ) হজ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: 'হজে গিয়ে আমি শুধু ইট আর একটি ভবন দেখেছি। এর থেকে আমি কি পুণ্য অর্জন করবো?' পারস্যের বিশিষ্ট সুফি সাধক বায়োজিদ বোস্তামি (৮০৪-৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ) হজে যাবার পূর্বে এক বৃদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করেন। বৃদ্ধ ব্যক্তি তাঁকে বলেছিলেন: 'আমাকে ঘিরে সাতবার প্রদক্ষিণ কর। কাবাতে গিয়ে 'তাওয়াফ' করা আর আমাকে ঘিরে প্রদক্ষিণ করা একই কথা। সুবিধা হলো তোমার সময় বাঁচবে আর দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পাবে।' বায়েজিদ তাই করে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন। সূত্র : Benjamin Walker, Foundations of Islam: The Making of a World Faith, Rupa & Co, Nwe Delhi, India, 2002, pp. 216. - অনুবাদক] । কোরানের সুরা তওবা-তে একটি আয়াত আছে যা এই ধোঁয়াশার ওপর কিছুটা আলোকপাত করে। 'হে বিশ্বাসীগণ! অংশীবাদীরা তো অপবিত্র; তাই এ-বছরের পর তারা যেন মসজিদ-উল-হারামের কাছে না আসে। যদি তোমরা দারিদ্রের ভয় কর তবে জেনে রাখো আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের অভাব দূর করতে পারেন।'(৯:২৮)। তফসির আল-জালালাইন-এর বক্তব্য অনুযায়ী এই আয়াতের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ আরবদেরকে বিজয় ও সম্মান দিয়ে ক্ষতি পুষিয়ে দেবেন। এই সুরা (তওবা) সময়ের ক্রমানুসারে কোরানের সর্বশেষ সুরা। ৬৩১ খ্রিস্টাব্দ বা হিজরি ১০ সালে মক্কা বিজয়ের পর এটি নাজিল হয়েছিল। অমুসলিম গোষ্ঠী কর্তৃক মক্কা ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রদানের কারণে মক্কার মানুষদের ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠার কথা ছিল। কারণ তাদের ব্যবসার প্রতিপত্তি ও জীবন-জীবিকার মান অন্যান্য আরবীয় গোষ্ঠীর নিয়মিত ভ্রমণের উপর নির্ভর করত। যদিও

মক্কাবাসীরা এবং নবি একই গোষ্ঠীর ছিলেন তবে তাদের বেশিরভাগই মুসলিম হয়েছিলেন বাধ্য করার কারণে। মক্কা যদি তার জৌলুশ হারাতো, তবে ইসলাম-ত্যাগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ারও ঝুঁকি ছিল। তাই মুসলমানদের জন্য মক্কা-ভ্রমণকে (হজ) বাধ্যতামূলক ঘোষণা করার মাধ্যমে এই ঝুঁকিকে প্রশমিত করা হয়েছে। এমন বিশ্লেষণকে আপাতত শুধু 'অনুমান-নির্ভর' বলা যায়। এ-বিষয়টি আসলে কতটুকু সত্য তা শতভাগ কখনো জানা যাবে না। ইসলামের হজ-ব্যবস্থায় পূর্বের পৌত্তলিকদের রেওয়াজ বহাল রাখার কোনো যৌক্তিকতা পাওয়া যায় না। বিশ্বনন্দিত আরব কবি আবুল-আলা আল-মারি[৫২]'হজ'নিয়ে মন্তব্য করেছেন এভাবে: 'এই পৃথিবীর দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসে। (শয়তানের প্রতি) পাথর ছুঁড়তে আর কালো পাথর চুম্বন করতে। কী উদ্ভট কথাই না তারা বলে! তবে কি সত্য অবলোকন করতে গিয়ে মানুষ অন্ধত্ব বরণ করেছে।'

মদিনায় সুরা-পান ও জুয়া খেলা নিষিদ্ধকরণের ঘোষণা দেয়া হয়েছিল এবং তা প্রয়োগ করা হয়েছিল। মদিনায় শুরুর দিকে জাকাত প্রদানকে কেন ঐচ্ছিক ঘোষণা করা হয়েছিল এবং এক পর্যায়ে নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে জাকাতকে কর আদায়ের অন্যতম প্রক্রিয়ায় কেন রূপান্তরিত করা হয়েছিল তা বুঝতে পারা মোটেও কঠিন কিছু না। আর ওই একই সময়ে ধর্মীয় যুদ্ধ বা জিহাদকে আইনগত ভিত্তি প্রদান করা হয়েছিল যার সদৃশ আর কোনো বিধান ছিল না। প্রথমে যুদ্ধের অনুমতি শুধুমাত্র সুরা হজে এই আয়াতের মাধ্যমে দেয়া হয়েছিল: 'যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে।'(২২:৩৯)।

এক পর্যায়ে ক্রিয়াপদগুলোকে নির্দেশনামূলক বানিয়ে ও বাক্যের ভাবকে আরও জোরালো করে যুদ্ধকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সুরা বাকারা, সুরা আনফাল, সুরা তওবাসহ বিভিন্ন মাদানি সুরাতে বলপ্রয়োগের নির্দেশনা যুক্ত করা হয়েছে। লক্ষণীয় হচ্ছে মক্কি সুরায় পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোনো নির্দেশনা খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে মাদানি সুরাগুলো এমন সব বিষয় দিয়ে পূর্ণ, যা পাঠ করলে মনে হয় অন্য যে কোনো বিষয়ের চেয়ে জিহাদ করা অনেক বেশি বাধ্যতামূলক।নবি আরবদের নিয়ন্ত্রণ করা ও তাদের নিয়ে তরবারি ব্যবহার না করে একটি ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন করা কতটা কঠিন তা বুঝতে পেরেই এই সিদ্ধান্তটি বেছে নিয়েছেন। কারণ সমগ্র আরবের মূল সংস্কৃতির মধ্যে 'যুদ্ধ'অঙ্গাঅঙ্গিভাবে গাঁথা। তাই আরবীয়দের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চাইলে 'যুদ্ধ'কে অস্বীকার করার কোনো পথ ছিল না। জিহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে মানুষের মূল্যবান মানবিক অধিকারগুলোকে অবজ্ঞা করার প্রয়োজন হতো। যেমন চিন্তা করার স্বাধীনতা বা ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিশ্বাস পালনের স্বাধীনতা। আর এ-কারণে আরবের আশেপাশে বিভিন্ন অঞ্চলে সমালোচনা ও প্রশ্ন উঠেছিল, যেগুলোর জবাব দেয়া সহজ ছিল না। যেমন, একটি ধর্ম বা মতবাদ প্রচার বা পালনে মানুষকে তরবারির দ্বারা বাধ্য করা কতটুকু যৌক্তিক? মানবিকতা ও ন্যায় বিচারের নীতির সাথে এগুলো কি আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ?

স্পষ্টত আমরা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে অনাচার ও ভ্রষ্টাচার বিভিন্ন আঙ্গিকে ছড়িয়ে পড়তে দেখেছি। তবে ন্যূনতম প্রজ্ঞার অধিকারী কোনো ব্যক্তির কাছে সাধারণ মানুষের চিন্তার বা বিশ্বাস করার স্বাধীনতাকে শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক কেড়ে নেয়ার চেয়ে নির্মম ও অযৌক্তিক স্বৈরাচার আর কিছু হতে পারে না। প্রতিপক্ষকে দমিয়ে রাখতে কোনো শাসকের অমানবিক প্রচেষ্টাকেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজনীতির মাঠে টিকে থাকার কৌশল হিসেবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। কিন্তু সাধারণ মানুষকেও শাসকগোষ্ঠীর ন্যায় চিন্তা করতে বা শাসকগোষ্ঠীর মতবাদ অনুসারে চলতে বাধ্য করা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় যে, সকল জাতিকেই কোনো না কোনো সময় এ ধরনের পীড়নের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। সংকীর্ণ অবস্থানে থেকে শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারের প্রশ্নকে তোয়াক্কা না করার ঘটনা আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন স্থানে ঘটতে দেখেছি। এমন প্রবণতা সাধারণ জনগণের মধ্যেও দেখা যায়, যখন তারা অন্যের মতামত ও বিশ্বাসকে মূল্য দিতে অপারগ হয়ে স্বৈরাচারী নীতিতে নিজেরাও বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। মানবজাতির ইতিহাসে বিভিন্ন অন্ধকার যুগের সূত্রপাত এই ধরনের রক্ষণশীল

পন্থার কারণেই হয়েছিল। এই উগ্রতা বা গোঁড়ামি মানুষদের ভিন্নমতাবলম্বী অন্য মানুষকে পোড়াতে, শিরোচ্ছেদ করতে, ফাঁসিতে ঝোলাতে, অঙ্গহানি করতে ও বন্দী করে রাখতে এমনকি জাতিগত গণহত্যা সাধনেও উদ্বুদ্ধ করেছে। বর্তমান যুগে আমরা বিভিন্ন দেশে নাৎসি ও কমিউনিস্ট শাসকদের দ্বারা সংঘটিত গণহত্যার ঘটনা উদাহরণ হিসেবে দেখতে পাই।

ইতিহাসের শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে অনেক দেশে চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হয়েছে এ-নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। যে প্রশ্নটি এখানে চিন্তার উদ্রেক ঘটায় তা হলো মানবাধিকারের এই লঙ্ঘনগুলো কি আধ্যাত্মিক স্রষ্টার দায়িত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। তিনি তো পূর্বে জানিয়েছিলেন : 'ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই।'(২:২৫৬)। এছাড়া তার সিদ্ধান্ত হচ্ছে : '. . . যার ধ্বংস হওয়ার কথা সে যেন (সত্যাসত্যের) প্রমাণ স্পষ্ট প্রকাশের পর ধ্বংস হয় এবং যার জীবিত থাকার কথা সে যেন (সত্যাসত্যের) প্রমাণ স্পষ্ট প্রকাশের পর জীবিত থাকে।'(৮:৪২)। আল্লাহ তো নবিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'আমি তোমাকে বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ হিসেবে পাঠিয়েছি।'(২১:১০৭) এবং 'তুমি অবশ্যই সুমহান চরিত্রের সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছ।'(৬৮:৪)।

মক্কায় থাকাকালীন ৯০ তম সুরা বালাদ নাজিলের সময় আবুল আসাদ নামের একজন দাম্ভিক ব্যক্তির কথা পূর্বে বলা হয়েছে। তার বিপুল সম্পদ ছিল। শারীরিকভাবেও তিনি অনেক শক্তিশালী ছিলেন। ওকাজ মেলায় তিনি কার্পেটের উপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিতেন, যদি কেউ তার পায়ের নিচ থেকে ওই কার্পেট সরাতে পারে তবে তাকে বড় অঙ্কের অর্থ পুরস্কার দেয়া হবে। যুবকেরা অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে বিভিন্ন দিক থেকে কার্পেট টানাটানি করত। কিন্তু কার্পেট ছিঁড়ে না যাওয়া পর্যন্ত টানতে থাকত আর আসাদ যেখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন সেখান থেকে কেউ তাঁকে সরাতে পারতেন না। এমন দাম্ভিক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা সত্ত্বেও সুরা বালাদে নবি মুহাম্মদের অগাধ বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কোরানের এই সুরার সুমিষ্টতা অন্য কোনো ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা যায় না। তথাপি এই সুরার ৪ থেকে ১৭ নম্বর আয়াতের অর্থ দুর্বল অনুবাদের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করছি : 'আমি মানুষকে শ্রমনির্ভর করেই সৃষ্টি করেছি। সে কি মনে করে যে কেউ কখনও তাকে কাবু করতে পারবে না? সে বলে, 'আমি প্রচুর ধনসম্পদ ব্যয় করেছি।'সে কি মনে করে যে তাকে কেউ দেখেনি?আমি কি তাকে দুটো চোখ, জিহ্বা আর ঠোঁট দিইনি? আর দুটো পথই কি আমি তাকে দেখাইনি? সে তো কষ্টসাধ্য পথ অবলম্বন করেনি? তুমি কি জান কষ্টসাধ্য পথ কী? সে হচ্ছে, দাসমুক্তি কিংবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান এতিম আত্মীয়কে বা দুর্দশাগ্রস্ত অভাবীকে; তার ওপর তাদের শামিল হওয়া যারা বিশ্বাস করে, পরস্পরকে ধৈর্য ধরার উপদেশ দেয় ও উপদেশ দেয় দয়াদাক্ষিণ্যের।' (৯০:৪-১৭)।

যে পৈত্রিক-ধর্মত্যাগী ব্যক্তি মক্কায় তার নিজস্ব বিশ্বাস ও অন্যদের প্রতি আল্লাহর অনুকম্পা প্রচার করে গিয়েছেন দীর্ঘ তের বছর ধরে, সেই মানুষটিই মদিনায় গিয়ে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যুদ্ধের নির্দেশ দিতে থাকলেন: 'তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেয়া হল।' (২:২১৬), '. . . যে সত্যধর্ম অনুসরণ করে না তাদের সাথে যুদ্ধ করবে...' (৯:২৯), 'কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম চাইলে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না...' (৩:৮৫), 'যখন তোমরা অবিশ্বাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে মোকাবিলা কর তখন তাদের ঘাড়ে-গর্দানে আঘাত করো। শেষে যখন তোমরা ওদেরকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করবে তখন ওদেরকে শক্ত করে বাঁধবে...।' (৪৭:৪)।

এরকম কয়েক ডজন কঠোর আয়াত মদিনায় নাজিল হয়েছিল। মক্কায় 'লোহার মূল্য'উল্লেখ করা হয়নি, তবে মাদানি সুরা হাদিদ-এ বলা হয়েছে: 'আর আমি দিয়েছি লোহা, যার মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য নানা উপকার; আর এ এজন্য যে, আল্লাহ যেন জানতে পারেন কে না-দেখে তাঁকে ও তার রসুলদেরকে সাহায্য করে।'(৫৭:২৫)। এ আয়াত থেকে মনে হতে পারে, মক্কায় হয়তো নবির কাছে 'লোহা'(লোহা দিয়ে তৈরি অস্ত্র) ছিল না, কিংবা লোহা ব্যবহারের সুযোগ ছিল না কিংবা আল্লাহ রসুলের দুর্ভোগ চিহ্নিতকরণের উপায় নির্ধারণে খুব একটা গুরুত্ব দেননি। মক্কায় থাকতে আল্লাহ মুহাম্মদকে আদেশ করেছিলেন: 'তুমি মানুষকে হিকমত ও সৎ উপদেশ দিয়ে তোমার প্রতিপালকের পথে ডাক দাও ও ওদের সাথে ভালোভাবে আলোচনা করো।

তার পথ ছেড়ে যে বিপথে যায় তার সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক ভালো করেই জানেন। আর যে সৎপথে আছে তাও তিনি ভালো করে জানেন।'(১৬:১২৫)।

এভাবে একটি আধ্যাত্মিক কাঠামো থেকে ইসলাম ক্রমেই আক্রমণ-প্রতিরক্ষাভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়। ইসলামের অগ্রযাত্রা 'গাজওয়া'থেকে লব্ধ মালামাল ও জাকাতের মাধ্যমে অর্জিত রাজস্বের ওপর নির্ভরশীল ছিল। মদিনায় হিজরতের পরে নবির যাবতীয় পদক্ষেপ এবং সিদ্ধান্তগুলো একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র নির্মাণকে কেন্দ্র করে নেয়া হয়েছে। অবশ্য যুদ্ধবন্দী হত্যা, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডসহ তার নির্দেশে সংঘটিত বেশকিছু কাজই বিদেশি পণ্ডিতদের কাছে নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে।

বদরের যুদ্ধের পর যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে কী করা যেতে পারে তা নিয়ে নবি অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলেন। তার মনের মধ্যে প্রশ্ন ঘোরপাক খাচ্ছিল, তিনি কি এই যুদ্ধবন্দীদের কিছু মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিবেন, যার মাধ্যমে ইসলামের যোদ্ধাদের বেতন দেয়া যেতে পারে? নাকি তাদেরকে দাস হিসেবে ব্যবহার করা উচিত হবে? নাকি তাদেরকে গৃহবন্দী করে রাখা হবে? তখন বাস্তববাদী ও দূরদর্শী সাহাবি হজরত ওমর বিন আল-খাত্তাব (যাকে ইসলামি রাষ্ট্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়) পরামর্শ দিলেন, যুদ্ধবন্দীদের মেরে ফেলাই যৌক্তিক হবে। ওমরের মতে মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের মুক্তি দেয়া ঠিক হবে না, কারণ এতে করে তারা পুনরায় শত্রুপক্ষের বাহিনীতে যোগ দিয়ে আরও তীব্রভাবে যুদ্ধ করতে পারে। আবার এদেরকে দাস হিসেবে রাখলে বা অন্তরীণ করে রাখলে তাদের পাহারা দিয়ে রাখার পেছনে অনেক খরচ হবে প্রতিনিয়ত। তাই যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করলে তাদের সমস্ত গোষ্ঠী যেমন ভয় পেয়ে যাবে তেমনি ইসলামের সামরিক মর্যাদাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। সুরা আনফালের এই আয়াতের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়: 'দেশে সম্পূর্ণভাবে শত্রু নিপাত না করা পর্যন্ত বন্দি রাখা কোনো নবির পক্ষে সমীচীন নয়। তোমরা চাও পার্থিব সম্পদ আর আল্লাহ চান পরলোকের কল্যাণ।'(৮:৬৭)।

বদর যুদ্ধে বন্দীদের মধ্যে দুইজন হচ্ছেন কুরাইশ বংশের বিখ্যাত সাহিত্যিক নদর বিন আল-হারিস এবং ওক্বা বিন আবু মোয়াইত। উল্লেখ্য নদর বিন আল-হারিস একসময় আল হিরার লাখমিদ রাজদরবারের রাজকবিও ছিলেন। তিনি ফেরদৌসি নামের একটি মনোমুগ্ধকর কবিতাও লিখেছিলেন। নদর পূর্বে বিভিন্ন সময় কোরানের সুরার মতো কবিতা লেখার দাবিও করেছিলেন। তিনি দাবি করতেন, কোরানের আদ-সামুদ-লুতের বর্ণনার চেয়ে তিনি আরও সুন্দর করে পারস্যের বিখ্যাত রুস্তম-ইসফানদার এররাজকীয়ও বীরত্বপূর্ণ কাহিনী-গাথা বলতে পারেন। নবি নদর ও ওকবা দুজনকে শিরোচ্ছেদ করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সাহাবি আল-মিক্বদাদ বিন আমর চেয়েছিলেন নদরের কাছ থেকে মোটা অংকের মুক্তিপণ আদায় করে ছেড়ে দিতে। তিনি নবিকে বললেন, 'এই লোক আমার বন্দী। তাই সে আমার গনিমতের মাল হিসেবে বিবেচ্য।' নবি মিক্বদাদকে জিজ্ঞেস করলেন, নদর লোকটি কোরানের আয়াত নিয়ে পূর্বে যেসব কটুক্তি করেছে, তা কি ভুলে গেছ?' নদর সম্পর্কে কোরানে মন্তব্য করা হয়েছে: 'যখন তাদের কাছে আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে, 'আমরা তো শুনলাম, ইচ্ছা করলে আমরাও এরকম বলতে পারি, এ তো শুধু সেকালের উপকথা।'(৮:৩১)। শেষ পর্যন্ত নদরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। মিক্বদাদও তার উপর থেকে নিজের দাবি তুলে নিয়েছিলেন। নদরের মাথা কেটে ফেলা হয়েছিল। এর পরে যাত্রা বিরতিতে কবি ওক্বা বিন আবু মোয়াইতকে নবির সামনে হাজির করা হয়। তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ আসিম বিন সাবিতকে দেয়া হয়েছিল। ইসলামের ইতিহাসের প্রথম দিককার নবির জীবনী-লেখক ইবনে ইসহাক তার 'সিরাত রসুল আল্লাহ' বইয়ে জানিয়েছেন, সাহাবি আসিম বিন সাবিত ওকবা বিন মোয়াতকে হত্যা করতে উদ্যত হলে ওক্বা কাঁদতে কাঁদতে নবিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আমি মারা গেলে আমার সন্তানদের কি হবে?' নবি উত্তরে বলেছিলেন: 'জাহান্নামের আগুন।' [দ্রষ্টব্য : মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ৩৮, বুক নম্বর ১৯ নম্বর ৪৪২১-৪৪২২।- অনুবাদক]।

মক্কা বিজয়ের পর নবি মুহাম্মদের পক্ষ থেকে বিরুদ্ধবাদীদের জন্য একটি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে সেখানে কিছু ব্যতিক্রম ছিল। ছয়জন পুরুষকে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই হত্যার নির্দেশ দেয়া হলো। এমনকি কাবা ঘরে দেখলেও তা প্রযোজ্য ছিল। এরা হচ্ছেন : সাফওয়ান বিন উমাইয়া, আব্দুল্লাহ বিন আল-খাতাল, মিকাস ইবনে সাবাবা আল-লায়থি, ইকরিমা বিন আবু জেহেল, আল হুরায়েস ইবনে নুকায়েদ বিন ওহাব এবং আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবু সারাহ। শেষোক্ত ব্যক্তি মদিনায় থাকাকালীন সময়ে বেশকিছু দিন কোরানের সুরার অনুলিখনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবু সারাহ হজরত উসমানের পিতামাতা কর্তৃক পালিত সন্তান ছিলেন। তিনি একসময় নবি মুহাম্মদের বেশ প্রিয়ভাজন ব্যক্তি ছিলেন। বিভিন্ন সময় নবির সম্মতিতে কোরানের আয়াতের শেষের দিকের শব্দগুলো তিনি পরিবর্তন করে দিতেন। যেমন কোরানের সুরা অনুলিখনের সময় নবি একবার এক আয়াতের শেষে যখন বলেছিলেন : 'এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ' (আরবিতে 'আজিজ', 'হাকিম') শব্দগুলো যোগ করার জন্য, আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবু সারাহ বাক্যটি সংশোধন করে পরামর্শ দিলেন, 'এবং আল্লাহ সব জানেন ও বিজ্ঞ'(আরবিতে 'আলিম', 'হাকিম') লেখার জন্য। নবি অমত করলেন না, লেখার অনুমতি দিলেন। কোরান আল্লাহর বাণী হলে নিশ্চয়ই কারো পক্ষে পরিবর্তন-সংযোজন করা সম্ভব নয়। তাহলে আব্দুল্লাহ বিন সাদের মতো একজন সাধারণ অনুলেখক কোরানের আয়াতের পরিবর্তন করে চলছেন, এটা সাদের মনেও সন্দেহ সৃষ্টি করে। তিনি কোরানের অলৌকিতায় সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই ইসলাম ত্যাগ করে মক্কায় গিয়ে কুরাইশদের দলে যোগদান করেন। [পারস্যের ফার্স রাজ্যে জন্মগ্রহণকারী ইসলামি পণ্ডিত ও কাজি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর আল-বায়দাওয়ি (মৃত্যু ১২৮৬ খ্রিস্টাব্দ) তার 'আছরার উত-তান্জিল ওয়া আছরার উত-তায়িল' শিরোনামের কোরানের তফসিরে বলেছেন : 'নবি একদিন কোরানের সুরা মুমিনুন-এর ১২ থেকে ১৪ পর্যন্ত আয়াত লেখার জন্য আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবু সারাহকে বললেন। আয়াতগুলো হচ্ছে : 'আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস থেকে। তারপর তাকে বীর্যরূপে এক নিরাপদ আধারে রাখি, পরে আমি বীর্যকে তৈরি করেছি একটি জমাট রক্তপিণ্ডে, তারপর রক্তপিণ্ড থেকে মাংসপিণ্ড তৈরি করেছি, তারপর মাংসপিণ্ড থেকে হাড় তৈরি করে, অতঃপর হাড়গুলোকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি। অবশেষে তাকে নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি।' (২৩:১২-১৪)। নবি এতটুকু বলার পর আব্দুল্লাহ বিন সাদ বলে উঠলেন, 'নিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান!' নবি বললেন, 'এই বাক্যটি লাগিয়ে দাও।'আবদুল্লাহ বিন সাদ তখন হতবাক হয়ে গেলেন। মানুষের বক্তব্য কোরানের আয়াতে সংযুক্ত হয় কিভাবে? তার মনে সংশয়ের সৃষ্টি হয়। আল্লাহর নামে প্রচারিত কোরানের বাণী তাহলে কার? শেষে আব্দুল্লাহ বিন সাদ ইসলাম ত্যাগ করে কুরাইশ দলে যোগ দিয়ে প্রচার করতে থাকেন: 'কোরান আল্লাহর ঐশীবাণী নয়, এটা নবি মুহাম্মদের নিজস্ব বক্তব্য। আমি নিজেও কোরানের কয়েকটি আয়াত সংশোধন করে দিয়েছি।'পারস্যের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আল-তাবারি (৮৩৯-৯২৩ খ্রিস্টাব্দ) কোরানের ৬ নম্বর সুরা আনআম-এর ৯৩ নম্বর আয়াতের তফসিরে আব্দুল্লাহ বিন সাদ- এর 'মুরতাদ' হয়ে যাওয়া নিয়ে একই ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন। তার বহুল প্রচারিত 'হিস্ট্রি অব আল-তাবারি'বইয়ে (ইংরেজিতে অনূদিত 'দ্যা লাস্ট ইয়ারস্ অব দ্যা প্রফেট', ভলিউম ৯, পৃ. ১৪৮) আব্দুল্লাহ বিন সাদ- এর 'মুরতাদ'হয়ে যাওয়া এবং এর পরবর্তী ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ আছে। - অনুবাদক]।

তথাপি আব্দুল্লাহ বিন সাদের ভাগ্য ভালো। মক্কা বিজয়ে পর হত্যা- তালিকায় নাম থাকার সংবাদ তিনি দুধভাই হজরত উসমানের মাধ্যমে পেয়ে যান। প্রাণ বাঁচাতে ভীত আব্দুল্লাহ বিন সাদ হজরত উসমানের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। উসমানও দুধভাইকে রক্ষার জন্য মক্কা বিজয়ের তাৎক্ষণিক উত্তেজনা প্রশমনের আগ পর্যন্ত কিছু দিন লুকিয়ে রাখেন। পরে তিনি একদিন সুযোগ মতো সাদকে নিয়ে নবির সামনে উপস্থিত হন ও তাঁকে ক্ষমা করে দেবার অনুরোধ জানান। দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকার পর নবি সম্মতিসূচক উত্তর প্রদান করেন। নবি হয়তো অনিচ্ছা সত্ত্বেও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন উসমানের মধ্যস্থতা মেনে নেন। ইরাকের বাগদাদে জন্মগ্রহণকারী বিশিষ্ট মুসলিম পণ্ডিত ইবনে সাদ আল-বাগদাদি (৭৮৪-৮৪৫ খ্রিস্টাব্দ) তার 'কিতাব আল-তাবাকাত আল-কবির'বইয়ে (ভলিউম

২, পৃ. ১৭৪) উল্লেখ করেছেন, হজরত উসমান তার দুধভাইকে নিয়ে চলে যাওয়ার পর কয়েকজন সাহাবি যখন নবিকে তার এই দীর্ঘ নীরবতার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, নবি উত্তরে বলেন: 'আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবু সারাহ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি প্রাণভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আমি ভেবেছিলাম আব্দুল্লাহ বিন সাদ আমার সামনে এসে কিছু বলার জন্য উঠে দাঁড়াবেন এবং তোমাদের মধ্যে কেউ একজন তার গর্দান কেটে ফেলবে।' এমনটা বলার কারণ হলো নবি পূর্বেই ঘোষণা দিয়েছিলেন, যেকোনো স্থানে সাদের রক্ত ঝরানো জায়েজ হবে, যদি তা কাবা শরিফের পর্দায় লেগে যায় তাহলেও সমস্যা নেই। মদিনার এক আনসার নবির বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বললেন: 'নবি কেন ইশারা করেননি?'নবি পুনরায় জানালেন, 'আল্লাহর রসুলদের চোখ মিথ্যা হতে পারে না।'অর্থাৎ তিনি নীরব থাকার ভান করে চোখ দিয়ে হত্যা করার ইশারা দিতে পারেন না। হজরত উসমান খলিফা হওয়ার পর আব্দুল্লাহ বিন সাদকে উত্তর আফ্রিকা আক্রমণে আরব সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ দান করেন। এই যুদ্ধে আব্দুল্লাহ বিন সাদ তার দায়িত্ব এতো সুচারুরূপে পালন করেছিলেন যে উসমান মিশর দখলকারী আমর ইবনে আল-আসকে সরিয়ে আব্দুল্লাহ বিন সাদকে মিশরের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

হত্যা- তালিকায় উল্লেখিত আব্দুল্লাহ বিন আল-খাতালসহ তার ফারহানা ও কারিবা নামের দুইজন দাসীও ছিলেন। যারা নবিকে ব্যঙ্গ করে গান গাইতেন। তাদের তিনজনকেই মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবা ও সারা নামের দুইজন নারীকে একই কারণে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। 'সারা'বানু আব্দুল মোতালেব গোত্রের আমর বিন হাশিমের 'মুক্তদাসী'ছিলেন। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবা নবির প্রতি নিজের আনুগত্য প্রকাশ করে ক্ষমা চাওয়ায় তাঁকে ক্ষমা করা হয়েছিল। আর মুক্তদাসী'সারা' নবির কাছে অনুনয়-বিনয় করে প্রাণভিক্ষা পেলেও পরে হজরত ওমর তাঁকে ঘোড়ার নীচে পদদলিত করে হত্যা করেন।

বানু-নাজির গোত্রের ইহুদি কাব বিন আল-আশরাফের হত্যাকাণ্ডের কথা পূর্বে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। কাবের পিতা ছিলেন তাঈ গোত্রের এবং মাতা বানু-নাজির গোত্রের। বদরের যুদ্ধের পর ইসলামের ক্রমবর্ধনশীলতা দেখে কাব মক্কায় চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি কুরাইশদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং লড়াই অব্যহত রাখার অনুরোধ জানান। কিছুদিন পর ৬২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি মদিনায় ফিরে আসেন এবং মুসলিম নারীদের নিয়ে প্রণয়াত্মক কবিতা লিখেন। এ কবিতায় তিনি নিজের কামজনিত ভালোবাসার কথা প্রকাশ করেছিলেন। নবি এসংবাদ শুনে ক্ষুব্ধ হন। তিনি সাহাবিদেরকে বলেন, 'আমার হয়ে কাব বিন আল-আশরাফকে শায়েস্তা করার জন্য কে আছ?'তখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা নামের একজন সাহাবি নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। নবি তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন। মুহাম্মদ বিন মাসলামার সাথে ছিলেন আবু বিন জবর আল-হারিস বিন আউস, আব্বাস বিন বশির এবং কাবের এক জ্ঞাতি ভাই আবু নায়েলা। আবু নায়েলাকে সঙ্গে রাখার কারণ ছিল কাব যেন সন্দেহ করতে না পারেন এবং ইয়াসরিবের শেষ প্রান্তে অবস্থিত তার সুরক্ষিত বাড়িতে লুকিয়ে না থাকেন। নবি শহরের শেষ মাথা পর্যন্ত তাদের সাথে যান এবং সেখান থেকে তাদের বিদায় জানিয়ে আল্লাহর নিকট তাদের সাহায্য করার জন্য দোয়া করেন। মাসলামার নেতৃত্বে তারা কাবের বাড়ির ভেতরে ঢুকেন। আবু নায়েলাকে দেখে কাব বিন আল-আশরাফ সন্দেহ করেননি। তিনিও তাদের সাথে বাড়ি থেকে বের হয়ে কথা বলতে থাকেন এবং শহরের দিকে হাঁটতে থাকেন। এক- পর্যায়ে মাসলামাসহ বাকিরা কাবের ওপর চড়াও হন এবং ধস্তাধস্তির পর তাকে হত্যা করেন। ইয়াসরিবে পৌঁছে মাসলামা দেখেন নবি গভীর রাত অবদি জেগে আছেন এবং শুভ সংবাদের অপেক্ষা করছেন। [হজরত জাবির বিন আব্দুল্লাহর বর্ণীত হাদিস অনুযায়ী : '. . . মুহাম্মদ বিন-মাসলামা দুজন সঙ্গী (আবু বিন জবর আল-হারিস বিন আউস এবং আব্বাস বিন বশির) নিয়ে প্রথম দিন কাব বিন আল-আশরাফের কাছে গিয়ে বললেন, 'ওই মানুষটি (নবি মুহাম্মদ) আমাদের কাছে কর দাবি করছেন, তিনি আমাদেরকে বড়ই জ্বালাতন করছেন।'কাব বললেন, 'ঈশ্বরের কসম! ওই লোকটির উপদ্রবে তোমাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। মাসলামা বললেন, 'যেহেতু আমরা তাকে নবি বলে মেনে নিয়েছি, তাই সহজে ছেড়ে আসতে পারি না। আমরা এখন দেখার অপেক্ষায় আছি কোন পথে কিভাবে তার ধ্বংস হয়। আমরা

এসেছি তোমার কাছে, তুমি যদি এক বস্তা খাদ্য আমাদের কর্জ দিয়ে সাহায্য করো। কাব রাজি হলেন। মাসলামা যাবার আগে বললেন, 'আমরা আগামীকাল আসবো।' পরের দিন গভীর রাতে তারা আসলেন। পথিমধ্যে মাসলামা তার সঙ্গীদেরকে বললেন, 'আমি যখন কাবের মাথা দুহাতে চেপে ধরবো তখনি তোমরা তাকে আক্রমণ করবে।' কাব ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, এতো গভীর রাতে কোথায় যাওয়া হচ্ছে? কাব বললেন, আমার বন্ধুরা এসেছে একটু সাহায্য চায়। কাবকে নিয়ে ঘর হতে বের হওয়ার পর কিছু দূর গিয়ে মাসলামা বললেন, 'কী দারুণ মিষ্টি সুগন্ধ তোমার চুলে, আমি কি একটু শুঁকে দেখতে পারি?' সহাস্য মুখে গর্বিত কণ্ঠে কাব বললেন, 'আরব দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারী আমার ঘরে, তাই এই সুগন্ধ!' মাসলামা চুলের সুগন্ধ শুঁকার ভান করে চুলসহ কাবের মাথা শক্ত করে দুহাতে চেপে ধরেন। সাথে-সাথে সঙ্গীরা দুদিক থেকে কাবের পাঁজর বরাবর তরবারি ঢুকিয়ে দেন। তারপর মাসলামা কাবের মস্তক কেটে নবির পায়ের কাছে নিয়ে রাখলেন। [দ্রষ্টব্য : বুখারি শরিফ, ভলিউম ৫, বুক ৫৯, নম্বর ৩৬৯।- অনুবাদক]।

আরেকজন প্রভাবশালী ইহুদি ও আউস গোত্রের পুরনো বন্ধু সালাম বিন আবিল হুকায়েক ইয়াসরিব থেকে খায়বার চলে গিয়েছিলেন। খাজরাজদের কয়েকজন ওই ইহুদি নেতা সালামকে হত্যার অনুমতি প্রার্থনা করেন। নবি অনুমতি দেন এবং আব্দুল্লাহ বিন আতিককে দলের নেতা হিসেবে নিয়োগ দেন। তারা তাদের কাজ ঠিকঠাকভাবে সম্পন্ন করেছিলেন এবং ফিরে আসার পর নবিকে সমস্বরে 'আল্লাহ মহান'বলে সংবাদটি প্রদান করেছিলেন। কাব ও সালাম নিহত হওয়ার পর আরেকজন ইহুদি ধর্মাবলম্বী ইয়াসির বিন রেজামকে হত্যা করার জন্য আব্দুল্লাহ বিন রাওহার নেতৃত্বে আরেকটি দল পাঠানো হয়েছিল। ইয়াসির খায়বারে গিয়ে বেদুইনদের একটি বড় গোষ্ঠী বানু গাতাফানকে নবির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য উৎসাহিত করছিলেন। হোজায়েল গোষ্ঠীর নেতা খালেদ বিন সুফিয়ান নাখলায় নিজের গোত্রের লোকদেরকে নবির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য উস্কানি দিয়েছিলেন। নবি সংবাদটি শুনে আব্দুল্লাহ বিন ওনায়েসকে পরিস্থিতি সামাল দিতে নির্দেশ দেন। পরে খালেদকে হত্যা করা হয়।

রেফা বিন কায়েস নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালালে নবি ক্ষুব্ধ হন এবং ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আব্দুল্লাহ বিন হাদ্রাদকে নির্দেশ দেন। আব্দুল্লাহ প্রথমে তীর ছুঁড়ে রেফাকে হত্যা করেন, পরে কুড়াল দিয়ে মস্তক আলাদা করে ফেলে নবির সামনে নিয়ে আসেন। ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানকে হত্যার জন্য মক্কার একজন পেশাদার খুনি আমর ইবনে উমাইয়াকে নিয়োগ করা হয়। আবু সুফিয়ান বিষয়টি টের পেয়ে পালিয়ে যান। বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেও আমর ইবনে উমাইয়া আবু সুফিয়ানকে হত্যা করতে পারেননি। উমাইয়া রাগের মাথায় একজন নিরীহ কুরাইশকে হত্যা করেন এবং অন্যজনকে গ্রেফতার করে ইয়াসরিবে নিয়ে যান। ১২০ বছর বয়সী একজন বয়োবৃদ্ধ আবু আফাককে হত্যা করা হয়েছিল কারণ তিনি নবির সমালোচনা করেছিলেন। নবির নির্দেশে সালেম বিন ওমর এই কাজ করেছিলেন। বয়োবৃদ্ধ মানুষকে হত্যা করায় ইয়াসরিবের ইহুদি নারী কবি আসমা বিনতে মারওয়ান ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি বানু খাতমা গোত্রের অধিবাসী। তার স্বামী ইয়াজিদ বিন জায়েদ, এবং পাঁচটি সন্তান নিয়ে তাদের সংসার। আসমা বিনতে মারওয়ান নবির বিরুদ্ধে একাধিক কবিতা লিখে সমালোচনা করেছিলেন। তিনি ইয়াসরিববাসীকে উত্তেজিত করতে চেয়েছিলেন মুহাম্মদের বিরুদ্ধে একত্রিত হতে। বদর যুদ্ধের পর ইসলামের প্রসার মেনে নিতে পারেননি। তিনি কবিতায় আউস, খাজরাজসহ ইয়াসরিবের বিভিন্ন গোত্র, যারা নবিকে সহযোগিতা করতেন এবং যারা নিস্পৃহ ছিল উভয়কে নিয়ে ব্যঙ্গ করেন। ইসলামের ইতিহাসের প্রথম দিককার নবির জীবনী-লেখক ইবনে ইসহাক তার 'সিরাত রসুল আল্লাহ'(ইংরেজিতে অনূদিত 'দ্যা লাইফ অব মুহাম্মদ') বইয়ে বলেছেন, ৬২৪ খ্রিস্টাব্দের রমজান মাসের ২৫ তারিখ নবির নির্দেশে উমায়ের বিন আদিয়া আল-খাতামি ঘুমন্ত অবস্থায় পাঁচ শিশুসন্তানসহ আসমা বিনতে মারওয়ানকে হত্যা করেন।

বদর যুদ্ধের দুই বন্দী আবু আজ্জা আল-জুমাহি ও মুয়াবিয়া বিন মুগিরাকে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দিয়ে ইয়াসরিবে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন নবি। ওহুদের যুদ্ধে নবি-বাহিনীর পরাজয় হলে মুয়াবিয়া পালিয়ে আত্মগোপন করেন এবং আবু আজ্জা পুরোপুরি মুক্তির

জন্য আবেদন করেন। নবি তৎক্ষণাৎ আবু আজ্জাকে এবং মুয়াবিয়া বিন মুগিরাকে গ্রেফতার করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ প্রদান করেন। উভয় নির্দেশই পালন করা হয়। জোবায়ের বিন আল-আওয়াম আবু আজ্জার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন।

ইয়াসরিবের খাজরাজ গোত্রের আব্দুল্লাহ বিন উবায়ের প্রথম দিকে ইসলামের প্রতি নিজের আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ক্রমে যখন ইসলামের প্রসার বাড়তে থাকে, নবির সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায় তখন তিনি তখন মুহাম্মদের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন। তিনি নবি মুহাম্মদের বিরোধিতা করে নিজের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রচার করতে শুরু করেন। মুসলমানরা তাঁকে মুনাফেকদের প্রধান হিসেবে চিহ্নিত করেন। এক পর্যায়ে হজরত ওমর খাজরাজের নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবায়েরকে হত্যা করাই উচিৎ বলে মন্তব্য করেন। তবে নবির আরেক অনুসারী, খাজরাজ গোত্রের সাদ বিন উবায়দা আব্দুল্লাহর প্রতি সদয় হবার অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন, 'আমাদের শাসক হবার ইচ্ছা যাতে আব্দুল্লাহ বিন উবায়েরের পূরণ না হয়, সেজন্য আল্লাহই আপনাকে আমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। অন্যথায় আমরা এতোদিন তার মাথায় মুকুট পরিয়ে তার হাতে সীলমোহর তুলে দিতাম।

বর্তমানকালের মিশরীয় বুদ্ধিজীবী মুহাম্মদ হোসেন হায়কলের[৫৩] (১৮৮৮-১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ) লেখা 'দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ' নামের নবি মুহাম্মদের জীবনী-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : 'নবি হজরত ওমরের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, আমি যদি তখন তোমার কথা অনুসরণ করে আব্দুল্লাহ বিন উবায়কে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করতাম তবে তার গোত্রের আত্মীয়-স্বজনেরা প্রতিশোধ নেবার জন্য আমাদের ওপর আক্রমণ করত। কিন্তু আমি এখন আদেশ দিলে তার আত্মীয়রা বরং সেটা আগে পালন করবে। হায়কলের মতে, 'আব্দুল্লাহ বিন উবায়ের এর ছেলে অন্য কারো হাতে নিজের পিতার মৃত্যু দেখার চেয়ে নিজেই তার পিতাকে হত্যা করতে আগ্রহী ছিলেন। নবি নির্দেশ দিলে তিনি নিজেই এমনটা করবেন বলে প্রস্তাব দিয়েছিলেন।'মিশরীয় ইসলামি পণ্ডিত জালালউদ্দিন আল-সুয়ুতি (১৪৪৫-১৫০৫ খ্রিস্টাব্দ) মন্তব্য করেছেন, কোরানের সুরা নিসা-এর ৮৮ নম্বর আয়াতটি আব্দুল্লাহ বিন উবায়ের প্রেক্ষিতে এসেছে: 'তোমাদের মধ্যে কী হয়েছে যে, তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেলে, যখন আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন? আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তোমরা তাকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাও? আসলে আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্য কখনও কোনো পথ পাবে না। (৪:৮৮)। সুয়ুতির বর্ণনায়, আব্দুল্লাহ বিন উবায়ের প্রতি ক্রোধের কারণে নবি তার অনুসারীদের বলেছিলেন যে, লোকটি সবসময় নিজ বাড়িতে প্রতিপক্ষ শিবিরের লোকজন নিয়ে বৈঠক করেন এবং বিপদ ঘটানোর চেষ্টা করেন, সে লোকটিকে সরিয়ে দিতে কেউ রাজি আছেন কি-না? ঘটনাক্রমে আব্দুল্লাহ বিন উবায়কে একসময় ক্ষমা করা হয়। এরপর তিনি হিজরি ৯ সালে (৬৩১ খ্রিস্টাব্দ) মারা যান। নবি তার শেষকৃত্যের আয়োজনও করেছিলেন।

যেসব হত্যাকাণ্ড শুধুমাত্র পরাক্রম প্রদর্শন কিংবা ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে সংগঠিত হয়েছিল, সেগুলোকে কৌশলে অনেক সময় অনেকে ইসলামের জন্য নিবেদিত সেবা বলে চালিয়েছেন। যেমন ইয়াসরিবে এক ইহুদি দোকানদার ভালো ব্যবসা করতেন। অনেক মুসলমান ক্রেতার সাথে তার সুসম্পর্ক ছিল। যেদিন নবি বানু কুরাইজা গোত্রের সকল ইহুদি পুরুষকে হত্যার নির্দেশ দেন, সে-সময় মুহায়সা বিন মাসুদ দৌড়ে এসে ইবনে সুনাইনা নামের ওই নিরীহ দোকানদারটিকে হত্যা করেন। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য মুহায়সা বিন মাসুদকে একজনই মাত্র তিরস্কার করেছিলেন, সে হচ্ছে তার আপন ভাই।

অষ্টম হিজরিতে রোমানদের বিরুদ্ধে যখন সমর অভিযানের পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছিল তখন নবির কাছে বার্তা আসে, শোয়ালেম নামের এক ইহুদির বাড়িতে বেশকিছু লোকের সমাগম হয়েছে। কিভাবে রোমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের এই যুদ্ধ প্রতিরোধ করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা চলছে। নবি তখন সাহাবি তালহা বিন ওবায়দুল্লাহসহ কয়েকজনকে সে-বাড়িটি চারদিক থেকে ঘিরে আগুন ধরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। একজন মাত্র মানুষ আগুনে পুড়ে যাওয়া বাড়ি থেকে বের হতে পেরেছিলেন। কিন্তু পালাতে

গিয়ে তার পা ভেঙে যায়। সুরা তওবার একটি আয়াতে যেসব মুসলিম গরমের কারণে এই অভিযানে যোগ দিতে পারেনি, তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে: 'আর তারা বলল, গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না।'বলো, 'জাহান্নামের আগুনই সবচেয়ে গরম।'(৯:৮১)।

নবুওতি ও শাসন

নবি হিসেবে মুহাম্মদের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই মক্কি সুরা বিশেষ করে সুরা মুমিনুন এবং সুরা নজম পাঠ করতে হবে। এই সুরায় মুহাম্মদকে যিশুর মতো আধ্যাত্মিক ব্যক্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। আর রাষ্ট্রনেতা, শাসক, আইন-প্রণেতা হিসেবে মুহাম্মদের ভূমিকা জানতে আমাদের পড়তে হবে সুরা বাকারা, সুরা নিসা, সুরা মুহাম্মদ, এবং সবশেষে সুরা তওবা'র মতো মাদানি সুরাগুলো। মদিনায় হিজরতের তিন-চার বছর পর ইহুদি গোত্রগুলো নির্মূল হলে এবং বানু মুস্তালিক গোত্রকে (মদিনার পশ্চিমে বসবাসকারী একটি বেদুইন উপজাতি) পরাজিত করার পর নবি মুহাম্মদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মুহাম্মদের জীবনী লিখতে গিয়ে ইতিহাসবিদ ইবনে হিশাম একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। একবার ইহুদি ধর্মের বানু-নাজির গোত্রের হাওয়া বিন আক্তাবের কন্যা সাফিয়া স্বপ্নে দেখেন চাঁদ তার কোমরে নেমে এসেছে। সাফিয়া তার স্বামী কেনানা বিন আবু রাবিয়াকে স্বপ্নের ঘটনাটি বললে তিনি ক্রোধে সাফিয়ার চোখে জোরে আঘাত করেন। ফলে সাফিয়ার চোখ ফুলে উঠে। কেনান বিন রাবিয়া স্ত্রীকে গাল দিয়ে বলেন: 'তুমি কি হেজাজের রাজার স্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখ নাকি?' পরবর্তীতে খায়বার দখলের পর নবি সাফিয়াকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। ইবনে হিশামের বর্ণনায় আরেকটি ঘটনার উল্লেখ আছে। বানু কায়নোকা গোত্রের আব্দুল্লাহ বিন সালাম ইসলাম গ্রহণ করলে ইহুদিরা তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ করতেন। তারা বলতেন, 'তুমি ভালো করেই জানো নবুওত শুধুমাত্র ইহুদি সন্তানরাই লাভ করতে পারে। এটি আরবদের জন্যে নয়। তোমার মুনিব কোনোভাবেই নবি নন, তিনি একজন রাজা মাত্র।'মক্কা বিজয়ের পর প্রাণভয়ে যখন কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি আব্বাস বিন আব্দুল মোতালেবকে বলেন : 'তোমার ভাতিজার দখলে তো আছে বিশাল অঞ্চল।'আব্বাস ফিরতি জবাব দিলেন : 'হ্যাঁ। নবুওত প্রাপ্তির জন্যই এই রাজত্ব।'

হজরত ওমর বিন আল-খাত্তাব ইসলামের ইতিহাসে একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য তিনি নবি মুহাম্মদের কাছে খুব বিশ্বস্ত এবং শ্রদ্ধেয় ছিলেন। ওমরের চারিত্রিক এই গুণাবলীর কারণেই ইসলাম প্রচারের শুরু থেকে নবি ওমরকে তার ঘনিষ্ঠজনের বৃত্তে নিয়ে আসেন। কুরাইশদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধিতে মুহাম্মদের সম্মতি নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন হজরত ওমর। তার কাছে এসন্ধি ছিল এক ধরনের পরাজয়। হুদায়বিয়ার সন্ধির আগে নবি কয়েকজন সাহাবি ও বেদুইন অনুসারীদের সাথে মক্কার বাইরে অবস্থান নিয়ে হজ পালনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কুরাইশরা এ-সংবাদ শোনা মাত্র মুহাম্মদের প্রবেশ ঠেকাতে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মক্কা থেকে ছয় মাইল দূরে অবস্থান নিয়ে মুসলমানরা সমঝোতার চেষ্টা করেন। শেষে উভয়ে এই শর্তে উপনীত হয় যে, 'মুসলমানেরা এ-বছর মদিনায় ফিরে যাবে তবে পরের বছর তারা কাবায় হজ করতে পারবেন।' এ-প্রস্তাবে ওমর ভেবেছিলেন কুরাইশরা নবিকে তাদের সব শর্ত মেনে নিতে বাধ্য করেছে। তাই তিনি আবেগ-তাড়িত হয়ে মুহাম্মদের কাছে এবিষয়ে জানতে চান। নবি তখন উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং চিৎকার করে বলেন : 'তোমার মা তোমার জন্য শোক করুক।' নবির

মুখে এঅভিশাপের কথা শুনে ওমর নিজেকে সংবরণ করেন। যে নবি হুদায়বিয়ার সন্ধি করেছিলেন আর যে নবি দশ/বারো বছর আগে প্রবল আগ্রহ নিয়ে ওমর ও হামজাকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেছিলেন, দুজনের পার্থক্য আছে। হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে কুরাইশদের নিকট আত্মসমর্পনের যুক্তিকে ভিন্ন আঙ্গিকে ভিত্তি দিতে নাজিল হয় সুরা ফাতাহ-এর প্রথম আয়াত : 'আল্লাহ তোমার জন্য সুস্পষ্ট বিজয় অবধারিত করেছেন।'(৪৮:১)। বর্তমানে সবাই স্বীকার করেন হজরত আবু বকরের কুশলী ভূমিকা ওমরসহ অনেকের অসন্তুষ্টি কমাতে ভূমিকা রেখেছিল।

যদিও হুদায়বিয়ার সন্ধি এক দৃষ্টিতে মুসলমানদের পিছপা হওয়া এবং এজন্য নবিকে ওমরসহ কয়েকজন সাহাবির অসন্তুষ্টির সম্মুখীন হতে হয় তবু এ-সন্ধি থেকে নবির গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। নবি হয়তো এ-সময় কুরাইশদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েননি কারণ তিনি সম্ভবত নিশ্চিত ছিলেন না, মুসলমানরা আদৌ কুরাইশদের পরাজিত করতে পারবে কিনা। ফলে একটি সাময়িক আপোস বা সন্ধি তার কাছে অধিক নিরাপদ ছিল। নবি জানতেন মুসলমানদের একটি পরাজয় কুরাইশদের শক্তিশালী করবে। তাছাড়া এ পরাজয় বেদুইনদের ওপর মুসলমানদের প্রভাব হ্রাস করবে এবং ইহুদিদের ক্ষোভ উসকে দিবে। যা মুসলমানদের ভবিষ্যতকে এক গভীর অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেবে। এসব দিক বিবেচনা করেই সম্ভবত নবি কুরাইশদের সাথে সন্ধি করেন। তিনি সম্ভবত কুরাইশদের শর্তাবলী মেনে নিয়েছিলেন এই চিন্তা করে যে, শর্ত মানার ফলে তার প্রভাব ও মর্যাদা সমুন্নত থাকবে এবং পরবর্তী বছর তার অনুসারীরা হজ করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে পরাজয়ের কোনো শঙ্কা থাকবে না।

হুদায়বিয়ার সন্ধিতে মুহাম্মদ যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন সেবিষয়ে অনুধাবণ করা যায় তার পরবর্তী খায়বার যুদ্ধযাত্রা থেকে। মুহাজিরদের অনেক নিকট-আত্মীয় তখনো মক্কায় বাস করতেন। তাই নবি জানতেন, মুহাজিরদের অনেকে সে-জন্যে কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে প্রাণপণে লড়াই করবেন না। কিন্তু ইহুদিদের শেষ শক্তিশালী ঘাঁটি খায়বার আক্রমণে সে-ধরনের কোনো শঙ্কা নেই। বরং খায়বারের যুদ্ধ জয় মুসলমানদের মনোবল ও গনিমতের মাল দুই-ই বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। সুরা ফাতহ্-এর কয়েকটি আয়াতে এ-সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে। যেমন এই আয়াতে বলা হয়েছে : 'বিশ্বাসীরা যখন গাছের নিচে তোমার কাছে তোমার আনুগত্যের শপথ নিল তখন আল্লাহ তাদের ওপর সন্তুষ্ট হলেন। তাদের অন্তরে যা ছিল তিনি তা জানতেন...।'(৪৮:১৮)।

হুদায়বিয়ায় যখন কুরাইশদের সাথে নবির যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী মনে হয়েছিল, তখন নবি মুসলমানদের নিয়ে একটি গাছের নিচে দাঁড়ান। কুরাইশদের যেকোনো প্রতিরোধের মুখে যুদ্ধ করে যাবার শপথ গ্রহণ করেন সবাই। ইসলামের ইতিহাসে এই শপথের নাম 'আল্লাহর সন্তুষ্টির শপথ'(বায়াত অর-রেদওয়ান)। মানে আল্লাহ এই শপথ থেকে খুবই আনন্দিত হয়েছেন। 'আর তাদের জন্য স্থির করলেন আসন্ন বিজয়।'(৪৮:১৮)। 'যুদ্ধে (তারা) লাভ করবে বিপুল সম্পদ।'(৪৮:১৯)। 'আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তোমরা যুদ্ধ- লভ্য বিপুল সম্পদের অধিকারী হবে। তিনি তোমাদের জন্য এ ত্বরান্বিত করবেন।' (৪৮:২০)। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর নবি দ্রুত মদিনাতে ফিরে আসেন এবং সেখানে এক পক্ষ কাটিয়ে খায়বারের উদ্দেশ্যে সৈন্য নিয়ে যাত্রা করেন। তিনি সন্দেহ করেছিলেন মুসলমানেরা হুদায়বিয়ার সন্ধি নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন তুলতে পারে। আবার তিনি এ-ও জানতেন, খায়বার যুদ্ধ জয় হলে সন্ধি নিয়ে প্রশ্ন তোলার চেয়ে গনিমতের মালের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন সবাই।

গনিমতের মাল হস্তগত করার বিষয়টি বেদুইনদের এতোই আন্দোলিত করেছিল যে, যারা কুরাইশদের সাথে যুদ্ধে যেতে রাজি ছিলেন না তারাও পর্যন্ত খায়বার আক্রমণে সঙ্গী হতে রাজি হয়ে গেলেন। সুরা ফাতহ্-এর ১৫ নম্বর আয়াতে এ-সম্পর্কেই বলা হয়েছে: 'তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে তখন যারা ঘরে থেকে গিয়েছিল তারা বলবে, 'আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও।'(৪৮:১৫)। এর পরের আয়াতে আল্লাহ নবিকে নির্দেশ দিয়েছেন, 'যে-সব মরুবাসী আরব ঘরে থেকে গিয়েছিল তাদেরকে বলো, তোমাদেরকে ডাকা হবে এক প্রবলপরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে। তোমরা ওদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ

না ওরা আত্মসমর্পণ করে। তোমরা এ-নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালো পুরস্কার দেবেন। কিন্তু তোমরা যদি আগের মতো পালিয়ে যাও তিনি তোমাদেরকে দারুণ শাস্তি দেবেন।'(৪৮:১৬)। খায়বারের জলাশয়ে কাছে কয়েকটি রাজকীয় প্রাসাদ ছিল। প্রথম দিনে 'সালাম বিন মেশকাম' প্রাসাদটি আক্রমণ করেন মুসলমানরা। কিন্তু দখলের আগে ভয়াবহ লড়াইয়ে ৫০ জন মুসলমান যোদ্ধা প্রাণ হারান। অন্যদিকে হজরত আবু বকরের নেতৃত্বে 'নাওম' প্রাসাদ আক্রমণ করা হয়। কিন্তু সফল হতে পারেননি। হজরত ওমরের নেতৃত্বে আক্রমণ করেও দখল নেয়া যায়নি প্রাসাদটি। অবশেষে হজরত আলি প্রাসাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। অন্যদিকে জাবির প্রাসাদের পানি-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। ফলে প্রাসাদে অবস্থানকারীরা বের হয়ে আসতে বাধ্য হয়। বাইরে এসে তারা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলেও শেষমেশ ব্যর্থ হয়ে পালিয়ে যায়। এভাবে একের পর এক কয়েকটি প্রাসাদের পতন ঘটে। সবশেষে মুসলমানেরা আস-সুলেমান এবং আল-ওয়াথি প্রাসাদদ্বয়ে পৌঁছেন। এই প্রাসাদ দুটিতে পূর্ব থেকে ইহুদি নারী ও শিশুদের নিরাপত্তার জন্য আলাদা করে রাখা হয়েছিল। ইহুদিরা শেষমেশ যুদ্ধ বিরতির আবেদন করেন। নবি যুদ্ধবন্দীদের বাঁচিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ইহুদিদের কৃষি জমির মালিকানা মুসলমানদের হাতে দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যদিও ইহুদিরা সে জমিতে কাজ করতে পারবে এবং তারা তাদের উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক মুসলমানদের দেবে।

খায়বার যুদ্ধ থেকে নবির কাছে গনিমতের ভাগ পড়ে সাফিয়া নামের ইহুদি রমণী। সেই সাফিয়া, যিনি স্বপ্নে চাঁদকে তার কোমরে নামতে দেখেছিলেন এবং স্বামীকে তা বলার পর আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। মদিনায় ফেরত আসার আগে নবি সাফিয়াকে বিয়ে করেন। খায়বারের পূর্বে ফাদাকের জলাশয়ের কাছে অন্য ইহুদি গোত্র বসবাস করত, তাও মুসলমানরা দখল নিতে সক্ষম হোন। এ-জন্যে তাদের কোনো যুদ্ধ করতে হয়নি। খায়বারের ইহুদিদের পরিণতির কথা বলতে ফাদাকের ইহুদিরা ভয়ে বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পন করেন এবং তাদের উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক মুসলমানদের দিতে রাজি হোন। মদিনার দক্ষিণে ওয়াদি আল-কোরা ও তায়মাতে বসবাসকারী ইহুদিরাও মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং আরোপিত শর্ত হিসেবে জিজিয়া কর দিতে রাজি হন। এভাবে মুসলমানদের বিজয় রথ এগুতে থাকে। হেজাজের সমস্ত দক্ষিণাঞ্চল নবি মুহাম্মদের শাসনাধীন হয়। এটা উল্লেখ্য যে খায়বার যুদ্ধ জয়কে নবি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত কূটনীতিতে কাজে লাগিয়েছেন। যুদ্ধ জয়ের পর বেদুইনদের বানু গাতাফান গোষ্ঠীকে নবি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। এই গোষ্ঠী ইহুদিদের সাথে বেশ সম্পর্কিত ছিল। তারা নবির সাহচর্যে না এসে ইহুদিদের সাথে থাকলে হয়তো মুসলামানদের এ-যুদ্ধ জয় করা অনেক কষ্টসাধ্য হতো। বানু গাতাফান গোষ্ঠীকে তাই গনিমতের মালের অর্ধেকই দিয়ে দেন নবি।

হিজরতের পরে নবির কার্যাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এসময় নবি ধর্মপ্রচারের সাথে সাথে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে সময় দিয়েছেন বেশি। যুদ্ধ জয়ে মুসলমানদের অন্যতম কৌশল ছিল 'গাজওয়া'বা আকস্মিক আক্রমণ করা। অন্য অনেক পদ্ধতি অনুসরণ করে আক্রমণ করা হতো, তবে তা সুনির্দিষ্ট গুপ্তচরদের পাঠানো গোপন তথ্যের উপর ভিত্তি করে। এভাবে কয়েকটি কুরাইশ বাণিজ্যিক কাফেলাকে লক্ষ্য করে আক্রমণ করা হয়। এসব আক্রমণ যেমন বিপক্ষ দলকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তেমনি প্রাপ্ত গনিমতের মাল বিজয়ী মুসলমানদের আরও নিবেদিতপ্রাণ যোদ্ধা হতে উৎসাহিত করেছে।

হিজরি ৩ সালে (৬২৫ খ্রিস্টাব্দ) মদিনার নিকট ওহুদ পাহাড়ের ময়দানে সংঘটিত যুদ্ধে পরাজয় মুসলমানদের জন্য ছিল একটি বিরাট ধাক্কা। কিন্তু এই পরাজয় অবধারিত ছিল না। যুদ্ধে পরাজিত মুসলমানদের মদিনায় ফেরত না পাঠিয়ে আবু সুফিয়ানের কুরাইশ দল মক্কায় ফেরত চলে যায়। এই যুদ্ধে নবির রণকৌশল অনুসরণ করা হয়নি। নবির নির্দেশ মেনে মুসলমানরা পাহাড়ের ঢালে অবস্থান নেননি। নিলে অবশ্য এই যুদ্ধে হারতেন না। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে কেউ কেউ গনিমতের মাল আগেভাগেই হস্তগত করার জন্য যার যার জায়গা ছেড়ে যান। ফলে যুদ্ধে পরাজিত হন।

হিজরি ৫ সালে (৬২৭ খ্রিস্টাব্দে) মুসলমানরা পুনরায় বিপদের সম্মুখীন হোন। কুরাইশ এবং বেদুইনরা সম্মিলিতভাবে মদিনা দখলের চেষ্টা করেন। ইসলামের ইতিহাসে এ-ঘটনাকে বলা হয় খন্দকের যুদ্ধে। এই যুদ্ধে মুসলমানরা মদিনার চারপাশে এক ধরনের পরিখা খনন করেন যা আগে কখনো দেখা যায়নি। প্রচলিত আছে যে, এই পরিখা নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম ইরানি নাগরিক সালমান আল-ফার্সি। কুরাইশদের পক্ষে পুনরায় নেতৃত্বে ছিলেন আবু সুফিয়ান। একজন কুরাইশ যোদ্ধাও পরিখা পার হয়ে মদিনায় প্রবেশ করতে পারেননি। মুসলমানদের জন্য ঝুঁকি ছিল মদিনার ভেতরে থাকা ইহুদি বানু কুরাইজা গোষ্ঠী কুরাইশদের সাথে যোগ দিতে পারে। কুরাইজা গোষ্ঠী যদি কুরাইশদের সাথে যোগ দিতো তবে মুসলমানরা এ যুদ্ধে পরাজিত হবার ও ইসলামের প্রসার থমকে যাবার সম্ভাবনা ছিল। নবি মুহাম্মদের কৌশলের কারণে সে যাত্রায় বিপদ কেটে যায়। দুই সপ্তাহ পর কুরাইশরা যুদ্ধ থেকে ক্ষান্ত দেন।

যুদ্ধের সময় নবি মুহাম্মদ গাতাফান গোষ্ঠীর গোপনে ইসলামে ধর্মান্তরিত নোয়াম বিন মাসুদ নামের একজন ব্যক্তিকে বানু কুরাইজা ও কুরাইশদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্য নিযুক্ত করেন। নোয়াম বিন মাসুদের সাথে মদিনার ইহুদি ও কুরাইশদের সাথে সুসম্পর্ক ছিল। ফলে উভয়েই তাকে নবি মুহাম্মদের প্রতিপক্ষ ভেবেছিলেন এবং তার বক্তব্য বিশ্বাস করেছিলেন। নোয়াম বিন মাসুদের ভূমিকার ফলে বানু কুরাইজা ও কুরাইশ বাহিনী একে অপরকে অবিশ্বাস করেন। অবশেষে বানু কুরাইজাদের তরফ থেকে কোনো সহযোগিতা না পেয়ে এবং হঠাৎ করে শৈতপ্রবাহে টিকতে না পেরে কুরাইশরা মক্কায় ফিরে যান। কুরাইশরা মক্কা ফেরত যাবার পরই নবি সশস্ত্র সৈনিকের একটি দল প্রেরণ করেন বানু কুরাইজাদের রাস্তায়। বানু কুরাইজা ভেবেছিল আবু সুফিয়ানের বাহিনীকে সাহায্য না করায় মুসলমানরা বোধহয় এবার সহনশীল আচরণ করবে। কিন্তু মুসলমানদের জন্য ভবিষ্যতের হুমকি মনে হওয়াতে নবি তাদেরকে মদিনা থেকে সমূলে বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কুরাইজাদের বিনাশ ইসলামের বিকশিত শক্তি সম্পর্কে অন্যদের ভীত করবে, মুসলমানদের জন্য বিশাল গনিমতের ব্যবস্থা হবে, তেমনি মদিনার আউস ও খাজরাজ গোষ্ঠীর লোকেরা ইসলামের পতাকার প্রতি আরও অনুগত হবেন।

৬২৫ খ্রিস্টাব্দের প্রেক্ষাপটে বানু-নাজির গোত্রের খেজুর গাছের বাগানে মুসলমানদের আগুন দেয়া ছিল ঘৃণিত একটি কাজ। যুদ্ধে পরাস্ত করার অন্য কোনো উপায় দেখে নবি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কোরানের সুরা হাশর-এর ২-১৭ নম্বর আয়াত নবির সিদ্ধান্তকে যৌক্তিক ভিত্তি দেবার জন্য নাজিল হয়েছে। ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানরা একই ধরনের কঠোর পদ্ধতি গ্রহণ করেন তায়েফ-নিবাসী বানু সাকিফদের অবরোধ করে রাখার সময়। অবরোধের মাধ্যমে মুসলমানরা বানু সাকিফদের বাইরে থেকে খাদ্য আসা বন্ধ করে দেন। কিন্তু শীঘ্রই মুসলমানরা বুঝতে পারেন, বানু সাকিফদের আবাসস্থলের ভেতরে খাদ্যের বড় মজুদ রয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদে অবরুদ্ধ করে রাখলেও তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। অন্যদিকে নবি আরব মুসলমান সৈনিকদের অস্থির চরিত্রের কথা চিন্তা করেন। অচিরেই সৈনিকেরা ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়বেন। তাই দ্রুত যুদ্ধ জয়ের কথা চিন্তা করে বানু সাকিফদের আঙ্গুরের ক্ষেত পুড়িয়ে দেবার আদেশ দেন। জীবিকার উৎস হিসেবে বানু সাকিফদের নিকট এই আঙ্গুরের ক্ষেত ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই তারা নবির কাছে একজন দূত প্রেরণ করে মুসলমানদের এ-রকম ধংসাত্মক কাজ থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেন। বিনিময়ে সমস্ত আঙ্গুর ক্ষেতের মালিকানা মুসলমানদের দিয়ে দেবার প্রস্তাব দেন। নবি তায়েফ অবরোধ স্থগিত করে মক্কা ফিরে যান এবং হাওয়াজেন গোত্র থেকে নেয়া গনিমতের মাল বন্টন করেন। বানু সাকিফ গোত্রের এক নেতা মালেক বিন আউসকে প্রস্তাব দেন, মালেক ইসলামে দীক্ষিত হলে তার স্ত্রী-সন্তানদের মুক্তি দেবার সাথে সাথে একশত উট প্রদান করা হবে। প্রস্তাবে রাজি হয়ে মালেক বিন আউস নিজের ধর্ম-গোত্র ত্যাগ করে নবির উপস্থিতিতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এই সব ঘটনা ইসলামের প্রাথমিক যুগে লিখিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থে লেখা আছে এবং তা নির্ভরযোগ্যও। ইসলামের প্রাথমিক বছরগুলোর ঘটনা নবি মুহাম্মদের মানসিকতা ও নতুন ধর্ম হিসেবে ইসলামের দ্রুত প্রসারের লৌকিক ব্যাখ্যা প্রদান করে।

মক্কা জয়ের পর এবং তায়েফ জয়ের পূর্বে নবি হাওয়াজেন গোত্রকে পরাস্ত করে প্রচুর গনিমতের মাল লাভ করেন। গনিমতের মাল বন্টনের সময় মুসলমানরা ভয় পেতেন, নবি উদারভাবে নব্য মুসলমানদের গনিমতের মাল সব দান করে ফেলবেন। যেভাবে তিনি মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান, তার সন্তান মুয়াবিয়া, আল-হারেস বিন আল-হারেস, আল-হারেস বিন হিশাম, সোহেল বিন অমর এবং হাওয়াতেব বিন আব্দুল ওজ্জাকে ১০০টি করে উট উপহার দিয়েছিলেন। এ ঘটনায় মদিনার আনসারগণ অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাদের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সাদ বিন ওবাদা নবির কাছে আনসারদের এ ক্ষোভের কথা জানান। নবি তখন আনসারদের ডেকে পাঠান, তাদের বক্তব্য শোনার জন্য। নবির এই কার্যক্রম তার কূটনৈতিক ও অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করার দক্ষতা প্রমাণ করে। নবি আনসারদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'ও আমার আনসারেরা! এটা কি ভালো নয় যে অন্যরা উট নিয়ে ফিরে গেল আর তোমরা ফিরে যাবে আল্লাহর দয়া নিয়ে?' মদিনায় অবস্থানকালীন সময়ে নবি মুহাম্মদ সম্পর্কে যে দলিল বা তথ্য ইসলামের ইতিহাসের প্রথমদিককার ঐতিহাসিকরা প্রকাশ করেছেন তাতে নবির চরিত্রে ধর্মপ্রচারকের সাথে একজন রাষ্ট্রনায়কের চিত্রও ধরা পড়ে। মুহাম্মদের জীবনী নিয়ে যে কোনো একনিষ্ঠ পাঠক পড়াশুনা করলে এ-ধরনের অসংখ্য প্রমাণ পাবেন।

তফসির আল-জালালাইনে সুরা নিসা-এর ১০৫-১০৭ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় নীচের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তমা বিন ইবরিক নামের একজন ব্যক্তি একজন সৈনিকের পোশাক চুরি করে তা ইহুদি ব্যক্তির ঘরে লুকিয়ে রাখেন। পোশাকের মালিক পোশাকটি লুকানো স্থানে খুঁজে পান। পোশাকের মালিক যখন পোশাক চুরির জন্যে তমাকে দায়ী করেন তখন তমা নিজেকে নির্দোষ দাবি করে ওই ইহুদি ব্যক্তিকে 'চোর' বলে দাবি করেন। তমার আত্মীয়রা এ-বিষয়টি নবির সামনে উপস্থাপন করেন এমনভাবে যে, তমা একজন মুসলমান তাই নবি যেন তমার পক্ষপাতিত্ব করেন। কিন্তু নবি তা করেননি। পক্ষপাতিত্বের চেয়ে তিনি সত্যকেই প্রাধান্য দিলেন। সুরা নিসার ১০৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : 'আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষের মধ্যে সেই মতো বিচার করতে পার আল্লাহ তোমাকে যেমন জানিয়েছেন। তুমি বিশ্বাসঘাতকদের জন্য তর্ক করো না।'(৪:১০৫)। সুরা হুজুরাত-এর ৯ নম্বর আয়াতেও একই ধরনের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এখান থেকে নবি মুহাম্মদের নেতৃত্বের গুণাবলীই যে প্রকাশিত হয় শুধুতাই নয়, সেই সাথে তৎকালীন আরব মুসলমান সমাজের অবস্থা ও দলাদলির চিত্রও উঠে এসেছে। আয়াতটি হল: 'বিশ্বাসীদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তুমি তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবে। তারপর তাদের এক দল যদি অন্য দলের বিরুদ্ধে সীমা ছাড়িয়ে যায়, তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করে। যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে তাদের ন্যায়ের সঙ্গে ফয়সালা করে দেবে, সুবিচার করবে।'আয়াতটি একই সাথে পরিষ্কার এবং বোধগম্য। তফসির আল-জালালাইনে আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ আছে যেখানে তৎকালীন আরবের সমাজিক অবস্থা ও নবি অনুসারীদের মধ্যকার মনোমালিন্যের বিষয়টি ফুটে ওঠেছে : 'নবি একবার একটি গাধার পিঠে চড়ছিলেন এবং যখন তিনি আব্দুল্লাহ বিন উবায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন গাধাটি শুকনো মলত্যাগ করে। ইবনে উবায় দুর্গন্ধের জন্যে নিজের নাক চেপে ধরেন। তখন সেখানে উপস্থিত আনসারদের এক নেতা আব্দুল্লাহ বিন রাওহা বলেন, 'ইবনে উবায়, আল্লাহর নামে শপথ নিয়ে বলছি, রসুলের কাছে তোমার শরীরে ব্যবহার করা সুগন্ধির চেয়ে গাধার এই মলের গন্ধ কম অসহনীয়।'ইবনে রাওহার এই বক্তব্য নিয়ে তার অনুসারীদের সাথে ইবনে উবায়ের অনুসারীদের সাথে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে লাঠি-জুতা নিয়ে দুই পক্ষ মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে।

মক্কা বিজয়ের পর কবি বোজায়ের বিন জোহায়ের বিন আবু সালমা তার ভাই কবি কাব বিন জোহায়েরকে একটি চিঠি লিখেন : 'যে কবিরা নবির নামে কবিতা লিখেছেন কিংবা নবির মনে কষ্ট দিয়েছেন, তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হচ্ছে। যারা এধরনের কাজ করেছিল তাদের অনেকেই এখন মক্কা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তাই আপনি নিরাপদে থাকতে চাইলে নবির কাছে গিয়ে ক্ষমা চাওয়া উচিত। অতীত কাজের জন্য যারা ক্ষমা প্রার্থনা করছেন নবি তাদেরকে শাস্তি দিচ্ছেন না। অন্যথায় আপনার উচিত মক্কা ছেড়ে চলে

যাওয়া যাতে মুসলমানরা আপনাকে দেখতে না পায়।' কাব ঠিক করলেন তিনি ইসলাম গ্রহণ করবেন। জীবন বাঁচাতে তিনি নবির প্রশংসা করে একটি কবিতা লেখেন যা 'আলখাল্লার কবিতা' নামে পরিচিত। কারণ নবি কবিতাটি শুনে এতো খুশি হয়েছিলেন যে, তিনি কাবকে তার নিজের একটি আলখাল্লা[৫৪] উপহার দিয়েছিলেন।

ওই সময়ে আরবের মানুষ সরল এবং অনানুষ্ঠানিক জীবনযাপন করতেন। তাই তারা তাদের নেতার সাথে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতো স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ করতেন। তাদের কাছে একমাত্র বাধ্যবাধকতা ছিল কোরানের নির্দেশ মেনে চলা। তারা নবি মুহাম্মদকে নিজেদের একজন মনে করতেন। কিন্তু এধরনের সম্পর্ক বেশি দিন থাকেনি। নিয়ম-কানুনের বাধ্যবাধকতা ও রীতিনীতি মেনে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নবি মুহাম্মদকে সম্মান দেখানো প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। সুরা হুজুরাত-এর ১-৫ নম্বর আয়াতে এবং কোরানের আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে নবির জন্য তার অনুসারীদের আদব-কায়দা নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে : 'হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহ ও তার রসুলের আগে যাওয়ার চেষ্টা করো না।'(৪৯:১)। যেহেতু আল্লাহর উপস্থিতি চোখে দেখা যায় না, তাই এই আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে, 'বিশ্বাসিগণ, তোমাদের সামনে নবি উপস্থিত থাকলে নবি স্থান ত্যাগ করা না পর্যন্ত তোমরা কোনো কথা বলো না বা কোনো কাজ করো না।'পরবর্তী আয়াত হচ্ছে: 'হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নবির কণ্ঠস্বরের ওপরে নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না আর নিজেদের মধ্যে যেভাবে উঁচুগলায় কথা বলো তার সঙ্গে সেভাবে উঁচুগলায় কথা বলো না।' (৪৯:২)। এই আয়াতের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে তারা যেন হজরত ওমরের মতো কোনো আচরণ না করেন। যেমন, হজরত ওমর হুদায়বিয়ার সন্ধির পর অন্যদের সম্মুখেই সন্ধির শর্তাবলী নিয়ে উচ্চস্বরে প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং মুহামদকে 'আল্লাহর রসুল'না বলে শুধু 'মুহাম্মদ'বলে সম্বোধন করেছিলেন। 'যারা আল্লাহর রসুলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে পরিশোধন করেছেন, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলতে পারে। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।'(৪৯:৩)। স্পষ্টত আরবেরা এধরনের আদব-কায়দার সাথে পরিচিত ছিলেন না। নবি মুহাম্মদের ক্ষমতা গ্রহণের পরই তারা এসব পালন করা শেখে। '(হে নবি!) যারা ঘরের পেছন থেকে তোমাকে উঁচুগলায় ডাকে তাদের বেশির ভাগই হচ্ছে নির্বোধ।'(৪৯:৪)। নবির বাড়ির পেছন দিকে তার স্ত্রীরা থাকতেন। সেদিক দিয়ে যারা চলাফেরা করত এবং নবিকে শুধু 'মুহাম্মদ'বলে সম্বোধন করত, তা নবি পছন্দ করতেন না। (অথবা আল্লাহ এই আচরণ পছন্দ করতেন না, কারণ এই বাক্যগুলো তো আল্লাহর!) একটা সময় পর্যন্ত এই ধরনের সম্বোধন স্বাভাবিক ছিল। নবি তার সাথী ও অনুসারীদের নিয়ে একসাথে কাজ করতেন। যুদ্ধের জন্য পরিখা পর্যন্ত খনন করেছেন। কিন্তু ক্ষমতায় আরোহণের পর তা বন্ধ হয়ে যায়। 'তোমার বের হয়ে আসা পর্যন্ত তারা যদি ধৈর্য ধরত তা হলে তাই হতো তাদের জন্য ভালো।'(৪৯:৫)। মুসলমানদের জন্য শিষ্টাচারের সুনির্দিষ্ট নিয়ম তৈরি হয় সুরা মুজাদালা-এর এই আয়াতের মাধ্যমে: 'হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা রসুলের সাথে একান্তে কথা বলতে চাইলে তার আগে কিছু সদকা দেবে।'(৫৮:১২)। অর্থাৎ নবির সাথে আদব-কায়দা প্রদর্শন কেমন হবে তা পরিষ্কার হয় এই আয়াত থেকে। কিন্তু যেসব দরিদ্র মুসলমানের নিকট এই নিয়ম মেনে চলা কষ্টসাধ্য মনে হয়েছিল তাদের জন্য পরবর্তী আয়াতে শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয়েছে : 'যদি তোমরা সদকা দিতে না পার, তবে আল্লাহ তোমাদের দিকে মুখ তুলে চাইবেন...।'(৫৮:১৩)।

নবির বাড়িতে প্রবেশের বিধি-নিষেধ আবার আসে সুরা আহজাব-এর ৫৩ নম্বর আয়াতে: 'হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদেরকে অনুমতি না দেয়া হলে, খাবার তৈরির জন্য অপেক্ষা না করে[৫৫], খাওয়ার জন্য নবির বাড়ির ভেতরে ঢুকবে না। তবে তোমাদেরকে ডাকা হলে তোমরা যাবে ও খাওয়ার পর চলে আসবে। কথাবার্তায় তোমরা মেতে যেও না; এমন ব্যবহার নবির বিরক্তির সৃষ্টি করে। সে তোমাদেরকে উঠে যাওয়ার জন্য বলতে সংকোচ বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ সত্য কথা বলতে সংকোচ বোধ করেন না...।'(৩৩:৫৩)। এই আয়াত নিয়ে মন্তব্যের প্রয়োজন নেই, কারণ তখন যা ঘটতো তারই সাক্ষী দিচ্ছে এই আয়াত। সাহাবিরা প্রায়ই আগে থেকে না-জানিয়ে নবির বাড়িতে প্রবেশ করতেন। খাবারের জন্য অপেক্ষা করতেন এবং খাবারের পর একে অন্যের সাথে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করতেন। মুহাম্মদ 'রসুল' হবার পর থেকে এ-ধরনের আচরণ আশোভন হিসেব বিবেচনা করা

হয়। মুহাম্মদের সাথে সাধারণ মানুষের কিছুটা দূরে রাখার প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়। কিন্তু সেটা মুহাম্মদের পক্ষে সরাসরি বলা অস্বস্তিকর। কিন্তু আল্লাহর জন্য নয়, কারণ তিনি এ-সকল অস্বস্তির ঊর্ধ্বে। অথবা অন্যভাবে বলা যায়, আল্লাহ তার রসুলের কণ্ঠে সাধারণ মানুষকে রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি সঠিক ব্যবহারের শিক্ষা প্রদান করেন। এই ব্যখ্যার ভিত্তি আরও সুদৃঢ় করে একই আয়াতের পরের বাক্যটি। যদিও এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর ভিন্নতা রয়েছে : 'তোমরা তার (নবির) স্ত্রীদের কাছে কিছু চাইলে পর্দার[৫৬] আড়াল থেকে চাইবে। এ-বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য পবিত্রতর...।' (৩৩:৫৩)। হজরত আয়েশা বর্ণিত একটি হাদিস থেকে জানা যায়, 'রসুল মুহাম্মদ ও আমি একবার এক থালা থেকেই খাবার খাচ্ছিলাম। তখন হজরত ওমর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রসুল ওমরকে আমাদের সাথে খাবারের আমন্ত্রণ জানালেন। ওমর আমাদের সাথে খেতে বসলে ওমরের আঙুল আমার আঙুলকে স্পর্শ করে। ওমর নবিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যদি পূর্বে আমার উপদেশ কর্ণপাত করতেন, তবে কারো চোখ তাকে (আয়েশা) দেখতে পারতো না।'এরপর-ই পর্দা সম্পর্কে উপরোক্ত আয়াত নাজিল হয়।

আব্দুল্লাহ বিন আল-আব্বাসের বর্ণিত একটি হাদিস অনুযায়ী সুরা আহজাবের ৫৩ নম্বর আয়াত নাজিলের কারণ হচ্ছে হজরত ওমরের মন্তব্য। যেখানে হজরত ওমর নবিকে বলেন, 'আপনার স্ত্রীরা অন্য স্ত্রীলোকের মতো নয়।' সুরা আহজাবের ৩২ নম্বর আয়াতও শুরু হয়েছে একই ধরনের বক্তব্য দিয়ে: 'হে নবিপত্নীগণ! তোমরা তো অন্য নারীদের মতো নও।' (৩৩:৩২)। কেন রসুলের স্ত্রীরা অন্যদের থেকে আলাদা হবেন? কারণ সোজা কথায় নবি মুহাম্মদের মর্যাদা অন্য সাধারণ মানুষের মতো একই পর্যায়ে ছিল না। নবির মর্যাদা ধরে রাখার জন্যে তার স্ত্রীদের মর্যাদাও ধরে রাখতে হবে। তাদেরকে প্রাচ্যের রাজকুমারীদের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হবে। সুরা আহজাব-এর ৫৩নম্বর আয়াতের (যার অংশবিশেষ ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে) শেষ বাক্য উপরোক্ত বিষয়বস্তুকে সমর্থন করে: '. . . তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহর রসুলকে কষ্ট দেয়া বা তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদেরকে বিবাহ করা সংগত হবে না। আল্লাহর কাছে এ গুরুতর অপরাধ।' (৩৩:৫৩)। নবি মুহাম্মদ তার স্ত্রীদের নিয়ে খুব সংবেদনশীল ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, ইজরাইলের প্রাচীন রাজাদের মতো তার স্ত্রীরা কোনো পরপুরুষ থেকে অস্পৃশ্য থাকবেন। এমন কি নবি মারা গেলেও। সাধারণ ধর্মান্তরিত মুসলমান থেকে নবি মুহাম্মদের মর্যাদা বেশি তা কোরানের ভিন্ন আরেকটি আয়াত থেকে ধারণা পাওয়া যায়। মক্কা বিজয়ের পর সুরা হুজুরাত-এর ১৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে: 'আরব মরুবাসীরা বলে, 'আমরা বিশ্বাস করলাম।'বলো, তোমরা বিশ্বাস করনি। বরং বলো, আমরা আত্মসমর্পন করার ভাব দেখাচ্ছি। কারণ এখনও তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মায়নি।' (৪৯:১৪)।

সদ্য মুসলমান হওয়া ব্যক্তিরা যখন বলেন, তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন, বল প্রয়োগ কিংবা যুদ্ধের ফলে ভীত হয়ে ধর্মান্তরিত হননি, তখন সুরা হুজুরাত-এর ১৭ নম্বর আয়াত নাজিল হয়: 'ওরা মনে করে ওরা আত্মসমর্পণ করে তোমাকে ধন্য করেছে। বলো, তোমাদের আত্মসমর্পণ আমাকে ধন্য করেছে মনে করো না, বরং বিশ্বাসের দিকে পরিচালিত করে আল্লাহই তোমাদেরকে ধন্য করেছেন।'(৪৯:১৭)। [অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করলেই 'বিশ্বাসী' প্রমাণিত হয় না। নবির মতো ইসলামের জন্য উৎসর্গিকৃতও বোঝা যায় না। ফলে তাদের সাথে নবির মান-মর্যাদা তুলনীয় নয়।- অনুবাদক]। সদ্য ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়া মুসলমানদের অত্যুৎসাহী মনোভাব আর গরিমার কথা জানতে পেরে নবি তাদের সমালোচনা করেন এবং সদকা দিতে নির্দেশ দেন। মক্কি সুরা ফাজর-এ এরকম ব্যক্তিদের সম্পর্কে একটি সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। এই সুরাটি তিনি কাবা ঘরের দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে পাঠ করে মক্কাবাসীকে শুনিয়েছিলেন। দুঃখজনক হচ্ছে আরবি কোরানের এই মনোমুগ্ধকর আর চাঞ্চল্যে ভরা সুর আক্ষরিক অনুবাদের মধ্যে ফুটে ওঠে না। তথাপি এই সুরার কিছু আয়াত দুর্বল অনুবাদের মাধ্যমে তুলে ধরা হল: 'তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক কী করেছিলেন আদ বংশের ইরাম গোত্রের ওপর যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের[৫৭], যার সমতুল্য কোনো দেশে তৈরি হয়নি? আর সামুদদের[৫৮] ওপর? যারা কুরা উপত্যকায় পাথর কেটে ঘর বানিয়েছিল? আর বহু শিবিরের[৫৯] অধিপতি ফেরাউনের ওপর? যারা দেশে সীমালঙ্ঘন করেছিল, ও সেখানে অশান্তি বাড়িয়েছিল। তারপর তোমার প্রতিপালক তাদের ওপর

শাস্তির কশাঘাত হানলেন। তোমার প্রতিপালক তো সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।' (৮৯:৬-১৪)। 'না, আসলে তোমরা পিতৃহীনকে সম্মান কর না, তোমরা অভাবগ্রস্তদের অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না, আর তোমরা উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে-যাওয়া ধনসম্পদ পুরো খেয়ে ফেল, আর তোমরা ধনসম্পদ বড় বেশি ভালোবাস।'(৮৯:১৭-২০)।

মদিনায় যেসব নিয়ম তৈরি হয়েছে তার প্রত্যেকটির ব্যবহারিক ও শৃঙ্খলাগত দিক রয়েছে। মরুবাসী আরবদের স্বেচ্ছাচারিতার লাগাম টেনে ধরার দরকার ছিল। সুরা নিসা-এর এই আয়াতে দেখতে পাই : 'হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে বের হবে তখন পরীক্ষা করে নেবে। আর কেউ তোমাদের মঙ্গল কামনা করলে বা শ্রদ্ধা জানলে ইহজীবনের সম্পদের লোভে তাকে বলো না, 'তুমি বিশ্বাসী নও।' কারণ আল্লাহর কাছে অনায়াসলভ্য সম্পদ (গনিমতের মাল) প্রচুর রয়েছে। তোমরা তো পূর্বে এমনই ছিলে! তারপর আল্লাহ তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, সুতরাং তোমরা পরীক্ষা করে নেবে। তোমরা যা কর আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন।' (৪:৯৪)। এই আয়াতটি যে ঘটনার প্রেক্ষিতে নাজিল হয় তা হচ্ছে: এক অভিযানের সময় নবির কয়েকজন অনুসারী সোলায়াম গোত্রের এক মেষ-পালককে আক্রমণ করেন। সেই মেষ-পালক তাদেরকে সালাম জানিয়ে সম্ভাষণ করেছিলেন, যা মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত প্রিয় ও প্রয়োজনীয়। কিন্তু অনুসারীরা ধরে নিলেন, মেষ-পালকটি ভীত হয়ে তাদেরকে সালাম দিয়েছেন তাই মেষ-পালককে হত্যা করতে দ্বিধা করলেন না। আর মেষগুলো গনিমতের মাল হিসেবে দখলে নেন তারা।

আরব সমাজে সে-সময় প্রচলিত আদব-কায়দার আরও কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় সুরা হুজুরাত-এর ১১ নম্বর আয়াতে : 'হে বিশ্বাসিগণ! কোনো পুরুষ যেন অপর পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারীর চেয়ে ভালো হতে পারে; আর কোনো নারীও অপর নারীকেযেন উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণীর চেয়ে ভালো হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না। আর তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা খারাপ কাজ।'(৪৯:১১)। এই আয়াত নাজিল হওয়া সম্পর্কে জানা যায়, তামিম গোত্রের কয়েকজন আম্মার, শোয়েবসহ কয়েকজন গরীব-অসহায় মুসলমানদের নিয়ে ঠাট্টা-মশকারা করেছিলেন। কোরানে এরকম ডজন খানেক আয়াত রয়েছে যা মানুষের মূল্যবোধ, আচার-আচরণ, আদব-কায়দার প্রতি দিকনির্দেশনা দেয়; যেমন, কোন অবস্থায় কী করতে হবে, কী করা যাবে না, কিভাবে কী বলতে হবে এবং কখন নিশ্চুপ থাকতে হবেইত্যাদি। একই সাথে এই আয়াতগুলি থেকে নবি মুহাম্মদের সময় আরব মানুষের সামাজিক আচরণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

ইসলামে নারী

‘নারীদের সহৃদয়তার সাথে দেখাশোনা কর! তারা অবরুদ্ধ[৬০] এবং তাদের নিজেদের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।’ হিজরি ৯ সালে (৬৩১ খ্রিস্টাব্দে) মক্কায় নবি মুহাম্মদ বিদায় হজের ভাষণে নারীদের সম্পর্কে এ-উক্তি করেছিলেন। প্রাক-ইসলামি যুগে আরব সমাজে নারীদের স্বাধীন নাগরিকের মর্যাদা ছিল না। পুরুষের অধীন বলে গণ্য করা হত। নারীদের প্রতি প্রায় সব ধরনের অমানবিক আচরণ ‘বৈধ’ হিসেবে স্বীকৃতি পেত। অন্য যে কোনো অস্থাবর সম্পত্তির (দাস) মতো আরব নারীও কোনো ব্যক্তির উত্তরসূরির হাতে উত্তরাধিকার সূত্রে চলে যেতেন। নতুন মালিক ওই নারীকে কোনো প্রকার দেনমোহর প্রদান করা ছাড়াই নিজের স্ত্রী করে রাখতে পারতো। ওই নারী যদি মালিকের স্ত্রী হতে অস্বীকৃতি জানায় তবে মালিক নারীর সম্পদ দখল নিতে পারতেন। যদি ওই নারী সেটাও না করতেন তবে মালিক আমৃত্যু তাকে আটকে রাখতে পারতো।

সুরা নিসা-এর ১৯ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে এই অমানবিক বিধান তুলে দেয়া হয় : ‘হে বিশ্বাসিগণ! জবরদস্তি করে নারীদেরকে তোমাদের উত্তরাধিকার গণ্য করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদের ওপর অত্যাচার করো না। তারা যদি প্রকাশ্যে ব্যভিচার না করে, তবে তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করবে।’(৪:১৯)। সুরা নিসার ৩৪ নম্বর আয়াতে ‘পুরুষ নারীর রক্ষাকর্তা’উক্তিটি সমাজে নারী-পুরুষের অসাম্যের কথা প্রকাশ করে। নারীর তুলনায় পুরুষের উচ্চতর অবস্থানের কথা উক্ত আয়াতের পরের দুই বাক্যে উল্লেখ করেছেন : ‘কারণ আল্লাহ তাদের এককে অপরের ওপর বিশিষ্টতা দান করেছেন, আর এ এজন্য যে, পুরুষরা তাদের ধনসম্পদ থেকে ব্যয় করে...।’ তবে ঠিক কোন কারণে আল্লাহ নারী অপেক্ষা পুরুষকে শ্রেয়তর হিসেবে বেছে নিয়েছেন নির্দিষ্ট করে তার ব্যাখ্যা করা হয়নি।

তফসির আল-জালালাইন-এর বক্তব্য অনুযায়ী পুরুষ নারী অপেক্ষা শ্রেয়তর কারণ তাদের বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞানের পরিধি, প্রশাসনিক দক্ষতা। আল-জামাখশারি[৬১], আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর আল-বায়দাওয়ি[৬২] এবং আরও অনেক মুসলিম পণ্ডিত অবশ্য এই বক্তব্যের আরও গভীরে গিয়ে অধিবিদ্যাগত রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। তাঁরা নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্বকে কোনো বিষয়ের ওপর তার নিয়মের কর্তৃত্বের সাথে তুলনা করেছেন। নবুওতি, ইমামতি, শাসনের অধিকারগুলো একমাত্র পুরুষের জন্য বরাদ্দ রেখেছেন, কারণ তাদের মতে এটা তুলনমূলক বেশি শক্তিশালী, বেশি বুদ্ধিমান ও বেশি বিচক্ষণ। ইসলামি আইনে পুরুষ উত্তরাধিকারসূত্রে নারী অপেক্ষা বেশি সম্পত্তি পায়। একজন পুরুষের সাক্ষ্যও নারীর তুলনায় বেশি গ্রহণযোগ্য। নির্দিষ্ট করে বললে পুরুষের ভাগের প্রাপ্য সম্পত্তি নারীর ভাগের তুলনায় দ্বিগুণ। একইভাবে আদালতেও একজন পুরুষের সাক্ষ্য একজন নারীর সাক্ষ্যের তুলনায় দ্বিগুণ গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করা হয়। জিহাদে অংশগ্রহণ করা বা শুক্রবারের জুমার নামাজে অংশ নেয়াও নারীদের জন্য জায়েজ নয়। তালাক দেয়ার অধিকার শুধুমাত্র স্বামীর রয়েছে; স্ত্রীর এতে কোনো হাত নেই। আরও বিভিন্ন কাজ, যেমন আজান দেয়া, মসজিদে ইমামতি করা, ঘোড়ায় চড়া, তীর-ধনুক চালানো, বড় ধরনের কোনো অপরাধে সাক্ষ্য দেয়া ইত্যাদি শুধু পুরুষদের জন্যই সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

এই পুরুষতান্ত্রিকতার পক্ষের যুক্তিগুলোর দুর্বলতা পাঠকেরা খুব সহজে ধরতে পারবেন। তৎকালীন সামাজিক পরিবেশই ছিল পুরুষের শাসকসুলভ-মনোভাব এবং নারীর নীচু অবস্থানের প্রধান কারণ। বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানেও নারীকে পুরুষের তুলনায় কম সম্মানের স্থান দেয়া হতো। ইসলামে নারীদের মূল্য উত্তরাধিকার ও সাক্ষ্যে পুরুষের তুলনায় অর্ধেক বলে বিবেচনা করা হয়। এধরনের বৈষম্য শুধুমাত্র ইসলামের জন্য বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। বরং নারীজাতির ক্রমাগত অবমাননার ফলাফল। বিষয়গুলো পুরোপুরি পরিষ্কার। ফলে হালকা চালে সাফাই গেয়ে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। ইতিহাসের শুরু থেকে সকল আদিম সমাজে পুরুষ জাতি বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রামের জন্ম দিয়েছে এবং নারীকে দ্বিতীয় আসনে ঠেলে দিয়েছে। জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিক নিৎসের ভাষায়

‘নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ বলে গণ্য করা হয়েছে।’প্রাচীন আরবে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতি বর্বরতা আরও ভয়ঙ্কররূপে ছিল। নবি মুহাম্মদ কোরানের আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নারীদের কিছু অধিকার দিয়ে বর্বরতার ধার অনেকটুকু কমিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। সুরা নিসার বেশিরভাগ আয়াতেই নারীদের প্রতি বৈষম্য হ্রাস ও আইনি অধিকার বিষয়ে মন্তব্য রয়েছে।

তবে যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে ইসলাম বিশেষজ্ঞদের তুলে ধরা বিভিন্ন বক্তব্যে যুক্তির পরিমাণ খুবই সামান্য। মূলত তাদের বক্তব্য প্রাচীন আরবীয় নিয়মকেই নতুন রূপে দাঁড় করানোর চেষ্টা। অবশ্য এর জন্য তাদেরকে খুব বেশি দোষ দেয়া যায় না। কারণ তাদের বক্তব্যের একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে, ‘কিভাবে আল্লাহ নারী অপেক্ষা পুরুষকে বেশি পছন্দ করেন, বা নারী অপেক্ষা পুরুষকে বেশি বিশিষ্টতা দান করেছেন’ সেই কোরানীয় বক্তব্যের ব্যাখ্যা দেয়া। সুরা নিসার ৩৪নম্বর আয়াতের আরেকটি ব্যাখ্যা আছে, ‘পুরুষ নারীর পিছনে অর্থ ব্যয় করে’এটা শুনতে যৌক্তিক মনে হতে পারে। যেহেতু নারীর খরচের দায়িত্ব পুরুষ ঘাড়ে তুলে নিয়েছে, সেহেতু নারী পুরুষের ওপর নির্ভরশীল। এ-কারণে নারী পুরুষের সকল আদেশ-নির্দেশ মানতে বাধ্য। আর এ-কারণে আল-জামাখশারি, আল-বায়দাওয়িসহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞ রায় দেন, পুরুষই হলো প্রভু এবং নারী হলো ভৃত্যস্বরূপ। সুরা নিসার উপরোক্ত আয়াতের এই বাক্য থেকে উপসংহার টানা যায় এভাবে: ‘তাই সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগতা এবং যা লোকচক্ষুর অন্তরালে আল্লাহর হেফাজতে তারা তার হেফাজত করে।’অর্থাৎ ভাল স্ত্রী তাকে বলা যায় যে তার স্বামীর কথা মেনে চলেন এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজেকে স্বামীর জন্য গচ্ছিত রাখেন। বোঝা যাচ্ছে স্ত্রীরা সবাই তাদের স্বামীর অধীন এবং এ-কথা ভুলে যাওয়া যাবে না।

এতো কিছুর পরও বলা যায় সুরা নিসা অনেক ক্ষেত্রেই নারীকে বেশ কিছু অধিকার দিয়েছে। প্রাচীন আরবীয় নিময়-কানুনের তুলনায় কোরানের বিধি কিভাবে নারীকে সহায়তা করেছে তা সুরা নিসার আয়াতগুলি থেকে বুঝা যায়। একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, সুরা নিসার ২০-২১ আয়াতদ্বয়ে রয়েছে পুরুষের প্রতি নির্দেশ : ‘যদি তোমরা এক স্ত্রীর জায়গায় অন্য স্ত্রী নেওয়া ঠিক কর আর তাদের একজনকে প্রচুর অর্থও দিয়ে থাক তবুও তার থেকে কিছুই নেবে না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ও জুলুম করে তা নিয়ে নেবে? কেমন করে তোমরা তা নেবে, যখন তোমরা পরস্পর সহবাস করেছ ও তারা তোমাদের কাছ থেকে শক্ত প্রতিশ্রুতি নিয়েছে?’ (৪:২০-২১)। স্ত্রীসঙ্গ উপভোগের পর বিবাহের সময় ধার্য দেনমোহর পরিশোধ না করে কোনো পুরুষ তালাক দিয়ে পুনরায় বিয়ে করতে পারবে না। দেনমোহর যা ধরা হয়েছিল তা ওই পুরুষকে পরিশোধ করতেই হবে। তবে এই সুরা নিসায় আবার প্রাচীন আরবের কিছু নারী-বিদ্বেষী নিয়মকে মেনে নেয়া হয়েছে। যেমন সুরা নিসার ওই ৩৪নম্বর আয়াতে শেষ বাক্যে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে: ‘স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে ভালো করে উপদেশ দাও, তারপর তাদের বিছানায় যেয়ো না ও তাদেরকে প্রহার করো।’ পুরুষেরা তাদের দৈহিক শক্তির কারণে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ও কাপুরুষোচিত কাজ সেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই করে আসছে। এমন-কী এই বিংশ শতাব্দীতেও তা সমান তালে চলছে। প্রকৃতপক্ষে কোরানে বর্ণিত এ-বিধান নারীর প্রতি এ নিষ্ঠুরতাকে ধরে রেখেছে।

প্রতিটি সম্প্রদায়ের নিয়মকানুনগুলো তাদের আচার-আচরণ, নৈতিকতাবোধকে প্রতিফলিত করে। সুরা নিসার ৩৪ নম্বর আয়াতকে আমরা সেভাবেই দেখতে পারি যে, প্রাচীন আরবীয়দের কাছে স্বামী ছিল প্রভুর মতো, স্ত্রীকে শারীরিক-মানসিক আঘাত করার সব রকম অধিকার তাদের ছিল। জুবায়ের বিন আল-আওয়ামের চতুর্থ স্ত্রী এবং হজরত আবু বকরের কন্যা আসমাকে একবার বলতে দেখা যায়, ‘জুবায়ের যখন স্ত্রীদের ওপর রেগে যেতেন তখন লাঠি না ভাঙা পর্যন্ত প্রহার করতে থাকতেন।’এ-ব্যাপারে ইসলামি আইনে অন্তত কিছু সীমারেখা এবং স্তরবিন্যাস করে দেয়া হয়েছে। প্রথমত সতর্কবাণী প্রদান করা হয়েছে। যৌনমিলনে বাধা প্রদানের ক্ষেত্রে স্ত্রীকে প্রহার করাকে সর্বশেষ বৈধ অস্ত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। অনেক তফসিরকারক এবং ইসলামি আইন-বিশেষজ্ঞদের মতে স্ত্রীকে প্রহার করা জায়েজ হলেও তা যেন হাড় ভাঙার পর্যায়ে চলে না যায়। তাহলে আবার শারীরিক

আঘাতের কারণে ক্ষতিপূরণ দেয়ার দাবি উঠতে পারে। ৩৪নম্বর আয়াত প্রসঙ্গে আল-জামাখশারি মন্তব্য করেছেন: 'ইসলাম-বিশেষজ্ঞদের অনেকে অবাধ্য স্ত্রীর প্রাপ্য শাস্তির এই স্তরবিন্যাস মেনে নিতে রাজি নন। তাঁরা একই সাথে তিন ধরনের শাস্তি প্রদানকেই অনুমোদন দিয়েছেন।'এধরনের ব্যাখ্যা একমাত্র ইবনে হানবল, ইবনে তায়মিয়ার[৬৩] মতো আরবীয় ধর্মীয় নেতাই দিতেন পারেন। তবে এ-সকল বক্তব্যের অর্থ একদম পরিষ্কার এবং পরবর্তী আয়াতে তা নিশ্চিত করে: 'আর যদি দুজনের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা কর তবে তোমরা তার (স্বামীর) পরিবার থেকে একজন ও ওর (স্ত্রীর) পরিবার হতে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে। যদি তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চায় তবে আল্লাহ তাদের মধ্যে ফয়সালার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন।' (৪:৩৫)।

নিকট আত্মীয়ের সাথে বিবাহের নিষেধাজ্ঞা সুরা নিসার ২৩ নম্বর আয়াতে দেখতে পাই। এই বিধানটি ইহুদি আইনেও আছে এবং প্রাচীন আরবের পৌত্তলিক সমাজেও এই নীতি অনুসরণ করা হতো। তবে ব্যতিক্রম হচ্ছে এর পূর্বের আয়াতে, 'নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদেরকে বিয়ে করেছে তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না। পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে।' (৪:২২)। কোরানের এ-রকম বিধান এবং বিশেষ শর্তারোপ থেকে আমরা বুঝতে পারি, ইসলাম-পূর্ব আরবে এমন জঘন্য ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তবে ২৪ নম্বর আয়াতের বিধান নতুন কিছু নয়। ইসলাম-পূর্ব যুগেও সেটা প্রযোজ্য ছিল। তবে বিস্ময়কর হচ্ছে, এই আয়াতের মাধ্যমে দাসীদেরকেও মালিকদের কাছে হস্তগত করা হয়েছে। অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করা, কিংবা যুদ্ধে বন্দী হওয়া দাসীকে কোনো মানবিকতা ও আইনি বাধ্যবাধকতা ছাড়াই বিবাহের জন্য হস্তান্তর করা যায়। এমন কী ওই দাসীর স্বামী জীবিত থাকলেও। ইবনে সাদের[৬৪] একটি উক্তি রয়েছে: 'হুনাইনের নিকট আওতাসের যুদ্ধে কয়েকজন নারী বন্দী আমাদের ভাগে পড়ে। যেহেতু ওই নারীদের স্বামী জীবিত ছিল, তাই তাদের সাথে যৌনমিলনে না গিয়ে নবির সাথে আলোচনা করতে গেলাম। তখন এই সুরা নিসার ২৪ নম্বর আয়াত নাজিল হয়: 'নারীদের মধ্যে তোমাদের ডান হাতের নারী (যুদ্ধবন্দী) ছাড়া সকল বিবাহিত নারী তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ।'(৪:২৪)। এভাবে ওই যুদ্ধবন্দিনীদের কর্তৃত্ব আমরা পেয়ে গেলাম।'আবার একই আয়াতে আমরা নবির মনে নারী অধিকার ও তৎকালীন কুপ্রথা নিয়ে সচেতনতা দেখতে পাই। শেষ তিনটি বাক্যে রয়েছে : 'তোমাদের জন্য এ আল্লাহর বিধান। উল্লিখিত নারীরা ছাড়া আর সকলকে ধনসম্পদ দিয়ে বিয়ে করা বৈধ করা হলো, ব্যভিচারের জন্য নয়। তাদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা উপভোগ করবে তাদেরকে নির্ধারিত মোহর দেবে। মোহর নির্ধারণের পর কোনো বিষয়ে পরস্পর রাজি হলে তাতে তোমাদের কোনো দোষ নেই। 'যাদেরকে তোমরা উপভোগ করবে তাদেরকে নির্ধারিত মোহর দেবে'- এই ধরনের বক্তব্য থেকে প্রশ্ন ওঠে ইসলামে কি 'অস্থায়ী বিবাহ'(মুতা[৬৫] বিবাহ) জায়েজ? সুন্নি পণ্ডিতরা বলেন, এমনটা জায়েজ নয়। কারণ এই বক্তব্যগুলো মুসলমানদের মক্কা বিজয়ের পর নাজিল হয়েছিল এবং এর মেয়াদ ছিল মাত্র তিনদিন। শিয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, এ-ধরনের বিবাহ ইসলাম অনুযায়ী জায়েজ।

সুরা মুমতাহানা-এর ১০ নম্বর আয়াত থেকে ওই সময়ের নারী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্ক বুঝা যায় : 'হে বিশ্বাসিগণ! বিশ্বাসী নারীরা দেশত্যাগী হয়ে তোমাদের কাছে এলে তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করো। আল্লাহ তাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে ভালো করে জানেন। যদি তোমরা জানতে পার যে তারা বিশ্বাসী তবে তাদেরকে অবিশ্বাসীদের কাছে ফেরত পাঠিয়ো না। বিশ্বাসী নারীরা অবিশ্বাসীদের জন্য বৈধ নয়, আর অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসী নারীদের জন্য বৈধ নয়। অবিশ্বাসীরা যা খরচ করেছে তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়ো। তারপর তোমরা তাদেরকে বিয়ে করলে তোমাদের কোনো পাপ হবে না, যদি তোমরা দেনমোহর দাও। তোমরা অবিশ্বাসী নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা খরচ করেছ তা ফেরত চাইবে ও অবিশ্বাসীরা ফেরত চাইবে তারা যা খরচ করেছে।'(৬০:১০)। অর্থাৎ কোনো বিবাহিত নারী যদি ইসলাম গ্রহণ করে পালিয়ে যায় তবে তার অবিশ্বাসী স্বামী স্ত্রীর ওপর অধিকার হারিয়ে ফেলে। সে অনুরোধ করলেও মুসলমানরা স্ত্রীকে ওই অমুসলমান ব্যক্তির কাছে ফিরিয়ে দিবেন না। তবে মুসলমানরা ওই ব্যক্তির স্ত্রীর প্রতি তার খরচের ক্ষতিপূরণ অবশ্য দিবেন। একইভাবে কোনো মুসলমানের স্ত্রী যদি অবিশ্বাসী হয়ে

যান, তবে ওই ব্যক্তি স্ত্রীকে রাখার জন্য জোর করতে পারবেন না এবং ওই নারীকে তার সম্প্রদায়ের কাছে ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে ফেরত পাঠিয়ে দিতে হবে।

স্ত্রীর প্রতি অসুস্থ মানসিকতা থেকে আরবীয়দের পরিবর্তনের জন্য নবির মানবিক চিন্তা চেতনার প্রতিফলন আমরা সুরা বাকারা-এর বিভিন্ন আয়াতে দেখতে পাই। যেমন : 'যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারা ইদ্দতকাল[৬৬] পূর্ণ করে, তখন তাদের যথাবিধি রেখে দেবে বা তাদেরকে ভালোভাবে বিদায় দেবে। তাদেরকে অত্যাচার বা তাদের ওপর বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে আটক করে রাখবে না।'(২:২৩১)। অর্থাৎ যখন কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার কথা উচ্চারণ করে ফেলেন তবে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ওই স্ত্রীকে পুনরায় বিয়ের জন্য স্বামীকে অপেক্ষা করতে হবে, কিন্তু তিনি তার স্ত্রীকে পুনরায় বিয়ে করার জন্য জোর করতে পারবেন না। আর তাদের বিয়ের পক্ষে বা বিপক্ষের সব সিদ্ধান্তই সম্মানজনকভাবে এবং দুই পক্ষের আপোসের মাধ্যমে নিতে হবে। দীর্ঘ সময়ের জন্য আটকে রেখে বা কোনো রকম হুমকির মাধ্যমে স্ত্রীর অধিকার খর্ব করা যাবে না। পরবর্তী আয়াতে এমনই নির্দেশ আমরা দেখি: 'তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও আর তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করতে থাকে তখন তারা যদি পরস্পর সম্মত হয়ে তাদের (পূর্বের) স্বামীদের বিধিমতো বিয়ে করতে চায় তবে তাদেরকে বাধা দেবে না।'(২:২৩২)। বলা হয়ে থাকে এই আয়াতটি এসেছে, মাকিল বিন ইয়াসিরের একটি আচরণের কারণে। তিনি তার বোনকে তালাকদাতা স্বামীর সাথে বিয়ে দিতে বাধা দিচ্ছিলেন।

সুরা বাকারা'র একটি কম আলোচিত বিষয়ের প্রতি আমরা এখন আলোকপাত করব। এই আয়াত থেকে আমরা নবি মুহাম্মদের সময়কার সমাজ-ব্যবস্থার এক ঝলক দৃশ্য দেখতে পাই: 'রজঃস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করবে, আর যতদিন না তারা পবিত্র হয়, তাদের কাছে (সহবাসের জন্য) যেয়ো না। তারপর যখন তারা পরিশুদ্ধ হবে, তখন তাদের কাছে ঠিক সেইভাবে যাবে যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন।'(২:২২২)। তফসির আল-জালালাইনের বক্তব্য অনুযায়ী 'ঠিক সেইভাবে যাবে'মানে রজঃস্রাবের পূর্বে যেভাবে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতেন, সেটাকে বুঝাচ্ছে। কিন্তু পরবর্তী আয়াতেই আমরা পরস্পর-বিরোধী একটি বক্তব্য দেখতে পাই : 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা যেতে পার।' (২:২২৩)। তফসির আল-জালালাইনে 'তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা যেতে পার'- কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে, 'দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, সামনে থেকে, পাশ থেকে, অথবা পিছন থেকে যেভাবে ইচ্ছা যৌনমিলনকে বুঝানো হচ্ছে।'এই তফসিরে আরও বলা হয়েছে, এই আয়াত নাজিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে সে-সময়ের একটি ইহুদি সংস্কারকে সবার মন থেকে দূর করা। ইহুদি সংস্কার অনুযায়ী, পেছন থেকে সঙ্গম করলে সন্তান ট্যারা চোখের, অথবা বাহাতি হয়ে জন্মায়। জালাল উদ্দিন আল-সুয়ুতি'র মতে ২২২নম্বর আয়াতের 'ঠিক সেইভাবে যাবে যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন'নির্দেশ পরবর্তী আয়াতের মাধ্যমে খারিজ হয়ে গিয়েছে। হজরত ওমরসহ নবির বেশ কয়েকজন সাহাবির আবেদনের ফলে এটি খারিজ হয়েছে। খ্রিস্টান-ইহুদিরা নারীর সাথে পাশ ফিরে মিলনে যেত। মদিনার আনসারেরাও একই প্রথা অবলম্বন করতেন। আর মুহাজিররা কুরাইশ ও অন্যান্য মক্কাবাসীর যৌন-আচরণ অনুসরণ করতেন। তারা নারীদের সাথে বিভিন্নভাবে মিলন করতেন। কখনো নারীদের বুকের ওপর, কখনোবা পিঠের ওপর বসিয়ে। কখনো পেছন থেকে, কখনো সামনে থেকে তাদের সঙ্গিনীর সাথে যৌনমিলন করতেন। কোনো মুহাজির পুরুষ কোনো আনসার নারীকে বিয়ে করলে তার সাথেও এরকম যৌন-আচরণ করতে চাইতেন। কিন্তু আনসার স্ত্রী অস্বীকৃতি জানিয়ে বলতেন, 'আমরা কেবল পাশ ফিরে শুয়ে থাকি।' বিষয়টি নবির কানেও পৌঁছায় এবং এ-বিষয়ে পুরুষদের করণীয় সম্পর্কে আয়াত নাজিল হয়। আহমদ ইবনে হানবল এবং তিরমিজির[৬৭] মতে আয়াতটির অর্থ হচ্ছে, 'সামনে অথবা পিছন থেকে, মাথার উপরে অথবা নিচে রেখে।' হজরত ওমর এক সকালে নবির 'কেমন কাটল?' প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, 'গতকাল রাতে আমি আমার পদ্ধতি পরিবর্তন করেছিলাম। কিন্তু আনন্দ পাইনি।' এরপর এই আয়াতটি নাজিল হয়।

কোরানের আয়াত এবং ইসলামের শিক্ষা থেকে বোঝা যায় প্রাচীন আরবে নারীদের মর্যাদা অত্যন্ত নিচু ছিল। পুরুষেরা নারীকে অত্যন্ত অমানবিক দৃষ্টিতে বিচার করতেন। যেমন সুরা নুর-এর ৩৩নম্বর আয়াতে আর্থিক লাভের জন্য দাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেহ ব্যবসায় বাধ্য করতে নিষেধ করা হয়:'. . . তোমাদের দাসীরা সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে, পার্থিব জীবনের টাকাপয়সার লোভে তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করো না।' (২৪:৩৩)। প্রচলিত আছে যে, আব্দুল্লাহ বিন উবায় পূর্বে এমন ঘৃণ্য ব্যবসায় নিয়োজিত ছিলেন। উবায় শুধু একমাত্র ব্যক্তি নন, আরব সমাজে দাসীদের যৌনব্যবসায় বাধ্য করে মালিকদের পকেট ভারী করা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা ছিল; ফলে অনেকেই এ-ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন। নবির মক্কা বিজয়ের পর মক্কাবাসী নারীদের একটি বড় অংশ ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং নবির কাছে আনুগত্য প্রকাশ করেন। এ-প্রেক্ষিতে সুরা মুমতাহানা-এর ১২নম্বর আয়াত নাজিল হয়। মক্কাবাসী নারীদের বিশ্বাস ও আচরণের ওপর শর্তারোপ করে ইসলামে দীক্ষিত হবার সুযোগ দেয়া হয় : 'হে নবি! বিশ্বাসী নারীরা যখন তোমার কাছে আনুগত্যের শপথ করতে এসে বলে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, অপরের সন্তানকে স্বামীর ঔরসে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবি করবে না, এবং সৎকাজে তোমাকে অমান্য করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করো আর তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।'(৬০:১২)। এই শর্তাবলীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ইসলামে দীক্ষিত হওয়া সহজবোধ্য এবং সহজে গ্রহণযোগ্য। শুধু পূর্বে পালন করা কুপ্রথাগুলি ত্যাগ করার কথা এখানে বলা হচ্ছে। এছাড়া ইসলামে নারীদের জোরে শব্দ করার ওপর নিষেধ করা হয়। পোশাকের কলার তুলে রাখা, চুল এলোমেলো রাখা ইত্যাদি অভ্যাসও ত্যাগ করার কথা বলে ইসলাম। মক্কা বিজয়ের পর এধরনের শর্তাবলী প্রকাশের পর কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবা বলেন, 'আদর্শ ঘরের কোনো স্বাধীন নারীই ব্যভিচার ও দেহব্যবসায় জড়াতে পারেন না।'

ইসলামি শিক্ষায় নিষিদ্ধ অন্যতম কুপ্রথা হচ্ছে নারী শিশুদের হত্যা করা। সুরা তাকভির-এর ৮-৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : 'জীবন্ত-কবর দেয়া কন্যাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হবে, কী দোষে ওকে হত্যা করা হয়েছিল?'(৮১:৮-৯)। ইসলাম-পূর্ব আরবে পুত্রসন্তানকে মূল্যবান বিবেচনা করা হতো। পুত্রসন্তান জন্ম হলে সবাই অহংকার করত। কিন্তু কন্যাসন্তানকে বোঝা ও অবমাননাকর মনে করতো। তারা এতোটাই নির্বোধ ছিল যে মানব-জাতির ভবিষ্যত রক্ষায় নারীদের যে প্রয়োজনীতা রয়েছে, সেটা তারা আন্দাজ করতে পারতেন না। সুরা নাহল-এর ৫৮-৫৯ নম্বর আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে: 'ওদের কাউকেও যখন কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন ওদের মুখ কালো হয়ে যায় ও মন ছোট হয়ে যায়। আর যে-খবর সে পায় তার লজ্জায় সে নিজের সম্প্রদায় থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। (ভাবে) অপমান সহ্য করে সে ওকে রাখবে? না মাটিতে পুঁতে ফেলবে? আহ্! কী খারাপ ওদের সিদ্ধান্ত! (১৬:৫৮-৫৯)।

নারী ও মুহাম্মদ

পশ্চিমা পণ্ডিত ইজহাক গোল্ডজিহার বলেছেন, ইসলাম প্রতিষ্ঠাতার কর্মজীবন ও ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কোরান, হাদিস ও জীবনীগ্রন্থগুলো যেভাবে অকপট ও বিস্তারিত তথ্যসমৃদ্ধ, অন্যান্য ধর্মের পবিত্রগ্রন্থ, ধর্মপ্রচারকের কীর্তিগাঁথা এবং ইতিহাসের বইগুলো সেদিক থেকে সমকক্ষ নয়। গোল্ডজিহার তার অত্যন্ত মূল্যবান বই *'Le dogme et la loi de 1'1slam'*- এর একটি অধ্যায়ে প্রশংসাসূচক মন্তব্যের মাধ্যমে নারীদের প্রতি নবি মুহাম্মদের ক্রমবর্ধান প্রীতি সম্পর্কে বিশদভাবে নথিভুক্ত ঐতিহাসিক সত্যগুলো তুলেধরেছেন। ইব্রাহিম এবং নুহ ছাড়াও যিশু এবং মুসা নবির জীবন সম্পর্কে আমরা যা জানি তা আসলে জনপ্রিয়

কল্পপুরাণে তৈরি কুয়াশার বাতাবরণে ও ধর্মীয় রক্ষণশীলতার ধারণায় আবদ্ধ। নবি মুহাম্মদের জীবন সম্পর্কে কোরানের আয়াত, নির্ভরযোগ্য হাদিস এবং প্রথমদিককার জীবনী-গ্রন্থগুলোতে শতাধিক বর্ণনা রয়েছে যেগুলো পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগ থেকে মুক্ত। এ-উৎসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কোরান, যার আয়াতে সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনাবলী সম্পর্কে তথ্য সরাসরি পাওয়া যায়; এবং আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময়কালীন প্রেক্ষাপটসমূহ তফসিরকারকদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জানা যায়। নবি মুহাম্মদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কিত আয়াতগুলোর সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে অনেক বেশি।

কোরানের সকল তফসিরকারক একমত যে, ইহুদিদের দ্বারা নবির নারীসঙ্গ প্রীতির সমালোচনার প্রেক্ষিতে সুরা নিসা-এর ৫৪ নম্বর আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। ইহুদিদের অভিযোগ ছিল স্ত্রীসঙ্গ গ্রহণ ছাড়া নবির অন্য কোনো কাজ নেই। আয়াতে বলা হয়েছে : 'তারা কি ঈর্ষা করে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা-যা দিয়েছেন? কারণ আমি ইব্রাহিমের বংশধরকে তো কিতাব ও হিকমত দিয়েছিলাম, আর তাদেরকে দিয়েছিলাম এক বিশাল রাজ্য।' (৪:৫৪)।

আল্লাহ-প্রদত্ত নবুওতির অধিকার এবং অধিক সংখ্যক স্ত্রী থাকার দরুন মুহাম্মদের প্রতি ইহুদিরা ঈর্ষান্বিত ছিল। ইহুদিদের বক্তব্য ছিল, একজন সত্যিকারের নবি এতোবেশিসংখ্যক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন না। আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে সমালোচকদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে এবং আবশ্যিকভাবে তা দাউদ এবং সলোমনের মতো নবিদের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে। উক্ত নবিদের নিরানব্বইজন করে স্ত্রী ও এক হাজারের মতো হারেমবাসী নারীসঙ্গী থাকার পরেও তাদের দুজনের নবি হিসেবে মর্যাদায় কোনো হানি ঘটেনি। ইসরাইলের সন্তানদের অন্যান্য রাজার কাহিনীর মতো এই ধারণাগুলো কল্পনার সুতোয় বোনা অত্যুক্তি মাত্র।

কোনো কোনো ইউরোপীয় সমালোচকদের মতে, যে ধর্মপ্রচারক পূর্বপুরুষের সংস্কার-বিশ্বাসকে প্রত্যাখান করে, সংশোধন করে নিজস্ব ধর্মপ্রচার করে গিয়েছেন, তার ব্যক্তিত্বের সাথে এরূপ মাত্রাতিরিক্ত নারীসঙ্গপ্রীতি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সমালোচক কয়েকজনের মতে, ইসলামের যেসব বিধি-বিধান নারীর মর্যাদা এবং অধিকারের উন্নয়ন ঘটিয়েছে সেগুলো নারীর প্রতি মুহাম্মদের ভালোলাগা থেকেই উৎসারিত হয়েছে।

আবেগের পরিবর্তে যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিষয়টি বিবেচনা করলে ইহুদিদের অভিযোগগুলো গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। নবি মুহাম্মদ অবশ্যই একজন মানুষ এবং প্রতিটি মানুষেরই দুর্বল দিক রয়েছে। যৌনচাহিদা মানুষের একটি আবশ্যিক প্রবৃত্তি এবং অন্যদের সম্পর্কে চিন্তা ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। এটা তখনই তিরস্কারযোগ্য যখন সমাজে ক্ষতিকর আচরণের বিস্তার ঘটায়। অন্যথায় একজন মানুষের ব্যক্তিগত জীবনযাপনের ভালো-মন্দ, শক্তি-দুর্বলতা নিয়ে আলোচনার কোনো অর্থ নেই। খ্রিস্টপূর্ব কাল থেকে সক্রেটিসের ভাবনা এথেন্স থেকে গ্রিসের সর্বত্র এবং পর্যায়ক্রমে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। সক্রেটিসের ব্যক্তিগত জীবন কি ঘৃণ্য ছিল, এই প্রশ্নটি গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে যদি না তিনি তার জীবনাচরণের মাধ্যমে সমাজের কোনো ক্ষতি সাধন করে থাকেন। অ্যাডলফ হিটলারকে যৌনপ্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে বলা যায় কারণ এদিক থেকে তিনি অক্ষম কিংবা সীমিতভাবে সক্ষম ছিলেন। পক্ষান্তরে তিনি ধ্বংসাত্মক চিন্তাধারা পোষণ করতেন যা পৃথিবীকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

নবি মুহাম্মদ নিজেকে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে বিবেচনা করতেন। তিনি নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেছেন। তার জনগণকে পৌত্তলিকতার অন্ধকূপ থেকে উদ্ধারে ব্রত ছিলেন। মুহাম্মদের নারী-প্রীতি কিংবা অনেক স্ত্রী গ্রহণের ঘটনা তার চূড়ান্ত লক্ষ্যের প্রতি যাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করেনি কিংবা তা অন্যদের অধিকারকেও ক্ষুণ্ন করেনি। মহান নেতাদের কাজের ধরন ও চিন্তাধারাকে সমসাময়িক সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুসারে এবং সমাজ ও মানবজাতির কল্যাণে এগুলোর অবদানের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা উচিত। অথচ এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করলে, মানুষের চিন্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণের ফলে যারা একমাত্র বাধ্য হয়ে

ইসলাম গ্রহণ করেছিল, অথবা বেঁচে থাকার জন্য কতগুলো কঠোর শর্তের ভিত্তিতে নিজেদের সহায়-সম্পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল, তাদের এই বিষয়গুলো নিয়ে তুলনামূলকভাবে প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ বেশি রয়েছে।

মুসলমানদের বিবেচনাবোধে ভুল ছিল, যদিও তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘরানার। ইসলামের প্রতিষ্ঠাতাকে মহিমান্বিত করতে গিয়ে মুসলিম পণ্ডিতেরা এমন সব বক্তব্য পেশ করেছেন ও লিখেছেন যা কোরানের স্পষ্টভাবে বোধগম্য আয়াত এবং নির্ভরযোগ্য আদি ঐতিহাসিক তথ্যগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক। মিশরীয় গবেষক এবং শিক্ষামন্ত্রী মুহাম্মদ হোসেন হায়কল তার 'লাইফ অব মুহাম্মদ'বইয়ে বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানের আলোকে এই বিষয়ে নিরীক্ষা করতে গিয়ে পাশ্চাত্য সমালোচনার প্রতি উষ্মা প্রকাশ করেছেন। এমন-কী বইটির একটি অধ্যায়ে অযাচিতভাবে নবির নারীপ্রীতিকে পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। ওই অধ্যায়ের একটি অনুচ্ছেদ এখানে উল্লেখ করা হলো: 'খাদিজার সাথে দীর্ঘ বিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে নবি মুহাম্মদ কখনো একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। ...এটা খুবই স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী একটি ব্যাপার। খাদিজা একজন ধনী সম্ভ্রান্ত মহিলা ছিলেন। তিনি একজন গরীব, কিন্তু সৎ ও কঠোর পরিশ্রমী কর্মচারীকে বিয়ে করেছিলেন। খাদিজা মুহাম্মদকে নিজ গৃহে জায়গা দিয়েছিলেন, কেননা স্বীয় স্বভাব কিংবা দারিদ্র্যের কারণে মুহাম্মদ অন্যান্য কুরাইশ যুবকের মতো উদ্দাম যৌনতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেননি। এ কারণেই বয়স্ক ও অভিজ্ঞ খাদিজা মনেপ্রাণে নিজের থেকে পনেরো বছরের ছোট স্বামীর যত্ন নিয়েছেন। নিজের অর্থবিত্ত কাজে লাগিয়ে মুহাম্মদকে সচ্ছলভাবে জীবনযাপনে সাহায্য করেছেন যেন মুহাম্মদ তার বাল্যজীবনের দুঃখকষ্ট ও চাচার উপর নির্ভরতার কথা ভুলে থাকতে পারেন। খাদিজার গৃহের নিরিবিলি ও আরামদায়ক পরিবেশে মুহাম্মদ তার দশ-বারো বছর ধরে জমে থাকা চিন্তাভাবনাকে পরিপূর্ণতা দানের সুযোগ পেয়েছেন। খাদিজা নিজে মুহাম্মদের মৌলিক চিন্তাধারার সাথে একমত ছিলেন। কেননা ওয়ারাকা বিন নওফলের চাচাতো বোন হিসেবে তিনিও হানিফদের নন্দনতত্ত্বের প্রতি আগ্রহী ছিলেন[৬৮]। মুহাম্মদের নবুওতি লাভের পর খাদিজা তার স্বামীর লক্ষের সত্যতা ও স্বর্গীয় অনুপ্রেরণার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। উল্লেখ্য খাদিজা মুহাম্মদের চার কন্যা জয়নাব, রোকেয়া, উম্মে কুলসুম এবং ফাতেমার মাতা ছিলেন[৬৯]। এই পরিস্থিতিতে খাদিজার জীবদ্দশায় মুহাম্মদ কিভাবে আরেকজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতেন? কেবল খাদিজার মৃত্যুর পরে মুহাম্মদ আয়েশার পাণিপ্রার্থী হয়েছিলেন। অন্যদিকে আয়েশা যেহেতু সাত বছর বয়সী শিশু ছিলেন সেজন্য আস-সাকরান বিন আমরের বিধবা স্ত্রী সওদাকে বিয়ে করেছিলেন।'এরপর হায়কল তার বইয়ে মন্তব্য করেন, 'সওদার না ছিল রূপ, না ছিল ধনদৌলত। তাঁকে বিয়ে করে নবি মুহাম্মদ আবিসিনীয় একজন মুসলিম অভিবাসীর নিঃসঙ্গ বিধবা স্ত্রীর প্রতি বদান্যতা ও কৃপার কাজ করেছেন।'

নবি মুহাম্মদ সওদাকে বিয়ে করেছেন কারণ একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা হিসেবে তিনি গৃহকার্যে পারদর্শী এবং চারটি শিশুকন্যাকে দেখাশোনায় সক্ষম- হায়কল এমনটা লিখলে আরও ভালো হতো। যদিও এই বক্তব্যের বিরোধিতার সুযোগ রয়েছে। কারণ নবি মুহাম্মদ প্রথমে আয়েশার কথা চিন্তা করেছিলেন। আয়েশা এতোটা অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন যে, তিনি দুবছর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে করতে পারতেন না। পরবর্তীতে মুহাম্মদ সওদাকে বিয়ে করেন। হতে পারে তিনি স্ত্রীসঙ্গবিহীন জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন না। এমন যুক্তিকে সমালোচনা করার কারণ নেই। সম্ভাব্য আরেকটি কারণ হতে পারে, ওই সময়ে বিয়ের উপযোগী অন্য কোনো মহিলার অনুপস্থিতি। কুরাইশরা মুহাম্মদকে নিজেদের কন্যাদানে অনাগ্রহী ছিলেন। আবার মুসলমানদের বিয়ের উপযোগী কোনো কন্যাসন্তান ছিল না। সময়টা ছিল খাদিজার মৃত্যু-পরবর্তীকালীন দুই বা তিন বছর। নবি তখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন। ইয়াসরিব বা মদিনায় অভিবাসনের পর নবি মুহাম্মদের জীবনধারা পাল্টে যায়। তখন নারীদের প্রতি আগ্রহ পূরণের সুযোগ আসে। এই সত্যকে অস্বীকার করার প্রয়োজন নেই। [সহীহ বুখারিতে নবি মুহাম্মদের নয় জন স্ত্রী ও দুই জন দাসীর সাথে যৌন সম্পর্ক থাকার কথা স্বীকার করে নেয়া হয়েছে এবং বলা বাহুল্য, সে যুগের নৈতিকতার সাথে ব্যাপারটি বেমানান নয়। কিন্তু তাঁকে সর্বকালের জন্য মানুষের আদর্শ বলে দাবি করলে বিপত্তির সূচনা ঘটে - অনুবাদক] ।নবি মুহাম্মদের স্ত্রীদের মোটামুটি একটি পূর্ণ তালিকা নীচে উল্লেখ করা হল :

১. খুয়েলিদ ইবনে আসাদের কন্যা খাদিজা একজন ধনী, সম্ভ্রান্ত মহিলা। মুহাম্মদ ছিলেন খাদিজার তৃতীয় স্বামী। খাদিজার গর্ভে নবি মুহাম্মদের প্রথম পুত্র সন্তান কাশেম, দুই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগে মৃত্যু হয়। এরপর জয়নাব, রোকেয়া, উম্মে কুলসুম এবং ফাতেমা চার কন্যাসন্তানের জন্ম দেন খাদিজা। আত-তাহের নামের আরেকটি পুত্রসন্তান হয় তাদের ঘরে। কিন্তু ওই পুত্র সন্তানটিও শৈশবে মারা যান।

২. জামা'র কন্যা সওদা। তিনি আবিসিনিয়ায় অভিবাসিত একজন মুসলমানের বিধবা স্ত্রী। মিশরীয় বুদ্ধিজীবী হায়কলের অভিমত, 'নবি তাঁকে বিয়ে করেছিলেন একজন নিঃসঙ্গ মুসলমান বিধবার প্রতি করুণা হিসেবে।'হায়কলের অভিমত উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. হজরত আবু বকর আস-সিদ্দিকির কন্যা আয়েশা। সাত বছর বয়সে মুহাম্মদের সাথে তার বিয়ে ঠিক হয় এবং নয় বছর বয়সে তিনি মুহাম্মদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের দুজনের বয়সের পার্থক্য প্রায় চল্লিশ বছর। হিজরি ১১ সনে (৬৩২ খ্রিস্টাব্দ) যখন মুহাম্মদ মৃত্যুবরণ করেন, তখন আয়েশার বয়স ষোল অথবা সতের। তিনি নবির সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী ছিলেন। হৃদয় থেকে কোরান শিক্ষালাভকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। নবির বচন ও কর্মের (হাদিস) এবং মুসলমানদের সংস্কৃতি সম্পর্কিত তথ্যেরও একজন গুরুত্বপূর্ণ উৎস তিনি। খলিফা উসমান হত্যাকাণ্ডের পর বিবি আয়েশা আলি বিন আবু তালিবের খলিফা পদে আসীন হওয়ার বিরোধিতা করেছিলেন।আয়েশা হিজরি ৩৬ (৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ) সনে আলির বিরুদ্ধে জঙ্গে জামাল বা উটের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেপরাজিত হোন।

৪. মক্কা থেকে মদিনায় অভিবাসী এবং ওহুদের যুদ্ধে আহত হয়ে মৃত্যুবরণকারী একজন মুসলমানের স্ত্রী উম্মে সালমা।

৫. হজরত ওমর বিন আল-খাত্তাবের কন্যা হাফসা। স্বামী মৃত্যুর পর তারও নবির সাথে বিয়ে হয়। এই বিয়ের একটি প্রায়োগিক দিক রয়েছে বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন।

৬. জাহাশের কন্যা জয়নাব। তিনি নবির পালকপুত্র (মুক্তদাস) জায়েদ বিন আল-হারিসের প্রাক্তন স্ত্রী। জয়নাবের সঙ্গে নবি মুহাম্মদের বিয়েকে অন্যতম ভালোবাসার বন্ধন হিসেবে গণ্য করা হয়। জায়েদ ও জয়নাবের সম্পর্ক নিয়ে একটি দীর্ঘ বর্ণনামূলক কবিতা রয়েছে। জয়নাবের জন্য নবির প্রীতি ও আদর এতোই বেশি ছিল, তাকে আয়েশার একজন প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত করে।

৭. মুসতালিক গোত্রের প্রধান আল-হারিস বিন আবু দেরার-এর কন্যা ও মুসাফির বিন সাফওয়ানের প্রাক্তন স্ত্রী জুয়ায়রিয়া। হিজরি ৫৪ (৬২৭ খ্রিস্টাব্দে) সালে বানু-মুসতালিক গোত্রের পরাজয়ের পর জুয়ায়রিয়াকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে আটক করা হয় এবং পরবর্তীতে মুসলমান যোদ্ধাদের মধ্যে একজনের গনিমতের মালে হিসেবে জায়গা হয়। জুয়ায়রিয়ার মালিক তাঁকে একটি নির্দিষ্ট মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা ছিল তার সাধ্যের বাইরে। জুয়ায়রিয়া তাই নবি মুহাম্মদের বাড়িতে গিয়ে সাহায্য চাইলেন, নবি যেন মুক্তিপণের পরিমাণ কমাতে মধ্যস্থতার দায়িত্ব নেন। পরবর্তী কাহিনী বিবি আয়েশার বর্ণনা অনুযায়ী, 'জুয়ায়রিয়ার সৌন্দর্য ও মাধুর্য এমনই ছিল যে, তাঁকে দেখামাত্র সবাই পুলকিত বোধ করত। জুয়ায়রিয়াকে আমার ঘরের দরজার সামনে দেখে আমি বিচলিত বোধ করি। কেননা নিশ্চিত ছিলাম আল্লাহর বান্দা তাঁকে দেখামাত্র পছন্দ করবেন এবং সেটাই হলো। জুয়ায়রিয়া যখন নবির সাথে দেখা করার সুযোগ পেলেন এবং আর্জি ব্যক্ত করলেন, নবি তখন বললেন, তিনি জুয়ায়রিয়ার জন্য আরও ভালো কিছু করবেন- নবি নিজে তার মুক্তিপণ পরিশোধ করবেন এবং পাণিপ্রার্থী হবেন। জুয়ায়রিয়া তা শুনে খুশি হয়ে সম্মতি জানালেন। নবির সাথে জুয়ায়রিয়ার বিয়ের পর মুসলমানরা মুসতালিক গোত্রের বন্দীদের অনেককে ছেড়ে দিলেন। যেহেতু তাঁরা নবি মুহাম্মদের তালাতো ভাইবোন ছিল। আমি অন্য কোনো নারীর কথা জানি না, যে নিজের আত্মীয়-স্বজনদের জন্য এমন সুন্দর পরিণতি ও আশীর্বাদ বয়ে নিয়ে এসেছে।'

৮. আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবিবা (আরেক নাম রামালা)। তার প্রথম স্বামী উবাদুল্লাহ বিন জাহাশ আবিসিনায় মৃত্যুবরণ করেন।

৯. খায়বারের ইহুদি নেতা কেনানা বিন আবু রাবিয়ার স্ত্রী সাফিয়া। তিনি হোয়ায় বিন আকতাবের কন্যা। খায়বার যুদ্ধে বন্দী হওয়ার পর নবি তাঁকে গনিমতের মাল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন। খায়বার থেকে মদিনায় আসার পরে নবি তাকে বিয়ে করেন।

১০. হেলাল গোত্রের আল-হারিসের কন্যা মায়মুনা। মায়মুনার এক বোনের বিয়ে হয়েছিল আবু সুফিয়ানের সাথে এবং আরেক বোনের সাথে আব্বাস বিন আব্দুল মোতালেবের বিয়ে হয়েছিল। মায়মুনা খালেদ বিন আল-ওয়ালিদের খালা। (খালেদ পরবর্তীতে সিরিয়া দখলে ভূমিকা রাখেন)। কথিত আছে মায়মুনার সাথে নবির বিয়ের পর খালেদ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবি তাকে কয়েকটি ঘোড়া উপহার দিয়ে বরণ করে নেন।

১১. শোরাইয়ার কন্যা ফাতেমা।

১২. ইয়াজিদের কন্যা হিন্দ (উম্মে সালমা)।

১৩. শাবার কন্যা আসমা।

১৪. খোজায়মার কন্যা জয়নাব।

১৫. কায়েসের কন্যা হাবলা। হাবলার ভাই আল-আশাত বিন কায়েস দক্ষিণ আরবের এক নেতা। তিনি ইরান দখলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।[৭০]

১৬. নোমানের কন্যা আসমা। নবি এই বিয়েকে পূর্ণতা দান করেননি।

১৭. আদ-জাহাকের কন্যা ফাতেমা। এই বিয়েও পূর্ণতা পায়নি।

১৮. মিশরীয় কপটিক খ্রিস্টান ক্রীতদাসী মারিয়া (মেরি দ্য কপ্ট বা মারিয়া কিবতিয়া)। তাঁকে ৬২৮ সালে মিশরের রোমান গভর্নর (ইসলামের ইতিহাসে মিশরের শাসকদের 'আল-মুকাওকিস'নামে ডাকা হয়) উপহারস্বরূপ দান করেছিলেন নবিকে[৭১]। মারিয়ার গর্ভে নবির ইব্রাহিম নামের এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু শৈশবেই শিশুটির মৃত্যু ঘটে।

১৯. মারিয়ার মতো রায়হানাও কোরানের ভাষায় 'তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায়'বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ রায়হানা ছিলেন একজন ক্রীতদাসী। তার সাথে বিয়ের প্রয়োজন ছিল না এবং যৌন সম্পর্ক স্থাপনেও কোনো বাধা ছিল না। তিনি ইহুদি গোত্র বানু-কুরাইজার একজন যুদ্ধবন্দী। যুদ্ধ শেষে তিনি গনিমতের মাল হিসেবে নবির কাছে জায়গা হয়েছিল। কিন্তু তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণে রাজি হননি এবং নবির সাথে কোনো চুক্তিভিত্তিক বিয়েতেও রাজি হননি। শেষে নবির গৃহে একজন গৃহপরিচারিকা হিসেবেই ছিলেন।

২০. দাউস গোত্রের উম্মে শারিক। তিনি সেই চারজন নারীর মধ্যে একজন, যারা নিজেদের নবির কাছে সমর্পণ করেছিলেন। চুক্তিভিত্তিক বিবাহিত নারী এবং অস্থায়ী সঙ্গী ছাড়াও নবির গৃহে আরও কয়েকজন নারী ছিলেন তাঁরা এই শ্রেণিতে পড়েন। চুক্তিভিত্তিক বিবাহিত স্ত্রীর সংখ্যা সর্বোচ্চ চারজন হতে পারে। এ-ধরনের বিয়েতে মোহরানা, সাক্ষীদের উপস্থিতি এবং নারীর পিতা কিংবা অন্য অভিভাবকের সম্মতির প্রয়োজন রয়েছে। ক্রীতদাসীর সাথে মুসলমানদের যৌনসম্পর্ক স্থাপনে বৈধতা দেয়া

হয়েছে, যদি ওই নারীর স্বামী পৌত্তলিক কিংবা অবিশ্বাসী হয়ে থাকেন। আর কেবলমাত্র নবির ক্ষেত্রে নিজেকে সমর্পণকারী কোনো নারীর সাথে নবির বিয়ের বৈধতা দেয়া হয়েছে সুরা আহজাব-এর ৫০ নম্বর আয়াতের শেষ অংশে। নবির কাছে নিজেদেরকে সমর্পণকারী অন্য তিনজন মহিলা হচ্ছেন মায়মুনা, জয়নাব এবং খাওলা।

উম্মে শারিক যখন নিজেকে নবির কাছে উপহার হিসেবে সমর্পণ করলেন বিবি আয়েশা তখন উদ্বিগ্ন বোধ করলেন। কেননা উম্মে শারিক ছিলেন খুব সুন্দরী এবং মুহাম্মদ উপহার হিসেবে তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করেন। হাদিসে আছে এ- ঘটনায় ঈর্ষা ও অসম্মান অনুভব করেন বিবি আয়েশা। তিনি বলেন, 'যে নারী নিজেকে একজন পুরুষের কাছে সমর্পিত করে, তার নিজের কী মূল্য থাকতে পারে এ ভেবে আমি আশ্বর্যান্বিত হই।'সুরা আহজাবের ৫০ নম্বর আয়াতের শেষাংশ 'কোনো বিশ্বাসী নারী নবির কাছে নিবেদন করলে আর নবি তাকে বিয়ে করে বৈধ করতে চাইলে সেও বৈধ' এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছিল যেখানে উম্মে শারিককে উপহার হিসেবে নবি কর্তৃক গ্রহণকে বৈধতা দেয়া হয়েছে। একথা শুনে আয়েশা রাগান্বিত হয়ে বলেন : 'আপনার প্রভু আপনার ইচ্ছাকে অনুমোদন দিতে ওহি পাঠাতে খুব একট বিলম্ব করেন না, তা তো দেখতেই পাচ্ছি।' [বুখারি হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী : 'খাওলা বিনতে হাকিমসহ কয়েকজন বিয়ের জন্য আল্লাহর নবির কাছে নিজেদের সমর্পন করেছিলেন। আয়েশা বললেন, 'এই মেয়েদের কী লজ্জা-শরম নেই, তাঁরা যেচে এসে পুরুষের কাছে নিজেকে সমর্পণ করছে?'এ-সময় সুরা আহজাবের ৫০-৫১ নম্বর আয়াতদ্বয় নাজিল হয়, যেখানে বলা হয়েছে, '. . . তুমি ওদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার কাছ থেকে দূরে রাখতে পার ও যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পার...'(৩৩:৫১)। আয়েশা তখন বলেন, 'হে আল্লাহর নবি! আপনাকে খুশি করতে আপনার প্রভু তো দেখি খুব একটা দেরি করেন না।'দ্রষ্টব্য: বুখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬২, নম্বর ৪৮।- অনুবাদক]।

তফসির আল-জালালাইনের লেখক মিশরের বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ জালালউদ্দিন আল-মাহালি ও জালালউদ্দিন আল-সুয়ুতি'র ভাষ্য থেকে বিবি আয়েশা ও নবির মনোমালিন্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী উম্মে শারিকের সাথে নবির সম্পর্ক হওয়ার পর এবং সুরা আহজাব-এর ৫০ নম্বর আয়াত অবতীর্ণ হবার পর আয়েশা রূঢ়ভাবে বলে ওঠেন, 'যে নারী নিজেকে একজন পুরুষের কাছে আগ বাড়িয়ে সমর্পিত করে, তার নিজের কী মূল্য থাকতে পারে, এ ভেবে আমি আশ্চর্যান্বিত হই।' পরবর্তীতে ৫১ নম্বর আয়াতে আয়েশাকে তিরস্কার করা হয় এবং ওই আয়াত অবতীর্ণ হবার পরেই নবির ইচ্ছাপূরণে প্রভু সময়ক্ষেপণ করেন না বলে আয়েশা মন্তব্য করেন। সুরা আহজাব-এর ৫০ নম্বর আয়াতে স্ত্রী ও ক্রীতদাসী গ্রহণে নবির অধিকারের কথা বলা হয়েছে: 'হে নবি! আমি তোমার জন্য তোমার স্ত্রীদেরকে বৈধ করেছি যাদেরকে তুমি দেনমোহর দিয়েছ ও বৈধ করেছি তোমার ডান হাতের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে যাদেরকে আমি দান করেছি, এবং বিয়ের জন্য বৈধ করেছি তোমার চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো, খালাতো বোনদেরকে যারা তোমার সঙ্গে দেশত্যাগ করেছে আর কোনো বিশ্বাসী নারী নবির কাছে নিবেদন করলে আর নবি তাকে বিয়ে করে বৈধ করতে চাইলে সেও বৈধ। এ বিশেষ করে তোমারই জন্য, অন্য বিশ্বাসীদের জন্য নয়...।' (৩৩:৫০)। একই আয়াতে আরও বলা হয়েছে: 'বিশ্বাসীদের স্ত্রী ও তাদের দাসীদের সম্বন্ধে আমি যা নির্ধারণ করেছি তা আমি জানি।'এই আয়াতের শেষাংশ নিয়ে বিবি আয়েশা প্রতিবাদ করলে ৫১ নম্বর আয়াতে সতর্কতা জারি করা হয়, যার মাধ্যমে স্ত্রীর ওপর নবির ক্ষমা চূড়ান্ত এবং অসীম পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। এর ফলে স্ত্রীরা নবির কোনো কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হন: 'তুমি ওদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পার ও যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পার, আর তুমি যাকে দূরে রেখেছ তাকে কামনা করলে তোমার কোনো দোষ নেই। এ-বিধান এজন্য যে, এতে ওদেরকে খুশি করা সহজ হবে আর ওরা দুঃখ পাবে না, এবং ওদেরকে তুমি যা দেবে তাতে ওদের প্রত্যেকেই খুশি থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা জানেন। আল্লাহ সব জানেন, সহ্য করেন।' (৩৩:৫১)।

আল-জামাখশারি তার লেখা কোরানের তফসিরগ্রন্থ ‘আল-কাশশাফ’- এ সুরা আহজাবের ৫১ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার মতে, ‘নবির স্ত্রীরা যারা একে অন্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তারা নিজেরা বেশি করে গনিমতের মালের ভাগ চেয়েছিলেন। (বানু কুরাইজা লোকদের হত্যা করার পর, মুসলমানরা প্রচুর পরিমাণ গনিমতের মাল পেয়েছিলেন। তখন নবির স্ত্রীরা এখান থেকে এক পঞ্চমাংশ ভাগ পাওয়ার আশা করেছিলেন)। বিবি আয়েশাকে উদ্ধৃত করে জামাখশারি বলেন, ৫১ নম্বর আয়াত অবতীর্ণ হবার আগ পর্যন্ত এক মাস নবি তার স্ত্রীদের সঙ্গ ত্যাগ করেন। ওই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর ভীতসন্ত্রস্ত স্ত্রীরা নবিকে তার ইচ্ছানুযায়ী আর্থিক সহায়তা ও ব্যক্তিগত সাহচর্য দেবার কথা বলেন।’

অর্থাৎ স্ত্রীদের সাথে নবি কিভাবে আচরণ করবেন তা নির্ধারণে নবির একচ্ছত্র আধিপত্যকে তার স্ত্রীরা স্বীকার করে নিলেন। জামাখশারি সুরা আহজাব-এর ৫১ নম্বর আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় বলেছেন, এই আয়াত নবিকে তার ইচ্ছামতো সমাজের যেকোনো নারীকে বিয়ে করার আগ্রহ, প্রস্তাব, স্ত্রীরূপে গ্রহণ কিংবা যে কোনো স্ত্রী বা সকল স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করেছে। এছাড়া হাসান বিন আলিকে উদ্ধৃত করে জামাখশারি লিখেছেন, নবি যদি একজন নারীর পাণিগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করতেন, তবে অন্য কারো পক্ষে সেই নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণের ক্ষমতা নেই, যদি না নবি তার মত পরিবর্তন করেন। জামাখশারি আরও লিখেছেন, ওই সময়ে নবির নয়জন স্ত্রী ছিলেন যাদের সবাইকে সমান সঙ্গ দেবার কথা থাকলেও তিনি তা ক্রমানুযায়ী করেননি, কিংবা পাঁচজনকে একেবারেই সঙ্গ দেননি। এই পাঁচজন হচ্ছেন সওদা, জুয়ায়রিয়া, সাফিয়া, মায়মুনা এবং উম্মে হাবিবা। যাদেরকে অনুগ্রহ করে নিয়মিত সঙ্গ দিয়েছেন তাঁরা হলেন আয়েশা, হাফসা, উম্মে সালমা এবং জয়নাব। আয়েশাকে আবার উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, ‘কোনো কোনো দিন এমন হতো যে, নবি আমাদের সবাইকে একে একে না ডেকে, শুধু তাদেরকেই অনুগ্রহ করতেন যাদের পালা আসতো এবং যাদের সাথে তার ওইদিন থাকার কথা।’নবি তালাক দিয়ে দিবেন এই ভেবে উদ্বিগ্ন সওদা বিন জামা নবিকে বলছেন, ‘আমার জন্য সময় বরাদ্দ দেবার প্রয়োজন নেই! আপনার সাথে আমার দাম্পত্য জীবনের আশা আমি পরিত্যাগ করেছি এবং আমার জন্য বরাদ্দ সময় আয়েশাকে অর্পণ করলাম। কিন্তু আমাকে তালাক দিবেন না। কেননা শেষ-বিচারের দিনে আমি আপনার একজন স্ত্রী হিসেবে গণ্য হতে চাই।’

৫১ নম্বর আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, ‘দাম্পত্য অধিকার হারানোর ফলে নবির স্ত্রীরা তুলনামূলকভাবে বেশি খুশি থাকবেন। যদিও স্বর্গীয় আদেশের মাধ্যমে নবিকে পূর্ণ দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে, এবং তার স্ত্রীদেরকে নবির কাছ থেকে যেকোনো পাওনা অধিকার আদায়ে বঞ্চিত করেছে, তথাপি এই বঞ্চনার মাধ্যমে তাদের কল্যাণ সাধিত হয়েছে। এর মাধ্যমে তাদের নিজেদের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হবে এবং তারা ভবিষ্যতে সুখী হবেন।’

হয়তো নবির স্ত্রীরা মানসিকভাবে আঘাত পেয়েছিলেন এবং তাদের আত্মসম্মানের উপর আঘাত এসেছিল, সেই প্রেক্ষিতে সুরা আহজাব-এর ৫২ নম্বর আয়াতে সান্ত্বনাসূচক বক্তব্য এলো। এই আয়াতের প্রতিটি শব্দে তাদের প্রতি সান্ত্বনা এবং আশ্বাসের বাণী রয়েছে : ‘(মুহাম্মদ!) এরপর তোমার জন্য কোনো নারী বৈধ নয় আর তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রীগ্রহণও বৈধ নয়, যদি ওদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধও করে, তবে তোমার ডান হাতের অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এ-বিধান প্রয়োজ্য নয়। আল্লাহ সমস্ত কিছুর ওপর কড়া নজর রাখেন।’

এই আয়াতে তথাপি একটি সমস্যা রয়ে গিয়েছে। যেমন বিবি আয়েশার একটি বক্তব্য সকল হাদিস-সংগ্রহকারক ‘নির্ভরযোগ্যহাদিস’ হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন: ‘সকল স্ত্রীর অনুমোদন না থাকা অবস্থায় নবি মারা যাননি।’অর্থাৎ নবির মৃত্যুর আগে সকল স্ত্রীই তার জন্য অনুমোদিত ছিল। [প্রভাবশালী সুন্নি পণ্ডিত ইসমাইল ইবনে কাসির (১৩০০-১৩৭৩ খ্রিস্টাব্দ) তার বিখ্যাত তফসির গ্রন্থে বলেছেন, সুন্নি ধর্মতাত্ত্বিক এবং হাদিস সংগ্রহকারক ইমাম আহমদ ইবনে হানবলের (৭৮০-৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ) সংগ্রহে বিবি আয়েশার উদ্ধৃত এই হাদিসটি রয়েছে। এছাড়া মুহাম্মদ ইবনে ইসা আত-তিরমিজি (৮২৪-৮৯২ খ্রিস্টাব্দ) এবং ইমাম আহমদ

আন-নাসাই'র (৮২৯-৯১৫ খ্রিস্টাব্দ) সংগৃহীত হাদিসেও তা রয়েছে। যেমন : 'সুনান আন-নাসাই', (ইংরেজি অনুবাদ) ভলিউম-৪, বুক-২৬, হাদিস-৩২০৭।- অনুবাদক]।আল-জামাখশারির মতে, সুরা আহজাবের ৫২ নম্বর আয়াতটি ৫০ নম্বর আয়াত দ্বারা বাতিল হয়েছিল। অর্থাৎ 'হে নবি! আমি তোমার জন্য তোমার স্ত্রীদেরকে বৈধ করেছি...'বক্তব্য টিকে গেছে আর '(মুহাম্মদ!) এরপর তোমার জন্য কোনো নারী বৈধ নয়...' বক্তব্যটি বাতিল হয়ে গিয়েছে। হজরত আয়েশার উদ্ধৃত হাদিসটিও ৫০ নম্বর আয়াতের সত্যতার দিকে ইঙ্গিত করে। কিন্তু অন্য কিছু না হোক, সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য হলেও কোরানের কোনো একটি আয়াত বাতিল হলে সেটি থাকবে উপরে, যে আয়াত দ্বারা বাতিল হয়েছে তা থাকবে নীচে। কারণ ভবিষ্যতের সম্ভাব্য কোনো কাজকে বর্তমানের কোনো বক্তব্য দিয়ে সংশোধন করা যায় না, বরং অতীতের কাজকে সংশোধন করা যায় বর্তমানের বক্তব্য দিয়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা দেখি বাতিলকৃত আয়াতটি (৫২নম্বর আয়াত) রয়ে গিয়েছে নীচে আর যে আয়াতটি বাতিল করেছে (৫০ নম্বর আয়াত) এটা অবস্থান করছে উপরে। কোরানের আয়াতের ধারাবাহিকতা সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এমন গরমিল হলো কিভাবে? [আল্লাহ কি নিজে এই গরমিল করেছেন, নাকি নবি-পরবর্তী খলিফাদের কোরান সংকলন কমিটি আয়াত বিন্যাস করতে গিয়ে এই গরমিল করেছেন?- অনুবাদক]। জালালউদ্দিন আল-সুয়ুতিও 'আল-ইতকান ফি উলুম আল-কোরান' নামের বইয়ে কোরানের সমস্যাগুলো নিয়ে একটি নিবন্ধে মত প্রকাশ করেছেন, 'সুরা আহজাবের এই পূর্ববর্তী আয়াত দ্বারা পরবর্তী আয়াত বাতিল হয়েছে।'

সুরা আহজাবের বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত নবির বিয়ে সম্পর্কিত অধিকারগুলো যখন একের পর এক যোগ হতে থাকে, তখন এগুলো থেকে বিস্ময়কর সুবিধা-প্রাপ্তির বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যান্য বিশ্বাসীদের জন্য চারজনে সীমাবদ্ধ থাকলেও নবির জন্য এর চেয়েও বেশি স্ত্রী গ্রহণ করা সম্ভব ছিল। নবির জন্য তার সাথে মদিনায় অভিবাসনকারী কাজিনদের বিয়ে করা অনুমোদিত ছিল, কোনো ধরনের যৌতুক প্রদান কিংবা সাক্ষীর উপস্থিতি ব্যতিরেকে নিজেকে তার কাছে সমর্পণকারী কোনো নারীকে নবি বিয়ে করতে পারতেন। স্ত্রীদের সমঅধিকার প্রদানে কিংবা তা রক্ষায় নবির কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না, তিনি যে কোনো স্ত্রীর সহচর্য স্থগিত কিংবা বাতিল করতে পারতেন। তিনি যদি কোনো নারীর পাণিপ্রার্থী হতেন, তবে অন্য পুরুষদের সেই নারীর পাণিপ্রার্থী হওয়ার আশা পরিত্যাগ করতে হতো; এবং নবির মৃত্যুর পরে অন্য কেউ তার কোনো স্ত্রীকে বিয়ে করার অনুমোদন ছিল না। এছাড়াও নবির কোনো স্ত্রীর বাড়তি ভাতা পাওয়ার দাবি জানানোর অনুমতি ছিল না।

নবিকে ব্যাপক সুবিধা এবং স্বাধীনতা দেবার বিপরীতে তার স্ত্রীগণের ওপর নানা বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছিল। তারা আর দশজন নারীর মতো থাকতে পারলেন না। তাদেরকে সবসময় লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই পর্দার পিছনে থেকে পুরুষের সাথে কথা বলতে হবে। পৌত্তলিক সংস্কৃতির কোনো গয়না পরিধান তাদের জন্য নিষিদ্ধ হলো। ভাতার পরিমাণ যাই হোক না কেন নবির স্ত্রীদের তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে; তাদের পালা যদি না আসে তবে তারা অভিযোগ করতে পারবে না এবং কোনো অবস্থাতেই তাঁরা পুনরায় বিয়ে করতে পারবে না। ৫৩ নম্বর আয়াতের শেষের দিকে সুনির্দিষ্টভাবে মুসলমান পুরুষদের জন্য আরোপিত হয়েছে: '. . . তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহর রসুলকে কষ্ট দেয়া তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদেরকে বিবাহ করা সংগত হবে না। আল্লাহর কাছে এ গুরুতর অপরাধ।'ইহুদিদের নীতিশাস্ত্র তালমুদেও ইহুদি-রাজার স্ত্রীদের পুনরায় বিয়ের ওপর একই রকম নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

আবদুল্লাহ বিন আল-আব্বাসের[৭২] বক্তব্য অনুযায়ী, একবার একজন ব্যক্তি নবির একজন স্ত্রীর সাথে দেখা করতে গেল, এবং নবি তাকে পুনরায় এ কাজ করতে নিষেধ করেন। লোকটি প্রতিবাদ করে এই বলে যে, নবির স্ত্রী তার চাচার মেয়ে এবং তাদের দুজনের এ-সাক্ষাতের পেছনে কোনো খারাপ অভিসন্ধি নেই।' নবি প্রত্যুত্তর দিলেন, 'আমি এ-সম্পর্কে অবগত আছি, কিন্তু আল্লাহ এবং আমার মতো কোনো ঈর্ষাপরায়ণ দ্বিতীয়জন নেই।' লোকটি ক্রুদ্ধ হয়ে ফিরে যাবার সময় গজগজ করে বলে গেল,

‘তিনি আমাকে আমার চাচাতো বোনের সাথে কথা বলতে নিষেধ করলেন। যাই হোক, নবির মৃত্যুর পর আমি আমার চাচাতো বোনকে বিয়ে করবো।’এ-ঘটনার পরই সুরা আহজাবের ৫৩ নম্বর আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে, এমন কোনো সময় আসেনি যখন নবির গৃহে তার বিশজন স্ত্রী একত্রে অবস্থান করেছেন। তার সম্মানিত স্ত্রী খাদিজার মৃত্যুর কথা পূবেই বলা হয়েছে। নবির স্ত্রী জয়নাব বিনতে খোজায়মা নবির জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন। রায়হানা নামের দাসীরও মৃত্যু হয় নবির জীবদ্দশাতেই। তিনি দুটি বিয়েকে পূর্ণতা প্রদান করেননি। তার মৃত্যুকালে নয়জনের বেশি পূর্ণ স্ত্রী ছিলেন না।

নবির স্ত্রীদের মধ্যে একসময় দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের আবির্ভাব ঘটেছিল। একপক্ষে ছিলেন আয়েশা, হাফসা, সওদা এবং সাফিয়া। অন্যপক্ষে জয়নাব বিনতে জাহাশ, উম্মে সালমাসহ আরও তিনজন। নবির কয়েকজন স্ত্রী এমন সব ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন, যেগুলো পরবর্তীতে ইসলামি ইতিহাস এবং সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। সবচেয়ে বেশি পরিচিতি পেয়েছে বিবি আয়েশা ও সাফওয়ান বিন আল-মোয়াত্তালকে কেন্দ্র করে ঘটা ঘটনাটি।

হিজরি ৫ সালে (৬২৭ খ্রিস্টাব্দ) বানু-মোসতালিক গোত্রের সাথে লড়াইয়ের সময় হজরত ওমরের একজন ক্রীতদাস ও মদিনার খাজরাজ গোত্রের একজন আনসারের সাথে ঝগড়া বেধে যায়। এই ঘটনায় খাজরাজ গোত্রের একজন নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবায় (যাকে মুসলমানরা বিশ্বাসঘাতকদের নেতা বলেই চিনতেন) ক্রুদ্ধ হয়ে তার আনসার সমর্থকদেরকে বললেন, ‘আমরা নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে এনেছি।’(মদিনার সবকিছু মুহাজিরদের দখলের চলে যাচ্ছে এমন ইঙ্গিত করে) কথায় আছে, কুকুরকে খাওয়ালেও সে ঠিকই কামড়ায়, এই প্রবাদটি এখন আমাদের ক্ষেত্রে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। চলুন আমরা সবাই ইয়াসরিবে ফিরে যাই। ওখানে বেশিরভাগ মানুষই আমাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু। এই সংখ্যালঘুদের উৎখাত করতে হবে।’নবি এই বক্তব্য শুনে তাড়াতাড়ি মদিনার দিকে যাত্রা করলেন, যাতে আব্দুল্লাহ বিন উবায়ের যে কোনো বিরুদ্ধবাদী কিংবা চক্রান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারেন। ফিরতিপথে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বিরতি দিয়ে তিনি দ্রুত চললেন।

এই অভিযানের সময় নবির সাথে ছিলেন বিবি আয়েশা। একটি যাত্রাবিরতিতে বিবি আয়েশা প্রাকৃতিক ক্রিয়া সম্পন্ন করতে মরুভূমির ভেতরে প্রবেশ করলেন। পালকির মধ্যে আসার সময় খেয়াল করলেন, তার পুঁতির মালাটি হারিয়ে গেছে। খোঁজাখুঁজি করতে দেরি হয়ে যায়। এদিকে বিবি আয়েশার অনুপস্থিতি খেয়াল না থাকায় নবি তার অনুসারীদের নিয়ে স্থান ত্যাগ করলেন। আয়েশা এসে দেখলেন তার হাওদা (হাতি কিংবা উটের পিঠের উপরে বসানো কাপড় ঘেরা বসার স্থান) বহনকারী উটটি অন্যান্য উটের সাথে সেই স্থান ত্যাগ করেছে। বিবি আয়েশা মরুভূমিতে একা পড়ে রইলেন। এরই মধ্যে সাফওয়ান বিন আল-মোয়াত্তাল আয়েশাকে দেখতে পেলেন। সাফওয়ানের দায়িত্ব ছিল মুসলমান সৈনিকদের একটু দূরে থেকে অনুসরণ করা, ভুল করে ফেলে যাওয়া জিনিসপত্র সংগ্রহ করা। মরুভূমির মধ্যে আয়েশাকে একা অবস্থান করতে দেখে চিনতে পারলেন। নিজের উটের পেছনের আসনে বসিয়ে তাকে মদিনায় নিয়ে আসেন। এই ঘটনার কথা গোপন থাকল না।

বিবি আয়েশার প্রতিদ্বন্দ্বী জয়নাবের বোন হামনা এ-ঘটনা শুনে সুযোগ কাজে লাগাতে চাইলেন এবং অভিযোগ করলেন আয়েশা ও সাফওয়ান ব্যভিচারে লিপ্ত। বিখ্যাত কবি হাসান বিন সাবিত ও মেসতা বিন ওসাসা নামের একজন মুহাজির হামনার সাথে কণ্ঠ মেলালেন। অন্যদিকে সুযোগ-সন্ধানী আব্দুল্লাহ বিন উবায় মদিনা শহরে গুজব ছড়িয়ে দিলেন। পরিস্থিতি মোটেও আয়েশার অনুকূলে ছিল না। অভিযানে নবির সঙ্গী হবার পর এই অল্পবয়স্কা ও সুন্দরী নারী নিজেকে আরও দুজন নতুন এবং একই রকম সুন্দরী রমণীর প্রতিপক্ষ হিসেবে আবিষ্কার করলেন। প্রথমজন হলেন জয়নাব বিনতে জাহাশ, যাকে বিয়ে করার জন্য কোরানের আয়াত নাজিল হয়ে নবিকে সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়জন হলেন জোয়ায়রিয়া বিন আল-হারিস, যিনি মোসতালিক

গোত্রের মুসাফি নামের একজনের প্রাক্তন স্ত্রী। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, জোয়ায়রিয়াকে অভিযানের পর বন্দী করা হয় এবং নবি তাকে তার মালিকের কাছ থেকে চারশ দিরহাম মুক্তিপণের বিনিময়ে কিনে নেবার কিছুদিন পরে বিয়ে করেন।

এটা অসম্ভব নয়, প্রতিপক্ষের আবির্ভাবে আয়েশার নারীত্ব এমনই আঘাত পেয়েছিল ও রুষ্ট হয়েছিল যে নবিকে সতর্ক করে তিনি জেনে-শুনে পাপ করেছিলেন কিংবা একটি অভিসারের অবতারণা ঘটিয়েছিলেন। যখন আয়েশার হাওদা উটের উপর তোলা হলো, কেউ লক্ষ্য করল না তা বেশি হালকা, এমনটা ভাবা কষ্টকর। মনে আরও প্রশ্ন জেগে উঠে। বিশ্রাম থেকে যাত্রা শুরুর পূর্বে নবি কেন তার প্রিয়তমা স্ত্রীর হাল-হকিকত জিজ্ঞেস করলেন না। আয়েশা কিভাবে এমন বেখেয়াল হয়ে পড়লেন যে, শতশত মুসলমানদের যাত্রা-প্রস্তুতি তার নজরে পড়ল না? তিনি সময়মত ফিরতে পারলেন না। সাফওয়ান তাকে খুঁজে পাবার আগ পর্যন্ত আয়েশা কিভাবে একা মরুভূমিতে পড়ে রইলেন? যদিও সাফওয়ানের কাজ ছিল অভিযান চলাকালীন সময়ে কিছু দূরত্ব বজায় রেখে একে অনুসরণ করা। যাত্রী ও পশুদের জন্য পরবর্তী যাত্রা বিরতির সময় তার কি অভিযানের যাত্রাবিরতির স্থানে পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল না? সাফওয়ানের আকস্মিক উদয় হওয়া এবং অভিযান চলে যাবার বেশ কিছু সময় পর আয়েশার উদ্ধার হবার ঘটনাটি তথ্য-প্রমাণ এবং যুক্তির বিচারে ধোপে টিকানো কষ্টকর। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে সাফওয়ানের সাথে যোগসাজশ করেই বিবি আয়েশা পেছনে থেকে গিয়েছিলেন।

সকালে যখন সাফওয়ান আয়েশাকে উটের পিছনের আসনে বসিয়ে শহরে প্রবেশ করলেন, শহরে তখন গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল এবং যতই তা ছড়িয়ে পড়ল ততই কুৎসিত আকার ধারণ করল। যেহেতু মদিনা শহরটি অনেক ছোট ছিল, ছোট ছোট বিষয়গুলোও কারো কাছে গোপন থাকে না। প্রশ্ন জাগে, এই ভয়ংকর গুজবের পর কিভাবে বিশ দিন সময় লাগল আয়েশার কাছে পৌঁছাতে? এবং তা শোনামাত্রই কেন আয়েশা অসুস্থ হয়ে পড়লেন? তিনি অবশ্য অসুস্থতার ভানও করে থাকতে পারেন। অসুস্থতার কারণে আয়েশাকে তার পিতার গৃহে ফিরে যাবার সুযোগ করে দেয়া হয়েছিল। স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধিতে ধারণা করা যায়, তিনি শুরু থেকে এই গুজব সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং তখনই অসুস্থতার ভান করে পিতার গৃহে ফিরে গেলেন যখন নবির কানে গুজবটি পৌঁছে গিয়েছিল। নবি যখন আয়েশার প্রতি শীতল আচরণ করতে লাগলেন এবং দূরত্ব বজায় রাখতে শুরু করলেন। এতো সব বাহ্যিক উপস্থাপন এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখে পড়লেও আয়েশার নির্দোষ হওয়াকে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। সম্পূর্ণ ঘটনাকে একটি ছেলেমানুষী ও নারীদের চাতুর্যপূর্ণ নাটক হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। সম্ভাবনা আরও জোরালো হয় যখন জানা যায় সাফওয়ান বহু আগে থেকে একজন কুখ্যাত নারীবিদ্বেষী লোক ছিলেন।

ঘটনা যাই হোক না কেন, লোকমুখে ছড়িয়ে পড়া এই গুজব নবিকে চরমভাবে বিচলিত করেছিল। তিনি বিশ্বস্ত দুজন সহচর ওসামা বিন জায়েদ ও আলি বিন আবু তালিবের পরামর্শ গ্রহণ করেন। ওসামা দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করেন, আয়েশা নির্দোষ এবং হজরত আবু বকরের মেয়ে হিসেবে তিনি কোনো অনৈতিক কাজে প্রলুব্ধ হতে পারেন না। অন্যদিকে আলির মত ছিল, নবির বিয়ে করার জন্য মেয়ের অভাব নেই, এবং ওই অভিসার-সম্পর্কিত আসল সত্য ঘটনা সম্ভবত আয়েশার দাসীর কাছ থেকে জানা যাবে। এরপরেই আলি ওই হতভাগ্য দাসীকে বেদম প্রহার করে সত্য উদ্ধারের চেষ্টা করলেন কিন্তু ওই দাসী কিছুই জানতেন না এবং কসম খেয়ে বললেন যে, বিবি আয়েশা নির্দোষ।

নবির মনে তবুও সন্দেহ দানা বেঁধে ছিল। যে কারণে নিজেই আবু বকরের গৃহে আয়েশাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলেন। কিন্তু তিনি কেবল কান্নাভেজা কণ্ঠে আয়েশার নিদোর্ষ হবার দাবি শুনতে পেলেন। তিনি যখন সেখানে অবস্থান করছিলেন, হঠাৎই একটি স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ নবির কাছে অবতীর্ণ হওয়ায় নবি মূর্ছা গেলেন। সবাই তাকে কাপড়ে মুড়ে, মাথার নিচে একটি বালিশ রেখে দিল। তিনি এতটাই ঘর্মাক্ত হয়ে গেলেন যে তার আলখাল্লা পুরোটা ঘামে ভিজে গেল। কিছুক্ষণ পর যখন তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন তখনই ২৪ নম্বর সুরা নুর অবতীর্ণ হলো। এই সুরাটি একটি দীর্ঘ অংশে (২-২৬ নম্বর আয়াত) ব্যভিচার এবং ব্যভিচারের

মিথ্যা অভিযোগ করার শাস্তি এবং ওই মিথ্যা অভিসারের কাহিনী নিয়ে বক্তব্য রয়েছে। এই আয়াতের মাধ্যমে আয়েশাকে ব্যভিচারের অভিযোগ থেকে দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

আল-জামাখশারির পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী কোরানে এর থেকে অন্য কোনো বিষয়ে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ২৩ নম্বর আয়াত এর সর্বোত্তম উদাহরণ: 'যারা সাধ্বী, নিরীহ ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা ইহলোক ও পরলোকে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।'(২৪:২৩)। মিথ্যা অভিসারের কাহিনীর সমাপ্তি ঘটে তিনজন কুৎসারটনাকারীকে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে। তারা হলেন হামনা, হাসান বিন সাবিত এবং মেসতা। সুরা নুর-এর ৪ নম্বর আয়াত অনুযায়ী তাদের প্রত্যেককে আশিবার বেত্রাঘাত করা হয়। পূর্ববর্তী ঘটনার প্রেক্ষিতে এই শাস্তি প্রদান করা হয়, কেননা তারা যখন অপরাধ করেন, তখনও এই আয়াত অবতীর্ণ হয়নি।

নবির জীবনী-গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত আরও একটি ঘটনা যা কোরানের আয়াতগুলোতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে তা হলো নবির পালক-পুত্র জায়েদ বিন হারিসের স্ত্রী জয়নাব বিনতে জাহাশের প্রতি নবির প্রীতি ও তার সাথে নবির বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। জায়েদ একজন যুদ্ধবন্দী, পরে ক্রীতদাস হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। বিবি খাদিজা তাকে ক্রয় করে মুহাম্মদকে উপহার দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে নবি তাকে মুক্ত করে দিলেন এবং সমসাময়িক একটি প্রথা অনুযায়ী পালক-পুত্ররূপে গ্রহণ করলেন। প্রাক-ইসলামি যুগের আরব সংস্কৃতিতে পালক সন্তানদের রক্তের সন্তানের সমান অধিকার দেওয়া হতো এবং তাদের ওপর একই বিধিনিষেধ আরোপিত হতো। যেমন উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে এবং আত্মীয়তা ও বিয়ের ক্ষেত্রে পছন্দের ভিন্নতায়। সুরা আহজাব-এর আয়াত ৪-৬ এ নিষেধাজ্ঞা আসার পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানরা আরবের প্রাচীন প্রথা পালন করতেন। এই বিষয়ে আব্দুল্লাহ বিন ওমর[৭৩] একবার বলেছিলেন, 'আমরা যারা নবির সান্নিধ্যে ছিলাম তারা জায়েদকে 'জায়েদ বিন মুহাম্মদ'নামে সম্বোধন করতাম। তিনি শুধু নবির পুত্রই ছিলেন না, নবির জন্য অন্যতম নিবেদিত- প্রাণ এবং দৃঢ়বিশ্বাসী সাহাবিও ছিলেন।'

জয়নাবের মায়ের নাম ছিল ওমায়মা, তিনি আবার আব্দুল মোতালেবের কন্যা। অর্থাৎ সম্পর্কে জয়নাব মুহাম্মদের ফুফাতো বোন। নবি নিজেই অনুরোধ করেছিলেন, জয়নাবকে যেন জায়েদের সাথে বিয়ে দেয়া হয়। প্রথমদিকে জয়নাব এবং তার ভাই আব্দুল্লাহ বিয়ের সম্মতি দানে আপত্তি করছিলেন। কারণ জায়েদ ছিলেন একজন মুক্ত ক্রীতদাস। ফলে জায়েদের সাথে তাদের সামাজিক মানমর্যাদার অসাম্য নিয়ে চিন্তিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে সুরা আহজাব-এর ৩৬ নম্বর আয়াত অবতীর্ণ হবার পর তারা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন: 'আল্লাহ ও তার রসুল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো বিশ্বাসী পুরুষ বা নারীর সে-বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তার রসুলকে অমান্য করলে সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।' (৩৩:৩৬)। এই প্রত্যাদেশের পর জয়নাবের সাথে জায়েদের বিয়ে দেয়া হয়। জয়নাবের প্রতি নবির ভালবাসাবোধ তৈরি হয় আরও পরে। যার সময়কাল এবং পরিস্থিতির বহু বর্ণনা রয়েছে। তফসির আল-জালালাইনের বর্ণনা অনুযায়ী, জায়েদের সাথে বিয়ের পরে জয়নাবের প্রতি নবির দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসে: 'কিছু সময় পর জয়নাবের প্রতি নবির দৃষ্টি পড়ে এবং নবির হৃদয়ে তার প্রতি ভালবাসার বীজ অঙ্কুরিত হয়।'

সুরা আহজাব-এর ৩৭ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে জামাখশারি বলেছেন, 'জায়েদের সাথে বিয়ের পরই জয়নাবের প্রতি নবির দৃষ্টি পড়ে। জয়নাব নবিকে এতটা বিমোহিত করেছিলেন যে, নবি তার ভালোবাসাবোধ নিয়ে মন্তব্য করেছেন- হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টির জন্য আল্লাহর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা।' নবি জয়নাবকে আগেও দেখেছেন। কিন্তু তখন তিনি নবিকে প্রীত করতে পারেননি, বা নবির মধ্যে ভালোবাসাবোধ জাগেনি। না-হলে নবি হয়তো নিজেই তার পাণিপ্রার্থী হতেন। নবির প্রশংসার কথা জেনে জয়নাব জায়েদকে তা অবহিত করেন। জায়েদের মন বলছিল, আল্লাহ তার হৃদয়ে জয়নাবের অবস্থানে একটি অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি

করেছেন। তিনি তাই তাড়াতাড়ি নবির কাছে ছুটে গিয়ে নিজ স্ত্রীকে তালাক দেবার অনুমতি চাইলেন। নবি পুরো ঘটনা জানতে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'জায়েদ জয়নাবকে সন্দেহ করেন কিনা?'প্রত্যুত্তরে জায়েদ বললেন, জয়নাবের কাছ থেকে তিনি দয়ালু আচরণই পেয়েছেন, কিন্তু তিনি উদ্বিগ্ন এই কারণে যে, জয়নাব নিজেকে তার থেকে অভিজাত মনে করেন এবং নিজেকে নবির স্ত্রী হবার যোগ্য হিসেবে বিবেচনা করেন। এ-সময় ৩৭ নম্বর আয়াতের সেই শব্দগুলো প্রত্যাদেশ হিসেবে আসলো: 'তুমি তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছে রাখো, আল্লাহকে ভয় করো।' এই তাৎপর্যপূর্ণ আয়াতটি নবি মুহাম্মদের সততা এবং জবাবদিহিতার একটি অনন্যসাধারণ উদাহরণ। আয়াতটির সম্পূর্ণ অনুবাদ এখানে দেয়া হল: 'স্মরণ করো, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন ও তুমিও যাকে অনুগ্রহ করেছ তুমি তাকে বলেছিলে, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছে রাখো, আল্লাহকে ভয় করো।' তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করেছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন। তুমি লোকভয় করছিলে, অথচ আল্লাহকেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত ছিল। তারপর জায়েদ যখন (জয়নাবের সাথে) বিবাহ-সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করলাম যাতে বিশ্বাসীদের পোষ্যপুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলে সেসব রমণীকে বিয়ে করতে বিশ্বাসীদের কোনো বাধা না হয়। আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে।'(৩৩:৩৭)।

এই আয়াতটি যথেষ্ট পরিষ্কার এবং বিশদ ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নেই। নবি জয়নাবকে পছন্দ করতেন, কিন্তু জায়েদ যখন নবির সাথে দেখা করে জয়নাবকে তালাক প্রদানের অনুমতি প্রার্থনা করলেন, নবি বিরুদ্ধ-মত দিয়ে জয়নাবের সাথে সংসার চালিয়ে যাবার পরামর্শ দিলেন। জায়েদকে উপদেশ দিয়ে নবি নিজের মনের ইচ্ছা আড়াল করলেন। কিন্তু আল্লাহ নবিকে বললেন যে, লোকে তাকে মন্দ বলবে এই ভয়ে জয়নাবের তালাকের জন্য নিজের সমর্থন প্রকাশে নবি বিরত রয়েছেন। নবির উপদেশ উপেক্ষা করে জায়েদ যখন জয়নাবকে তালাক প্রদান সম্পন্ন করলেন, তাকে বিয়ে করতে আল্লাহ তখন নবিকে অনুমতি দিলেন যেন মুসলমানরা কখনো তাদের পালক-পুত্রের সাবেক স্ত্রীদের বিয়ে করতে কোনো বিধি-নিষেধের সম্মুখীন না হয়।

সম্ভবত জায়েদের সাথে বিয়ের অনুষ্ঠানে জয়নাবের প্রতি নবির দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। জয়নাবের আলাদা বসবাস করার কারণে জায়েদ নবির সাথে দেখা করে তালাকের অনুমতি চাওয়ার ঘটনা থেকে বোঝা যায়, খুব বেশি দিন স্থায়ী না হলেও তারা দুইজন একটি স্বাভাবিক দাম্পত্য সম্পর্কে ছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে আল-জামাখশারির বর্ণিত ঘটনাবলী ক্রমানুসারে সাজানো যেতে পারে: বিয়ের অনুষ্ঠানে জয়নাবকে একনজর দেখার পর মুহাম্মদ তার সুখানুভূতি প্রকাশ করেন এই বলে, 'হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টির জন্য আল্লাহর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা।' নবির এ-কথা শুনতে পেয়ে এবং সম্ভবত তার প্রতি নবির দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দেখে জয়নাব নবির প্রকৃত অনুভূতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন। এই অনুভূতি জয়নাবকে প্রেরণা যোগায় এমন একটি লক্ষ্য অর্জনে, যেখানে তিনি কুরাইশ গোত্রের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির স্ত্রীর মর্যাদা পাবেন। এই আশার বশবর্তী হয়ে এবং যেহেতু জয়নাব কখনো জায়েদকে স্বামী হিসেবে কামনা করেননি, তাই তিনি জায়েদের সাথে শীতল আচরণ করতে শুরু করেন। নিজ লক্ষ্য অর্জনে এতোটা অগ্রসর হলেন যে, নিজের সম্ভ্রান্ত পরিচয় নিয়ে দম্ভ প্রকাশ করতে শুরু করলেন। তার প্রতি নবির অনুভূতি নিয়ে গর্ববোধ করা শুরু করলেন। জায়েদ তার নেতা এবং মুক্তিদাতার প্রতি কৃতজ্ঞচিত্তে তৎক্ষণাৎ জয়নাবকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং নবির উপদেশ উপেক্ষা করে তালাকের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলেন।

ক্যামব্রিজ তফসিরে[৭৪] এক ভিন্নবিবরণ রয়েছে: 'একদিন আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ (আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তার ওপর) জয়নাবের বাড়িতে জায়েদের সাথে দেখা করতে গেলেন, সেখানে জয়নাবকে একটি চৌবাচ্চায় সুগন্ধি ঢালতে দেখেন। নবি তাকে দেখে প্রীত হলেন এবং জয়নাবকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার বাসনা জেগে ওঠে। নবিকে দেখে জয়নাব তাকে নিজ হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন। নবি তখন বললেন, 'প্রশংসনীয় সৌষ্ঠব এবং সৌন্দর্যদায়িনী! হায় জয়নাব! হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টির জন্য আল্লাহর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা!' এ-কথাটি দুইবার বলে নবি চলে গেলেন। জায়েদ ফেরার পর জয়নাব তাকে ঘটনা খুলে বললেন এবং

জানালেন, ‘আপনি আর আমাকে পাবার অধিকার রাখেন না। যান এবং তালাকের অনুমতি চেয়ে আসুন।’ জায়েদের মনে জয়নাবের প্রতি বিদ্বেষ জেগে ওঠে। তিনি আর জয়নাবকে দৃষ্টিসীমার মাঝে সহ্য করতে পারছিলেন না। তালাক সম্পন্ন হবার পর, নবি জায়েদকে অনুরোধ করেন, জায়েদ যেন জয়নাবের সাথে দেখা করে বলেন, ‘আল্লাহ তাকে নবির স্ত্রী হিসেবে মনোনীত করেছেন।’ জায়েদ জয়নাবের বাড়ির দরজায় গিয়ে টোকা দিলেন। জয়নাব বললেন, তালাক দেবার পর তার কাছে জায়েদের এখন কি প্রয়োজন থাকতে পারে? জায়েদ উত্তর দিলেন, তিনি আল্লাহর রসুলের কাছ থেকে জয়নাবের জন্য একটি বার্তা নিয়ে এসেছেন। সকল প্রশংসা আল্লাহর রসুলের জন্য বলে জয়নাব দরজা খুলে দিলেন। জায়েদ ভেতরে প্রবেশ করা মাত্র জয়নাব কাঁদতে শুরু করলেন। জায়েদ বললেন, ‘এখন কাঁদার সময় নয়। আল্লাহ তোমাকে আমার চেয়েও ভালো একজন স্বামী দিয়েছেন।’ জয়নাব উত্তর দিলেন, ‘আপনি কিছু মনে নিবেন না! কে সেই স্বামী?’ জায়েদ যখন জানালেন, ‘আল্লাহর রসুলই সেই ব্যক্তি, জয়নাব তখন মাটিতে মাথা ঠুকে প্রার্থনায় নিমগ্ন হলেন।’

অন্য আরেকটি বর্ণনা অনুযায়ী জায়েদ বলেছেন: ‘আমি জয়নাবের গৃহে গিয়ে তাকে রুটি সেঁকতে দেখি। যেহেতু সে শীঘ্রই নবির স্ত্রী হতে যাচ্ছে, নবির প্রতি আমার শ্রদ্ধার কারণে আমি তার দিকে সরাসরি তাকালাম না। আমি তার দিকে পিছু ফিরে জানালাম, নবি জয়নাবের পাণিপ্রার্থী হতে চেয়েছেন।’

তফসির আল-জালালাইনের মতে বিবাহ-বিচ্ছেদের পর পুনরায় বিবাহের জন্য মধ্যবর্তী যে কয়েকটি দিন অপেক্ষা করতে হয়, নবি সেদিনগুলো অপেক্ষা করেন এবং তা শেষ হওয়ার সাথে সাথে নবি কোনো প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে জয়নাবের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। সেখানে তাৎক্ষণিকভাবে একটি ভেড়া জবাই করে বিবাহ-ভোজের আয়োজন করা হয়। ভোজের অনুষ্ঠান এবং মানুষের মাঝে রুটি ও মাংস বিতরণের কর্মযজ্ঞ অনেক রাত অবধি চলেছিল। প্রচলিত আছে যে, হজরত ওমর এবং বিবি আয়েশা উভয়েই মন্তব্য করেছেন, সুরা আহজাব-এর ৩৭ নম্বর আয়াতে নবির সততা ও সত্যবাদিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। আয়েশা আরও বলেছিলেন, নবি যদি কোনো কিছু লুকিয়ে রাখার ইচ্ছা করতেন, তবে জয়নাবের প্রতি তার মনের ভাবনা কখনো কোরানে উল্লেখ হতো না। যেমন এই আয়াতে বলা হয়েছে, ‘তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করেছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন’ এ শব্দগুলো কখনো অবতীর্ণ হতো না।

শুধুমাত্র কোরানের সুরা আহজাব-ই নয়, কোরানের আরও অনেক সুরা থেকে নবির সততা এবং সত্যবাদিতার পরিচয় পাওয়া যায়। নবি তার মানবিক দুর্বলতা স্বীকারে কুণ্ঠাবোধ করেননি। যদিও মুসলমান রক্ষণশীলরা দীর্ঘদিন ধরে এই সত্যকে স্বীকার করতে চান না, যারা কিনা রাজার থেকেও বেশি রাজকীয় আচরণে প্রলুব্ধ এবং অলৌকিকতার প্রতি চরম আসক্ত। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এ সম্পর্কে সামান্য পরিমাণে আলোকপাত করা হয়েছে। হাদিসের অনেকগুলো স্পষ্ট প্রমাণ ও সুরা আহজাব-এর ৩৭ নম্বর আয়াতের পরিষ্কার অর্থকে অগ্রাহ্য করে ইসলামি পণ্ডিত আল-তাবারি[৭৫] মন্তব্য করেছেন, ‘তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করেছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন’বাক্যটি নবি মুহাম্মদকে উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ হয়নি। এটা জায়েদকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। জায়েদের মনের মাঝে কোনো কিছু গোপন ছিল! আল-তাবারি এই ভিত্তিহীন ব্যাখ্যাকে গ্রহণযোগ্য করতে গিয়ে অভিযোগ করলেন : ‘জায়েদের একটি মারাত্মক ব্যাধি ছিল, যার খবর তিনি গোপন করেছিলেন। এই ব্যাধির কারণে তিনি জয়নাবকে তালাক দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সমাজের কাছ থেকে তার রোগের খবর গোপন রাখা জায়েদের উদ্দেশ্য ছিল।[৭৬]

মিশরীয় মনীষী মুহাম্মদ হোসেন হায়কল তার লেখা নবির জীবনীগ্রন্থ ‘লাইফ অব মুহাম্মদ’- এ বলেছেন : ‘জয়নাব হলেন নবির ফুফাতো বোন। নবি তাঁকে পূর্বেও দেখেছেন এবং বিয়ে করার কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। তিনি তাই জয়নাবকে তালাক না দেবার জন্য জায়েদকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু জায়েদ তার পথপ্রদর্শকের উপদেশ অমান্য করে ঠিকই নিজের স্ত্রীকে তালাক দিলেন। পরবর্তীতে পৌত্তলিক-আরবের প্রথা ভঙ্গের জন্য নবি জয়নাবকে বিয়ে করলেন বিশ্বাসীদেরকে দেখানোর জন্য যে, দত্তক

গ্রহণের পর দত্তক পুত্রের সাবেক স্ত্রীকে বিয়ের অনুমোদন রয়েছে। জয়নাবকে বিয়ে করার পেছনে এটি একমাত্র কারণ এবং সম্ভবত এ-কারণেই তিনি বিচ্ছেদ-পরবর্তী বিরতি সমাপ্ত হবার পর তাড়াতাড়ি জয়নাবের গৃহে যান এবং বিয়ের উৎসব সম্পন্ন করেন।'হায়কলের মতে, নবির বেশিরভাগ বিয়ের পেছনে রাজনৈতিক কারণ রয়েছে কিংবা বিয়েগুলোর মাধ্যমে তার ধর্ম প্রচারে সুবিধা হয়েছে। নিজের এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে তিনি নবির সাথে হজরত ওমর বিন আল-খাত্তাবের মেয়ে হাফসার বিয়ের ঘটনার একটি উদাহরণ টেনেছেন : 'একদিন ওমর তার স্ত্রীর সাথে একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। ওমরের স্ত্রী রাগান্বিত ও ঝাঁঝালো ভাষায় তর্ক চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ওমর রেগে গিয়ে বললেন, 'নারীরা জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পুরুষের সাথে আলোচনার উপযুক্ত নয়। তাদের মতামত প্রকাশ করারও কোনো প্রয়োজন নেই।' তার স্ত্রী প্রত্যুত্তরে বললেন, 'আপনার কন্যা আল্লাহর রসুলের সাথে এতো বেশি ঝগড়া করে যে, তা-নিয়ে নবি সারাদিনই রেগে থাকেন।' স্ত্রীর মুখে এই কথা শুনে ওমর সরাসরি হাফসার বাড়িতে গেলেন তাঁকে জিজ্ঞেস করার জন্য। তিনি হাফসাকে আল্লাহর শাস্তি ও নবির রাগ থেকে সতর্ক হবার কথা বললেন। তিনি আরও বললেন, 'এই অল্পবয়স্কা মেয়েটিকে (আয়েশা) নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ো না, যে কিনা নিজের সৌন্দর্য এবং তার প্রতি নবির ভালবাসার কারণে দাম্ভিক আচরণ করে! নবি তোমাকে আমার কারণে বিয়ে করেছেন, তোমাকে ভালবাসেন বলে নয়।'

এটা ঠিক যে নবির অনেকগুলো বিয়ের মধ্যে কয়েকটি সম্পন্ন হয়েছিল আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে ইসলাম-প্রচারের জন্য। হায়কলের মতে, এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আলি এবং উসমানকে নবি জামাতা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। খালেদ বিন আল-ওয়ালিদ ইসলাম গ্রহণ করে হিজরি ৭ সালে (৬২৯ খ্রিস্টাব্দে) মক্কায় হিজরত করতে যান। কারণ সে-সময় নবি সর্বশেষ স্ত্রী মায়মুনাকে বিয়ে করেছিলেন। মায়মুনা খালেদের খালা ছিলেন এবং নবির দুই চাচা আব্বাস ও হামজার স্ত্রীদের একজনের বোন ছিলেন।

বিবাহ সম্পর্কিত আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়, যা ওই সময়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং কোরানেও এ-সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত, নবি মারিয়া নামের ক্রীতদাসীর সাথে শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন। হাফসা তখন আকস্মিকভাবে সেখানে উপস্থিত হোন। নবির দিকে অসম্মানসূচক ভাষায় চিৎকার করে বলেন, 'আপনি কেন আপনার দাসীকে নিয়ে আমার বিছানায় শুয়ে আছেন?' হাফসাকে সন্তুষ্ট করতে নবি আর কখনো মারিয়াকে স্পর্শ না করার প্রতিজ্ঞা করলেন। ঝড় শান্ত হয় গেলে নবি মত পরিবর্তন করলেন। হয়তো তিনি মারিয়াকে পছন্দ করতেন কিংবা মারিয়া এ-ঘটনায় মনে আঘাত পেয়েছেন এই ভেবে। সুরা তাহরিম-এর প্রথম পাঁচটি আয়াতে নবির তখনকার আচরণ সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে : 'হে নবি! আল্লাহ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন কেন তুমি তা নিষিদ্ধ করছ তোমার স্ত্রীদেরকে খুশি করার জন্য? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আল্লাহ তোমাদের শপথ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, আল্লাহ তোমাদের সহায়। আর তিনি সর্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী।'(৬৬:১-২)। সুরা মায়িদা-এর ৮৯ নম্বর আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী, ভুলবশত বা নিরর্থক শপথ বাতিলের জন্য দশজন গরীবকে মাঝারি ধরনের খাবার দিয়ে, বা কাপড় দিয়ে সহায়তা কিংবা একজন দাসকে অবমুক্ত করা অথবা তিনদিন রোজা থাকার কথা কোরানে বলা হয়েছে। মোকাত্তেল বিন সুলেমানের[৭৭] একটি হাদিস ভাষ্যে রয়েছে, নবি মারিয়াকে স্পর্শ না করার যে শপথ করেছিলেন, সুরা মায়িদার নির্দেশ অনুযায়ী একজন দাসকে অবমুক্তকরণের মাধ্যমে সেই শপথ বাতিল করেন; এবং হাসান বিন আলির একটি হাদিস অনুযায়ী সুরা ফাতিহার ২ নম্বর আয়াতের 'যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়াময়' শব্দগুলো থেকে বোঝা যায় আল্লাহ নবিকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

'(স্মরণ করো) নবি তার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিল। তারপর সেই স্ত্রী তা অন্যকে বলে দেয়, আল্লাহ নবিকে তা জানিয়ে দেন। এ-বিষয়ে নবি সেই স্ত্রীকে কিছু বললও না। নবি যখন তাকে বলল, সে জিজ্ঞেস করল, 'কে আপনাকে একথা

জানাল?’ নবি বলল, ‘আমাকে জানিয়েছেন তিনি, যিনি সর্বজ্ঞ, যাঁর সব জানা।’(৬৬:৩)। এই আয়াত নিয়ে আলোকপাত করা দরকার: ‘নবি হাফসাকে অনুরোধ করেছিলেন, এ- ঘটনা যেন অন্য কেউ জানতে না পারে এবং মারিয়াকে আর তিনি স্পর্শ করবেন না বলে শপথ নিয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনাটি বিবি হাফসা বিবি আয়েশাকে বলে ফেলেন। নবি যখন হাফসার সাথে কথা বলেন এবং এও জানান, হাফসার বক্তব্য ফাঁসের কথা ইতিমধ্যে আল্লাহ তাকে জানিয়েছেন। যদিও নবি কতটুকু জানেন তা পরিষ্কার করেননি। হাফসা ভেবে নিলেন, আয়েশা হয়তো নবিকে এ-বিষয়ে অবহিত করেছেন। তিনি যখন জিজ্ঞেস করলেন নবি কিভাবে জানেন, নবি প্রত্যুত্তরে বললেন যে, আল্লাহ তাকে এ সম্পর্কে অবহিত করেছেন।’ কোরানের প্রতিটি পাঠকই এ-বিষয়ে একমত হবেন যে, মানব-জাতির জন্য সর্বকালের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে এ-ধরনের ব্যক্তিগত বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্তি অবশ্যই আমাদেরকে আশ্চর্যজনক ধাঁধার মধ্যে ফেলে দেয়। কোরানের তফসিরকারকদের দেয়া ব্যাখ্যাগুলোও বিস্ময়কর। যেমন ক্যামব্রিজ তফসির-এ বর্ণিত একটি বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে: ‘হাফসা যখন আয়েশাকে নবির এই ঘটনা জানালেন এবং আল্লাহ যখন নবিকে হাফসা কর্তৃক এই তথ্য ফাঁসের খবর সম্পর্কে অবহিত করলেন, নবি এর প্রমাণ দেয়ার জন্য হাফসা আয়েশাকে যা বলেছেন তার কিয়দংশ হাফসাকে অবহিত করলেন।’

এ-ধরনের ব্যক্তিগত সাংসারিক বিষয়াবলী, মেয়েলি-কথাবার্তা যা পৃথিবীর যেকোনো সময় যেকোনো প্রান্তে ঘটে থাকতে পারে, তা কিভাবে কোরানের আলোচ্য-সূচিতে জায়গা পেতে পারে? এর মাধ্যমে আল্লাহকে, সমগ্র বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তাকে ছোট করা হয়নি? আল্লাহকে হাফসার সাথে আয়েশার কথাবার্তার একজন তথ্য-ফাঁসকারী পর্যায়ে নামিয়ে আনেননি? যেকোনো পরিস্থিতিতে, সুরা তাহরিম-এর প্রথম তিনটি আয়াত স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য-কলহের একটি সাধারণ পরিস্থিতি মাত্র।

পরবর্তী দুটি আয়াতের (৪-৫ নম্বর আয়াত) মাধ্যমে হাফসা এবং আয়েশাকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। তারা দুজন যদি প্রতিবাদ করতে থাকেন এবং স্ত্রী- স্বরূপ ঈর্ষা প্রকাশ করতে থাকেন তবে তারা নবির বিরাগভাজন হবেন। এজন্য শেষ হাতিয়ার স্বরূপ নবি তাদেরকে তালাক দিতে পারবেন। ‘তোমাদের হৃদয় যা কামনা করেছিল তার জন্য তোমরা দুজন অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে যাও। তোমরা যদি তার (নবির) বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে (জেনে রাখো) আল্লাহ তার অভিভাবক; জিবরাইল ও সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসীরা, আর তার ওপর ফেরেশতারাও, তাকে সাহায্য করবে।’(৬৬:৪)। ‘নবি যদি তোমাদের সকলকে তালাক দেয়, তবে তার প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে হয়তো তোমাদের চেয়ে আরও ভালো স্ত্রী তাকে দেবেন; যারা মুসলমান, বিশ্বাসী, তওবা করে, এবাদত করে, রোজা রাখে, অকুমারী ও কুমারী।’(৬৬:৫)। যদিও এই আয়াতগুলোর অর্থ এবং অবতারণার পরিস্থিতি উভয়েই পরিষ্কার, তথাপি কোনো কোনো তফসিরকারক এই আয়াতগুলোকে এমন উদ্ভট উপায়ে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, তা অবিশ্বাস্য! পাঠক হিসেবে তা আমাদের মধ্যে শুধু মৃদু হাস্যরসের সৃষ্টি করে। ‘ক্যামব্রিজ তফসির’ অনুযায়ী এই আয়াতে ব্যবহৃত ‘ইহায়ইবল’ (বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্তরা) বলতে মিশরের ফারাও রাজার স্ত্রী আসিয়াকে বোঝানো হয়েছে। কুমারী (আবকার) শব্দ দ্বারা যিশু খ্রিস্টের মাতা মেরিকে বোঝানো হয়েছে। তাদের দুজনই নবি মুহাম্মদকে বিয়ে করার জন্য স্বর্গে অপেক্ষা করে আছেন।

সুরা তাহরিম-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সম্পূর্ণ আরেকটি ভিন্ন প্রেক্ষাপট জানা যায়। এই ভাষ্য-অনুযায়ী, নবি জয়নাবের বাড়িতে কিছু মধু পান করেছিলেন এবং এতে ঈর্ষান্বিত হয়ে আয়েশা এবং হাফসা নবিকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনার মুখ দিয়ে বাজে গন্ধ আসছে যে।’ প্রশ্নের আকস্মিকতায় বিব্রত নবি তখন প্রতিজ্ঞা করলেন, তিনি আর কখনো মধু খাবেন না। পরবর্তীতে (সম্ভবত নিজের প্রতিজ্ঞায় অনুশোচনাবোধ থেকে) এই প্রতিজ্ঞাকে অস্বীকার করে সুরা তাহরিম-এর ১নম্বর আয়াত অবতীর্ণ হয়। তখন থেকে ক্ষতিপূরণ প্রদানপূর্বক প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের নিয়ম চালু হয় এবং নবির স্ত্রীদের সতর্ক করা হয় এই বলে

যে, তাদেরকে নবি তালাক দিতে বাধ্য হবেন যদি না তারা নিজের মধ্যকার ঈর্ষা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা বন্ধ করেন। এই ভাষ্যটি স্বীকৃত হাদিস হবার সম্ভাবনা কম, কেননা তা হাফসার জানা তথ্যকে এবং নবির গোপন খবর ফাঁস হবার ঘটনা বেমালুম চেপে গিয়েছে।

পাদটীকা

৪৪. কোরানের ১০৫ তম সুরা ফিল-এ এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবিসিনীয়রা এই যুদ্ধে একটি বিশাল রাজকীয় হাতি ব্যবহার করেন। সুরা ফিল-এর ৩-৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল পাখি কঙ্কর ফেলে আবিসিনীয় বাহিনীকে কুপোকাত করে ফেলে। ইতিহাসবিদ ইকরিমা এবং কোরানের বিশিষ্ট তফসিরকারক আল-তাবারি'র মতে, কোরানের এই আয়াতগুলো রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আসলে যুদ্ধের ময়দানে আবিসিনীয়রা গুটিবসন্তে আক্রান্ত হয়েছিল।

৪৫. ধারণা করা হয়, কোরানের ৩৪ তম সুরা সাবা'র ১৫-১৬ নম্বর আয়াতদ্বয় এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে। প্রত্নতাত্ত্বিক ও শিলালিপির নিদর্শন থেকে জানা গেছে, এই ঘটনা ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে ঘটেছিল।

৪৬. মক্কা থেকে প্রায় ৫০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত তুলনামূলক বড় শহর। এখানে স্বল্পপরিসরে কৃষিকাজের মাধ্যমে খাদ্যশস্যের চাষ হতো। বাণিজ্যিক কাফেলা ও মরুযাত্রীর ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এই শহর গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পৌত্তলিকদের দেবী আল-লাতের একটি উপাসনালয়ও এখানে ছিল।

৪৭. কোরানে একবার (৩৩:১৩) এই শহরের নাম 'ইয়াসরিব' উল্লেখ করা হয়েছে এবং চারবার আল-মদিনা (৯:১০১, ৯:১২০, ৩৩:৬০, ৬৩:৮) উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৮. *'Le dogme et la loi de 1'1slam'*অনুবাদ :*Felix Arin*, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্যারিস ১৯৫৮, পৃ. ৩।

৪৯. 'উম্মিয়িন'শব্দটিকে অনেকক্ষেত্রে 'নিরক্ষর'হিসেবে ধরা হয়। তবে ক্ষেত্রবিশেষে এবং কোরানের অনেক জায়গায় 'যাদেরকে ধর্মগ্রন্থ দেয়া হয়নি'বলতে বোঝানো হয়েছে।

৫০. সুরা বাকারা'র ১৯১ নম্বর আয়াতে 'ফিৎনা' শব্দটি 'যন্ত্রণা প্রদান' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'নৈরাজ্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়নি।

৫১. ইরানের খোরাসানের তুশ শহরের আবু হামিদ মুহাম্মদ আল-গাজ্জালি (১০৫৮-১১১১ খ্রিস্টাব্দ) একজন অসামান্য মরমী সাধক ও ধর্মবিশারদ ছিলেন। তার সবচেয়ে বহুল পঠিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে : 'ইহিয়া উলুম ঈদ-দ্বিন' (নীতিনৈতিকতা বিষয়ক গ্রন্থ),

‘কিমিয়ায়ে সাদাত’, ‘তামফাতুল আল-ফালাসিফা’(অধিবিদ্যাবিষয়ক দর্শন) এবং ‘আল-মনকেদ মেন আদ-দালাল’ (আত্ম-জৈবনিক)। ইমাম গাজ্জালি যদিও একজন বিশিষ্ট সুন্নি বিশেষজ্ঞ, তবে তার লিখিত রচনাবলী শিয়া মতাবলম্বীদের অনেকেই সম্মানের চোখে দেখে থাকেন।

৫২. দ্রষ্টব্য : পাদটীকা ২০।

৫৩. দ্রষ্টব্য : পাদটীকা ৬।

৫৪. খুব সম্ভবত নবির রেওয়াজ অনুসরণ করে আব্বাসীয় শাসক এবং পরবর্তী মুসলমান শাসকরা সম্মানসূচক উপহার হিসেবে ‘আলখাল্লা’ পরিধান করতেন। যদিও প্রাচ্যে এই পোশাকটি ইসলামের প্রচারের অনেক আগে থেকে পরিধান করা হতো। মিশরীয় কবি শরাফ উদ্দিন আল-বুশিরি’র (১২১২-১২৯৬ খ্রিস্টাব্দ) লিখিত ‘আলখাল্লা গাথা’ নামে জনপ্রিয় একটি ধর্মীয় কবিতা রয়েছে। কবিতাটা তিনি লিখেছেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার পর। একদিন কবি স্বপ্নে দেখেন নবি তার দিকে একটি আলখাল্লা ছুঁড়ে দিচ্ছেন, সেখান থেকে তিনি কবিতা লেখার প্রেরণা লাভ করেন।

৫৫. আলি দস্তি বাক্যটি ব্যবহার করেছেন এভাবে ‘খাবার রান্নার জন্য বসে আছো এমন ভাব প্রদর্শন করিও না।’

৫৬. আরবি ‘হিজাব’শব্দটির মূল অর্থ ‘ঢেকে রাখা’। ‘বোরখা’ শব্দের অর্থে ‘পর্দা’ শব্দের ব্যবহার অনেক পরে শুরু হয়েছে।

৫৭. ইসলামি পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী, ‘আদ’ হচ্ছে একটি প্রাচীন জাতির নাম আর ইরাম হচ্ছে তাদের শহর। অবশ্য ভিন্নমতে ওই গোষ্ঠীর প্রধানের নাম হচ্ছে ইরাম। আল্লাহ প্রেরিত নবি হুদকে অপমান করায় ওই জনগোষ্ঠীকে বন্যা ও অনাবৃষ্টির কবলে পড়তে হয়। ফলে তারা ধ্বংস হয়ে যায়।

৫৮. আরেকটি প্রাচীন জনগোষ্ঠীর নাম হচ্ছে সামুদ। রোমান লেখনীতেও এদের নাম উল্লেখ আছে। তারা পেত্রা নগরীর নাবাতিয়ানদের সমগোত্রীয় ছিল এবং সেমেটিক রচনা ও লিপিতে এখনো তাদের কিছু লেখা অবশিষ্ট খোঁজ পাওয়া যায়। রোমানরা পেত্রা নগরী দখল করার পর তাদের শহর আল-হেইর (হেজাজের উত্তরে অবস্থিত) ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রে ছিল অনেক দিন ধরে। আল হেরা থেকে উদ্ধার করা পাথরের লিপিতে (পেত্রা থেকে কিছুটা ছোট) সামুদের লেখা রয়েছে। ইসলামি বর্ণনা অনুযায়ী, নবি সালেহকে অস্বীকার করায় সামুদবাসীরা বজ্রাঘাত ও ভূমিকম্পের ফলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

৫৯. সাধারণভাবে আরবি ‘ওয়াতাদ’ শব্দের অর্থ কাঠের টুকরোর স্ক্রু অথবা তাবু গাঁথার পেরেক বোঝায়। ‘শিবির বা তাবুর অধিপতি’ কথাটির কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত কোনো তফসিরকারক বা ইসলামি চিন্তাবিদ দিতে পারেননি।

৬০. আলফ্রেড গিয়োম অনূদিত ইবনে ইসহাকের ‘লাইফ অব মুহাম্মদ’, অক্সফোর্ড ১৯৫৫, পৃ. ৬৫১। আলি দস্তি এবং আলফ্রেড গিয়োম উভয়েই আরবি ‘আওয়ান’ শব্দটিকে ‘বন্দী’ বা ‘অবরুদ্ধ’ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আক্ষরিক অর্থে এটি হচ্ছে ‘মধ্যবর্তী’। এক্ষেত্রে সম্ভবত ‘স্বাধীন ও পরাধীনের মধ্যবর্তী’ কিছু বোঝানো হয়েছে। সুরা বাকারা-এর ৬৮ নম্বর আয়াতে ‘বয়স্ক ও কমবয়সীর মধ্যবর্তী’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ভিন্নমতে এটি হচ্ছে আরবি ‘আনিয়া’ শব্দের বহুবচন, যার অর্থ হচ্ছে ‘অক্ষমতায় যন্ত্রণাক্লিষ্ট’।

৬১. মাহমুদ বিন ওমর আল-জামাখশারি (১০৭৫-১১৪৪ খ্রিস্টাব্দ) কোরানের তফসিরসহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বই রচনা করেছেন। তার ‘আল-কাশশাফ’ নামের কোরানের তফসিরসহ আরবি ব্যাকরণ ও আরবি-ফার্সি অভিধানও তিনি রচনা করেছেন। তিনি

ইসলামের যুক্তিবাদী 'মুতাজিলা' দর্শনের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। একই সাথে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কোরানের লৌকিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন।

৬২. আব্দুল্লাহ বিন ওমর আল-বায়দাওয়ি আরবিতে কোরানের তফসির রচনা করেছেন। এখনো সুন্নি মুসলমানরা এই তফসির গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহার করেন। 'আনোয়ার উল-তানজি' শিরোনামের এই তফসির গ্রন্থটি আল-জামাখশারির 'আল-কাশশাফ' - কে ভিত্তি করে রচিত তবে মুতাজিলা দর্শনের প্রভাবমুক্ত।

৬৩. বাগদাদে জন্মগ্রহণকারী ইমাম আহমদ বিন হানবল (৭৮০-৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ) হাদিসের সংকলন 'আল-মোসনাদ'- এর রচয়িতা। সংকলনটি শেষ পর্যন্ত হানবলের পুত্র আব্দুল্লাহ সমাপ্ত করেন। ইসলামি ধর্মতত্ত্বের আক্ষরিক ও নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অনুসরণের তিনি পথিকৃৎ। তিনি হানবলি দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। আব্বাসীয় শাসনামলে মুতাজিলা মতাদর্শের বিপক্ষে দাঁড়ানোর কারণে নির্যাতনের শিকার হন এবং কারাবাসও করতে হয়। দামেস্ক শহরের নাগরিক আহমদ বিন তায়মিয়া (১২২২-১৩২৮ খ্রিস্টাব্দ) পরবর্তীতে হানবলি মতাদর্শকে প্রসারিত করেন এবং বই রচনা করেন। যা কট্টরপন্থী ওয়াহাবি মতাদর্শ বিকাশে ভূমিকা রেখেছিল।

৬৪. ইরাকের বসরা শহরে জন্মগ্রহণকারী মুহাম্মদ বিন সাদ (৭৮৪-৮৪৫ খ্রিস্টাব্দ) 'কিতাব আল-তাবাকাত' গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থে নবি ও সাহাবিদের জীবনী এবং ৪২৫০ টি হাদিসের উল্লেখ রয়েছে।

৬৫. আরবি ভাষায় 'মুতা' পরিভাষাটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে 'উপভোগ করা'। সুরা নিসার ২৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত 'যাদেরকে তোমরা উপভোগ করবে'শব্দসমষ্টিও একই উৎসের অর্থ প্রকাশ করে।

৬৬. আরবি 'ইদ্দা'শব্দের অর্থ 'অপেক্ষার প্রহর'। এটা সেই সময়কালকে বোঝায় যখন কোনো বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত নারীর দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি থাকে না। কারণ এই সময়কালে তার আগের স্বামী কর্তৃক অন্তঃসত্ত্বা হবার সম্ভাবনা থাকে। ইসলামি শাস্ত্র অনুযায়ী, কোনো বিধবার জন্য ইদ্দতকাল হচ্ছে ৪ মাস ১০ দিন, কোনো তালাকপ্রাপ্ত নারীর জন্য ৩ মাস, বিধবা দাসীর জন্য ২ মাস, তালাকপ্রাপ্ত দাসীর জন্য ১.৫ মাস।

৬৭. আব্বাসীয় খলিফার শাসনামলে মুহাম্মদ আত-তিরমিজি'র (মৃত্যু ২৭৯ হিজরি বা ৮৯২ খ্রিস্টাব্দ) জন্ম পারস্যে। সুন্নি ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যতম ছয়টি হাদিস সংকলনের অন্যতম 'জামি আত-তিরমিজি'সংকলনটি করেছেন তিনি। সুন্নি মুসলমানদের কাছে এই হাদিসের স্থান শীর্ষে।

৬৮. হানিফ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে প্রথম অধ্যায়ে।

৬৯. নবি মুহাম্মদের কন্যা জয়নাবের প্রথম বিয়ে হয়েছিল খাদিজার বোনের ছেলে আবুল-আসের সাথে। রোকেয়া ও উম্মে কুলসুমের বিয়ে হয়েছিল মুহাম্মদের চাচা আবু লাহাবের দুই পুত্র ওতবা ও ওতাইবার সাথে। আর ফাতেমার বিয়ে হয়েছিল মুহাম্মদের চাচাতো ভাই আলি বিন আবু তালিবের সাথে। ইসলাম প্রচার শুরু করলে নবি মুহাম্মদের সাথে চাচা আবু লাহাবের দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং লাহাব পুত্রদেরকে মুহাম্মদের কন্যাদ্বয়কে তালাক দিতে বাধ্য করেন। পরে রোকেয়ার সাথে বিয়ে হয় হজরত উসমানের। রোকেয়ার মৃত্যুর পর উসমান বিয়ে করেন মুহাম্মদের আরেক কন্যা উম্মে কুলসুমকে।

৭০. 'এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম'- এ লেখক এইচ. রেকেনডর্ফ মেয়েটির নাম বলেছেন 'কায়লা'। (দ্রষ্টব্য : Encyclopedia *of Islam, 2nd ed., Leiden 1960, vol. I, p. 697, article al-Ash'ath*)।আবার ডব্লিউ. এম. ওয়াট মেয়েটির নাম বলেছেন

‘কোতায়লা’(*Muhammad at Madina, Oxford 1956, p. 397*)। উভয় লেখকই উল্লেখ করেছেন, নবি মুহাম্মদের সাথে তার বাগদান সম্পন্ন হয়েছিল কিন্তু মেয়েটি মদিনা পৌঁছানোর আগেই নবির মৃত্যু ঘটে।

৭১. ইরানের বাদশাহ খশরু-২ পারভেজের সেনারা ৬১৬ খ্রিস্টাব্দে মিশর আক্রমণ করে। ৬২৮ সাল পর্যন্ত মিশরের বিশাল অংশ ইরানের দখলে ছিল। ঐতিহাসিক আল-তাবারি ‘হিস্ট্রি অব দ্যা প্রফেটস্ এন্ড কিংস্’(তারিক আল-রসুল ওয়া আল-মুলুক) বইয়ে বলেছেন, ষষ্ঠ হিজরিতে (৬২৭-৬২৮ খ্রিস্টাব্দ) বিশিষ্ট কবি এবং সাহাবি হাসান ইবনে সাবিত মিশর ভ্রমণকালে মিশরের রোমান গভর্নর (আল-মুকাওকিস নামে সম্বোধন করা হয়) নবির জন্য খ্রিস্টান ক্রীতদাসী মারিয়া কিবতিয়া এবং সাবিতকে মারিয়ার বোন শিরিনকে উপহার হিসেবে প্রদান করেন। সম্ভবত ৬২৮ সালের পূর্বে মারিয়া মদিনায় এসে পৌঁছান।

৭২. নবির চাচাতো ভাই ও আব্বাসীয় খেলাফতের পূর্বপুরুষ আব্দুল্লাহ বিন আল-আব্বাস (ইবনে আব্বাস নামেও পরিচিত) প্রচুর সংখ্যক হাদিস-বক্তা হিসেবে সুপরিচিত। ৬৮৭ খ্রিস্টাব্দে (৬৮ হিজরি) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৭৩. দ্বিতীয় খলিফা ওমর ইবনে আল-খাত্তাবের পুত্র আব্দুল্লাহ বিন ওমর (৬১৪-৬৯৩ খ্রিস্টাব্দ)। মুসলমানদের পক্ষে তিনি অসংখ্য যুদ্ধে লড়াই করেছেন। কিন্তু উচ্চপদে দায়িত্ব পালন করতে তিনি সবসময় অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। একজন সৎ, ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এবং অভ্রান্ত হাদিস-বক্তা হিসেবে তিনি সুপরিচিত।

৭৪.দ্রষ্টব্য : পাদটীকা ৪৩।

৭৫. দ্রষ্টব্য : পাদটীকা ১।

৭৬. প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে জন্মানো ওসামা নামে এক পুত্রসন্তান ছিল জায়েদের। ৬২৬ সালে জয়নাবকে তালাক দেবার পর তিনি আরও বিয়ে করেন এবং অনেক সন্তানের পিতা হন। মুসলমানদের পক্ষে তিনি অনেক যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। নবি তাঁকে প্রথম সিরিয়া-অভিযানের সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। ওই যুদ্ধে (মুতা যুদ্ধ নামে পরিচিত) তিনি মৃত্যুবরণ করেন। জায়েদের তরুণ পুত্র ওসামা ৬৩২ সালের সিরিয়া অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সেনাপতির দায়িত্বে ওসামার নিয়োগ নিয়ে অনেক শীর্ষ সাহাবি অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।

৭৭. আল-জামাখশারি তার বিখ্যাত কোরানের তফসির ‘আল-কাশশাফ’- এ (পাদটীকা ৬১ দ্রষ্টব্য) হাদিসটি মোকাত্তেল বিন সুলেমানের বলে উল্লেখ করেছেন। আলি দস্তিও আল-জামাখশারি’র এই হাদিসটি গ্রহণ করেছেন।(তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. পল প্র্যাকম্যান)।

চতুর্থ অধ্যায়

অধিবিদ্যা

কোরানে আল্লাহ

নয়টি উজ্জ্বল গম্বুজের(গ্রহ) পাশে আমাদের পৃথিবীটা আসলে মহাসাগরে ভাসমান একটা ক্ষুদ্র পোস্তদানার মত। কিন্তু নিজেকে যখন আমরাসেই পোস্তদানার সাথে তুলনা করি তখননিজেদেরই আবার হাস্যকর রকম ক্ষুদ্র বলেই প্রতীয়মান হয়।- শাবেস্তারি[৭৮]

আমাদের পৃথিবী যাকে চতুর্দশ শতাব্দীর পারস্যের খ্যাতিমান সুফি কবি মাহমুদ শাবেস্তারি সামান্য একটা পোস্তদানার সাথে তুলনা করেছেন, আসলে এর ওজন ছয় হাজার বিলিয়ন টন, পরিধি ৪০, ০৭৬ কিলোমিটার এবং ভূপৃষ্ঠের মোট ক্ষেত্রফল ৫১০, ১০০, ০০০ বর্গকিলোমিটার। কিন্তু অন্যান্য গ্রহের তুলনায় পৃথিবী ক্ষুদ্র একটা গ্রহ মাত্র। সূর্যের চারদিকে একবার প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর ৩৬৫ দিনের সামান্য কিছু বেশি সময় লাগে। সৌরজগতের অন্য ৮টি গ্রহও নির্ধারিত কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করছে। সবচেয়ে দূরবর্তী গ্রহ প্লুটো যা তুলনামূলকভাবে অল্প ভরবিশিষ্ট (প্রায় বুধের সমান) এবং এর কক্ষপথ সূর্য থেকে প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন থেকে ৭.৫ বিলিয়ন কিলোমিটার পর্যন্ত দূরবর্তী। [উল্লেখ্য ১৯৩০ সালের দিকে প্লুটোর আনুষ্ঠানিক নামকরণ হলেও, ২০০৬ সালের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়নের ২৬তম সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্লুটো আর আমাদের সৌরজগতের গ্রহ নয়, এটি ‘বামন গ্রহ’ বলে পরিচিত হবে।-অনুবাদক]। প্লুটো থেকে সূর্যের বিশাল দূরত্বকে আমাদের কল্পনার মধ্যে নিয়ে আসার সুবিধার্থে এভাবে ভাবতে পারি, একটি জেট বিমান যদি ঘণ্টায় ১০০০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে তবে সূর্য থেকে প্লুটোর দূরত্ব অতিক্রম করতে বিমানটির ৭০০ বছর সময় লাগবে। আবার সূর্যের মহাকর্ষ বলের কার্যকর প্রভাব শুধু প্লুটো পর্যন্ত নয়, বরং তা সূর্য থেকে প্লুটোর দূরত্বের শতগুণ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই দূরত্ব অতিক্রম করতে জেট বিমানের পূর্বোক্ত গতিতে সত্তর হাজার বছর লাগবে।

আবার সূর্য আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশাল নক্ষত্র হওয়া সত্ত্বেও এটি আকাশ গঙ্গা ছায়াপথের মধ্যম আকৃতির একটি তারকা মাত্র। আকাশ গঙ্গা ছায়াপথকে ফার্সি ভাষায় ‘কাহকাসান’ (হলুদাভ ফিতা) বলা হয়, কারণ গ্রীষ্মের রাতে মেঘমুক্ত আকাশের দিকে তাকালে একে কিছুটা হলুদাভ ডোরাকাটা দাগের মত দেখায়। আকাশ গঙ্গা ছায়াপথে এখন পর্যন্ত সাত হাজার তারকা চিহ্নিত করা হয়েছে যাদের প্রায় সবারই সূর্যের মত আলাদা গ্রহমণ্ডলী রয়েছে।

মহাসাগরে ভাসমান আমাদের এই পৃথিবী নামক পোস্তদানাটির পৃষ্ঠতল মোট ৫১০, ১০০, ০০০ বর্গকিলোমিটার এবং এর আয়তন ১, ০৮২, ৮৪২, ২১০, ০০০ ঘনকিলোমিটার যা সূর্যের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। পৃথিবী থেকে সূর্য কত বড় সেটা আমরা এইভাবে তুলনা করলে বুঝতে পারি, সূর্যকে যদি আমরা একটি ফাঁপা গোলক হিসাবে বিবেচনা করলে তবে এক মিলিয়ন সংখ্যক পৃথিবী

গোলকের মধ্যে স্থান করে নিতে পারবে। কেবল সূর্যই আমাদের সৌরজগতের শতকরা ৯৯.৮৬ ভাগ পদার্থ নিয়ে গঠিত আর বাকি ৯টি গ্রহ ০.১৪ ভাগ নিয়ে গঠিত যার মধ্যে পৃথিবী ও তার চাঁদ শতকরা ০.০০১৪ ভাগ পদার্থ নিয়ে গঠিত।

মহাকাশে সূর্যের চেয়ে প্রায় ৫০০ গুণ বড় নক্ষত্রও রয়েছে যেখানে সূর্যের ব্যাস ১, ৩৯২, ০০০ কিলোমিটার ও এবং এর আনুমানিক ভর হচ্ছে ১, ২০০, ০০০, ০০০ বিলিয়ন টন। ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে মহাকাশের আকাশ-গঙ্গা ছায়াপথের একটি নক্ষত্র হচ্ছে সূর্য। হিসাব করে দেখা গেছে মহাকাশের প্রতিটি ছায়াপথে কমপক্ষে একশ বিলিয়ন করে নক্ষত্র রয়েছে। উন্নত টেলিস্কোপ ও গাণিতিক বিশ্লষণের সাহায্যে পাওয়া তথ্য অনুসারে মহাকাশে আমাদের আকাশ গঙ্গা ছায়াপথসহ প্রায় ১০০ মিলিয়ন ছায়াপথ ছড়িয়ে আছে।

সাধারণত আমাদের চারপাশের দূরত্ব মাপতে যে ধরনের হিসাব ব্যবহার করি, সেভাবে নক্ষত্রদের মধ্যকার দূরত্ব মাপা অনেকের কাছেই অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এবং এর মাধ্যমে সহজে বোধগম্যও হয় না। এ-জন্য মহাকাশে নক্ষত্রদের দূরত্ব মাপতে আলোকবর্ষের হিসাব ব্যবহার করা হয়। সূর্যের আলো প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩০০, ০০০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে এবং এক বছরে (এক আলোকবর্ষ) আলো প্রায় ৯,৪৬০ বিলিয়ন কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। মহাকাশের অনেক নক্ষত্রই আমাদের থেকে এত দূরে অবস্থিত যে এগুলো থেকে আলো এসে পৌঁছতে প্রায় শত থেকে হাজার খানেক বছর লেগে যায়।

মহাকাশ সম্পর্কে উপরের এই হিসাব-নিকাশ আমাদেরকে একদম হতবুদ্ধি করে দেয় এবং এর বিশালতা সম্পর্কে এমন একটা অস্পষ্ট ধারণা দেয়। কিন্তু একইসাথে পরিষ্কারভাবে এটাই দেখায় যে, পৃথিবী আসলে বিশাল একটা মহাসাগরে ভাসমান অতি ক্ষুদ্র পোস্তদানা মাত্র। যেকোনো চিন্তাশীল ব্যক্তি যদি মহাবিশ্বের এ বিশালতা উপলব্ধি করতে চায় তবে সে নিজেকে অসহায় মনে করতে বাধ্য। আপাত প্রতীয়মান অসীম মহাবিশ্বের যদি কোনো সীমা থেকেও থাকে তবে সেটা মানুষের এখনও অবোধগম্য। যদি এই অসীম মহাবিশ্বের একটা সীমা থাকেও এবং এর একটা শুরুর কাল থাকে তবে তাও আমাদের কাছে অবোধগম্য বলে মনে হয়। বিশাল এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা হিসেবে আমরা যদি এখানে আল্লাহ্ বা ঈশ্বরকে নিয়ে আসি তবে আমাদেরকে আগেই ধরে নিতে হবে তিনি মহাবিশ্ব থেকে অনেক বড় এবং এর উর্ধ্বে। বিশাল এই মহাকাশের বিস্ময় উদ্রেককর ব্যবস্থার একজন নিয়ন্ত্রক রয়েছেন বলে যদি ধরে নিতে হয় তবে পূর্বেই আমরা ভেবে নেব তিনি অসীম ক্ষমতাধর হবেন। তাই এ ধরনের স্রষ্টা বা নিয়ন্ত্রক আমাদের সীমাবদ্ধ বোধশক্তিরও অতীত হবেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পারস্যের জনপ্রিয় সুফি সাধক জালালউদ্দিন রুমি যেমনটি বলেছেন : ‘তিনি তাই যা আমাদের জন্য অকল্পনীয়।’ সাধারণভাবে মানুষ খুব গভীরভাবে চিন্তা করতে পারে না। ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে নিরীক্ষা করলে দেখা যায় মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে তার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার আলোকে একটি বৃহৎ কিছু বলে ধরে নেয়, তাঁর মধ্যে মানুষের মতই আবেগ, দুর্বলতা, আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাভিলাষ রয়েছে।

হাদিসে একটি আরবি লোককথা রয়েছে এবং এটা বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (ওল্ড টেস্টামেন্ট) থেকেই এসেছে, তা হল : ‘ঈশ্বর মানুষকে তাঁর নিজের মত করে সৃষ্টি করেছেন।’তবে সত্য হচ্ছে এর বিপরীত। স্বয়ং মানুষই ঈশ্বরকে নিজের মত করে সৃষ্টি (বা কল্পনা) করে নিয়েছে। কিছুদিন আগে ‘এবং মুসা ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছেন’ নামে একটি বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসাত্মক বই লেখা হয়েছে যা হঠাৎ করেই আমার নজরে আসে। ওল্ড টেস্টামেন্টের ‘এবং ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন’বাক্যটিকে ব্যবহার করে এ বইতে যুক্তির সাহায্যে দেখানো হয়েছে যে উল্টোটাই সঠিক, ঈশ্বর বরং মুসার কল্পনার ফসল। ওল্ড টেস্টামেন্টে আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাই অত্যন্ত উদ্ধত, রাগী, নির্মম ও প্রশংসা পাওয়ার জন্য উন্মুখ। অগণিত সৃষ্টির মধ্যে তিনি আব্রাহামকে পছন্দ করেছিলেন কারণ তিনি ছিলেন অত্যন্ত বাধ্যগত এবং আব্রাহামের বংশধরদেরকেও ঈশ্বর নির্বাচন করলেন পৃথিবীর অধিপতি হিসাবে।

নুহের পরে আব্রাহামকে সবচেয়ে বেশি বাধ্য এবং বিনীত বান্দা হিসাবে পাওয়ায় ঈশ্বর তাকেই পছন্দ করলেন এবং একই কারণে আব্রাহামের স্ত্রী সারাহকে অন্তঃসত্ত্বা হতে সমর্থ করলেন যাতে বৃদ্ধ বয়সে তিনি ইসহাকের জন্ম দিতে পারেন। ঈশ্বরের পছন্দের লোকদের জনক হওয়ার জন্য ও কেনানে ইসহাকের সাথে বিবাহযোগ্য কোনো রমণী না থাকায় ঈশ্বরের নির্দেশে আব্রাহাম ক্যালডিয়ায় দূত পাঠালেন যিনি ইসহাকের সাথে আব্রাহামের ভ্রাতুষ্পুত্রী রেবেকাকে বিবাহের জন্য বাগদানের অনুরোধ করেছিলেন ও রেবেকাকে ফিলিস্তিনে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরে ঈশ্বর ইসরাইলের সন্তানদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি পেলেন যে তারা অন্য কারো উপাসনা করবে না এবং এর পরিবর্তে তারা পৃথিবীর শাসনকর্তা হবে। বিশাল এই মহাবিশ্বের প্রতিপালকের সম্পূর্ণ মনোযোগ শুধু সৌরজগতের বা পৃথিবীর প্রতি নিবদ্ধ হয়নি বরং তা কেবল সীমাবদ্ধ ছিল পৃথিবীপৃষ্ঠের অতিক্ষুদ্র একটি অংশের প্রতি, যার নাম ছিল ফিলিস্তিন। [মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে যে-সকল নবি-রসুল ও জনপদের ঘটনাবলীর বর্ণনা পাই তার প্রায় সবটাই কেবল স্থানীয়, বিশ্বের অন্যান্য অংশের কোনো উল্লেখ নেই, বিষয়টি নিঃসন্দেহে কৌতূহল উদ্রেককর- অনুবাদক]।

একদা ঈশ্বর সদম ও গমোরাহ শহরের অধিবাসীদের অসদাচারণ ও পাপাচার দেখে এত ক্রুদ্ধ হোন যে তিনি শহরদ্বয় ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেন। এমনকি ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র আব্রাহামের সুপারিশও কাজে আসেনি। ঈশ্বরের নির্দেশে বজ্রপাতে সকল লোক মারা গেল। নারী, পুরুষ, মহিলা, শিশু, দোষী, নির্দোষ কেউই বাদ গেল না। ব্যতিক্রম কেবল ঘটলো আব্রাহামের ভ্রাতুষ্পুত্র লুতের ক্ষেত্রে, যাকে ঈশ্বরের আদেশে ফেরেশতাগণ এই গণহত্যা থেকে নিরাপদ রেখেছিলেন। সম্পূর্ণ ওল্ড টেস্টামেন্ট জুড়ে ঈশ্বরকে অস্থিরমতি, নির্দয় হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। বাইবেল থেকে দেখা যায় মুসারও একই রকম স্বৈরতান্ত্রিক মনোবৃত্তি ছিল। ডেভিড ও সলোমনও তাঁদের রাজত্বকালে ইসরাইলিদের শাসনের ক্ষেত্রে একই ধরনের ভাবাদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। উরিয়ার স্ত্রী'র (বাথ-সেবা, বাইবেলে বর্ণিত উরিয়ার স্ত্রী। ডেভিড তাঁকে প্ররোচিত করে তাঁর স্বামীকে হত্যা করেন এবং তাঁকে বিয়ে করেন) কাহিনী থেকে দেখা যায়, অন্য মানুষের অধিকারের ব্যাপারে ডেভিডের সম্মানবোধ খুব সামান্যই ছিল।

কোরানে আল্লাহর সর্বোৎকৃষ্ট ও সদ্বগুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা, সব অভাব থেকে মুক্ত এবং করুণাময়। শুধু এগুলো নয়, তিনি কর্তৃত্বব্যঞ্জক, ক্রুদ্ধ এবং ছলনাকারী। যেমন সুরা আনফালের ৩০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : 'বস্তুত আল্লাহর ছলনা সবচেয়ে উত্তম।' সুরা আল ইমরানের ৫৪ নম্বর আয়াতেও একই কথা বলা হয়েছে। স্রষ্টার এই গুণাবলী পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যদি সর্বশক্তিমান স্রষ্টা পূর্ণ সত্তা এবং পরমোৎকর্ষ গুণাবলীসম্পন্ন হয়ে থাকেন তবে তিনি কিভাবে 'রাগ করা' বা 'প্রতিশোধ নেয়া'র মত চরিত্র ধারণ করেন? [দেখুন সুরা সাজদাহ : আয়াত ২২; সুরা জুকরুফ : আয়াত ৪১ ও ৫৫ ইত্যাদি- অনুবাদক]। যেখানে স্রষ্টা সর্বশক্তিমান সেখানে তাঁর রাগ করা বা ক্ষুব্ধ হওয়ার প্রয়োজন কী যা সরাসরি দুর্বলতাকে নির্দেশ করে? কেন ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হবেন এমন নগণ্য মানুষের ওপর, যারা তাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার দরুন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও মহাবিশ্বের উপর কর্তৃত্ব হৃদয়ঙ্গমে অক্ষম? কোরানে যখন আল্লাহ নিজেকে পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু বলে অভিহিত করেছেন (১২:৯২), তাঁর কি উচিত মানুষকে এই মর্মে হুমকি প্রদান করা যে, কেউ তাঁর সাথে শরিক করলে তা হবে সম্পূর্ণ ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ (৪:১১৬)। তাঁর কি উচিত মানুষকে অনন্তকাল নরকবাসের শাস্তি দেয়া? কোরানে তো আল্লাহ নিজেই বলেছেন তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি অবিবেচক হবেন না (৫০:২৮) অথচ তিনি পাপীদের নরকের উত্তপ্ত আগুনে পতিত করে শাস্তি দেবেন। তিনি বলেন যখনই অবিশ্বাসীদের চামড়া দোজখের আগুনে পুড়ে যাবে তখনই আবার নতুন চামড়া জন্মাবে যাতে তারা অনন্তকাল কঠোর শাস্তি পেতে থাকে (৪:৫৫)। কারো চির-অতৃপ্ত ক্ষোভই কেবল এরকম শাস্তি দিতে প্রলুব্ধ করতে পারে এবং ক্ষোভ নিঃসন্দেহে দুর্বলতার পরিচায়ক। একজন সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার এরকম দুর্বলতা কি থাকতে পারে? কোরানে বলা হয়েছে, পরম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতায়ালা যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন আর যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন (১৮:১৭), আবার এও বলা হয়েছে যারা বিভ্রান্ত হবে তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে। [দ্রষ্টব্য : সুরা বাকারা : আয়াত ১০ ও ৯০; সুরা মায়িদা : আয়াত ৯৪; সুরা তওবা : আয়াত ৩৯। ইত্যাদি।- অনুবাদক]

কোরানে একদিকে আল্লাহকে সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী বলে অভিহিত করা হয়েছে অপরদিকে ঠিকই আবার বলা হচ্ছে তাঁর মানুষের সাহায্য প্রয়োজন : 'মরিয়মের সন্তান ঈসা যখন তার শিষ্যদের বললেন, কে আল্লাহর রাস্তায় আমাকে সাহায্য করবে? তখন শিষ্যরা বলল, আমরা ঈশ্বরের সাহায্যকারী।' (সুরা সাফফ : আয়াত ১৪)। 'আমি মানুষের জন্য লোহা নাজিল করেছি যাতে মানুষের জন্য মহাশক্তি ও উপকার রয়েছে যাতে অদৃশ্য আল্লাহ জানতে পারেন কে তাঁকে ও তাঁর রসুলকে সাহায্য করেছে।' (সুরা আল হাদিদ : আয়াত ২৫)।

এসব অভিযোগ গুরুতর। দীর্ঘদিন ধরে ইসলামি পণ্ডিত ও কোরানের ব্যাখ্যাকারকরা এসব অসঙ্গতি দূর করার জন্য বিভিন্ন ব্যাখ্যা হাজির করেছেন। এই প্রবন্ধে দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনার পটভূমিকেন্দ্রিক কোরানের কয়েকটি আয়াত নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

হজরত মুহাম্মদের চাচা আবু লাহাব একবার তাঁকে বলেছিলেন : 'ধ্বংস হও মুহাম্মদ, তুমি কি এজন্য আমাদের আমন্ত্রণ করেছ?' এর জবাবে মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা অসীম ক্ষমতাশালী আল্লাহ নগণ্য আবু লাহাবের মাথায় বজ্রপাতের মত নাজিল করলেন সুরা লাহাব (১১১), যা থেকে লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলও রেহাই পাননি :

'ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত! আর সে নিজে।

তার ধনসম্পদ ও উপার্জন তার কোনো কাজে আসবে না।

সে জ্বলবে অগ্নিশিখায়

আর তার জ্বালানিভারাক্রান্ত স্ত্রীও,

যার গলায় থাকবে কড়া আঁশের দড়ি।'

[আবু লাহাবের আসল নাম আব্দুল ওজ্জা, তিনি নবি মুহাম্মদের চাচা আবু তালিবের ছোট ভাই। নবির দুই মেয়ে রোকেয়া এবং উম্মে কুলসুমের সাথে আব্দুল ওজ্জার দুই ছেলে ওতবা ও ওতাইবার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু এই বিয়ে বেশি দিন টিকেনি, উভয়ের মধ্যে তালাক হয়ে যায়। এ-জন্য নবি মুহাম্মদ মনঃক্ষুণ্ন ছিলেন এবং চাচা আব্দুল ওজ্জার পরিবারের সাথে তাঁর শীতল সম্পর্ক বিরাজ করছিল। ৬১৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে একদিন হজরত মুহাম্মদ সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে কুরাইশ গোত্রের উদ্দেশ্যে ডাক দিলেন। সে-সময় এভাবে পাহাড়ের উপরে উঠে ডাক দেয়া হত কোনো বিশেষ বিপদের আশংকা হলে। সবাই কাজকর্ম ফেলে সেখানে ছুটে এলে মুহাম্মদ তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। এতে অনেকেই বিরক্ত হন। আব্দুল ওজ্জাও বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন : 'ধ্বংস হও মুহাম্মদ! ...'তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে মুহাম্মদও বলেছিলেন, 'তুমিও ধ্বংস হও, অনির্বাণ শিখায় জ্বলতে থাকো।'এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নবি ওহি পেলেন 'সুরা লাহাব' আর চাচা আব্দুল ওজ্জা হয়ে গেলেন 'আবু লাহাব' মানে 'অগ্নিশিখার পিতা'।-অনুবাদক] নিজেকে নিয়ে গর্ব করার জন্য আবুল আসাদকে তিরস্কার করা হয় সুরা বালাদে। সুরা হুমাজা'য় (১০৪) ওয়ালিদ বিন আল-মুগিরা এবং উমাইয়া বিন খালাদের প্রতি একই ধরনের হুমকি দেয়া হয়েছে যারা নবি মুহাম্মদকে নিয়ে নিন্দা এবং নিজেদের সম্পদ নিয়ে গর্ব করত। সুরা কাউসারে আলাস বিন ওয়ায়েলকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে মুহাম্মদকে 'লেজকাটা' (উত্তরাধিকারহীন) বলে উপহাস করার জন্য। বদরের যুদ্ধের পর কাব বিন আল-আশরাফ নামের জনৈক ইহুদি কবি মক্কায় গিয়ে এ যুদ্ধে হেরে যাওয়া পৌত্তলিকদের প্রতি সমবেদনা জানালে এবং তাদেরকে মুহাম্মদের উপর মর্যাদা দান করলে মহাবিশ্বের পরম স্রষ্টা ক্রুদ্ধ হয়ে কোরানের আয়াত নাজিল করলেন : সুরা নিসা : ৫১-৫৭। সুরা হাশরে আল্লাহ বানু নাজির নামের ইহুদি গোত্র নির্মূল করাকে আনন্দের সাথে সমর্থন করেন। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস একসময় সুরাটির নাম দিয়েছিলেন 'সুরা বানু নাজির'।

কোরানে আল্লাহ শুধু মুহাম্মদের উদ্দেশ্য-বাস্তবায়নে বাধাদানকারীদের তিরস্কার করেছেন এমন নয়, তিনি বিভিন্ন নারীর সাথে মুহাম্মদের সমস্যায় জড়ানোর বিষয়েও মধ্যস্থতা করেছেন। সুরা আহজাবের ৩৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ মুহাম্মদকে তাঁর পালকপুত্রের স্ত্রীর সাথে বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। একই সুরার ২৮-২৯ নম্বর আয়াতে বানু-কুরাইজা গোত্রকে হত্যা করে নবির বাহিনী যেসব মাল দখলে নিয়েছিলেন তা থেকে অতিরিক্ত পরিমাণে দাবি করলে নবির স্ত্রীদের তালাকের হুমকি দিয়ে সতর্ক করে দেয়া হয়। হাফসা যখন নবির সাথে মরিয়মের সম্পর্ক নিয়ে অভিযোগ আনেন তখন সুরা তাহরিমের বিভিন্ন আয়াত নাজিল হয়েছে, বিষয়টি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। হাফসা ও আয়েশার পারস্পরিক মনোমালিন্য আল্লাহকে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ করে তোলে, তিনি তাদেরকে সতর্ক করে দেন যেন তাঁরা নবিকে জ্বালাতন বন্ধ করেন ও অনুতপ্ত হন অন্যথায় আল্লাহ, জিবরাইল ও সৎ ঈমানদাররা নবিকে সমর্থন করবে এবং নবি যদি তাঁদেরকে তালাক প্রদান করেন তবে আল্লাহ তাঁদের পরিবর্তে আরও উত্তম স্ত্রী প্রদান করবেন যারা হবেন অনুগত, ইবাদতকারী, রোজা পালনকারী, কতক বিধবা এবং কতক কুমারী (সুরা তাহরিম : আয়াত ৫)। কোরানের একজন ব্যাখ্যাকারক এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'বিধবা'মানে ফেরাউনের স্ত্রী 'আসিয়া'আর 'কুমারী'মানে যিশুর মা 'মরিয়ম'এবং তাঁদের সাথে জান্নাতে নবি মুহাম্মদের বিবাহ সম্পন্ন হবে। অবশ্য কোরানে এই সুরার শেষ আয়াতদ্বয়ে আসিয়া ও মরিয়মের কথা উল্লেখ থাকলেও সরাসরি এ বিষয়ে কিছু বলা হয়নি।

সুরা নূর-এ আয়েশার প্রতি মিথ্যা অপবাদ ও সতী নারীর প্রতি এ ধরনের মিথ্যা অপবাদদানকারীদের প্রতি শাস্তি বিষয়ে বক্তব্য রয়েছে। আয়েশাকে মিথ্যা অপবাদ দেয়ার অভিযোগে বিশিষ্ট সাহাবি ও ওহি লেখক হাসান বিন সাবিত ও হামনা বিন জাহাশকে শাস্তি প্রদান করা হয় এবং আয়েশাকে নির্দোষ ঘোষণা করা হয়।

হিজরি ১ থেকে ১১ হিজরি (৬২২- ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত শুধু অসীম মহাবিশ্ব নয় বরং আরবের হেজাজ ও নেজদ অঞ্চল ছাড়া প্রায় সমগ্র বিশ্বকেই ভুলে যাওয়া বা অবজ্ঞা করা হয়েছিল। ঐসব অঞ্চলের লোকেরা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল এবং ধর্মীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণে অনীহা বা শৈথিল্য প্রদর্শন করেছিল। তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য দোজখের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলছিল আর যারা ভয় ও যুদ্ধলব্ধ গণিমতের মালের প্রতি দৃঢ়তা ও সাহস প্রদর্শন করেছিল তাদের জন্য বেহেশতের তলদেশে নহর প্রস্তুত হচ্ছিল।

নবিকে যখন উপহাস করা হয়েছিল তখন তাঁকে কোরানের আয়াত নাজিল করে সান্ত্বনা দেয়া হল : 'যারা বিদ্রুপ করে তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আমিই যথেষ্ট।'(সুরা হিজর : ৯৫)। সুরা আনফালের পুরোটা জুড়ে দ্বিতীয় হিজরিতে (৬২৪ খ্রিস্টাব্দ) সংঘটিত বদরের যুদ্ধে মহান সৃষ্টিকর্তার গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসু ভূমিকার কথা উল্লেখ রয়েছে। কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে দামেস্ক থেকে মক্কার দিকে একটি মালবাহী বাণিজ্যিক কাফেলা যাচ্ছিল। নবি এ খবর জানতে পেরে একদল সাহাবি নিয়ে ওই কাফেলাকে আক্রমণ করতে মদিনায় অপেক্ষা করতে লাগলেন। আবু সুফিয়ান গুপ্তচর মারফত বিষয়টি জানতে পেরে মক্কায় সাহায্যের জন্য খবর পাঠান, তখন আবু জেহেলের বাহিনী মক্কা থেকে কাফেলাকে রক্ষা করতে চলে এল। আবু সুফিয়ান সংঘর্ষ এড়িয়ে সর্তকতার সাথে নিরাপদে কাফেলা নিয়ে মক্কায় চলে যান। নবির বাহিনীর কিছু লোক যারা আবু সুফিয়ানের কাফেলাকে কব্জা করতে না পেরে হতাশ হয় এবং বদরের মাঠে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধের সম্মুখীন হয় আবু জেহেলের বাহিনীর সাথে। যুদ্ধে আবু জেহেলকে পরাস্ত করে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মালিকানা তারা দাবি করেন। আল্লাহ তাৎক্ষণিকভাবে তাদেরকে সতর্ক করে দেন সুরা আনফালের প্রথম দিকের আয়াতগুলো নাজিল করে। নবম আয়াতে আল্লাহ এই যুদ্ধে এক সহস্র ফেরেশতা দিয়ে সহায়তা করার কথা বলেছেন। দ্বাদশ আয়াতে অবিশ্বাসীদের ঘাড়ে এবং সারা অঙ্গে আঘাত করে হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং সপ্তদশ আয়াতে বলছেন : 'তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, আল্লাহ তাদেরকে হত্যা করেছিলেন, আর তুমি যখন কাঁকর ছুড়েছিলে তখন তুমি ছোড়নি আল্লাহই তা ছুড়েছিলেন। তা ছিল বিশ্বাসীদেরকে ভালো পুরস্কার দেওয়ার জন্য।'এ-বক্তব্য দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যখন মুহাম্মদ আবু

জেহেলের বাহিনীর দিকে কাঁকর নিক্ষেপ করেছিলেন সেটা আসলে আল্লাহই করেছেন এবং এর মাধ্যমে আবু জেহেলের দল পরাজিত হয়।

যুদ্ধ শেষে প্রথমে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বণ্টন নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়। সমস্যা সমাধানে আল্লাহ এই সম্পদের পাঁচ ভাগের এক ভাগ নিজের জন্য এবং রসুলের জন্য বরাদ্দ করেন। 'তোমাদের গনিমা'য় এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রসুলের, পিতৃহীন দরিদ্র ও পথচারীদের জন্য।'(৮:৪১)। সৃষ্টিকর্তা যেহেতু গনিমা'র ভাগ নিতে কখনো আসবেন না, তাই এই অংশটুকু রসুলের ভাগেই থাকবে। এবার আরেকটি সমস্যা তৈরি হল যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে। হজরত ওমরের পছন্দ মত একটা আয়াত নাজিল হল : 'দেশে সম্পূর্ণভাবে শত্রুনিপাত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোনো নবির পক্ষে সমীচীন নয়।'(৮: ৬৭)। একটু পরেই এই সিদ্ধান্ত বদল করে হজরত আবু বকরের পছন্দ মত যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায়ের মাধ্যমে মুক্তি ব্যবস্থা করে আরেকটি আয়াত নাজিল হয় : 'হে নবি! তোমাদের হাতে ধৃত যুদ্ধবন্দীদেরকে বলো, 'আল্লাহ যদি তোমাদের হৃদয়ে ভালো কিছু দেখেন, তবে তোমাদের কাছ থেকে যা নেওয়া হয়েছে তার চেয়ে ভালো কিছু তিনি তোমাদেরকে দেবেন ও তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।'(৮:৭০)। উল্লেখ্য বদর যুদ্ধে নবি মুহাম্মদের চাচা আব্দুল বিন আব্বাসও যুদ্ধবন্দী হয়েছিলেন। প্রথম দিকে হজরত ওমরের সিদ্ধান্তানুযায়ী যুদ্ধবন্দীদেরকে মেরে ফেলতে চাইলেও পরে হজরত আবু বকরের পরামর্শানুযায়ী যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ মুক্তিপণ আদায় করে ছেড়ে দেয়া হয়।

সুরা আনফালের সম্পূর্ণটা পৌত্তলিকদের সাথে যুদ্ধ-বিবাদ নিয়ে রচিত হয়েছে। গাতাফান গোত্র কুরাইশদের সাথে মিলিত হয়ে একসাথে মদিনা আক্রমণ করে বসে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আল্লাহ কিভাবে হস্তক্ষেপ করেছিলেন তার বিবরণ রয়েছে সুরা আহজাবের নবম আয়াতে : 'হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা তোমরা স্মরণ করো, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদেরকে আক্রমণ করেছিল ও আমি তাদের বিরুদ্ধে এক ঘূর্ণিঝড় ও অদৃশ্য বাহিনী পাঠিয়েছিলাম। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন। (সুরা আহজাব : আয়াত ৯)। দশম থেকে ত্রয়োদশ আয়াত পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ কিভাবে এ-যুদ্ধে মুসলমানদের বিরাট সাহায্য করেছিলেন।

'ক্যামব্রিজ তফসির'- এ ঘটনাটির বিবরণ এভাবে দেয়া হয়েছে: 'মহান আল্লাহতায়ালা প্রচণ্ড ঝড় পাঠিয়ে শত্রুদলের তাবুগুলোকে উল্টে দিলেন, তাদের আগুনকে নিভিয়ে দিলেন এবং তাদের ঘোড়ার আস্তাবল ধ্বংস করেছিলেন। ফেরেশতারা তখন চিৎকার করে বললেন, আল্লাহ মহান!'[ইসলামের ইতিহাসে এই যুদ্ধ খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ নামে খ্যাত। মক্কা থেকে বিশাল সেনাবাহিনী মদিনা আক্রমণ করতে গেলে পারস্যের নাগরিক সালমান আল-ফার্সির পরামর্শে চারদিকে পরিখা খনন করা হয়। আক্রমণকারী মক্কাবাসীরা পরিখা ডিঙিয়ে আর অগ্রসর হতে না পেরে পরিখার পাশে তাবু ফেলে অপেক্ষা করতে থাকেন। মাসখানেক মদিনা অবরুদ্ধ করে রাখার পর তারা এক মরুঝড়ের কবলে পড়েন।-অনুবাদক] ।

কোরানের গভীর বিশ্বাসী তফসিরকারক কখনো প্রশ্ন উত্থাপন করেন না, 'আল্লাহ ওই ঝড় এক মাস পর না পাঠিয়ে আগে কেন পাঠালেন না?'আল্লাহ যদি তা করতেন তবে মদিনার মুসলমানদের সে-সময় পরিখা খননের মত দুঃসাধ্য কাজ করতে হত না এবং দীর্ঘদিন শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে গভীর দুশ্চিন্তায় থাকতে হত না। কোনো ভাষ্যকারই প্রশ্ন তোলেননি, 'ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা কেন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন যেখানে নবির ছোট চাচা হামজা বিন আব্দুল মোতালেবসহ সত্তরজন সাহাবি মৃত্যুবরণ করেন।' 'কেন আল্লাহ তাঁদের সাহায্যার্থে ফেরেশতা পাঠালেন না যেমন পাঠিয়েছিলেন খন্দকের যুদ্ধে?' কয়েকজন ফেরেশতা বা গায়েবি কোনো মরুঝড় যদি ওহুদের যুদ্ধে সাহায্য করত তবে নবি পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্তি পেতেন, পাথরের আঘাত থেকে রক্ষা পেতেন এবং এমন পরিস্থিতিতে পড়তেন না যেখানে হজরত আলি নিজের জীবন বিপন্ন করে তাঁকে একদম শহিদ হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

কোরানের একাধিক আয়াতে হেজাজের সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার বিবরণ পাওয়া যায়। এসব আয়াতে ধর্মীয় আদেশ-নিষেধের সাথে তৎকালীন বিভিন্ন ঘটনা ও সংঘাতের কথা উল্লেখ রয়েছে। বিভিন্ন বিতর্ক, রটনাকারীদের কুৎসার জবাব, ব্যক্তিগত ঝগড়ায় মধ্যস্থতা, যুদ্ধের জন্য সনির্বন্ধ আহ্বান, মুনাফেকদের নিন্দা, যুদ্ধলব্ধ মাল, নারীর প্রতি নির্দেশ এবং বিরোধীপক্ষ ও অবিশ্বাসীদের মৃত্যুর পর দোজখের আগুনের হুমকি দিয়ে কোরানে শতাধিক আয়াত রয়েছে। নগরের বাসিন্দারা যদি পাপকাজে লিপ্ত থাকে তবে স্রষ্টার ক্রোধে গোটা নগর ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, পূর্বে এরকম গজব নাজিল হয়েছিল পুণ্যবান-পাপী সবার ওপরে।

কোরানে স্রষ্টার মানবসুলভ গুণাবলী আছে। তিনি খুশি হোন, তিনি ক্রোধান্বিত হোন। তাঁর পছন্দ-অপছন্দ রয়েছে ও তাঁকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব। এককথায় মানুষের সব ধরনের মানবীয় গুণাবলী ও স্বভাব স্রষ্টার রয়েছে, যেমন ভালবাসা, রাগ করা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, ষড়যন্ত্র, ছলনা ইত্যাদি। আমরা যদি ধরে নেই বিশাল এই মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা রয়েছেন তবে যৌক্তিকভাবে ধরে নিতে হবে সেই স্রষ্টা আমাদের মতো নগণ্য মানুষের মানবিক বৈশিষ্ট্য ও দুর্বলতা থেকে তিনি মুক্ত। সুতরাং আমরা কোরানের স্রষ্টার বৈশিষ্ট্যাবলী হজরত মুহাম্মদের নিজস্ব চিন্তা প্রসূত বলে ধরে নিতে বাধ্য। আর হজরত মুহাম্মদ নিজেই বলেছেন তিনিও একজন মানুষ মাত্র। আমরা জানি তিনি অন্যান্য মানুষের মত মনে কষ্ট পেতেন, ছেলে হারানোর ব্যথায় কাতর হয়েছেন, ওহুদের যুদ্ধে তাঁর চাচা হামজার বিকৃত লাশ দেখে শোকাতুর হয়ে প্রতিশোধের শপথ নিয়েছেন।

পূর্বে উল্লেখিত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করলে প্রশ্ন আসে, কোরানে হজরত মুহাম্মদ ও আল্লাহকে কি আদৌ আলাদা করা সম্ভব নাকি দুজন আসলে এক সত্তা? কোরানের প্রচুর সুরা-আয়াত পর্যালোচনা করলে ঘুরে-ফিরে এই প্রশ্ন সামনে চলে আসে। বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য আরও কয়েকটি প্রসঙ্গ আলোচনা করা দরকার। সকল মুসলমান বিশ্বাস করেন কোরান আল্লাহর বাণী।এই বিশ্বাস কোরানেরই কিছু আয়াতের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছে, যেমন: 'কোরান ওহি, যা প্রত্যাদেশ হয়।' (সুরা নজম : আয়াত ৪-৫)। 'আমি কোরান অবতীর্ণ করেছি কদরের রাত্রে।' (সুরা কাদর : আয়াত ১)। কোরান মুসলমানদের বিশ্বাসের একমাত্র দলিল, যা অবিসংবাদিত, রাজকীয় ও পরম পবিত্র বলে বিবেচিত হয়।

শুরু থেকে কোরানকে এত বেশি মর্যাদাশীল বলে ভাবা শুরু হয় যে (কোরান রচিত হওয়ার) মাত্র একশ'বছরের মধ্যে মুসলিম পণ্ডিতদের কাছে জিজ্ঞাসার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, কোরান সৃষ্ট নাকি তা আল্লাহর মতই অসৃষ্ট মানে তা কখনো অস্তিত্বহীন ছিল না। এই বিতর্ক চলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। কিন্তু কোরান অসৃষ্ট হওয়ার বিষয়টি ইসলামি ধর্মতত্ত্বের মৌলিক নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক।

তথাপি আব্বাসীয় খলিফা মুতাসিমের (৮৩৩-৮৪২ খ্রিস্টাব্দ) শাসনামলে সুন্নি ইমাম আহমদ বিন হানবল কোরানের অসৃষ্ট হওয়ার মতবাদকে পরিত্যাগ করা দূরের কথা এ ব্যাপারে তাঁর বিশ্বাস এতই প্রবল ছিল যে তিনি বরং অজ্ঞান হওয়ার আগ পর্যন্ত এজন্য চাবুকের আঘাত সহ্য করে নেন। অর্থাৎ তিনি 'আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক'আয়াতখানিও আল্লাহর মতই চিরন্তন বলে মনে করতেন। [কোরান অসৃষ্ট বিষয়টি ইমাম আহমদ বিন হানবলের মতো ব্যক্তিদের গভীর বিশ্বাসের মূলে রয়েছে কোরানের একাধিক আয়াত। যেমন সুরা বুরুজে বলা হয়েছে : 'বস্তুত এ হচ্ছে সম্মানিত কোরান, যা রয়েছে লওহে মাহফুজে (সংরক্ষিত ফলকে)।'(৮৫:২১-২২)। লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত কোরান লিখেছিলেন পবিত্র-সম্মানিত ফেরেশতারা। (দেখুন : ৮০ সুরা আ'বাসা : আয়াত ১৩-১৬)।-অনুবাদক]

বিশ্বাসের মোহে আবদ্ধ থাকলে কাউকে যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে লাভ হয় না। বিষয়টি তাদের জন্যও সত্য, যারা কোরান পড়েছেন। কোরানের প্রথম সুরা ফাতিহা একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হতে পারে। এই সুরায় সাতটি[৭৯] আয়াত রয়েছে এবং একে 'সাত

পুনরাবৃত্তি'[৮০] বলে। এই সুরার বিশেষ মর্যাদার জন্য একে কোরানের সর্বপ্রথমে স্থান দেয়া হয়েছে। সুরাটির অনুবাদ নিচে দেয়া হল :

'পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহর নামে

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই,

যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়াময়

বিচারদিনের মালিক।

আমরা একমাত্র তোমারই উপাসনা করি, তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি

তুমি আমাদেরকে চালিত করো সঠিক পথে

তাদের পথে যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ,

যারা (তোমার) রোষে পতিত হয়নি, পথভ্রষ্টও হয়নি।'

এই বাক্যগুলো আল্লাহর হতে পারে না। এর বিষয়বস্তু থেকে এটা পরিষ্কার যে, এটি নবির (বা অন্য কোনো ব্যক্তির) রচিত কথামালা, কারণ এখানে আল্লাহর প্রশংসা রয়েছে, আল্লাহর প্রতি প্রণতি ও মিনতি রয়েছে। স্রষ্টা কখনো নিজের প্রতি বলবেন না-'আমরা একমাত্র তোমারই উপাসনা করি, তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।' বাক্যের এই বিড়ম্বনা এড়ানো যেত যদি সুরাটির আগে 'বল' (আরবিতে 'কুল') বা 'এই বলে প্রার্থনা কর' কথাটি সংযুক্ত থাকত; যেমন রয়েছে সুরা ইখলাস-এর প্রথম আয়াতে (বলো, 'তিনি আল্লাহ (যিনি) অদ্বিতীয়), সুরা কাফিরুন (বলো, 'হে অবিশ্বাসীরা!') কিংবা সুরা কাহাফ্-এ রয়েছে, 'বলো, 'আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ; আমার ওপর প্রত্যাদেশ হয় যে আল্লাহই তোমাদের একমাত্র উপাস্য।'(১৮:১১০)। এটি যৌক্তিকভাবে অসম্ভব যে, এই বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা মহান আল্লাহতায়ালা কখনো বলবেন, 'আমরা একমাত্র তোমারই উপাসনা করি, তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।' যেহেতু সুরা ফাতিহা কেবলমাত্র আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর প্রতি মিনতি ছাড়া কিছুই নয় তাই ধারণা করা যুক্তিযুক্ত যে এই সুরা আল্লাহর বাণী নয় বরং নবি বা অন্য কারো রচিত প্রার্থনা। বিখ্যাত সাহাবি, কোরানের হাফেজ, হাদিস-বক্তা ও কোরানের অনুলেখক আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ সুরা ফাতিহার এই আয়াতকে তাঁর অনুমোদিত কোরানে অন্তর্ভুক্ত করেননি এবং সুরা ফালাক ও সুরা নাসকেও তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন।

সুরা লাহাবকেও এর উদ্যত ভঙ্গির জন্য মহাবিশ্বের মহান প্রতিপালকের বাণী বলে ধরে নেয়া যায় না (যা লাওহে মাহফুজে হজরত মুহাম্মদের জন্মের অনেক আগে অনাদিকাল থেকেই সংরক্ষিত ছিল), যার দ্বারা নবির চাচা আব্দুল ওজ্জাকে জবাব দেয়া হয়েছে। মহাবিশ্বের মহান প্রতিপালকের জন্য শোভনীয় হতে পারে না একজন অজ্ঞ আরব ও তাঁর স্ত্রীকে হিংসামূলক অভিশাপ বর্ষণ করা।

কোরানের কিছু আয়াতের বক্তা আল্লাহ আবার কিছু আয়াতে বক্তা মুহাম্মদ বলে প্রতীয়মান হয়। সুরা নজমের প্রথমে আল্লাহ বলেছেন, তিনি মুহাম্মদের নবুওতিকে অনুমোদন করেছেন : 'তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, পথভ্রষ্টও নয়। আর সে নিজের

ইচ্ছামতো কোনো কথা বলে না। কোরান ওহি, যা তাঁর ওপর অবতীর্ণ হয়।' (৫৩:২-৫)। একই সুরার পরের আয়াতগুলো (২১-২৮) থেকে মনে হয়, এখানে বক্তা নবি মুহাম্মদ নিজে। যেমন নবি এখানে পৌত্তলিকদের লাত, মানাত ও ওজ্জাকে আল্লাহর কন্যা হিসেবে বিশ্বাস করার নিন্দা করছেন : 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওজ্জা সম্বন্ধে, আর তৃতীয়টি মানাত সম্বন্ধে? তোমরা কি মনে কর তোমাদের জন্য পুত্রসন্তান আর আল্লাহর জন্য কন্যাসন্তান? এরকম ভাগ তো অন্যায়।' (৫৩:১৯-২২)। এটি আল্লাহর বাণী বলে মনে হয় না, কারণ আল্লাহ নিজেকে প্রশ্ন করতে পারেন না তাঁর কন্যা সন্তান আছে কিনা সে ব্যাপারে। প্রায় চৌদ্দশত বছর আগে আরবের হেজাজ অঞ্চলের সমাজে অনেক কুসংস্কার-কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। তাঁরা পুত্রসন্তানের জন্য গর্ববোধ করতো আবার কন্যা সন্তানের জন্য বিব্রতবোধ করতো। কন্যা সন্তান সে-সময়কার সমাজে অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল যা কোরানের কিছু আয়াতেও বিবৃত হয়েছে। যেমন সুরা বনি-ইসরাইলে রয়েছে : 'তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের জন্য পুত্রসন্তান ঠিক করেছেন আর তিনি নিজে ফেরেশতাদেরকে কন্যা হিসেবে গ্রহণ করেছেন?'(১৭:৪০)। এই ধরনের প্রশ্ন কেবল নবি মুহাম্মদ দ্বারা উত্থাপিত হতে পারে। কারণ তা আল্লাহর বাণী হলে এরূপ হতে পারতো : 'আমি কি তোমাদের জন্য পুত্রসন্তান নির্ধারিত করেছি এবং নিজের জন্য ফেরেশতাদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছি?' তদুপরি মহাবিশ্বের স্রষ্টা-প্রতিপালকের কাছে লিঙ্গভেদ কোনো গুরুতর বিষয় হতে পারে না, বিধায় তাঁর পক্ষে এরকম আয়াত রচনাও সম্ভব নয়।

কন্যাশিশুর প্রতি কুসংস্কার এখনো বিশ্বব্যাপী বিদ্যমান, এমনকি অনেক সভ্য দেশেও তা বিদ্যমান। প্রাচীন আরবরা পুত্র সন্তান নিয়ে গর্ব করত আবার কেউ কেউ এমন বর্বর ছিল যে কন্যাশিশুকে হত্যা করে ফেলত। [এই একবিংশ শতাব্দীতেও ভারতীয় উপমহাদেশের অনেক স্থানে কন্যাশিশু হত্যা বা কন্যাভ্রুণ নষ্ট করে ফেলার প্রবণতা দেখা যায়।-অনুবাদক]। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হল প্রাচীন আরবরা আবার ফেরেশতাদের স্ত্রীলিঙ্গ বিশিষ্ট বলে মনে করত। নবি মুহাম্মদ তৎকালীন আরবদের মত পুত্রসন্তান লাভের আশা করতেন। যখন তিনি কোনো নারীকে বিয়ে করেছেন তখন তাঁর গর্ভ থেকে পুত্র সন্তান ভীষণভাবে প্রত্যাশা করতেন। নবির সন্তান কাশেম মারা যাওয়ায় তিনি প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছিলেন, যখন আলাস বিন ওয়ায়েল তাঁকে 'লেজকাটা' (উত্তরাধিকারহীন) বলে ব্যঙ্গ করতো তখন তিনি বেশ দুঃখ পেতেন (নবিকে তখন সান্ত্বনা দেয়ার জন্য সুরা কাউসার নাজিল হয়)। পরবর্তীতে নবি বেশ আনন্দিত হয়েছিলেন যখন উপপত্নী মরিয়মের (মারিয়া দ্যা কপ্ট) গর্ভে ইব্রাহিম নামের পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু মাত্র নয় মাসের মাথায় শিশুটি মারা গেলে বংশের প্রদীপ রক্ষার চিন্তায় ভীষণভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন তিনি। তাই নবি পৌত্তলিকদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আল্লাহ কি তোমাদের পুত্রসন্তান দিয়ে অনুগ্রহ করেন?'

কোরানে এরকম অসংখ্য আয়াত রয়েছে যেখানে আল্লাহ ও মুহাম্মদের মধ্যে কে আসল বক্তা তা নিয়ে বিভ্রম সৃষ্টি হয়। সুরা বনি-ইসরাইলের প্রথম আয়াত, যেখানে নবির রাত্রিকালীন ভ্রমণের (মেরাজ) কথা উল্লেখ রয়েছে : 'পরম পবিত্র ও মহিমাময় তিনি, যিনি তাঁর দাসকে রাত্রে সফর করিয়েছিলেন তাঁর নির্দশন দেখাবার জন্য মসজিদ-উল-হারাম থেকে মসজিদ-উল-আকসায়-যার চারদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি। তিনি তো সব শোনেন, সব দেখেন।' (১৭:১)। 'পরম পবিত্র ও মহিমাময় তিনি, যিনি তাঁর দাসকে রাত্রে সফর করিয়েছিলেন মক্কা থেকে ফিলিস্তিন পর্যন্ত'- এধরনের বক্তব্য আল্লাহর উচ্চারিত বাণী হতে পারে না কারণ আল্লাহ নিজেই নিজেকে ধন্যবাদ দিতে পারেন না, এটি মনুষ্যসুলভ বাতুলতা। এটা আল্লাহর প্রতি মুহাম্মদের পক্ষ থেকে প্রশংসাজ্ঞাপন মাত্র। এই আয়াতের পরের অংশ যেখানে দূরবর্তী মসজিদের কথা বলা হয়েছে, 'যার চারদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি'- এর বক্তা আল্লাহর নিজের বলে মনে হয়, তবে শেষের অংশ 'তিনি তো সব শোনেন, সব দেখেন'-নবি মুহাম্মদের উক্তি বলেই মনে হয়।

এভাবে একই আয়াতে বারেবারে বক্তা পরিবর্তিত হওয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হচ্ছে সুরা ফাতহ্। 'আল্লাহ তোমার জন্য সুস্পষ্ট বিজয় অবধারিত করেছেন। যাতে আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের ত্রুটিগুলো মাফ করবেন...।' (৪৮:১-২)। এই

আয়াতদ্বয় আল্লাহর বাণী হলে এ-রকম হতে পারতো : 'আমি আপনার জন্য সুস্পষ্ট বিজয় অবধারিত করেছি। যাতে আমি আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের ক্রটিগুলো মাফ করবো।' যদিও এই ধরনের ভাষাগত গোলযোগের কারণ আমরা সহজে ব্যাখ্যা করতে পারি। শুধু এই আয়াতদ্বয় নয়, আরও অনেক আয়াত আছে যা একই ধরনের জটিলতার সৃষ্টি করে। এরকম একটি আয়াত হচ্ছে সুরা আহজাবের ২১ নম্বর আয়াত : 'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করে তাদের জন্য আল্লাহর রসুলের মধ্যে এক উত্তম আদর্শ রয়েছে।' সহজেই বলা যায়, এখানে বক্তা আল্লাহ হলে অবশ্যই বাক্যটি এরকম হতো : 'তোমাদের মধ্যে যারা আমাকে ও পরকালকে বেশি ভয় করে এবং আমাকে বেশি করে স্মরণ করে তাদের জন্য আমার রসুলের মধ্যে এক উত্তম আদর্শ রয়েছে।' সুরা আহজাবের পরের দুটি আয়াতে (২২-২৩) মদিনার মুসলমানদের খন্দকের যুদ্ধে অবিচলতার জন্য। পরের আয়াতে বলা হয়েছে : 'আল্লাহ তো সত্যবাদিতার জন্য পুরস্কার দেন, আর তাঁর ইচ্ছা হলে তিনি মুনাফিকদের শাস্তি দেন বা ক্ষমা করেন। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (৩৩:২৪)। এই আয়াত পরিষ্কারভাবে আল্লাহর বাণী বলে প্রতীয়মান হয় না, বরং বক্তা স্বয়ং নবি মুহাম্মদ। কেননা আল্লাহ বক্তা হলে তা হতো : 'আমি তো সত্যবাদিতার জন্য পুরস্কার দেই...'।

অষ্টম হিজরিতে (৬৩০ খ্রিস্টাব্দে) যখন রোমানদের বিরুদ্ধে নবির অভিযানের প্রস্তুতিকালে মদিনার একটি গোত্রের প্রধান জাদ বিন কায়েস যুদ্ধে যোগ দিতে অপারগতা জানিয়ে বললেন, 'আমাকে ক্ষমা করুন ও প্রলোভন থেকে বাঁচান। রোমান নারীদের দেখে আমি হয়তো তাদের প্রলোভন থেকে নিজেকে সংযত রাখতে পারবো না।' এর প্রত্যুত্তরে সুরা তওবা'র এই আয়াত নাজিল হয় : 'আর ওদের মধ্যে এমন লোক আছে যে বলে 'আমাকে অব্যাহতি দাও আর আমাকে বিশৃঙ্খলায় ফেলো না।'সাবধান! ওরাই বিশৃঙ্খলায় পড়ে আছে। আর জাহান্নাম তো অবিশ্বাসীদের ঘিরে রাখবে।'(৯:৪৯)। স্বাভাবিকভাবে এটি নবি মুহাম্মদের বাণী, আল্লাহর বাণী নয়। কারণ নারীলোভী জাদ বিন কায়েস যুদ্ধ থেকে দূরে থাকার জন্য নবি মুহাম্মদের কাছে অব্যাহতি চেয়েছেন, আল্লাহর কাছে নয়। আল্লাহ তাঁর রসুলকে সমর্থন করে ওজর-উত্থাপনকারীদের জন্য দোজখ তৈরি করতে পারেন কিন্তু এ-ধরনের বিষয়ে তিনি এভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না।

কোরানে বক্তা হিসেবে আল্লাহ ও নবির মধ্যকার বিভ্রান্তিকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার অবকাশ নেই। মাঝে মাঝে আল্লাহ নবিকে আদেশ দিয়ে বলছেন-'বলো'। মাঝে মাঝে কিছু আয়াত পাওয়া যাচ্ছে যেখানে মুহাম্মদ বক্তা হয়ে আল্লাহর প্রশংসা করছেন। কোরানের এই আয়াতগুলি থেকে আভাস পাওয়া যায় নবি মুহাম্মদের অবচেতন মন হয়তো আরবদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, সুনির্দিষ্ট সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসার জন্য, বিভিন্ন মানবিক ক্রটি-বিচ্যুতি থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য এবং উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য ক্রমাগত প্রণোদনা দিত।

কোরানে আল্লাহর ওপর ছলনা বা ষড়যন্ত্রের মতো বৈশিষ্ট্য আরোপিত হওয়ার ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। সুরা কলমে রয়েছে : 'যারা এই বাণী প্রত্যাখান করে তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দাও, আমি ধীরে ধীরে ওদেরকে কোনদিকে নিয়ে যাব ওরা তা জানে না। আমি ওদেরকে সময় দিয়ে থাকি। আমার কৌশল অত্যন্ত শক্ত।'(৬৮:৪৪-৪৫)। সুরা আ'রাফ-এ রয়েছে : 'যারা আমার নির্দশনাবলিকে মিথ্যা বলে আমি তাদেরকে ক্রমে ক্রমে এমনভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাই যে, তারা জানতেও পারে না। আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি। আমার কৌশল বড়ই নিপুণ।'(৭:১৮২-১৮৩)। সুরা আনফালে কুরাইশ-প্রধানদের গোপন সভাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে : 'স্মরণ করো, অবিশ্বাসীরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল তোমাকে বন্দী, হত্যা বা নির্বাসিত করার জন্য। তারা যেমন ছলনা করত, তেমনি আল্লাহও ছলনা করতেন। বস্তুত আল্লাহর ছলনা সবচেয়ে উত্তম।'(৮:৩০)। [উল্লেখ্য এই আয়াতে আরবি শব্দ 'ইয়ামকুরু' ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থ হচ্ছে- 'সে ধোঁকা দিচ্ছে', 'ষড়যন্ত্র করছে' ইত্যাদি। শব্দটি

আয়াতে দুইবার উল্লেখ রয়েছে। অনেক কোরান-অনুবাদক কাফেরদের ক্ষেত্রে এই শব্দের অর্থ 'ষড়যন্ত্র/ছলনা' হিসেবে ব্যবহার করেছেন কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে এর অর্থ করেছেন 'পরিকল্পনা করা', 'কৌশল করা' ইত্যাদি।-অনুবাদক]।

ধূর্তামি বা ছলনাকে বীরত্বের বিকল্প হিসাবে ভাবা সম্ভব, যদি প্রতিপক্ষ বেশ শক্তিশালী হয়। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ যিনি মহাবিশ্বকে 'হও' বললেই হয়ে যায়; যার হুকুমে মহাবিশ্বের সব কিছু ঘটে তাকে কেন ছলনা, ধূর্তামি, ষড়যন্ত্র বা প্রতারণার আশ্রয় নিতে হবে?এ-ধরনের ছলনার একটি ঐতিহাসিক উদাহরণ হচ্ছে যখন হজরত আলি ও হজরত মুয়াবিয়ার মধ্যে খেলাফত সমস্যার সমাধানে কুরাইশ বংশের আমর ইবনে আল-আস চালাকি করে পরাস্ত করেছিলেন আবু মুসা আল-আশারিকে।[৮১]

আল্লাহ ও মুহাম্মদের মধ্যে কোরানে কে আসল বক্তা, তা নিয়ে বিভ্রম তৈরি হয় প্রচুর। যেমন সুরা ইউনুসে রয়েছে : 'তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই বিশ্বাস করত। তা হলে কি তুমি বিশ্বাসী হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে?'(১০:৯৯)। এই আয়াতটি নবির সাথে আল্লাহর কথোপকথন মনে হলেও পরের আয়াতেই মনে হয়, নবি পৌত্তলিকদের একরোখা মনোভাবের জন্য নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এই বলে- 'আল্লাহর অনুমতি ছাড়া বিশ্বাস করা কারও সাধ্য নেই। আর যারা বোঝে না আল্লাহ তাদেরকে কলুষলিপ্ত করবেন।'(১০:১০০)। মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ কখনো এমন মনোভাব পোষণ করবেন না যে, কিছু লোক তাঁকে বিশ্বাস করুক আর কিছু লোক তাঁকে অবিশ্বাস করুক। পরম স্রষ্টা কখনো রাগ করতে পারেন না কারণ রাগ মানবীয় অনুভূতি দুর্বলতার প্রকাশক এবং রাগের কারণ হচ্ছে কোনো কিছু ব্যক্তি-ইচ্ছার বিপরীত ঘটা। অথচ আল্লাহর জন্য অপছন্দনীয় কিছু হওয়া বা ঘটা সম্ভব নয়। সুরা আহজাবের ২৪ নম্বর আয়াতটিও আল্লাহর নয়, নবি মুহাম্মদের উক্তি বলেই মনে হয় : 'আল্লাহ তো সত্যবাদিতার জন্য পুরস্কার দেন, আর তাঁর ইচ্ছা হলে তিনি মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন বা ক্ষমা করেন। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

আরবরা অস্থিরমতি এবং প্রায়শ পরিবর্তনশীল স্বভাবের ছিল; এবং যেদিকে সুবিধা বেশি সেদিকে পক্ষ নিত। ইসলামের শুরুর দিকে এজন্য মক্কার কিছু মুসলমান হিজরত করেননি। বদর যুদ্ধে আবু জেহেলের পক্ষে ও নবি মুহাম্মদের বিপক্ষে অবস্থান নেন। গরিব ও অসহায় হওয়া সত্ত্বেও এদের অস্থিরচিত্ততা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে তোলে। ফলে সুরা নিসা'র এই আয়াতগুলি নাজিল হয় : 'যারা নিজেদের অনিষ্ট করে তাদের প্রাণ নেওয়ার সময় ফেরেশতারা বলে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে?'তারা (ফেরেশতারা) বলে, 'তোমরা নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে বসবাস তো করতে পারতে, আল্লাহর দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না?' এরাই বাস করবে জাহান্নামে, আর বাসস্থান হিসেবে তা কী জঘন্য! তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে না ও কোনো পথও পায় না, আল্লাহ হয়তো তাদের পাপ ক্ষমা করবেন, কারণ আল্লাহ পাপমোচনকারী ক্ষমাশীল। (৪:৯৭-৯৯)। [মৃত্যুভয় থাকায় অনেক মুসলমান হিজরতে উৎসাহিত হননি। তাই বারে বারে হিজরতে পুণ্যের কথা ও লোভনীয় প্রস্তাব দেয়া হয়েছে কোরানে : 'আর যে-কেউ আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করবে সে পৃথিবীতে বহু আশ্রয় ও প্রাচুর্য লাভ করবে। আর যে-কেউ আল্লাহ ও রসুলের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগী হয়ে বের হয় আর তার মৃত্যু ঘটে তার পুরস্কারের ভার আল্লাহর ওপর। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (৪:১০০)। পরম করুণাময়ের কাছ থেকে এ-রকম প্রস্তাব শোভনীয় নয়।-অনুবাদক]।

হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবস্থানকালীন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে নবি মুহাম্মদের প্রতি নির্দেশ এসেছিল : 'তুমি মানুষকে হিকমত ও সৎ উপদেশ দিয়ে তোমার প্রতিপালকের পথে ডাক দাও ও ওদের সাথে ভালোভাবে আলোচনা করো। তাঁর পথ ছেড়ে যে বিপথে যায় তার সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক ভালো করেই জানেন। আর যে সৎপথে আছে তাও তিনি ভালো করে জানেন। যদি তোমরা শাস্তি দাও, তবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয় ঠিক ততখানি শাস্তি দেবে। অবশ্য ধৈর্য ধরা ধৈর্যশীলদের জন্য ভালো।' (সুরা নাহল : আয়াত ১২৫-১২৬)। কয়েক বছর পর ইসলাম প্রভাবশালী হয়ে উঠলে মক্কায় বিজয়ী বাহিনীর প্রধান হিসেবে প্রবেশ করেন নবি মুহাম্মদ। নির্দেশ তখন পরিবর্তন হয়ে যায় : 'তারপর নিষিদ্ধ মাস পার হলে মুশরিকদের যেখানে পাবে

হত্যা করবে। তাদেরকে বন্দী করবে, অবরোধ করবে ও তাঁদের জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওত পেতে থাকবে। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামাজ কায়েম করে ও জাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সুরা তওবা : আয়াত ৫)।

মানুষের সীমাবদ্ধতার দরুন সে অসহায় অবস্থায় একভাবে আর সফল হলে অন্যভাবে আচরণ করে। কিন্তু পরম স্রষ্টা যেহেতু সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ তাই তাঁর পক্ষে দুই ধরনের পরিস্থিতিতে ভিন্ন মানসিকতা দেখানোর কারণ অবোধগম্য। হিজরতের প্রথম বছর আল্লাহ কোরানে বললেন : 'ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই। নিঃসন্দেহে সৎপথ ভ্রান্তপথ থেকে পৃথক হয়ে গেছে। সুতরাং যে তাগুত (অসত্য দেবতা)-কে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করবে সে এমন এক শক্ত হাতল ধরবে যা কখনও ভাঙবে না। আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন।'(সুরা বাকারা : আয়াত ২৫৬)। বছরখানিক পরই (নবি রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী-ক্ষমতাশালী হলে) আল্লাহ আদেশ দিলেন : 'যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।'(২:১৯০)। 'এবং তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো।' (২:২৪৪)। এবং এই বলে সতর্ক করে দিলেন : 'মুসলমানদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহর পথে নিজের ধনপ্রাণ দিয়ে জিহাদ করে তারা সমান নয়, যারা নিজেদের ধনপ্রাণ দিয়ে জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে যারা ঘরে বসে থাকে তাদের ওপর মর্যাদা দিয়েছেন।'(২:৯৫) । পূর্বে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল ধর্মে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই আর এখন মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।

হিজরতের পূর্বে আল্লাহ নৈতিক উপদেশ নাজিল করেছিলেন : 'ভালো ও মন্দ দুই-ই সমান নয়। ভালো দিয়ে মন্দকে বাধা দাও। এতে তোমার সাথে যার শত্রুতা সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো।' (সুরা হা-মিম-সিজদা : আয়াত ৩৪)। হিজরতের পর মদিনায় বিপরীতধর্মী আয়াত নাজিল হলো : 'সুতরাং তোমরা অলস হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না, তোমরাই প্রবল; আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন, তিনি তোমাদের কর্মফল ক্ষুণ্নকরবেন না। (সুরা মুহাম্মদ : আয়াত ৩৫)।

আচরণ ও কণ্ঠস্বরের এরকম পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। আরেকটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে, অগণিত তারকারাজি আর গ্রহমণ্ডলী নিয়ে গঠিত বিশাল মহাবিশ্বের স্রষ্টার কেবলমাত্র আরবের হেজাজ অঞ্চলের লোকদের প্রতি এ ধরনের প্রশ্নের হেতু কী হতে পারে : 'তোমরা যে-পানি পান কর, সে-সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করেছ? তোমরাই কি তা মেঘ থেকে নামিয়ে আনো, না আমি তা বর্ষণ করি? আমি তো ইচ্ছা করলে তা লোনা করে দিতে পারি। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?'(সুরা ওয়াকিয়া : আয়াত ৬৮-৭০)।

কোরানের একাধিক সুরা পাঠে মনে হতে পারে স্রষ্টা বোধহয় মানুষের ওপর নির্ভরশীল। 'আর আমি দিয়েছি লোহা, যার মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য নানা উপকার; আর এটা এজন্য যে, আল্লাহ যেন জানতে পারেন কে না-দেখে তাঁকে ও তাঁর রসুলদেরকে সাহায্য করে। আল্লাহ তো শক্তিধর, পরাক্রমশালী।' (সুরা হাদিদ : আয়াত ২৫)। এ-আয়াত থেকে মনে হতে পারে মানুষ তরবারি দ্বারা আল্লাহ ও রসুলকে সাহায্য করতে পারে, এই ধরনের দুর্বলতার কারণ কি?সর্বশক্তিমানের কেন প্রয়োজন হবে মানুষের সাহায্যের? আর আরেকটি আয়াত আছে এ-রকম : 'হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও।' (সুরা সাফফ : আয়াত ১৪) [এই আয়াতে সাহায্যের আরবি হিসেবে 'আনসার'শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে 'আনসারাল্লাহ'মানে 'আল্লাহর সাহায্যকারী'-অনুবাদক]। আবার কোরানে পঞ্চাশটিরও বেশি আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, মানুষকে সঠিক পথে নিয়ে আসা বা ইসলাম ধর্মে আনা তাঁর (আল্লাহর) ইচ্ছার বা পছন্দের ওপর নির্ভরশীল। যেমন : 'নিশ্চয়ই তারা বিশ্বাস করবে না যাদের বিরুদ্ধে তোমার প্রতিপালকের সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হয়ে গেছে। এমনকি ওদের কাছে প্রত্যেকটি নিদর্শন আসলেও, যতক্ষণ না তারা কঠিন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। (সুরা ইউনুস : আয়াত ৯৬-৯৭)। 'আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতাম। কিন্তু আমার একথা অবশ্যই সত্য যে আমি নিশ্চয়ই জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।'

(সুরা সিজদা : আয়াত ১৩)। 'যারা আল্লাহও নিদর্শনে বিশ্বাস করে না আল্লাহ তাদেরকে পথনির্দেশ করেন না এবং তাদের জন্য আছে নিদারুণ শাস্তি।' (সুরা নাহল : আয়াত ১০৪)। এ-ধরনের আয়াতগুলো পড়লে মনে হয় আল্লাহ হয়তো নিজেই চাচ্ছেন না সব মানুষ সঠিক পথে বা তাঁর ধর্মে আসুক, আবার যারা সঠিক পথে বা ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন অনন্তকাল ধরে দোজখের যন্ত্রণাময় শাস্তি। মানুষ সঠিক পথে আসুক তা আল্লাহর ইচ্ছা নয়-বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে সুরা আনআমে : '. . . আমি তাদের অন্তরের ওপর আবরণ দিয়েছি যেন তারা তা বুঝতে না পারে। আমি তাদেরকে বধির করেছি। আর তারা সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলেও তাতে বিশ্বাস করবে না।' (সুরা আন'আম : আয়াত ২৫)। প্রায় একই ধরনের বক্তব্য আছে সুরা কাহাফে : 'যখন ওদের কাছে পথের নির্দেশ আসে, তখন কখন ওদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা হবে বা কখন শাস্তি এসে পড়বে এই প্রতীক্ষাই ওদেরকে বিশ্বাস করতে ও ওদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধা দেয়।'(১৮:৫৫)। আবার এটাও সত্যি যে, কোরানে প্রায় পঞ্চাশটিরও অধিক আয়াত আছে যেখানে আল্লাহকে বিশ্বাস ও অনুসরণ না করার জন্য মৃত্যুর পর অসীম সময় ধরে ভয়ঙ্কর শাস্তি ভোগের হুমকি দেয়া আছে।

কোরানে বাতিলকৃত ও বাতিলকারী আয়াতের উপস্থিতি রয়েছে।[৮২] [এগুলোকে যথাক্রমে 'মানসুখ'ও 'নাসিখ'বলা হয়। সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা এমন কিছু বলবেন বা সিদ্ধান্ত দিবেন যা পরে বাতিল করতে হবে এ-রকম ভাবা অযৌক্তিক। ইসলাম মতে, কোরানের সবগুলো আয়াতই কেয়ামতের আগ পর্যন্ত ক্রিয়াশীল। কিন্তু কোরানে ঠিক এ-ধরনের ঘটনা ঘটেছে একাধিকবার, আল্লাহ কোনো বিষয়ে একটা নির্দেশ দিয়েছেন পরে সে নির্দেশের পরিবর্তন এনেছেন। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, যে আয়াতগুলোর নির্দেশ পরিবর্তন হয়ে গেছে সেগুলো কোরান থেকে কেন বাদ দেয়া হয়নি? এগুলোর বর্তমান উপযোগিতা কী?-অনুবাদক]। তফসিরকারক এবং ইসলামি ধর্মতাত্ত্বিক কোরানের কয়েকটি বাতিল আয়াতের তালিকা করেছেন। সিদ্ধান্তের পরিবর্তন কেবল মানুষ বা অন্যকেউ করতে পারে। স্বাভাবিকভাবে মানুষ একসাথে সম্পূর্ণ বাস্তবতাকে আঁচ করতে পারে না। মানুষের চিন্তা কোনো ঘটনার বাহ্যিকরূপ দর্শনে ভ্রান্তির দিকে যেতে পারে কিন্তু তারা অভিজ্ঞতা ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নিজেকে শোধরাতে পারে। সুতরাং মানুষের জন্য এটি বাঞ্ছনীয় যে তারা তাদের অতীত সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা পরিবর্তন করবে। কিন্তু সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী স্রষ্টার পক্ষে সিদ্ধান্ত বা নির্দেশনা পরিবর্তন অযৌক্তিক ও বাস্তবতাবিরোধী। হজরত মুহাম্মদের বিরোধীরা এ-ব্যাপারটা নিয়ে তাচ্ছিল্য করেছিলেন যে, তিনি আজ এক ধরনের উপদেশ পান তো পরদিন আবার তা বাতিল করে ফেলেন। এদের এই বক্তব্যের জবাবে আরেকটি আয়াত নাজিল হয় : 'আমি কোনো আয়াত রদ করলে বা ভুলে যেতে দিলে তার চেয়ে আরও ভালো বা তার সমতুল্য কোনো আয়াত আনি। তুমি কি জান না যে আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান?'(সুরা বাকারা : ১০৬)। স্রষ্টা যেহেতু সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তাই স্পষ্টত তিনি এমন কোনো আয়াত নাজিল করতে পারেন না যা পরবর্তীতে বাতিল করতে হয়। যেহেতু স্রষ্টা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান তাই তিনি এমন নির্দেশনা দিতে সক্ষম যার পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। যে কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তি যিনি স্রষ্টাকে সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করেন তিনি প্রশ্ন তুলতে বাধ্য যে, কেন স্রষ্টা এমন কোনো নির্দেশনা দিবেন যা পরবর্তীতে তাঁর কাছে সঠিক নয় বলে মনে হয়, বিধায় তা প্রত্যাহার করে নেবেন বা পরিবর্তন করবেন।

উপরে প্রদত্ত আয়াতে (২:১০৬) একটা অসংগতি হলো, যেহেতু আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম তাই তিনি কেন উত্তম আয়াতগুলো আগে নাজিল করেননি? দেখা যায় কোরান নাজিল হওয়ার যুগেও কিছু প্রশ্নকারী লোক তাদের অনড় অবস্থানে ছিল। সুরা নাহলে বলা হয়েছে : 'আমি যখন এক আয়াতের জায়গায় অন্য এক আয়াত উপস্থিত করি, তখন তারা বলে, 'তুমি তো কেবল মিথ্যা বানাও।'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন তা তিনি ভালো জানেন, কিন্তু ওদের অনেকেই (তা) জানে না।' (১৬:১০১)।

কোরান 'আল্লাহর বাণী' হলে তাতে মানবীয়-বুদ্ধিমত্তার আলামত থাকার কথা নয়। উপরের আয়াতের অসঙ্গতি একদম স্পষ্ট। আল্লাহ জানতেন তিনি কী নাজিল করছেন। তাই এক আয়াত দ্বারা আরেক আয়াতকে প্রতিস্থাপিত করার ব্যাপারটি সন্দেহের সৃষ্টি

করে। এমনকি আরবের হেজাজ অঞ্চলের অশিক্ষিত জনগণের মনেও এ প্রশ্নের উদয় হয়েছিল যে, যিনি (আল্লাহ) তার বান্দাদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ আবগত, তিনি প্রথমেই তাঁদের (বান্দাদের) জন্য সর্বোত্তম বিধান প্রদান করতে পারেন এবং তাঁকে (আল্লাহ) তাঁর দুর্বল বান্দাদের মতো সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হত না। এগুলো নিয়ে বিস্তারিত অধ্যয়ন ও গবেষণা থেকে এই উপসংহারে পৌঁছানো যায় যে, কোরানের আয়াতে এসব অসঙ্গতি আল্লাহ ও নবির মধ্যে পরস্পর মিলেমিশে যাওয়ার কারণেই উদ্ভূত হয়েছে। মুহাম্মদের মনের গভীরে মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ প্রোথিত ছিলেন এবং তিনি আরবদের পরিচালনার জন্য হয়েছিলেন আল্লাহর রসুল। হজরত মুহাম্মদ তাঁর চিন্তা-কর্ম বাস্তবায়ন করেছিলেন তাঁর মানব-প্রকৃতি বজায় রেখেই। ফলে কোরানের আয়াতগুলোয় তাঁর উভয় ধরনের (আল্লাহ ও নবি) ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

এ ব্যাপারে হাঙ্গেরীয় বংশোদ্ভূত ইসলাম-বিশেষজ্ঞ ইজহাক গোল্ডজিহারের নিরীক্ষণ বেশ চমৎকার ও সম্পূর্ণ বিবেচনাযোগ্য, যা বর্ণিত হয়েছে তাঁর মূল্যবান বই *'Le dogme et Ie loi de l'Islam'*- এর তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতে। তিনি লিখেছেন : 'নবিরা দার্শনিক বা ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন না। তাদের বোধশক্তি যে বার্তা তাঁদেরকে বহন করতে উদ্বুদ্ধ করত তা পূর্বপরিকল্পনার দ্বারা তৈরি মতবাদ ছিল না এবং তা প্রণালীবদ্ধ করতে সক্ষম কোনো নীতিমালাও ছিল না।'

নবি মুহাম্মদ যা শিক্ষা দিয়েছেন তা তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকেই নির্গত হয়েছিল এবং জনগণ তাঁর প্রদান করা শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। বিশ্বাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আকার নেয়। পরে ধর্মীয় পণ্ডিতরা জনগণের মধ্যেকার বিভিন্ন বিশ্বাসকে সমন্বয় করে একটি সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলেন। ধর্মীয় পণ্ডিতরা ধর্মে কোনো খুঁত বা অসঙ্গতি পেলে বিভিন্নভাবে তা দূর করা বা ব্যাখ্যা দেয়ার ব্যবস্থা করেন। তারা নবি প্রদত্ত প্রতিটি বাণীর একটি গূঢ় অর্থ কল্পনা বা আবিষ্কার করে নিয়েছেন ও ধরে নিয়েছেন এগুলোর পেছনে কোনো না কোনো যুক্তি রয়েছে। এক কথায় তারা এমন অর্থ, ব্যাখ্যা ও ধারণা নিয়ে এসেছিলেন যা স্বয়ং নবির মনে কখনো উদয় হয়নি, এবং সে-সব প্রশ্নের উত্তর ও সমস্যার সমাধান দিয়েছেন যার সম্মুখীন নবিকেও কখনো হতে হয়নি। ধর্মীয় পণ্ডিতরা তা করেছিলেন একটি ধর্মীয় ও দার্শনিকভিত্তি-সম্পন্ন ব্যবস্থা হিসাবে এবং বিরুদ্ধবাদী-ভিন্নমতাবলম্বী ও সংশয়বাদীদের জন্য এক অলঙ্ঘনীয় দূর্গ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য। তারা নবির নিজস্ব দর্শনের উপর ভিত্তি করেই তা করেছিলেন। এসব উৎসাহী পণ্ডিতরা যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হননি তা নয়, অন্য ধর্মতাত্ত্বিক ও তফসিরকারক নবির কথার প্রচুর ভিন্ন অর্থ ও ব্যাখ্যা করেছেন এবং ভিন্ন ধরনের ধর্মীয় সমাজ গড়ে তুলেছেন। [উল্লেখ্য আমরা বিখ্যাত চার সুন্নি মাজহাবের চার ইমামের কথা ধরতে পারি। তাদের সিদ্ধান্ত ও ব্যাখ্যা অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী। এছাড়া সুন্নি, আহলে হাদিস, শিয়া, কাদিয়ানি ইত্যাদি বিভিন্ন যুগের ধর্মীয় পণ্ডিতদের স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দেখা যায়।-অনুবাদক]। যদিও পশ্চিমা ইসলাম-বিশেষজ্ঞ ইজহাক গোল্ডজিহার তাঁর ভাবনাকে সব ধর্মের ক্ষেত্রে একই সাথে প্রকাশ করেছেন তথাপি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি প্রখর হয়েছে ইসলামের প্রাথমিক সময়ের খারিজি[৮৩], শিয়া, মরজিতি[৮৪], মুতাজিলা[৮৫] ও আশারিয়া[৮৬] ইত্যাদি ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধকে পর্যবেক্ষণ করার মধ্য দিয়ে। নিজে জন্মসূত্রে ইহুদি হওয়ায় এবং খ্রিস্টান চার্চ সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান থাকায় তিনি ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে একই ধরনের ব্যাপক বিতর্কের বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তবে তিনি একইসাথে ইসলামের বিস্তারের ব্যাপারে গভীর পর্যবেক্ষণে আগ্রহী ছিলেন।

আরও কিছু মৌলিক বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এ-অধ্যায়ে যোগ করা যায়। কোরানে এমন অনেক আয়াত আছে যেগুলো বুদ্ধিমান পাঠকের কাছে স্পষ্ট হওয়ার কথা। যেমন : সুরা ফাতেহর দশম আয়াতে বর্ণিত 'আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপরে'অর্থাৎ এটাই বুঝাচ্ছে আল্লাহর ক্ষমতা অনেক বেশি। সুরা ফুরকানের ৫৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : 'তারপর তিনি আরশে সমাসীন হন।'আরশ শব্দের অর্থ রাজসিংহাসন। যেহেতু আল্লাহর কোনো দেহ নেই তাই তিনি কোনো আসনে বসার কথা নয় বরং তিনি হবেন মহাবিশ্বের সর্বোচ্চ প্রভু। সুরা কিয়ামা'তে বলা হয়েছে : 'সেদিন কোনো কোনো মানুষের মুখ উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের

প্রতিপালকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে।' (৭৫:২২-২৩)। এখান থেকে বুঝায় যে, পুণ্যবান নরনারী আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করবে। কোরানে বারবার একথা পুনরাবৃত্তি হয়েছে যে, 'আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা ও সর্বজ্ঞানী'- এ থেকে আমরা বুঝি কোনো কিছুই আল্লাহর অজানা নেই।

অনেক মুসলমান বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অনমনীয়। তারা কোরানের যে ব্যাখ্যা হাদিসে আছে শুধু তা-ই গ্রহণ করতে চান এবং মনে করেন ধর্মীয় ব্যাপারে এর বাইরে কোনো যুক্তি বা বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ অনুমোদনযোগ্য নয়। তারা উপরে উল্লেখিত কোরানের আয়াতগুলোকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করেন এবং বিশ্বাস করেন আল্লাহর মানুষের মতই মাথা, মুখ, চোখ, হাত, পা রয়েছে এবং তিনি ঠিক মানুষের মতই অনুভূতিক্ষমতা সম্পন্ন। কারণ কোরানে আল্লাহর শোনা, বলা, দেখা এবং মানবসুলভ বিভিন্ন গুণের কথা উল্লেখ আছে। বাগদাদের একজন ধর্মপ্রচারক আবু মা'মার আল হুজাইলি'র (মৃত্যু ২৩৬ হজরি বা ৮৫০ খ্রিস্টাব্দ) মতে কেউ যদি এরকম আক্ষরিক ব্যাখ্যা অবিশ্বাস করে তবে সে কাফের। বিখ্যাত ইমাম আহমদ বিন হানবল কোরানের আক্ষরিক অর্থকেই গ্রহণ করেছেন এবং এর প্রতি আজীবন অবিচল ছিলেন। এই মজহাবের পরবর্তী প্রধান আহমদ বিন তায়মিয়া এ-ব্যাপারে এতোই গভীর বিশ্বাসী ছিলেন যে তিনি মুতাজিলাদের কাফের ও বিশিষ্ট ইসলামি দার্শনিক গাজ্জালিকে ধর্মবিরোধী বলে মনে করতেন। একদিন তিনি দামেস্কর প্রধান মসজিদে (উমাইয়া মসজিদ) উপস্থিত জনগণের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় ভাষণ শেষে মিম্বর থেকে নামতে নামতে বলেছিলেন, 'আল্লাহ তাঁর সিংহাসন (আরশ) থেকে এভাবে নামবেন যেভাবে আমি নামছি।'

এই ধরনের রক্ষণশীল মানসিকতাসম্পন্ন ধর্মান্ধরা শুধু মুতাজিলাদের নয় বরং আশারির মতো ধর্মতাত্ত্বিকদেরও অনৈসলামিক বলে মনে করতেন। তারা তাদের সংকীর্ণ ধর্মীয় ব্যাখ্যার ভিন্নব্যাখ্যাকে 'বিপজ্জনক উদ্ভাবন'বলে অভিহিত করতেন। আবু আমর আল কোরেশি ঘোষণা দিয়েছিলেন সুরা শুরা'র ১১ নম্বর আয়াত : 'কোনোকিছুই তাঁর মতো নয়'যা প্রকাশ করছে তা সরাসরি গ্রহণ করা ধর্মবিরুদ্ধ। তাঁর মতে এ আয়াত দ্বারা কেবল বুঝায় আল্লাহর সদৃশ কোনো পরম সত্তা নেই। কারণ আল্লাহর মানুষের মতোই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে। আবু আমর আল কোরেশি শেষ বিচার সংক্রান্ত সুরা কলমের একটি আয়াতের কথা বলেছেন : 'সেই দারুণ সংকটের দিনে যেদিন ওদেরকে সিজদা করার জন্য ডাকা হবে, (সেদিন) কিন্তু ওরা তা করতে পারবে না। (৬৮:৪২)। এরপর কোরেশি নিজের ঊরুতে হাত দিয়ে আঘাত করে বলেছিলেন, 'আল্লাহরও ঠিক আমার মত হাতপা রয়েছে।'

গোঁড়া ধর্মবাদীদের এ-রকম বিশ্বাস ইসলাম-পূর্ব যুগের আদিম বিশ্বাস ও প্রথার কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। আরবদের মধ্যে থেকে হঠাৎ করে জড়বাদী ধারণা, বিমূর্ত চিন্তায় অক্ষমতা, আধ্যাত্মিক নির্লিপ্ততা, উচ্ছৃঙ্খলা ও একগুঁয়েমি দূর হয়ে গেছে এমন নয়। সর্বোপরি তাদের মন-মানসিকতা ইরানীয়দের মতো কোনো ভিন্ন জাতি দ্বারা প্রভাবিত হয়নি অথবা তারা বিভিন্ন ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তিক দল যেমন মুতাজিলা, সুফি, শিয়া, ইখওয়ানুস-সাম এবং বাতেনাইতদের[৮৭] সংশ্রবে আসেনি।

এটা সুবিদিত যে, মৌলবাদের ধারা আরবীয়দের মধ্য থেকে আগত এবং ইসলামের প্রথম দিকের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা অ-আরবীয়দের কাছ থেকে এসেছে। মুতাজিলা ও তাদের পরবর্তী চিন্তাবিদরা হয় অ-আরবীয় অথবা এরকম আরবীয় যারা গ্রিক ও ইরানীয় প্রভাবে আদিম সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন। সবশেষে বলা যায় এসব বিষয় এ অধ্যায়ের প্রথম দিকে দেয়া অভিমতটিকে প্রমাণ করে, 'মানুষ ঈশ্বরকে নিজের মত করে কল্পনা করে নিয়েছে।'

জিন ও জাদু

জিন মানুষের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় অদৃশ্য। জিন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন পুরুষ জিন, স্ত্রী জিন, পরী ইত্যাদি। উপকারী জিন যেমন আছে তেমনি অপকারী জিনও রয়েছে। কিছু বিরল ক্ষেত্রে মানুষ জিনকে দেখতে সক্ষম হয় এবং লোকমুখে শোনা যায় কখনো কখনো পরীদের রাণী কোনো এক পুরুষ মানুষের প্রেমে পড়ে যায়, কখনো আবার পুরুষ জিন স্ত্রী মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অনেক সমাজ-সংস্কৃতিতে এ-বিষয়টি লোককথায় রয়েছে-কিছু অশুভ আত্মা আছে যা মানুষের দেহে প্রবেশ করে মৃগী রোগের লক্ষণ সৃষ্টি করে।

একইভাবে জাদুতে বিশ্বাসও দীর্ঘকালব্যাপী বিশ্বময় ছড়িয়ে আছে। অনেকের বিশ্বাস মন্ত্র, মন্ত্রপূত কবচ বা এরকম অন্যান্য কিছু দ্রব্য স্বাভাবিক উপায়ে পাওয়া অসম্ভব এমন কিছু করতে বা পেতে সহায়তা করে, যেমন এগুলো কারো মৃত্যু ঘটাতে পারে, প্রেমে পড়তে বাধ্য করতে পারে, পাগল করে দিতে পারে অথবা একটি মোমের পুতুলের চোখদুটি বিদ্ধ করার মাধ্যমে সাথে সাথে কাউকে অন্ধ করে দিতে পারে। এরকম জড়বুদ্ধিসম্পন্ন বিশ্বাস ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকেই সকল জাতির মধ্যে স্পষ্ট। দুঃখজনকভাবে এগুলো অপেক্ষাকৃত উন্নত জাতির মধ্যেও এখনো বিদ্যমান।

এই দুই ধরনের বিভ্রান্তিমূলক বিশ্বাসকে (জিন ও জাদু) ব্যাখ্যা করা কঠিন নয়। মানুষ উপলব্ধি ক্ষমতাসম্পন্ন এবং কৌতূহলী প্রাণী। মানুষের মন তার চারপাশে ঘটা বিভিন্ন ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করে বেড়ায় এবং প্রায়ই প্রকৃত কারণ বের করা তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। যখন মানুষের দুর্বল মন অজানার-অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ায় তখন তা বেশিরভাগ সময় অনুমান ও কল্পনার রাজ্যে চলে যায়। যৌক্তিক চিন্তা করে সমাধান পাওয়া না গেলে মানুষ কল্পনার আশ্রয় নেয়। মানুষ প্রকৃতির কাছে দুর্বল এবং সে প্রায়ই ভয় ও বাসনার ঊর্ধ্বে যেতে পারে না। উক্ত ব্যাপারগুলো মানুষকে কুসংস্কারের রসাতলে ঠেলে দেয়। একসময় জাদুটোনা, জ্যোতিষশাস্ত্র ইত্যাদির সাহায্যে ভবিষ্যতকথন মানুষের হৃদয়ের অন্ধকারে বাসা বেধেছিল। সপ্তম শতাব্দীর আরবরা কুসংস্কারে নিমজ্জিত থাকার বিষয়টি আশ্চর্যজনক নয়। আশ্চর্যের বিষয় যেটি তা হলো কোরানে উক্ত বিভ্রমদ্বয়ের (জিন ও জাদু) কথা শুধু উল্লেখ করা হয়েছে তাই নয় বরং এগুলোকে বাস্তব বলে অবিহিত করা হয়েছে।

সুরা ফালাক ও সুরা নাস -এর মূল বিষয় জাদুটোনা। বেশির ভাগ তফসিরকারকের মতে, কুরাইশ বংশের পৌত্তলিক লাবিব বিন আসাম নবিকে জাদু করেছিল, যা তাঁর স্বাভাবিক কাজকর্ম চালাতে ব্যাঘাত ঘটায় এবং নবি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে জিবরাইল এসে তাঁকে জাদুর বিষয়টি অবহিত করেন। ক্যামব্রিজ তফসিরে রয়েছে, নবি যখন অসুস্থ অবস্থায় ঘুমাচ্ছিলেন তখন স্বপ্নে দেখলেন দুজন ফেরেশতা তাঁর মাথার উপরে এসেছেন এবং একজন অপরজনকে জিজ্ঞেস করছেন-'এই লোকটি কেন অসুস্থ হয়েছে ও আর্তনাদ করছে?'অন্য ফেরেশতা উত্তর দিলেন-'কারণ লাবিব তাঁকে জাদু করেছে, ও যা দিয়ে জাদু করেছে তা দরওয়ান কূপের নিচে আছে।'নবি ঘুম থকে উঠে হজরত আলি এবং আম্মার বিন ইয়াসিরকে (প্রথমদিককার একজন ধর্মান্তরিত মুসলিম) জাদুকৃত বস্তুর সন্ধানে পাঠালেন। তাঁরা কূপ থেকে পানি সরিয়ে ফেললেন এবং ফেরেশতারা যেমন বলেছিলেন সেভাবে কূপের নিচের একটি পাথরের তলদেশ থেকে বস্তুটি উদ্ধার করলেন। বস্তুটি ছিল একটি দড়ি যাতে এগারোটি গিঁট দেয়া ছিল। তাঁরা এটি নবির কাছে নিয়ে এলেন। এরপর কোরানের সুরা দুটি নাজিল হয় যাতে এগারোটি আয়াত ছিল এবং একেকটি আয়াত পাঠের সাথে একটি করে গিঁট খুলতে লাগলো। এবং নবি সুস্থ হলেন। তাবারি আরও বর্ণিল বিবরণ দিয়েছেন, অবশ্য তফসির আল-জালালাইনে শুধু

বলা হয়েছে এই সুরা দুটির প্রতিটি আয়াত একেকটি গিঁট খুলেছিল। জামাখশারি জাদুতে বিশ্বাসী ছিলেন না তাই তিনি যুক্তিবাদীদের মতো এই কাহিনী তাঁর 'কাশশাফ' থেকে বাদ দিয়েছিলেন। [দ্রষ্টব্য : বুখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৭১, নম্বর ৬৫৮, ৬৬০-৬৬১ হাদিসে এই জাদুটোনার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।-অনুবাদক।]

কোরানের কোনো তফসিরকারক বা ধর্মতত্ত্ববিদ জিনের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ করেননি, কারণ কোরানের দশটিরও অধিক আয়াতে জিনের কথা বলা হয়েছে। 'জিনকে সৃষ্টি করেছেন ধূম্রহীন অগ্নিশিখা থেকে।'(সুরা রহমান : আয়াত ১৫)। 'সুরা জিন' নামে কোরানের একটি সুরা রয়েছে, এর প্রথম দুই আয়াতে বলা হয়েছে একদল জিন কোরান আবৃত্তি শুনেছে : 'বলো, আমি প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জেনেছি যে জিনদের একটি (কোরান) শুনেছে ও তাদের সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে বলেছে, 'আমরা তো এক বিস্ময়কর কোরান শুনেছি, যা সঠিক পথনির্দেশ দেয়। তাই আমরা এতে বিশ্বাস করেছি। আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের কোনো শরিক করব না।'(৭২:১-২)। বিশ্বের অন্যান্য আদিম সমাজের মতো প্রাচীন আরবরাও ভাল এবং মন্দ আত্মায় বিশ্বাস করতো। মরুভূমির রুক্ষ আবহাওয়া ও একাকীত্ব তাদের এ-বিশ্বাসকে প্রবল করে তুলত। যখন একজন আরব বসবাসের অযোগ্য ভূতুড়ে জায়গায় একাকী রাত্রি যাপন করত তখন সে ভয় পেয়ে খারাপ জিনের কাছ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মন্ত্রোচ্চারণ করত। কোরানে এ নিয়ে বলা হয়েছে : '. . . কোনো কোনো মানুষ কিছু জিনের শরণ নিত, ফলে ওরা জিনদের অহংকার বাড়িয়ে দিত।'(৭২:৬)।

যেখানে আদিম সমাজ ও উন্নত সভ্যতার নিম্নস্তরের লোকদের মধ্যে এই ধরনের বিভ্রান্তিকর ও অযৌক্তিক বিষয়ে বিশ্বাসের কারণ সহজেই বোধগম্য, সেখানে আল্লাহর গ্রন্থ কোরানে উক্ত বিষয়গুলো সত্য বলে বর্ণিত হওয়া বিস্ময়কর বটে। অথচ ওই গ্রন্থ তথা ধর্মকে যিনি প্রচার করেছেন তিনি তাঁর এলাকার বহু লোকপ্রথা এবং কুসংস্কারকে প্রত্যাখ্যান করেছেন; তাদের নৈতিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে সংস্কার করেছেন। সুরা জিনে যেসব বিষয় আলোচনা করা হয়েছে (যেমন নবির সাথে জিনের যোগাযোগ) তা হয়তো মুহাম্মদ স্বপ্নে দেখেছিলেন। নবি হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার সময় তিনি প্রথমবারের মত ফেরেশতাকে দেখতে পেয়েছিলেন-এটা মানসিক উত্তেজনাপ্রসূত অলীক দর্শন ছিল। দূরবর্তী মসজিদে ভ্রমণ (ইসরা ও মেরাজ) স্বপ্নে ঘটেছিল বলে ব্যাখ্যা করা যায়।

আরেকটি সম্ভাবনার কথা বলা যায়। জিনের অস্তিত্বের প্রতি মুহাম্মদের গভীর বিশ্বাস তাঁর কল্পনাবিলাসী মনের ওপর এতই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে তিনি মানুষের মতই উপলব্ধিক্ষমতা সম্পন্ন, বৌদ্ধিক চিন্তার অধিকারী ও নৈতিক বোধসম্পন্ন আরেকটি জাতির দর্শন লাভ করেছেন বলে তাঁর মনে হতে লাগলো, যারা এক ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাসের ব্যাপারে মানুষের মতই বাধ্য ছিল। এখানে প্রশ্ন আসে জিনদের নিজেদের মধ্য থেকে নবি নিয়োগ করা হয়নি কেন? কারণ কোরানের একাধিক আয়াতে (১০:৪৭ ও ১৬:৩৬) স্পষ্ট বলা হয়েছে প্রতিটি জাতি থেকে (যিনি তাদের ভাষায় কথা বলেন ও তাদের অন্তর্ভুক্ত) তাদের নিজস্ব রসুল প্রেরণ করা হয়। তদুপরি সুরা বনি-ইসরাইল বলা হয়েছে : 'ফেরেশতারা যদি নিশ্চিন্ত হয়ে পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করতে পারত তবে আমি আকাশ থেকে এক ফেরেশতাকেই ওদের কাছে রসুল করে পাঠাতাম।' (১৭:৯৫)। বিষয়টি এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়, সুরা জিন রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন জালালুদ্দিন রুমি বলেছিলেন : 'আপনি যখন শিশুদের সাথে থাকবেন তখন শিশুসুলভ ভাষা ব্যবহার করতে হবে।' সম্ভবত নবি তাঁর লোকদের প্রণোদিত করার মানসে এই কাহিনী তৈরি করেন যে, জিনরা কোরান শুনে এত বেশি প্রভাবিত হয়েছে যে তারা মুসলমান হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা যাই হোক, নবি মুহাম্মদকে দোষারোপ করা যায় না। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের অনেকেরই গণিত, প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানে উন্নত ধারণা থাকা সত্ত্বেও সমসাময়িক সাধারণ মানুষের বিশ্বাসকে পরিহার করতে পারেননি, প্রকৃতপক্ষে তারা গ্রিক ধর্মীয় মিথলজির মধ্যে ডুবে ছিল। তবে হ্যাঁ, এখানে একটি উভয় সঙ্কট আছে। মুসলিমরা বিশ্বাস করেন কোরান আল্লাহর কাছ থেকে নবি মুহাম্মদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং কোরানের কোনো অংশ নবি কর্তৃক রচিত বলে অস্বীকার করেন। তদুপরি সুরা

জিন শুরু হয়েছে 'বল'আদেশ দিয়ে। আল্লাহ কি আরবের হেজাজ অঞ্চলের লোকদের জিন-পরীতে বিশ্বাসের সাথে একমত? অথবা এগুলোতে বিশ্বাস কি মুহাম্মদের হৃদয়ে প্রোথিত ছিল এবং তাঁর বাণীতে তা চিরন্তন রূপ পেয়েছে?

মহাবিশ্বের সৃষ্টি কাহিনী

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম মানুষের চিন্তার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এটি প্রাচীনকালের মানুষের সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্পর্কিত সরল ও অপরিপক্ক ধারণাকে প্রদর্শন করে। বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী, ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম নেন যা 'সাবাতের দিন'নামে পরিচিত। যেহেতু সৃষ্টির আগে সূর্যের অস্তিত্ব ছিল না বিধায় সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় ঘটত না তাই পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টির সময়কে দিন (ছয় দিন) ধরে হিসাব করা স্পষ্টত অবান্তর। এছাড়া প্রশ্ন হল, কেন ঈশ্বর মানুষের তৈরি করা সময়ের মাপদণ্ড দিয়ে তাঁর সৃষ্টির সময়কে হিসাব করবেন? কেন তিনি পৃথিবী নামক গ্রহের সময়কে একক ধরে হিসাব করবেন যেখানে অন্যান্য অনেক দূরবর্তী গ্রহ (যেমন নেপচুন) রয়েছে? ঈশ্বর সূর্য ও পৃথিবী সৃষ্টি করার আগের সময়ে দিন ও রাত কিভাবে সংগঠিত হত?

মহাবিশ্বকে ছয় দিনে সৃষ্টি করার ব্যাপারটি কোরানের অন্তত আটবার উল্লেখ করা হয়েছে। [আরবি 'সিত্তাতি আইয়্যাম'মানে সরলভাবে 'ছয় দিন'। আইয়্যাম হচ্ছে আরবি ইয়াওম বা দিন-এর বহুবচন। এছাড়া 'আরশ'শব্দের অর্থ রাজসিংহাসন। বিভিন্ন আয়াতে (৭:৫৪, ২৫:৫৯, ১১:৭, ২৩:৮৬-৮৭, ১১৬, ৩২:৪) আল্লাহর আরশে আরোহণের কথা উল্লেখ আছে। প্রশ্ন উঠতে পারে কেন নিরাকার স্রষ্টাকে রাজসিংহাসনে আরোহণ করতে হবে? তবে কি মানব-মানসের ধারণার ওপর ভিত্তি করে স্রষ্টার ধারণা তৈরি হয়েছে? কোরানে স্পষ্টভাবে বলা আছে-আল্লাহর সিংহাসন আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির আগে পানির ওপরে ছিল। উল্লেখ্য আল্লাহর ধারণা ইসলাম-পূর্ব যুগের পৌত্তলিকদের কাছ থেকে এসেছে। আরবের পৌত্তলিকরা 'আল্লাহ'কে অন্যতম প্রধান দেবতা মনে করতো। হজরত মুহাম্মদের বাবা যিনি পৌত্তলিক ছিলেন তাঁর নাম ছিল 'আব্দুল্লাহ'মানে 'আল্লাহর দাস', তাঁর চাচা আবু লাহাবের আসল নাম 'আব্দুল ওজ্জা'মানে দেবী ওজ্জার দাস।-অনুবাদক]। নিচে এরকম কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো :

১. তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, তারপর তিনি আরশে সমাসীন হন। (সুরা ইউনুস : আয়াত ৩)।

২. তোমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ যিনি আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, তারপর তিনি আরশে সমাসীন হন। (সুরা আ'রাফ : অয়াত ৫৪)।

৩. যখন তাঁর আরশ পানির ওপর ছিল তখন তিনিই আকাশ ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করেন। (সুরা হুদ : আয়াত ৭)। এ-আয়াত থেকে জানা যায় ছয় দিনে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করার আগে আল্লাহর সিংহাসন পানির ওপরে ছিল অর্থাৎ সিংহাসন ও পানি আসমান ও জমিন সৃষ্টির আগে থেকেই অস্তিত্বশীল ছিল। সুরা ইউনুসের ৩ নম্বর আয়াত এবং সুরা আ'রাফের ৫৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখ রয়েছে আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পর তাঁর সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। এটা সম্ভবত বাইবেলের বর্ণনার প্রতিধ্বনি যেখানে বলা হয়েছে ঈশ্বর ছয় দিনে সৃষ্টির পর সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছেন। লক্ষণীয় এই আয়াতগুলোর গঠন দেখে মনে হয় তা আল্লাহর বাণী নয় বরং আল্লাহ সম্পর্কে অন্য কোনো ব্যক্তির বক্তব্য। নবির নিজের বক্তব্যও হতে পারে। নিচের আয়াতের বক্তা আল্লাহ :

৪. ‘আমি আকাশ, পৃথিবী এবং দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছি। ক্লান্তি আমাকে স্পর্শ করেনি।’(সুরা কাফ্ : আয়াত ৩৮)। এই আয়াতটি আগের তিন আয়াতের থেকে কিছুটা ভিন্ন যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ ছয়দিনে শুধু আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তা নয় বরং এর মধ্যে যা আছে সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন। এবং এ-ধরনের গুরুকাজ সম্পাদনে কোনোভাবে ক্লান্ত হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছে। মানুষ বা অন্য প্রাণীরা ক্লান্ত হতে পারে কোনো গুরুকাজ সম্পাদনের ফলে, একজন সর্বশক্তিমান ও চিরঞ্জীব স্রষ্টা ক্লান্ত হওয়ার প্রশ্নই আসে না। তাই ‘ক্লান্তি আমাকে স্পর্শ করেনি’ কথাটি বিস্ময়ের সঞ্চার করে ও নিরাকার স্রষ্টার এ-ধরনের পরিচয় জ্ঞাপন বিভিন্ন প্রশ্নের জন্ম দেয়। অবশ্য এই বিবরণ বাইবেলে বর্ণিত ঈশ্বরের সপ্তম দিনে বিশ্রামের ধারণার বিপরীত।

৫. বলো, ‘তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবে যিনি দুদিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও?’ (সুরা হা-মিম-সিজদা : আয়াত ৯)। এখানে বক্তা স্বয়ং আল্লাহ, তিনি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করছেন দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্টির কথা। এই বাক্যটি এরকম ইঙ্গিত করছে যে, আরবের মক্কার লোকেরা দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে অবগত ছিল এবং তাই তাদের উচিত নয় সেই স্রষ্টাকে অস্বীকার করা যিনি মাত্র দুই দিনে এরকম দুষ্কর কার্য সমাধা করেছেন। কিন্তু আরবরা নিশ্চয় এই সৃষ্টির ব্যাপারে জানত না, তা না-হলে তাদেরকে প্রশ্ন করা হত না, ‘কেন তারা স্রষ্টায় বিশ্বাস করে না।’ যদিও এখানে আল্লাহ বক্তা বলে মনে হয়, তারপরেও এ ধরনের বাণী আল্লাহর জন্য উপযোগী নয়। অসীম জ্ঞানী পরমেশ্বরের উচিত নয় এটি আশা করা যে, পৃথিবী দুই দিনে সৃষ্টি হয়েছে বললেই লোকে তাঁকে বিশ্বাস করে ফেলবে অথবা কিছু আরব দুই দিনে কেউ একজন পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তা স্বীকার করলেই তাঁকে সবাই বিশ্বাস করে ফেলবে? সুতরাং এ-ধরনের বাক্যও স্রষ্টার নয়, অন্য কারো কল্পনার ফসল হতে পারে।

৬. তিনি পৃথিবীর উপরিভাগে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন ও সেখানে কল্যাণ রেখেছেন, চারদিনের মধ্যে সেখানে মাত্রা অনুযায়ী খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন, সমানভাবে সকলের জন্য, যারা এর সন্ধান করে। (৪১:১০)।

৭. তারপর তিনি আকাশের দিকে মন দিলেন, আর তা ছিল ধোঁয়ার মতো। তারপর তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে বললেন, ‘তোমরা কি দুজনে স্বেচ্ছায় আসবে নাকি অনিচ্ছায়?’ তারা বলল, ‘আমরা স্বেচ্ছায় এলাম।’(৪১:১১)। সুরা হা-মিম-সিজদাহ এর আয়াতে আল্লাহর আরশের উল্লেখ নেই। এই সুরার ১০-১১ আয়াতে আকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আরবি ভাষা আনুসারে উক্ত আয়াতে উল্লেখিত ‘আকাশ’ ও ‘পৃথিবী’ স্ত্রীবাচক বিশেষ্য। ‘বললেন’ক্রিয়াপদটিও স্ত্রীবাচক বিশেষ্য এবং দ্বিবচন, কিন্তু আয়াতটির শেষে সংযোজিত বিশেষণ ‘ইচ্ছায়’ পুরুষবাচক এবং বহুবচন। তাই এই বাক্য-সমষ্টি আরবি ব্যাকরণ অনুসারে সিদ্ধ নয়।

৮. তারপর তিনি আকাশকে দুদিনে সাত-আকাশে পরিণত করলেন আর প্রত্যেক আকাশকে তার কাজ বুঝিয়ে দিলেন। (৪১:১২)। এই আয়াতে অতিরিক্ত দুই দিনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা সাত আকাশকে সজ্জিতকরণে ব্যয় হয়েছে। এই ‘দুই দিন’ছয় দিনে মহাবিশ্ব সৃষ্টির বিষয়টিকে আট দিনে পরিণত করে এবং কোরানের বিভিন্ন আয়াতে ছয় দিনে সৃষ্টির সাথে বৈপরীত্ব সৃষ্টি করে। এ-ধরনের বিশৃঙ্খলা এসব আয়াতকে ‘আল্লাহর বাণী’ হিসেবে মেনে নিতে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দেয়। আরেকটি উভয়-সঙ্কট অবস্থা সৃষ্টি করে সুরা তওবা’র দিনপঞ্জি সম্পর্কিত আয়াত : ‘আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর কাছে মাসগণনায় মাস বারোটি, তার মধ্যে চারটি মাস (মহরম, রজব, জিলকদ ও জিলহজ) হারাম। এ-ই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান।’(৯:৩৬)।

পৃথিবীর মানুষ জানে প্রায় ৩৬৫ দিনে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসে। তারা উপলব্ধি করতে পারে বছরে চারটি ঋতু আছে ও সে অনুযায়ী তাদের কাজকর্মকে সাজিয়ে নেয়। প্রাচীন ব্যবিলনীয়, মিশরীয়, চীনা, ইরানীয় ও গ্রিক সভ্যতার লোকজন

সৌরবছর অনুযায়ী তাদের দিন গণনা করত, তারা সূর্যের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে চার ঋতুর প্রত্যেকটির তিন ভাগে ভাগ করে নেয়, ফলে বছরে ১২ টি মাস হয়ে যায়। সামান্য গাণিতিক জ্ঞানসম্পন্ন প্রাচীন লোকদের কাছে সূর্যের অবস্থানের সঠিক পর্যবেক্ষণ কঠিন ছিল। তাই তারা হিসাব সহজ করার জন্য চাঁদের বিভিন্ন দশাকে পর্যবেক্ষণ করে মাসের হিসাব তৈরি করতে থাকে। [চাঁদ ২৭.৩ দিনে একবার পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে আসে এবং ২৯.৫ দিনে পূর্বের দশায় ফিরে আসে। তাই চাঁদের দশা পর্যবেক্ষণ করে মাসের হিসাব করা সূর্যের তুলনায় সহজ ছিল প্রাচীন লোকদের জন্য। এছাড়া মরুময় পরিবেশে চাঁদ পর্যবেক্ষণও সহজতর ছিল।-অনুবাদক]। যেহেতু চাঁদের দশার সাথে ঋতু পরিবর্তনের সম্পর্ক নেই তাই চন্দ্রমাস কৃষিকাজের সময় হিসাবের ক্ষেত্রে গুরুত্বহীন, যা তখনকার সময় জীবিকা নির্বাহের মূল উৎস ছিল।

আরবের বাসিন্দারা তারিখ হিসাবের ক্ষেত্রে চন্দ্রমাস ব্যবহার করত। যুদ্ধ-কলহ থেকে নিয়মিত বিরতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে চারটি মাসকে পবিত্র বলে গণ্য করা হত। এই চার মাস যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল। কিছু আরবীয় লোক বারোটি চন্দ্রমাসের সমন্বয়ে যে বছর গণনা করত তাকে সৌরবছরের সাথে সমতা বিধানের নিমিত্তে বছর শেষে নতুন বছর গণনা স্থগিত করে পুরনো বছরকে কিছুদিন দীর্ঘায়িত করত। অবশ্য কোরানে দেখা যায়, প্রাচীন আরবরা চন্দ্রবছরকে প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম বলে উল্লেখ রয়েছে। সৌরবছরের সাথে সমতা বিধানের নিমিত্তে বছরের দীর্ঘায়নকে কোরানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে : 'এই মাস অন্য মাসে পিছিয়ে দিলে তাতে কেবল অবিশ্বাসের মাত্রা বৃদ্ধি করবে।'(৯:৩৭)। যে প্রভু প্রাচীন আরবীয় চন্দ্রমাস দ্বারা তারিখ গণনাকে সর্বযুগ ও পৃথিবীর সকল স্থানের জন্য আবশ্যক করে দেন তিনি নিঃসন্দেহে একজন স্থানীয় আরবীয় দেবতা। তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা নন। অথবা তিনি হয়তো স্বয়ং নবি মুহাম্মদ। একইভাবে আরবীয়-প্রথা মক্কায় তীর্থযাত্রাকে মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় কর্তব্যে পরিণত করা হয়েছে। সাফা-মারওয়ায় দৌড়ানোকে ইসলামি-প্রথায় নিয়ে আসা হয়েছে। মানুষের একটি ধর্মীয় প্রথাকে প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে কোরানে : 'লোকে তোমাকে নূতন চাঁদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বলো, তা মানুষের সময় ও হজের সময়-নির্দেশ করে।' (২:১৮৯)।

তফসির আল-জালালাইন-এ আয়াতের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এরকম : 'চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি এজন্য ঘটে যাতে মানুষ শস্য রোপন ও কাটা, হজ, রোজা রাখা ও রোজা ভঙ্গ করা ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করতে পারে।' চাঁদের বিভিন্ন দশা কৃষিকাজের ক্ষেত্রে কোনোরূপ সাহায্য করতে পারে না। চন্দ্রমাসগুলো হজ ও রোজার সময়কে নির্দেশের ক্ষেত্রে ব্যবহারের আদেশ দেয়া হয়েছে,এটি আরবে নিত্যনৈমিত্তিক কাজে ব্যবহার উপযোগী ছিল না। চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির মূল কারণ হচ্ছে পৃথিবীর চারপাশে এর নিজ কক্ষপথে ঘূর্ণন এবং পৃথিবীর ঘূর্ণনের সাথে সাথে এর অবস্থান পরিবর্তন ও বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর সাথে সূর্যের অবস্থান। বাঁকা চাঁদ ও পূর্ণ চাঁদ হেজাজ ও নেজদ অঞ্চলে আরবদের বাস শুরু করার হাজার বছর আগে থেকে মানুষের কাছে দৃশ্যমান ছিল। এমন কী, যখন মানবজাতির জন্ম হয়নি তখনও চাঁদের এই হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটত। এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা বলে কেউ থাকলে নিশ্চয়ই তিনি এ-গুলো সম্পর্কে অবগত থাকার কথা। সুতরাং তিনি এমন কোনো বাক্য উচ্চারণ করবেন না, যা কোনো ঘটনার ফলকে (হজ, রোজা) তার 'কারণ'হিসেবে চিহ্নিত করবে।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে : 'অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশ ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল? তারপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম।'(সুরা আম্বিয়া : ৩০)। শুধু অবিশ্বাসী-কাফেররা নয় বরং অন্য কেউই এ-রকম ঘটনা কখনো প্রত্যক্ষ করেনি বা এ-রকম বিষয় ভেবে দেখারও কোনো কারণ ঘটেনি। যারা কাফের নয় তাদের কাছেও আয়াতটি সহজবোধ্য নয়। [আকাশ ও পৃথিবী সংযুক্ত ছিল-এরকম বক্তব্য থেকে কেউ কেউ আজকের যুগে বিগব্যাং থিওরির সাথে মিলিয়ে দিতে চান। এই আয়াতে স্পষ্টভাবে পৃথিবীর কথা হয়েছে, কিন্তু পৃথিবীর উদ্ভব ঘটেছে বিগব্যাং-এর প্রায় হাজার কোটি বছর পরে। তাই এই আয়াত বরং আমাদেরকে পৃথিবী-কেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণার ইঙ্গিত দেয়।-অনুবাদক]।

পাদটীকা

৭৮. পারস্যের প্রখ্যাত সুফি কবি মাহমুদ শাবেস্তারি। উত্তর-পশ্চিম ইরানের শহর তাবরিজে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১২৮৮ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যুবরণ করেন ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে। আনুমানিক ১৩১১ খ্রিস্টাব্দের দিকে সুফিবাদ নিয়ে তাঁর অনবদ্য কাব্যরচনা 'গুলশান-ই-রাজ'ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে লন্ডন থেকে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে *'The Rose-Garden of Mysteries'* শিরোনামে। ইংরেজি অনুবাদ এবং সম্পাদক : Edward Henry Whinfield।

৭৯. প্রথম সুরা ফাতিহা'য় 'পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহর নামে'বাক্যকে একটি আলাদা আয়াত হিসেবে গণনা করা হয়েছে, অন্য সুরাগুলোর ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। সুরা ফাতিহা'য় আরও ছয়টি ছোট আয়াত রয়েছে।

৮০. আরবি 'মারহানি'শব্দটিকে 'পুনরাবৃত্তি'হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে। এটা একটা অস্পষ্ট অনুবাদ। শব্দটি কোরানের অন্য দুটি আয়াতেও এসেছে; যথা সুরা হিজরের আয়াত ৮৭ সুরা জুমারের আয়াত ২৩। এই অনুবাদ নিয়ে ভিন্নমত রয়েছে। একটি ধারণা মতে, এই শব্দের অর্থ হচ্ছে আয়াতসমূহ দুইবার অবতীর্ণ হয়েছে এবং অন্য ধারণা মতে কিছু আয়াতকে প্রার্থনার সময় বারবার ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। অবশ্য অন্য আরেকটি মতে, এর অর্থ হচ্ছে প্রশংসা করা।

৮১. কুরাইশ বংশের বানু সাহম গোত্রের আমর ইবনে আল-আস মিশর দখল করে প্রথম শাসক হয়েছিলেন। আবু মুসা আল-আশারি ছিলেন ইয়েমেনের বাসিন্দা। পরবর্তীতে বসরার গভর্নর নিযুক্ত হন এবং খুজেস্তান দখল করেন। ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে হজরত আলি ও মুয়াবিয়ার মধ্যে সিরিয়ার সিফিফন প্রান্তরে সংঘটিত যুদ্ধ সমাপ্তির জন্য মধ্যস্থতা করেন আমর ও আশারি। আমর ইবনে আল-আস ছিলেন মুয়াবিয়ার পক্ষে এবং আশারি ছিলেন হজরত আলির পক্ষে। দক্ষিণ জর্দানের নিকটবর্তী শহর পেত্রার কাছে আধরুতে বৈঠকে বসেন আমর এবং আশারি। আমর যুদ্ধ বন্ধের জন্য আলি ও মুয়াবিয়া উভয়কে অযোগ্য ঘোষণা করতে আশারিকে প্ররোচিত করেন এবং আশারিও সেই বক্তব্যে সায় দেন। কিন্তু পরে আমর ইবনে আল-আস মুয়াবিয়ার পক্ষ নিয়ে কেবল আলিকে অযোগ্য ঘোষণা করেন।

৮২. বাতিল হওয়া আয়াতের মধ্যে রয়েছে সুরা বাকারার ২৪০ নম্বর আয়াত। এটি কোরানে বিধবাদের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধান। এর স্থলে নাজিল হয়েছে সুরা নিসার ১২ নম্বর আয়াতটি। আবার সুরা নিসার ১৯ নম্বরআয়াতটি বাতিল করে নাজিল হয়েছে সুরা নুরের ২ নম্বর আয়াত। এটি নারীদের ব্যভিচারের সম্পর্কিত কোরানের বিধান। মাদক গ্রহণ সম্পর্কিত বিধান সুরা বাকারা'র ২১৯ নম্বর আয়াত বাতিল করে প্রতিস্থাপিত হয়েছে সুরা মায়িদা'র ৯১ নম্বর আয়াত।

৮৩. খলিফার দাবি নিয়ে মধ্যস্থতার চুক্তি অনুমোদন করায় আলির পক্ষ থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয় খারিজিরা। ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে তারা আলির দল থেকে বেরিয়ে পড়ে। খারিজিদের মতে, 'একজন কালো ক্রীতদাসও যদি সবচেয়ে ধার্মিক মুসলমান হয়, তবে তাকেই ইমামের (মুসলিম সমাজের নেতা) মর্যাদা দেয়া উচিত। আবার যে মুসলমান গুরুতর অপরাধ করে তার ইমান নষ্ট হয়ে যায়, তাকে কৃতকর্মের জন্য ইহজগতেই শাস্তি পেতে হবে।'খারিজিদের কিছু গোষ্ঠী এখনো ওমান ও আলজেরিয়ায় বসবাস করে।

৮৪. মরজিতি সম্প্রদায় বিশ্বাস করতেন একজন মুসলমানের ইমানের নিষ্ঠতা কেবলমাত্র আল্লাহই বিচার করতে পারেন। এমন কী মুসলমান অপরাধীদের সাজার জন্য শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত অথবা আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়া উচিত। মরজিতি গোষ্ঠী উমাইয়া খলিফাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন কেননা তাদের মতে, উমাইয়া খলিফারা পাপী হলেও প্রতিষ্ঠিত শাসক ছিলেন।

৮৫. মুতাজিলারা ইসলামের মধ্যে যুক্তিবাদী ধর্মীয়-সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত। মুতাজিলাদের মতে, 'স্রষ্টা বা আল্লাহর কেবল প্রয়োজন রয়েছে বলেই তাঁর অস্তিত্ব রয়েছে। মানুষ স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী এবং কোরান অনাদিকাল থেকে রচিত নয়, মুহাম্মদের জীবনকালে আল্লাহ কর্তৃক কোরান রচিত হয়েছে।'আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুন (৭৮৬-৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ), আল-মুতাসিম বিল্লাহ (৭৯৬-৮৪২ খ্রিস্টাব্দ), এবং তাঁর পুত্র আল-ওয়াতিক (৮১৬-৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ) তাঁদের শাসনামলে মুতাজিলাদের ধর্মতত্ত্বের পাশাপাশি যুক্তিবিদ্যা, দর্শন চর্চায় উৎসাহ প্রদান করেন এবং মুতাজিলা-বিরোধী বিচারক ও সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে শুদ্ধি-অভিযান পরিচালনা করেন। মুতাজিলাদের মধ্যে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হিসেবে বিবেচনা করা হয় পারস্যের আল-জামাখশারিকে (১০৭৫-১১৪৪? খ্রিস্টাব্দ)।

৮৬. ইরাকের বসরায় জন্মগ্রহণকারী সুন্নি ধর্মতাত্ত্বিক আবুল হাসান আলি ইবনে ইসমাইল আল-আশারি'র (৮৭৪-৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ) অনুসারীদের আশারিয়া বলা হয়। ইসমাইল আল-আশারি তরুণ বয়সে মুতাজিলা মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন। ছাত্রজীবনে প্রখ্যাত মুতাজিলা শিক্ষক আল-জুব্বায়-এর ছাত্রও ছিলেন। পরর্তীতে তিনি যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করে সুন্নি ইসলামের রক্ষণশীল মতাদর্শ গ্রহণ করেন। তিনি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও বৈজ্ঞানিক কার্যকারণে অবিশ্বাসী হয়ে নিয়তিবাদ এবং আল্লাহ কর্তৃক অবিরাম সৃষ্টিতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। যুক্তি ও দর্শনের চর্চাকে তিনি কুফরি বিদ্যা বলে অভিহিত করেন। তাঁর অনুসারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, আল-গাজ্জালি, আল-রাজি, আবু বকর আল-বাকিল্লানি, আবুল হাসান আল-বাহিলি, আল-জুয়ায়নি প্রমুখ।

৮৭. কোরানের আয়াত ও ইসলামি আইন-প্রথাসমূহের গূঢ় অর্থ অনুসন্ধানে নিয়োজিত ব্যক্তিদের হেয় করতে মধ্যযুগে কট্টরপন্থী ইসলামি চিন্তাবিদরা এই পরিভাষাটি ব্যবহার করতেন। যদিও খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্বে এই শব্দটি আধ্যাত্মিক সাধক সুফিদের জন্য প্রযোজ্য ছিল। পরবর্তীতে ইসমাইলি শিয়া গোষ্ঠী যেমন পূর্ব আরবের কারমাতি গোষ্ঠী, মিশরের ফাতেমি রাজবংশ, ইখওয়ান আশ-শিয়া নামের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে, যারা খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর দিকে বসবাস করতো তাদের বাতেনাইত বলে সম্বোধন করা হতো।

পঞ্চম অধ্যায়

মুহাম্মদের পর

পরবর্তী প্রজন্ম

হিজরি ১১ সালে (আনুমানিক ৮ জুন ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ) যে উজ্জ্বল তারকা আরব-জগতে ২৩ বছর ধরে জ্বলজ্বল করছিল তা অবশেষে অস্তমিত হয়ে গেল। মুহাম্মদের মৃত্যুর পর আনসারদের মাঝে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় নবির মরদেহ ঠাণ্ডা হবার আগেই বানু সায়েদা সভাকক্ষে আনসাররা জমায়েত হলেন। তাঁরা আওয়াজ তুললেন, 'আমাদের জন্য একজন আমির, তোমাদের জন্য আরেক আমির'। এর ফলে যা হবার তাই হল। মক্কা থেকে আসা মুহাজির এবং মদিনার স্থানীয় বাসিন্দা যারা ইসলাম গ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে বিরোধ চরমে পৌঁছায়। ইসলামের ইতিহাস পাঠ করলে এটা পরিষ্কার জানা যায় যে, নবির মৃত্যুর পর মুসলমানদের মধ্যে পর্যায়ক্রমিক ক্ষমতার লড়াই দানা বাঁধে। এই ক্ষমতার সংগ্রামে 'ধর্ম' ব্যবহৃত হয়েছে হাতিয়ার হিসেবে।

নবুওতি লাভের পর মুহাম্মদ মক্কায় অবস্থান করেন তের বছর। এরপর তিনি চলে যান মদিনায়। এই তের বছর মুহাম্মদ মূলত আধ্যাত্মিক কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এ-সময় কোরানের যে আয়াতগুলি নাজিল হয় তার সবই ছিল ধর্মোপদেশ, পথনির্দেশ এবং উত্তম কাজ করার আবেদন, যাতে করে মক্কাবাসীরা অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকে। মদিনায় হিজরতের পর এ-ধরনের নৈতিকতাভিত্তিক এবং আধ্যাত্মিকধর্মী আয়াত নাজিল হওয়া কমে যায়। এর বদলে মদিনার আয়াতগুলোতে প্রধানত গুরুত্ব পায় আদেশ-নিষেধ এবং আইন। আল্লাহ এই আয়াতগুলি তখনকার মদিনার মুসলমানদেরকে তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে সুসংহত ও শক্তিশালী করার জন্য প্রেরণ করেন। ফলে মাদানি আয়াতের মাধ্যমে মুহাম্মদ এক নতুন সমাজের ভিত্তি স্থাপনে সচেষ্ট হন। মদিনার অনুকূল পরিস্থিতির জন্য নবি মুসলমানদের এক নতুন সমাজ সৃষ্টিতে সফল হন।

কোরান এবং মুহাম্মদের জীবনযাপন থেকে এটা পরিষ্কার যে, মক্কা ও মদিনার পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু তা যাই হোক সব কিছুর পিছনে মুহাম্মদের একটি উদ্দেশ্য ছিল, আর তা হল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। অবশেষে মদিনায় এক ইসলামি রাষ্ট্র সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি তাঁর আজন্ম লালিত লক্ষ অর্জন করেন। নবি কৌশলী হয়েছেন, শক্তি প্রয়োগ করেছেন, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, রক্তপাত হয়েছে। এই যাবতীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য পূরণ করেছেন। এ-হলো ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা, ইসলামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু নবির মৃত্যুর পরে ইসলাম প্রতিষ্ঠার উদ্দীপনা অনেকাংশে ধাক্কা খায়। নেতৃত্বের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তখন হয়ে ওঠে প্রধান উদ্দেশ্য। তথাপি সবকিছুর মূলে রয়েছে ইসলাম, এবং ইসলাম ছাড়া যে কোনো কিছুই টিকে থাকবে না তাও সবাই বুঝলেন। তাই নবি-পরবর্তী সবাই ইসলামকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকতে সচেষ্ট হলেন। সে জন্য পরবর্তী প্রায় ১২ বছর ইসলামের বিধান এবং নবির রীতিনীতি খুব কড়াকড়িভাবে মেনে চলা হত। এই সময়টা ছিল দুই খলিফার : যথাক্রমে হজরত আবু বকর (হিজরি ১১ বা ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ থেকে হিজরি ১৩ বা ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ) এবং হজরত ওমর (হিজরি ১৩ বা খ্রিস্টাব্দ ৬৩৪ থেকে হিজরি ২৩ বা ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ)। কিন্তু নবির মৃত্যুর পর যত দিন যেতে লাগল তত ইসলামকে হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করা হতে লাগল এবং ইসলামের লক্ষ থেকে সবাই দূরে সরে যেতে থাকলেন। ইসলাম ব্যবহৃত হতে থাকল নেতৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা দখলের জন্য।

নবি মুহাম্মদ যখন মারা যান তখন মদিনার আনসারদের খাজরাজ গোত্রের নেতা ছিলেন সাদ বিন ওবায়দা। তিনি সমগ্র মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব নিতে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু ওমর ছিলেন অতিশয় দক্ষ ও কুশলী। তিনি অবিলম্বে আবু বকরকে নেতা ঘোষণা করে সাদ বিন ওবায়দার স্বপ্নকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে তাঁকে বিস্মৃতির অতলে পাঠিয়ে দিলেন। আবু বকর নেতা হওয়ার পরও কখনো ভুলে গেলেন না ওমরের ঋণ। তিনি নেতৃত্ব নেবার পরপরই ঘোষণা দিলেন, নেতৃত্ব হচ্ছে 'নবির উত্তরাধিকারী হওয়া' - যার নাম হচ্ছে খেলাফত। আবু বকর সুপারিশ করলেন যে তাঁর পরে খলিফা হবেন ওমর। ওমর খলিফা হবার পর মনে মনে ঠিক করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর খলিফা হবেন আব্দুর রহমান বিন আউফ। তথাপি ওমর যখন ছুরিকাহত হয়ে মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করার জন্য ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিষদ গঠন করেন। সেই পরিষদ হজরত উসমানকে খলিফা নির্বাচিত করেন। হিজরি ৩৫ (৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ) সালে উসমান আততায়ীদের হাতে খুন হবার পর তাঁর খেলাফতের অবসান ঘটে। সুষ্ঠুভাবে রাজত্ব চালাবার জন্য খলিফা উসমান হজরত আলির কাছে আনুগত্য কামনা করেন। কিন্তু উসমানকে তাঁর পাঁচ বছরের খেলাফতের পুরোটাই কাটাতে হয়েছে গৃহযুদ্ধ সামলাতে। যেমন জামালের যুদ্ধ, সিফিফনের যুদ্ধ এবং নাহরাবানের যুদ্ধ। এ-সময় কুরাইশ বংশের মুয়াবিয়া বিন সুফিয়ান এবং কুরাইশ বংশের বানু শাহম গোত্রের আমর ইবনে আল-আস খলিফা উসমানের শত্রু হয়ে পড়েন। তাই উসমানকে রাজত্ব চালানোর পাশাপাশি এই দুই গৃহশত্রুকেও মোকাবেলা করতে হয়। শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-চলাকালীন অবস্থায় হিজরি ৪০ সালে (৬৬১ খ্রিস্টাব্দ) উসমান আততায়ীদের হাতে নিহত হন। খলিফা উসমানের পর নবির স্থলাভিষিক্ত হবার অজুহাতে ক্ষমতা দখলের জন্য প্রচণ্ড উন্মাদনা শুরু হয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় তৎপরবর্তী অনেক ঘটনার মাঝে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মুয়াবিয়ার উমাইয়া খেলাফতের পত্তন এবং তাঁর উত্তরাধিকারগণ, হিজরি ৬১ (৬৮০ খ্রিস্টাব্দ) সালে মুয়াবিয়া পুত্র ইয়াজিদের হাতে আলির পুত্র হোসেনের মৃত্যু, হিজরি ৬১ (৬৮০ খ্রিস্টাব্দ) সালে আব্দুল্লাহ বিন জুবায়েরের সাথে যুদ্ধে কাবাকে অপবিত্র করা, হাশেমি গোত্রের প্রবল প্রচারণার মুখে উমাইয়া খেলাফতের পতন এবং আব্বাসিয়াদের খেলাফত দখল, পশ্চিমাঞ্চলে প্রতিদ্বন্দ্বী ফাতেমি বংশের ক্ষমতা দখল, এবং পূর্বাঞ্চলে বিপ্লবী ইসমাইলি আন্দোলন। ইসমাইলি আন্দোলন তুঙ্গে উঠে যখন হিজরি ৬৫৬ (১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ) সালে মঙ্গলীয় বাহিনী হালাকু খানের নেতৃত্বে বাগদাদ দখল করে আব্বাসিয়া খেলাফতের পতন ঘটায়।

প্রশ্ন ওঠে নবি মুহাম্মদ আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় অনুপ্রেরণার ভিত্তিতে যে ইসলামি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন তাঁর মৃত্যুর পর সেই রাষ্ট্র কেমন করে চালানো হল? নবির কি উচিত ছিল না তাঁর উত্তরাধিকার মনোনীত করে যাওয়া, যাতে করে নতুন মুসলিম সমাজ জানতো তাদের প্রধান দায়িত্বসমূহ কী কী হবে? আরও কিছু প্রশ্ন আছে এর সাথে, যেমন নবির সহচরদের কী উচিত ছিল না যেভাবেই হোক নবির উত্তরাধিকারী কে হবে সে-ব্যাপারে একটা সমঝোতায় আসা? যেহেতু নবুওতি হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত, তাই ভবিষ্যতে মুসলমানদের আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব কী ক্ষমতা দখলে জড়িয়ে পড়বে? নবি যদি নিজেই তাঁর উত্তরাধিকারী ঠিক করে যেতেন তবে কাকে তিনি মনোনীত করতেন? আলি ছিলেন নবির চাচাতো ভাই, একই সাথে তাঁর মেয়ে ফাতেমার স্বামী, এবং হাশেমি গোত্রের প্রথম পুরুষ যিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এছাড়াও আলি ছিলেন একজন অসীম সাহসী যোদ্ধা ও সুদক্ষ সমরনায়ক। একাধিকবার বিপদে আলি নবির জীবন রক্ষা করেছেন। নবির কি উচিত ছিল না আলিকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করে যাওয়া? আবু বকর ছিলেন উচ্চপদাধিষ্ঠিত। লুকিয়ে মদিনা যাবার পথে মুহাম্মদ একদা গুহায় আশ্রয় নেন। আবু বকরও সেই রাতে মুহাম্মদের সাথে গুহায় থেকেছেন। ইসলামের প্রথম যুগে আবু বকর ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ইসলামের জন্য বয়ে আনেন প্রচুর সম্মান। এছাড়াও আবু বকর তাঁর সুন্দরী কন্যা আয়েশাকে বিয়ে দিয়েছেন নবির সাথে। মুহাম্মদর কি উচিত

ছিল না আবু বকরকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যাওয়া? ওমর ছিলেন এক সুদৃঢ়, একনিষ্ঠ, ও সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। ইসলামের রক্ষাকর্তা হিসেবে ওমর ছিলেন আপোষহীন। রাজনীতিতেও তিনি ছিলেন দক্ষ। নবি কি কখনও চিন্তা করেছিলেন যে ওমরই হবেন তাঁর যোগ্যতম উত্তরাধিকারী? মুহাম্মদ মদিনাতে নবুওতি পালন করলেন দশ বছর। এই সুদীর্ঘ দশ বছরে তিনি কেন উত্তরাধিকারী সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করলেন না? যে নবি এত দূরদর্শী এবং রাজনৈতিক বিচক্ষণসম্পন্ন ছিলেন, যিনি শূন্য থেকে নিজের একক প্রচেষ্টায় মদিনাতে মুসলিম-সমাজের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন আমরা কী চিন্তা করতে পারি সেই নবি উত্তরাধিকারী মনোনয়নের মতো এতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অবহেলা করে যাবেন? মৃত্যুর আগে নবি ইসলামকে আরব জাতীয়তাবাদ বলে নির্ধারিত করেছিলেন এবং বলে ছিলেন যে আরবে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম থাকবে না। সেই নবিই কেমন করে তাঁর সদ্যভূমিষ্ঠ ইসলামি রাষ্ট্রের উত্তরাধিকারের বিষয়টি দৈবের হাতে ছেড়ে দিলেন?

বলাবাহুল্য, এই ধরনের অনেক প্রশ্নই আমাদের মনে জাগে। কিন্তু প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর কোনোদিনও পাওয়া যাবে না। ফলে এ-বিষয়ে আমরা যা যা জানতে পাই তা শুধুমাত্র অনুমান ছাড়া আর কিছু নয়। নবি পরবর্তী ইসলামের যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই উত্তরাধিকারের বিষয়টি।

আমরা হয়তো নিশ্চিতভাবে বলতে পারি নবি তাঁর উত্তরাধিকার নির্ধারণের জন্য কোনো স্থির সিদ্ধান্ত নেননি। কথিত আছে হিজরি ১০ সালে (৬৩২ খ্রিস্টাব্দ) নবি বিদায় হজের পর যখন মদিনায় ফিরছিলেন তখন 'গাদির আল খুম' নামের এক জলাধারের (কেউ কেউ বলেন কূপ) কাছে যাত্রাবিরতি দেন এবং আলির হাত ধরে বললেন, 'আমি যাদের বন্ধু (অভিভাবক) আলিও তাদের বন্ধু (অভিভাবক)'। উল্লেখ্য 'মাওলা' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে 'নিকটে আসা', এর আরও দুটি অর্থ রয়েছে, অভিভাবক/বন্ধু এবং আশ্রিত ব্যক্তি। শিয়ারা মনে করেন যে ওই বাক্য দ্বারা নবি আলিকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিয়োজিত করে গিয়েছেন। [কোনো কোনো মুসলিম পণ্ডিতের তফসিরে (যেমন তফসির নিশাপুরি, তফসির জুর-আল-মনসুর, তফসির কবির প্রমুখ) রয়েছে : 'নবি অনেক আগেই তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে আলিকে মনোনীত করে ছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় তিনি এ-ঘোষণাটি স্থগিত রেখেছিলেন, যাতে ভুল বোঝাবুঝি না হয়।' (সূত্র : Saiyid Safdar Hosain, *The Early History of Islam*, Low Price Publications, Delhi, (First Published 1933), 2006, page 235)। শিয়াদের মধ্যে কেউ কেউ হজরত আলিকে নবির উত্তরাধিকার হিসেবে মনোনয়নের ব্যাপারে সুরা ইনশিরাহ এর ১-৮ নম্বর আয়াতের দিকে নির্দেশ করেন। যদিও এই সুরায় আলিকে সরাসরি মুহাম্মদের পরবর্তী নেতা হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি, শুধুমাত্র নবিকে ভারমুক্ত করার কথা বলা হয়েছে।-অনুবাদক] সুন্নিরা অবশ্য তা অস্বীকার করেন। সুন্নিরা বলেন, নবি যদি এই বাক্য বলে থাকেন তবে তা বলেছিলেন ইসলামের প্রতি আলির একনিষ্ঠতা আর সেবার প্রতি প্রশংসা করে। আলি যে ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন তা সকল মুসলিমই স্বীকার করেন। এখানে এটাও বলা যেতে পারে যে, আলিকে উদ্দেশ্য করে ওই বাক্যকে যদি নবির উত্তরাধিকারী মনোনয়নের সিদ্ধান্ত বলে ধরা হয় তবে নবি অসুস্থ থাকাকালীন সময় যখন আবু বকরকে নামাজের ইমামতি করতে আদেশ দেন, সেই উদাহরণটাও বলতে হয় নবির সিদ্ধান্ত ছিল যে আবু বকর হবেন তাঁর উত্তরাধিকারী। খেলাফত বিষয়ে সুন্নিদের বক্তব্যকে আপাতদৃষ্টিতে যৌক্তিক মনে হলেও শিয়াদের সাথে এ-বিষয়ে অনেক বিরোধ রয়েছে। সুন্নিরা তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে কোরানের এই আয়াতের উদ্ধৃতি দেন: '. . . আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম ও তোমাদের ওপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম মনোনীত করলাম। তবে যদি কেউ ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়, কিন্তু ইচ্ছা করে পাপের দিকে না ঝোঁকে (তার জন্য) আল্লাহ তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।' (সুরা মায়িদা : আয়াত ৩)।

সুন্নিরা বলেন যে এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ মুহাম্মদের নবুওতির দায়িত্ব সম্পন্ন করেন এবং মুসলমানদের জন্য কোরানের নির্দেশাবলী বাধ্যতামূলক করে দেন। এই মত অনুযায়ী কোরান হচ্ছে নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ। তাই মুসলমানদের জন্য মুহাম্মদ নির্বাচিত কোনো ঐশ্বরিক ও অভ্রান্ত উত্তরাধিকারীর দরকার নাই, যা শিয়ারা বিশ্বাস করেন। সুন্নিরা আরও বলেন, যে কোনো ব্যক্তি যদি কোরানের আদেশ মানেন এবং নবির আদর্শে চলেন তবে তিনি মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব দিতে পারেন। তাই নবির সহচরদের অধিকার আছে যাকে তাঁরা যোগ্য মনে করবেন তাকেই মুসলমানদের নেতা হিসাবে নিয়োগ করবেন। এই নেতাই মুসলিমদের কোরান এবং সুন্নাহর (নবির আচার-ব্যবহার এবং তাঁর উদাহরণ) পথে চালাবেন। সুন্নিদের এই মতবাদ কিছুটা বিশ্বাসযোগ্য হলেও বলতে হবে যে এটা 'বিগতকালীন ব্যাপারেও প্রযুক্ত' -এর উদাহরণ। চার খলিফার আমলে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যার ভিত্তিতে সুন্নিদের এই মতবাদ প্রসার পায়। কিন্তু মনোযোগ দিয়ে ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে বুঝা যাবে যে এ-বক্তব্য সঠিক নয়।

নবির মৃত্যুর সাথে সাথে বানু সায়েদার হলঘরে যে কলহের সূত্রপাত হয়, তা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে সবার মনে তখন প্রাধান্য পাচ্ছিল নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা। তখন দরকার ছিল একজন উত্তরাধিকারীর যে মুসলমানদের কোরান এবং সুন্নাহর রাস্তায় এগিয়ে নিয়ে যাবেন। কিন্তু দুই পক্ষই একজন সুদক্ষ উত্তরাধিকারী নিয়োগে ব্যর্থ হয়। এই কোলাহলপূর্ণ সমাবেশে মদিনার স্থানীয় মুসলমানরা (আনসার) এবং মক্কা থেকে আগত শরণার্থীরা (মুহাজির) এই দুই পক্ষই নেতৃত্বের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দাবি করল। আনসারদের দাবি ছিল তাঁরা নবিকে সাহায্য করেছিলেন, আর মক্কার মুহাজিররা দাবি করলেন নবির সাথে তাদের আত্মীয়তার।

এই সভায় উত্তরাধিকারী নির্বাচনের জন্য নবির নিজস্ব গোত্র, হাশেমি গোত্রের কোনো নেতা উপস্থিত ছিলেন না। নবির ভ্রাতুষ্পুত্র আলি এবং নবির চাচা আল আব্বাস ছিলেন নবির সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। এই দুইজন সেই বৈঠকে যোগদান করেননি। মুহাম্মদ তাঁর দশজন সহচরকে (ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম দশজন পুরুষ) বেহেশতের নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। বানু সায়েদার বৈঠকে সেই দশজনের মধ্যে আরও দুইজন অনুপস্থিত থাকলেন। তাঁরা হলে তালহা বিন উবায়দুল্লাহ এবং জুবায়ের বিন আওয়াম। তাঁরা ফাতেমা-আলির ঘরে নবির মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত ছিলেন। এ-সময় আলিকে জানানো হয় বৈঠকে মুহাজিররা জিতেছেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, 'মুহাজিররা নবির আত্মীয়। ওদের উৎস একই গাছ, আর সেই গাছ হচ্ছেন নবি'। এ-কথা শুনে আলি বললেন, 'ওরা গাছের যুক্তি দিয়েছে কিন্তু গাছের ফলের কথা ভুলে গেছে'। এই সংবাদ শুনে জুবায়েরও ক্ষেপে উঠলেন। রাগতস্বরে বললেন, 'এরা যতক্ষণ পর্যন্ত না আলির প্রতি তাঁদের আনুগত্য দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার তরবারি কোষবদ্ধ হবে না'।

কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান (মুয়াবিয়ার পিতা) বললেন, 'ওহে আবদে মনাফের বংশধরেরা (হাশেমি এবং উমাইয়া গোত্রের সাধারণ উৎস) আজ যে মরুঝড় উঠেছে তা মিষ্টি ভাষায় শান্ত করা যাবে না। তাঁরা আবু বকরের মত নীচুগোত্রের লোককে তোমাদের নেতা নিযুক্ত করেছে। তাঁরা এতোই নীচুজাতের ব্যক্তিকে চায়, তবে আলি অথবা আল-আব্বাসকে সুযোগ দিল না কেন?' মুহাম্মদের একসময়কার তীব্র বিরোধী (যিনি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইসলাম কবুল করেন) আবু সুফিয়ান আলির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'আপনি আপনার হাত দিন, আমি আপনার কাছে আমার আনুগত্য জানাব। আপনি চাইলে আমি মদিনা ভরে দিব অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য দ্বারা'। আবু সুফিয়ানের এই প্রস্তাব আলি প্রত্যাখ্যান করলেন।

নবি এবং ইসলামের প্রতি আলির ছিল অকৃত্রিম ও গভীর অনুরক্তি। এ-জন্য আলির নৈতিকতার মান অন্যান্য আরবের চেয়ে অনেক উপরে। এটা পরিষ্কার যে একমাত্র আলি ব্যতীত বাকি সব বিশিষ্ট কুরাইশ ব্যক্তির লোভ ছিল ক্ষমতা দখলের। এ-বিষয়টি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করার জন্য তাবারির ইতিহাস থেকে এবং ইবনে হিশামের 'নবির জীবনী' থেকে কিছু উদ্ধৃতি পুনরায় উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি ঘটনা ছিল এ-রকম: নবির অসুস্থতার শেষ দিনে আলি নবির গৃহ থেকে চলে যান। জনসাধারণ আলিকে ঘিরে ধরেন। তাঁরা নবির স্বাস্থ্যের বিষয়ে জানতে চান। আলি উত্তর দিলেন, 'আল্লাহকে ধন্যবাদ, তিনি সুস্থ হচ্ছেন'। তখন আলিকে একপাশে নিয়ে আব্বাস বললেন, 'আমার মনে হয় তিনি মৃত্যুর পথে। তাঁর মুখে আমি যা দেখেছি সেই দৃশ্য আমি আগেও দেখেছি আব্দুল মোতালেবের ছেলেদের মৃত্যুকালে। আপনি নবির কাছে যান এবং জেনে নিন তাঁর পরে কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন। কর্তৃত্ব যদি আমাদের হাতেই রাখতে হয় তা আমাদের জানা দরকার। আর কর্তৃত্ব যদি অন্যের হাতে বর্তায় তাহলে তাঁর উচিত হবে কাউকে সুপারিশ করা।' আলি উত্তরে বললেন, 'আমি কখনোই এ-ধরনের প্রশ্ন করব না। তিনি যদি এই ব্যাপারটা আড়ালে রাখেন, তাহলে ভবিষ্যতে কেউ আমাদের দিকে তাকাবে না'।

এটা অনস্বীকার্য যে প্রথম দুই খলিফার রাজত্ব ভালই চলেছিল। দুজনের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া যদিও প্রশ্নের উর্ধ্বে নয় এবং তাঁদের ক্ষমতায় আরোহণের বিষয়ে নবির সহচরদের সর্বসম্মত সমর্থন ছিল না, তথাপি সরকার চালানোর নীতিতে তাঁরা কোরান ও নবির সুন্নাহ থেকে বিচ্যুত হননি। হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমর সৎ ছিলেন। আলি ছিলেন নবির স্থলাভিষিক্ত হবার জন্য সবচেয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি। তথাপি আবু বকর খলিফা হলে আলি ছয় মাস পরে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নেন। কিন্তু ওমর খলিফার আসনে বসলে তাঁর প্রতি আনুগত্য জানাতে তিনি কোনো দ্বিধা করলেন না। তৃতীয় খলিফা উসমানের সততা প্রশ্নের উর্ধ্বে নয়। উসমান খেলাফতকালে অনেক ক্ষেত্রেই কোরান-লঙ্ঘন করেছেন ফলে সমগ্র মুসলিম সমাজে অসন্তোষ ধূমায়িত হয় এবং অচিরেই তা বিদ্রোহের রূপ নেয়।

খলিফা নির্বাচন পরিষদের সম্মতিক্রমেই উসমান খলিফার পদ দখল করেন, এবং তাঁর প্রতি সাধারণ জনতার সমর্থনও ছিল। তাই উসমানের খেলাফতে কিছুটা গণতন্ত্রের আভাষ পাওয়া যায়। ওমর ছয় সদস্যের এক পরিষদ গঠন করে নির্দেশ দেন তাদের মধ্যে থেকে একজনকে খলিফা মনোনীত করতে, যে তাঁর উত্তরাধিকারী হবেন। এই ছয় সদস্য ছিলেন : আলি, উসমান, তালহা, জুবায়ের, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং আব্দুর রহমান বিন আউফ। আব্দুর রহমান প্রস্তাব দিলেন যে আলি অথবা উসমান খলিফা হবেন। আলি অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাই আব্দুর রহমান বিন আউফ উসমানের প্রতি তাঁর আনুগত্য জানালেন। তাঁর দেখাদেখি পরিষদের অন্যান্য সদস্যরাও উসমানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেন। এর তিন দিন পূর্বে জনতার মতামত জানবার জন্য আব্দুর রহমান বিন আউফ এক জনমত যাচাই করেন।

উসমান জনগণের ইচ্ছায় খলিফার আসনে বসলেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখা গেল তাঁর শাসন-দক্ষতার মান নবির আদর্শ থেকে অনেক দূরে। উসমানের বিরুদ্ধে কমপক্ষে পঞ্চাশটি অন্যায়ের অভিযোগ উঠে। এর জন্য মূলত দায়ী ছিলেন তাঁর নিজস্ব গোত্রের আত্মীয়স্বজনরা। ব্যক্তিগতভাবে উসমান ছিলেন বিনয়ী ও সাদাসিধে। কিন্তু উসমানের বড় দুর্বলতা ছিল, তিনি তাঁর নিকট আত্মীয়দের কাকুতিমিনতি বা অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারতেন না। খলিফা হিসেবে ওমরের চরিত্রের যে দৃঢ়তা ছিল তার সাথে উসমানের কোনো তুলনা হয় না। ওমর তাঁর সিদ্ধান্তে এতই দৃঢ় থাকতেন যে নবির কোনো সহচর পর্যন্ত ওমরকে তাঁর সিদ্ধান্ত হতে বিচ্যুত করতে পারতেন না।

খলিফা নির্বাচনে আলিই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। তিনি খলিফা মনোনয়ন পেলে মদিনার আমজনতা এবং নবির প্রায় সমস্ত সাহাবিরা শুভেচ্ছার সাথে তা গ্রহণ করেন। কিন্তু আলির শাসনকাল ছিল খুব স্বল্প। এই স্বল্পকালে তাঁকে তিনটি গৃহযুদ্ধের মোকাবেলা করতে হয়। আলিকে বেশ কিছু নাশকতামূলক ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার সম্মুখীনও হতে হয়। এছাড়াও নবির দুই প্রবীণ সহচর যথা তালহা এবং জুবায়ের আলির প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রত্যাহার করে নেন। আলি যখন এই দুজনকে যথাক্রমে কুফা এবং বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করতে আপত্তি জানান তখনই তাঁরা আলির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন।

এ-ধরনের প্রায় ডজন খানেক ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। খলিফা নিয়োগে সুন্নি-মতামত নীতিগতভাবে মেনে নিলেও ইতিহাস থেকে দেখা যায়, এটা সর্বাংশে সত্য নয় এবং এই পদ্ধতি মুসলমানদের কোনো উপকারে আসেনি। ক্ষমতা এবং সম্পদের উপর লোভের ফলে কোরান ও সুন্নাহকে বিসর্জন দেয়া হয়েছে।

একটা প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়, নবি মুহাম্মদ কি তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচনের ব্যাপারে অন্য কারো চেয়ে বেশি সক্ষম ছিলেন না? নবি মুহাম্মদ এ-বিষয়ে যে অদ্বিতীয়ভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন তা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। কারণ মুহাম্মদ নবুওতির গুণে গুণান্বিত ছাড়াও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাঁর সমসাময়িকদের চেয়ে শীর্ষে ছিলেন। তিনি ছিলেন ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ। মানবচরিত্র এবং তাঁর সহচরদের মানসিকতা সম্পর্কে তাঁর ছিল গভীর জ্ঞান। তিনি যখন ক্ষমতার তুঙ্গে, তখন তাঁর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার সাহস কারো ছিল না। এতো অবাধ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নবি তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়নের বিষয়ে নীরব রইলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন তিনি নীরব ছিলেন? তাঁর উত্তরাধিকারী নিয়োগের মতো এতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে তিনি কি চিন্তা-ভাবনায় আনেননি? অথবা তিনি কি জানতেন যে তিনি আরও অনেক দিন বাঁচবেন তাই উত্তরাধিকারী মনোনয়নের সময় আসেনি?

নবির অসুস্থতার সময় বয়স ছিল ৬৩ বছর। এটা তেমন বৃদ্ধ-বয়স নয়। তাঁর অসুস্থতা ছিল অল্পদিনের। এই অসুস্থতাকালীন ঘটনাবলী থেকে মনে হয়, নবি তাঁর অসুস্থতাকে মারাত্মক ভাবেননি। শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ভেবেছিলেন কিছুদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠবেন। তাই হয়তো নবি তাঁর অসুস্থতার প্রথম দিনে স্ত্রীগণকে জানালেন, তিনি আয়েশার গৃহে সেবা-শুশ্রূষা পেতে চান। সেই সময় আয়েশা শিরঃপীড়ায় ভুগছিলেন। তাই রসিকতা করে নবি আয়েশাকে বললেন, 'তুমি কি আমার আগেই মারা যেতে চাও যাতে করে আমাকে তোমার লাশ ধুতে হয় এবং দাফন করতে হয়?' আয়েশাও রসিকতা করে জবাব দিলেন, 'তাহলে তো আপনি নির্বিঘ্নে আমার গৃহেই আপনার অন্যান্য স্ত্রীর সাহচর্য পেতে পারবেন।' এ-থেকে বুঝা যায়, নবি ভেবেছিলেন তাঁর অসুখ তেমন মারাত্মক নয়।

এই অনুমানের সমর্থনে আরও কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। রোগাক্রান্ত হবার শুরুর দিকে নবি সিরিয়ার খ্রিস্টান-আরবদের আক্রমণ করার জন্য এক সেনাবাহিনী গঠনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এই আক্রমণকারী বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে নবির মুক্তক্রীতদাস ও পালকপুত্র জায়েদ বিন হারিসের পুত্র বিশবছর বয়স্ক ওসামাকে মনোনীত করেন। এই সিদ্ধান্তে মুসলিম সৈন্যদের মাঝে অসন্তোষ দেখা দেয়। কারণ মুহাজির ও আনসারদের মাঝে বেশ কয়েকজন ঝানু সেনানায়ক ছিলেন যারা ওসামার পদটি পাবার জন্যে আগ্রহী ছিলেন। তবে অসন্তোষের খবর পেয়ে নবি ক্রুদ্ধ হোন। মসজিদের বেদিতে দাঁড়িয়ে নবি ঘোষণা দেন, 'এই ধরনের অসন্তোষ অবাধ্যতারই নামান্তর।' তিনি আরও বলেন, 'ওসামার নিয়োগ সবচেয়ে উত্তম সিদ্ধান্ত।' নবির এই ঘোষণা প্রকাশের পর অসন্তোষ-প্রকাশকারীরা চুপ হয়ে যান। এ-ঘটনা হতেও প্রতীয়মান হয় মুহাম্মদ ভেবেছিলেন তাঁর অসুস্থতা সাময়িক এবং আশা করছিলেন দ্রুত সেরে উঠবেন।

এই ঘটনার পক্ষে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে হয়, যা উত্তরাধিকারী নির্ণয়ের চাইতে কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তখনও নবি নিজস্ব তত্ত্বাবধানে কোরান সংগ্রহ ও সম্পাদনার কাজে হাত দেননি। কোরান হচ্ছে মুহাম্মদের নবুওতির হুকুমনামা এবং মুসলিমদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। মুহাম্মদের মৃত্যুকালে কোরান এককভাবে সংগৃহীত ছিল না। সে-সময় কোরান মুহাম্মদের বিভিন্ন সহচর ও ওহি লেখকদের মাঝে বিক্ষিপ্ত ছিল। মুহাম্মদের মৃত্যুর পর ইসলাম-বিশারদ এবং কোরান বর্ণনাকারীদের মধ্যে প্রচুর তফাৎ দেখা দেয়। এ-সমস্যা সৃষ্টি হত না, যদি মুহাম্মদ তাঁর জীবদ্দশায় কোরান সংকলনের কাজটি সম্পন্ন করে যেতেন। বর্তমানে কোরানের আক্ষরিক ব্যাখ্যা নিয়ে যে সমস্যা আছে, তাও থাকত না। কোরানের যে-সব আয়াত রহিত হয়েছে কিংবা যে-সব আয়াত অন্য আয়াতকে রহিত করেছে সেগুলোকেও সহজে সনাক্ত করা যেত। সর্বোপরি কোরানকে সাজানো যেত সুরা এবং আয়াতের নাজিল হওয়ার কালক্রম অনুযায়ী। প্রচলিত আছে যে, হজরত আলি কালক্রম অনুযায়ী কোরানের একটি সংকলন করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে এটি সংরক্ষণ করা হয়নি।

মুহাম্মদের দুইজন ওহি লেখকের অন্যতম ছিলেন জায়েদ বিন সাবিত। কথিত আছে জায়েদ একবার বলেছিলেন : ‘আবু বকর আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, ‘অনেকদিন যাবত ওমর আমাকে চাপাচাপি করছেন কোরান সংগ্রহ এবং সংকলিত করার জন্য। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে নারাজ। কারণ কোরান সংকলন যদি এতোই প্রয়োজনীয় ছিল তবে নবি নিজেই এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতেন। কিন্তু ইয়ামামার যুদ্ধে নবির অনেক সহচর মারা গেলেন। এদের অনেকেই কোরানের বিভিন্ন আয়াত মুখস্ত করে রেখেছিলেন। তাঁদের মৃত্যুর সাথে তাঁরা কোরানও নিয়ে গেলেন কবরে। তাই আমি এখন কোরান সংকলনের ব্যাপারে ওমরের সাথে একমত।’

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে ওমর কোরান সংকলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং এ-জন্য খলিফা আবু বকরকে প্ররোচিত করেন। এরপরও কোরান সংকলন করতে অনেক দিন পার হয়। উসমান কোরান সংকলনের জন্য একটি কমিটি করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই কমিটি যে কোরান সংকলন করেন তা কালক্রমানুযায়ী হয়নি। এমন কী এই কমিটি হজরত আলি এবং বিশিষ্ট সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদের কাছে যে কোরান ছিল তা ধর্তব্যেও আনলেন না।

উসমানের কমিটির প্রণীত কোরানের সুরাগুলির দৈর্ঘ্য অনুযায়ী সাজালেন। বেশি দৈর্ঘ্যের সুরাগুলি আগে (সুরা ফাতিহা বাদে) এবং স্বল্প দৈর্ঘ্যের সুরাগুলি শেষে। এ-ধরনের বিন্যাস একেবারে অপ্রয়োজনীয়। কারণ যুক্তি অনুযায়ী মক্কি সুরাগুলি আসা ছিল কোরানের প্রথম দিকে এবং মাদানি সুরাগুলি থাকা উচিত ছিল শেষের দিকে। কিন্তু উসমানের কোরান-সংকলন কমিটি মক্কি সুরার মাঝে মাদানি সুরা আর মাদানি সুরার মাঝে মক্কি সুরা মিলিয়ে কোরানের বিন্যাস করলেন। যাহোক, নবির মৃত্যু হয়েছিল অকস্মাৎ, ফলে তিনি কোরান সংকলন ও সম্পাদনার সময় পাননি।

অনেকের ধারণা, অসুস্থতার শেষের দিন নবি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর অসুখ মারাত্মক। সে দিন ২৮শে সফর হিজরি ১১ অথবা ১৩ই রবিউল আওয়াল, ইংরেজি ৮ই জুন ৬২৩ সন। এ-দিন জ্বরের তীব্রতা বেড়ে গেলে নবি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। যখন জ্ঞান ফিরে আসে তখন তাঁর কাছে পরিষ্কার হল, তাঁর আর বেশি সময় নেই। তাই আশেপাশের সকলকে কাছে আসতে বললেন এবং এক দোয়াত কালি এবং এক খণ্ড কাগজ দেয়ার কথা বললেন : ‘আমি তোমাদের জন্যে কিছু লিখতে চাই (অথবা কাউকে দ্বারা লিখাতে চাই)। এটা করা হলে ভবিষ্যতে তোমরা বিপথে যাবে না।’ দুর্ভাগ্যবশত নবির শেষ ইচ্ছা পূরণ হয়নি। যারা নবির নিকটে ছিলেন তাঁরা প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তারপর তাঁরা নিজেদের মধ্যেই বচসা শুরু করে দিলেন। উপস্থিত একজন বললেন, ‘তিনি কি ক্রোধান্বিত

হয়ে এ-সব বলছেন? তাঁকে কি ভূতে ধরেছে? তাহলে ওঝা নিয়ে আসি।' এ-শুনে জয়নাব বিনতে জাহশ এবং কয়েকজন সাহাবি বলে উঠলেন, 'নবি যা চাইছেন তোমাদের উচিত তা অবিলম্বে নিয়ে আসা।' ওমর বললেন : 'নবির জ্বর অত্যধিক। আমাদের জন্যে রয়েছেন আল্লাহ এবং কোরান, এগুলোই আমাদের জন্য যথেষ্ট। অন্যকিছুর দরকার নেই।' এভাবে যারা চেয়েছিল নবির লিখিত পথনির্দেশ যাতে তাঁরা ভবিষ্যতে ভুল পথে না যায় এবং যারা চাননি যে তিনি কিছু লিখুন, তারা দুই পক্ষে বিভিক্ত হয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক শুরু করে দেন। নবি এই বচসা দেখে খুব মর্ম-পীড়িত হলেন। এক সময় তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেলে দুই পক্ষকেই তাঁর সামনে বাকযুদ্ধ বন্ধ করতে বললেন। কারোই ধারণা ছিল না যে নবি কী লিখতে চাচ্ছিলেন। আর তাছাড়া তিনি অসুস্থ, তাই কারো বোধগম্য ছিল না, কাকে দিয়ে লেখাবেন তাঁর নির্দেশগুলো। তিনি কি তাঁর উত্তরাধিকারীর নাম লিখতে চেয়েছিলেন? এমন কিছু লিখতে চাচ্ছিলেন যা কোরানে ছিল না? অথবা কোরানের কোনো কিছু কি তিনি বাতিল করতে চাচ্ছিলেন? অথবা আরব জাতির প্রগতির জন্য কি কোনো নীতিমালা দিতে চেয়েছিলেন? এই সবই যদি হয় তবে তিনি মৌখিকভাবে তা বললেন না কেন? নবির এই নীরবতা চিরকালের জন্যে এক রহস্য হয়ে থাকবে।

উপরের ঘটনাতে একটি বিতর্কিত বিষয় আছে। ওমর ছিলেন একজন নির্ভীক, দৃঢ় ও অটল মানুষ। ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার উপর ওমর ছিলেন সম্পূর্ণ নিবেদিত। এহেন ওমর কেন মুহাম্মদের শেষ লিখিত নির্দেশের বিরোধী হলেন আর বললেন কোরানই হবে যথেষ্ট? ওমর কি সত্যিই বিশ্বাস করেছিলেন যে, নবি জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছেন? ওমর তো বাস্তববাদী, দূরদর্শীসম্পন্ন হিসেবে পরিচিত। সে-জন্যেই কি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, মুহাম্মদ মৃত্যুর পূর্বে আলিকেই তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে পারেন? এমন যদি হয়, তবে ওমর ভালভাবেই জানতেন যে আপামর মুসলিম সমাজ নবির ইচ্ছাকেই সম্মান দেখাবে। এবং এর ফলে ওমরের হাতে কোনো ক্ষমতা থাকবে না। খলিফা মনোনয়ন নিয়ে শিয়াদের মধ্যে এ-ধারণাটাই বিদ্যমান। যৌক্তিকভাবে বিচার করলে শিয়াদের এই ধারণা অমূলক নয়। কেননা ওমর কেন নবিকে তাঁর শেষ ইচ্ছে লিখতে দিলেন না তার সঠিক এবং বিশ্বাসযোগ্য কারণ আজ পর্যন্ত কেউ উপস্থাপন করতে পারেননি।

ইসলামের ইতিহাসে ওমর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি ছিলেন নবির প্রিয়, সম্মানিত এবং প্রভাবশালী সাহাবি। রাজনৈতিক বিষয়াবলীতে ওমর ছিলেন শক্তিশালী স্তম্ভ। গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছাড়াও তিনি মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণে ছিলেন দক্ষ। তাঁর দূরদর্শিতাও ছিল অপরিসীম। ফলে ধারণা করা যায়, ওমর পূর্বেই অনেক হিসাব নিকাশ করেছিলেন। তিনি জানতেন নবিকে যদি তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করার সুযোগ দেওয়া হয় তবে তা নিঃসন্দেহে হবেন আলি অথবা আবু বকর। এঁদের মধ্যে আলি ছিলেন হাশেমি গোত্রের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। আবার তিনি নবির ভাই, নবির জামাতা, এক নির্ভীক যোদ্ধা এবং ঘনিষ্ঠ ওহি-লেখক। এছাড়া আলির ছিল নিজস্ব মৌলিক চিন্তাধারা। ফলে আলি সহজে অন্য কারো চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হতেন না। আবু বকর ছিলেন ওমরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মদিনার দশ বছর আবু বকর ও ওমর একে-অপরের সান্নিধ্যের মধ্যে ছিলেন। নবির অন্যান্য সহচরদের চেয়ে আবু বকরের সাথেই ওমর বেশি মেলামেশা করতেন। যে কোনো ব্যাপারে তাঁদের দুজনের থাকত মতের মিল। আলি ও আবু বকর, এই দুজনের মাঝে ওমর অবশ্যই আবু বকরকে বেছে নিবেন মুহাম্মদের উত্তরাধিকারী হিসেবে। আবু বকর ছিলেন ধীর ও শান্ত মেজাজের। আবু বকরের গোত্র প্রভাবশালী ছিল না। তাই ওমর জানতেন, আবু বকর মুহাম্মদের স্থলাভিষিক্ত হলে মূলত তিনিই হবেন আবু বকরের দক্ষিণ হস্ত। আর নবির উত্তরাধিকারী যদি আলি হন তবে আলি পাবেন নবির সহচরদের সম্মান এবং সমগ্র হাশেমি গোত্রের সমর্থন। এই অবস্থায় আলি ওমরকে পাশ কেটে চলবেন, বিষয়টি ওমর ভাল করেই বুঝেছিলেন। ওমর আবু বকরের বয়সের বিষয়েও সজাগ ছিলেন। মুহাম্মদ

যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন আবু বকরের বয়স ছিল ষাটের ঊর্ধ্বে। প্রবীণ ব্যক্তি হিসেবে আবু বকর ছিলেন সম্মানিত। আর আলির বয়স ছিল মাত্র বত্রিশ। তাই ওমর জানতেন আবু বকর নেতা হলে শীঘ্র ওমরের হাতে ক্ষমতা চলে আসবে কিন্তু আলি নেতা হলে সেটা হবে না। সংক্ষেপে বলা যায় আবু বকর নবির উত্তরাধিকারী হলে ওমরের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণে সহায়তা হবে। এ-দিক দিয়ে চিন্তা করলে বুঝা যায় ওমর কেন নবির শেষ নির্দেশের বিষয়ে অস্বস্তি বোধ করছিলেন। ওমর হয়তো ভেবেছিলেন মুহাম্মদ বোধহয় শেষ ইচ্ছাপত্র লিখে যেতে পারেন; এবং নবির মৃত্যুর পরে শাসনক্ষমতা শুধুমাত্র হাশেমি গোত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে যার ফলে অন্যান্যদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে।

হতে পারে নবির লেখার উদ্দেশ্য উত্তরাধিকারী মনোনীত করা ছিল না। তিনি ভিন্ন কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে ওমর কোনোক্রমেই ঝুঁকি নিতে চাননি। তিনি এই ব্যাপারে আর বৃথা তর্কে যেতে চাননি। ওমর ভেবেছিলেন নবি শেষমেশ উইল করতে পারেন। তাই তিনি নিজের মনের কথা গোপন রেখে বলেছিলেন নবি প্রবল জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বলছেন, তাই তাঁর পক্ষে কোরানে কিছু যোগ করার মতো অবস্থা নেই। ওমর আরও বললেন নবির কাছে যত ওহি এসেছে তা সবই এসেছিল যখন তিনি সুস্থ ও ভাল স্বাস্থ্যে ছিলেন। কোরানে যা থাকার সব কিছুই নবি পেয়ে গেছেন সে অবস্থায়, কাজেই নতুন আর কিছু লেখার প্রয়োজন নাই।

অনেকে প্রশ্ন তুলেন নবি যদি কাউকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করতে চেয়েছিলেন তবে তার নাম তিনি মৌখিকভাবে জানালেন না কেন? শিয়াদের বিশ্বাস অনুযায়ী, নবির উদ্দেশ্য ছিল আলিকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করা। তাই যদি হয় তবে যখন বাহাস শুরু হল এবং যখন ওমর কাগজ-কলম আনতে নিষেধ দিলেন তখন নবি মৌখিকভাবে অথবা অন্য কোনো উপায়ে তাঁর শেষ ইচ্ছেটা জানিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু নবি তা করেননি। এ-সময় নবির কক্ষে অনেক ব্যক্তিই উপস্থিত ছিলেন। ফলে তিনি যা বলতেন তা মুখে মুখে সমগ্র মুসলিম-সমাজে ছড়িয়ে পড়ত। তাহলে কি নবির অন্য কোনো কারণ ছিল যার জন্য তিনি তাঁর শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেননি? আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে এই রহস্যের গভীরতা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কিন্তু সেটা সত্য নয়।

একটা বিষয় আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়, মুহাম্মদ সারাটা জীবন যা করে এসেছেন তার সব কিছুর পেছনে সর্বদা কোনো না কোনো উদ্দেশ্য কাজ করেছে। তেইশ বছর ধরে তাঁর মনে এক দুর্বার আকাঙ্ক্ষার শিকড় গেড়ে ছিল। এই শিকড় তাঁর মনে-প্রাণে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে এই দুর্বার শক্তি তাঁর ব্যক্তিত্বের অঙ্গ হয়ে পড়ে। নবির এই অদম্য উদ্দেশ্য ছিল এক ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যার ভিত্তি হতে হবে আরব জাতীয়তাবাদ। নবির ছিল সহজাত জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মানুষের চরিত্র বুঝার অসাধারণ ক্ষমতা। তাঁর সব সহচরের গুণ ও মেজাজের বৈশিষ্ট্য তিনি খুব ভাল করে জানতেন। নবি খুব ভালভাবে লক্ষ করেছিলেন ওমরের চরিত্রের একাগ্রতা, দূরদর্শিতা, দৃঢ়তা এবং নৈতিকতা। ওমর এবং আবু বকরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বও নবি ভাল করে জানতেন। ইসলামে দীক্ষা নেবার পর থেকে ওমর হয়ে যান নবির সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহচর। নানা সময়েই ওমর নবিকে প্ররোচিত করেছিলেন সিদ্ধান্ত নেবার জন্য, যা পরিশেষে ইসলামের কল্যাণ বয়ে আনে। আবু বকর ছিলেন মুহাম্মদের বিশ্বস্ত অনুগামী। কিন্তু ওমর সেরকম ছিলেন না। ওমর ছিলেন নিজস্ব ধ্যান-ধারণার ব্যক্তি। অনেক ক্ষেত্রে ওমর তাঁর অভিপ্রায় নবির কাছে উপস্থাপিত করতেন এবং নবি প্রায়ই ওমরের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় পূরণ করতেন। মিশরীয় বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ জালালউদ্দিন আল-সুয়ুতির (১৪৪৫-১৫০৫ খ্রিস্টাব্দ) লেখা 'আল-ইতকান ফি উলুম আল-কোরান' বইয়ের একটি অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে 'কোরানের সেইসব প্রত্যাদেশ যা সাহাবিদের অভিপ্রায়ে সংযোজিত'। কোরানের আয়াতের কয়েকটি এসেছে

ওমরের পরামর্শ থেকে। মোজাহেদ বিন জাবর বলেছেন : 'কোনো বিষয়ে ওমর তাঁর মতামত জানালেন। কিছু পরে তা ওহি হয়ে কোরানে স্থান পেয়ে যেত।' এমনকি ওমর নিজেই বলেছেন কোরানের তিনটি আয়াত তাঁর ব্যক্তিগত পরামর্শে কোরানে স্থান পেয়েছে। এই আয়াতগুলি হচ্ছে মুসলিম নারীদের পর্দার ব্যাপারে (সুরা আহজাব : আয়াত ৫৯), বদরের যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে (সুরা আনফাল : আয়াত ৬৭), এবং ইব্রাহিমের তৈরি ঘর (কাবা) স্থান সম্পর্কে (সুরা বাকারা : আয়াত ১২৫)। এ-বিষয়গুলিতে সুন্নাহ-সংকলনকারী, মুহাম্মদের জীবনীকারক, এবং কোরানের তফসিরকারকদের অনেক কিছু বলার আছে। তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী ওমর ব্যক্তি হিসেবে অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং বিজ্ঞ ছিলেন। এজন্য নবি ওমরকে বিশ্বাস করতেন। এ-ধরনের ব্যক্তি নবির ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে পাঁচজনের বেশি ছিলেন না।

মুহাম্মদের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে বুঝা যায়, উদ্দেশ্য ছাড়া তিনি কোনোভাবে কিছু লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন না। এমনও হতে পারে নবি মৌখিকভাবে কারো নাম উল্লেখ করলে তা হয়তো ওমর, আবু বকর এবং তাঁদের সহযোগীরা বিরোধিতা করে বসতেন। ফলে নবির জীবদ্দশাতেই ইসলামের অনেক ক্ষতি হয়ে যেত। নবি তাঁর জীবদ্দশায় যে অপরিসীম সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন তাতে তিনি ইচ্ছামাফিক যেকোনো সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারতেন। কিছুদিন পূর্বে নবি ওসামা বিন জায়েদকে সেনাপতি নিয়োগ দেয়ায় অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হন। কিন্তু তিনি তীব্র তিরস্কারের সাথে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু মুহাম্মদের মৃত্যুর পর এ-বিষয় অন্যদিকে মোড় নেয়। তাঁর অবর্তমানে কার ক্ষমতা ছিল যে গোত্রে-গোত্রে শত্রুতার অবসান ঘটাতে পারেন? কে নেতৃত্ব ও ধনদৌলতের প্রতি লোভ লালসার সমাপ্তি ঘটাতে সক্ষম ছিলেন? এক ইসলামি সমাজ গড়া ছিল নবির মুখ্য উদ্দেশ্য। নবি যে এত কষ্ট করে নতুন ইসলামি সমাজের ভিত্তি করলেন সেটার কি হবে? আরবরা কি আবার তাদের পরস্পর দীর্ঘকালব্যাপী হানাহানি ও খুনোখুনিতে মেতে উঠবে? নবির মনে হয়তো এ-ধরনের অনেক চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। তাই তিনি শুধুমাত্র তাঁর ঘরে যারা ছিলেন তাদেরকে চলে যেতে বলে চুপ থাকাটাই শ্রেয় মনে করলেন। এছাড়া আরও অন্যান্য কারণও হয়তো থাকতে পারে, যার জন্য নবি তাঁর কোনো উত্তরাধিকারী মনোনীত করেননি।

আলির যে অনেক গুণ ছিল তা তাঁর শত্রুমিত্র উভয়েই একমত। আলি জীবনে কখনো মূর্তিপূজা করেননি। এগার বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম প্রচারের প্রথমদিকে ওহুদের যুদ্ধে আলি মুহাম্মদকে মারাত্মক বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। পরিখার যুদ্ধে আমর বিন আবদ ওয়াদকে আলি ধরাশায়ী করেন এবং খায়বার যুদ্ধে নাতাত দুর্গে আক্রমণ করেন। হিজরতের আগে রাতে (নবি ও আবু বকর সে-রাত একসাথে গুহায় কাটান) নিহত হবার আশংকা থাকা পরও নবির বিছানায় আলি শুয়ে ছিলেন। নবির সহচরদের মধ্যে আলিই সবচেয়ে বেশি শত্রু হত্যা করেছেন। নবির উদাহরণ পালনে অসীম সাহসিকতা, অকপটতা, বাকপটুতা ও নির্ভুলতায় আলি সবার প্রশংসা অর্জন করেছেন। মুহাম্মদের নিজস্ব গোত্র হাশেমিদের কাছে আলি ছিলেন সম্মানিত ব্যক্তি। আলির এতো গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন মুহাম্মদের সহচরদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। এমন-কী তিনি ছিলেন মুহাম্মদের চাচাতো ভাই ও জামাতা (নবি তনয়া ফাতেমার স্বামী)। মুহাম্মদ হয়তো ভেবেছিলেন আলিকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলে আত্মীয়পোষণের অভিযোগ আসতে পারে। ফলে আন্তঃগোত্রীয় ঈর্ষার জন্ম হতে পারে যা মুসলিম সমাজের জন্য ক্ষতিকর হবে।

দুঃখের বিষয় হচ্ছে আলির অনন্য-সব গুণাবলী হয়তো নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় তাঁর অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। অপরিসীম উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের শাসন করতে দরকার স্থৈর্য, আত্মসংবরণ, এবং মধ্যপন্থী মানসিকতা। নিচুপদের লোকদের

আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি মনোযোগ দেয়াও একান্ত কর্তব্য। নবি মুহাম্মদের মাঝে এই গুণাবলী যথেষ্ট ছিল। মক্কা বিজয়ের পর সামান্য কয়েকজন ছাড়া নবি তাঁর বিপক্ষের, সে যতই একগুঁয়ে অথবা জেদি হোক, কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেননি। হাওয়াজেন গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অর্জিত গনিমতের সকল মাল নবি কুরাইশ নেতাদের মধ্যে বিতরণ করে দেন। কিন্তু এ-ব্যাপারে আলি ছিলেন অনমনীয়। যে দাবিগুলি তিনি অন্যায্য মনে করতেন তিনি সেগুলিকে কোনোদিন বিবেচনায় আনতেন না। হিজরি ১০ (৬৩১-২ খ্রিস্টাব্দ) সালে আলি ইয়েমেনে এক সামরিক অভিযানের নেতৃত্ব দেন। তাঁর সৈন্যরা দাবি করেন যুদ্ধে পাওয়া গনিমতের মাল তাদেরকে সাথে সাথে ওই স্থানেই বিতরণ করে দিতে হবে। কিন্তু আলি তাদের এই দাবি অগ্রাহ্য করে সকল মাল নবির কাছে জমা করলেন। পরে নবি ওই যুদ্ধে লব্ধ মাল সকলের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিতরণ করে দিলেন। সৈন্যরা আলির বিরুদ্ধে নালিশ করলে নবি আলিকে সকল অভিযোগ থেকে মুক্ত করে দিলেন। উসমানের খলিফা হবার সময় উবায়দুল্লাহ বিন ওমর হত্যা করেন হরমুজানকে (এক ইরানি সেনাপতি, তাঁকে যুদ্ধবন্দী হিসাবে মদিনাতে আনা হয় এবং পরে একজন উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়)। উবায়দুল্লাহ সন্দেহ করেছিলেন যে তাঁর পিতা সাবেক খলিফা ওমরের হত্যাকাণ্ডের সাথে হরমুজান জড়িত[৮৮]। হত্যাকাণ্ডের বিচার শুরু হলে উসমান আলির সাথে পরামর্শ করেন। আলি সাথে সাথে উত্তর দিলেন, ইসলামি আইন অনুযায়ী উবায়দুল্লাহকে এই হত্যার বদলা দিতে হবে। অর্থাৎ উবায়দুল্লাহর সাজা হবে মৃত্যুদণ্ড। উসমান আলির পরামর্শ মানেননি। উবায়দুল্লাহ ছিলেন খলিফা ওমরের দ্বিতীয় পুত্র। উসমান ওমরের এই দ্বিতীয় পুত্রের জীবনরক্ষা করলেন। উবায়দুল্লাহকে দিতে হল হত্যার খেসারত-অর্থাৎ রক্তের মূল্য। এরপর উসমান উবায়দুল্লাহকে ইরাকে পাঠিয়ে দিলেন।

নবি খুব ভাল করেই আলির সদগুণের সাথে পরিচিত ছিলেন। এছাড়াও নবি জানতেন যে আলি কোনো কিছুকে সঠিক মনে করলে সেই ব্যাপারে আপোষহীন থাকতেন। স্বাভাবিকভাবে আলির এই আদর্শবান চরিত্র প্রশংসনীয়। কিন্তু এটা সত্যি অনেক ব্যক্তি ধর্মের লেবাস পরলেও ধনদৌলতের লোভ সামলাতে পারেননি। তাই বাস্তবতা যাচাইয়ে আলির এই আপোষহীন মানসিকতা যথাযোগ্য নয়। আলি যদি নেতৃত্ব নেন তবে এ-সকল লোভী ব্যক্তিরা বিপদ পড়বেন। তাতে সমগ্র মুসলিম সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়তে পারে এবং ইসলামের লক্ষ অর্জন করা যাবে না। নবি এ-বিষয়টিতেও সজাগ ছিলেন। আলির রাজত্বকাল ছিল স্বল্পসময়, হিজরি ৩৫, ১৮ জিলহজ থেকে হিজরি ৪০, ১৭ রমজান (১৭ জুন ৬৫৬-২৪ জানুয়ারি ৬৬১) পর্যন্ত। এই সময় যারা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাঁরা প্রমাদ গোনেন। যারা পাপের পথে চলেছিলেন, আলি তাদের সাথে কোনো সমঝোতায় আসতে অস্বীকার করলেন। এমন কী খুব অল্প সময়ের জন্যেও আলি তাদেরকে ছাড় দিতে চাইলেন না। আলির এই অনমনীয় মনোভাবের জন্য সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়ার সাথে বিরোধ দেখা দেয়। তালহা এবং জুবায়ের ছিলেন নবির সহচরদের মধ্যে অন্যতম বয়োজ্যেষ্ঠ দুই সাহাবি। নবির এই দুই সাহাবিও আলির বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিলেন।

সব ঘটনা বিশ্লেষণ করলে একটা ব্যাপার পরিষ্কার যে, নবি তাঁর উত্তরাধিকারী নিয়োগ করার আগেই মারা যান। নবির এই সিদ্ধান্ত তাঁর প্রজ্ঞা এবং দূরদর্শিতারই প্রমাণ করে। অনেক চিন্তাভাবনা করে নবি হয়ত শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ক্ষমতার লড়াইয়ে মুসলিম সমাজকে বিভক্ত করা সঠিক হবে না। এই ক্ষমতার লড়াই প্রকৃতির নিয়ম মাফিক চলুক-নবি তাই চাইলেন। এই নিয়মে যে সবচাইতে বলবান সেই টিকে থাকবে, যাতে করে ইসলামও বেঁচে থাকবে।

এ-ঘটনার সাথে আধুনিককালের একটি ঘটনার মিল পাওয়া যায়। রাশিয়ার বলশেভিক পার্টির নেতা লেনিন অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি সোভিয়েত কমিউনিস্ট দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় উপস্থিত হতে পারলেন না। তাই তাঁর বিছানা থেকে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটিকে একটা চিঠি পাঠান। সেই চিঠিকে বলা হয় লেনিনের জবানবন্দি। চিঠিতে লেনিন সোভিয়েত বলশেভিক দলের দুই প্রখ্যাত সদস্যের প্রশংসা করলেন। এ-দুই ব্যক্তি ছিলেন স্টালিন এবং ট্রটস্কি। লেনিন লিখলেন এই দুই ব্যক্তি নতুন সরকারের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু লেনিন এও আশঙ্কা করলেন যে ভবিষ্যতে দুজনের মাঝে বিরোধ ঘটতে পারে। লেনিন পত্রে এই দুজনের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার দিকগুলোও তুলে ধরলেন। কিন্তু উত্তরাধিকারী নির্বাচনের ব্যাপারে চুপ থাকলেন। মনে হয় লেনিনও চাইলেন যে প্রকৃতির নিয়মমাফিক যে যোগ্যতম ব্যক্তি সে-ই বিজয়ী হবে।

ইসলামের পূর্বে আরবরা তাদের নিজ নিজ গোত্র, বংশ অথবা বংশবৃত্তান্ত নিয়ে বড়াই করতেন। তাদের এই দাম্ভিকতার মূলে তাদের কোনো নৈতিক উৎকর্ষতা বা আচরণের সাধারণ মাধুর্য ছিল না। বরং তাদের গর্ব প্রকাশ পেত হত্যাকাণ্ডে শৌর্য দেখানো, লুটতরাজ এবং অন্য গোত্রের নারী অপহরণের মধ্যে। ইসলাম আরবদের এই অসভ্যতার মূলে আঘাত হানে এবং কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধার্মিকতাকেই প্রাধান্য দেয়। কিন্তু ইসলামের এই নতুন মানদণ্ড বেশিদিন থাকল না। সত্যি বলতে হিজরি ২৩ (৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ) সালে খলিফা ওমরের মৃত্যুর পর ইসলামের নৈতিকতার মানদণ্ডে ফাটল ধরে। উসমানের সময় ধার্মিকতার স্থলে আত্মীয়পোষণ প্রাধান্য পেল। আবুজর গিফারির[৮৯] এবং আম্মার বিন ইয়াসিরদের[৯০] মতো ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা পেছনে পড়ে রইলেন। এ-স্থানে উসমানের গোত্রের লোকেরা, যেমন মুয়াবিয়া বিন সুফিয়ান এবং হাকাম বিন আবুল আস'রা পেলেন শাসনকর্তার পদ।

ইসলামের সবচেয়ে উজ্জ্বল নীতি ছিল মহত্ত্ব এবং ধার্মিকতা। উমাইয়া খেলাফতের সময় (হিজরি ৪১-১৩২ বা ৬৬১-৭৫০ খ্রিস্টাব্দ) ইসলামের এই নীতিগুলিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়। এর স্থলে প্রাধান্য পায় গোত্র ও জাতিগত দাম্ভিকতা। এই দম্ভ আরও ব্যাপকতা লাভ করে ক্রমে। ফলে শুরু হয় আরব জাতীয়তাবাদের দাবি মেটানোর পালা। এই প্রক্রিয়া শুরু হয় বিজিত জাতি পদানত করে এবং তাদের সম্পদ হরণ করে।

আরবের উষর মরুভূমির বেদুইনরা আক্রমণ শুরু করেন সভ্যজগতের বিশাল এলাকা। মরুভূমির বেদুইনরা দখল করে নিলো সভ্যজগতের শাসন ক্ষমতা এবং হরণ করে এইসব বিজিত দেশগুলির বিশাল ধনসম্পদ। ক্ষমতা-মদমত্ততার দরুন আরববাসী হয়ে উঠল অসীম গর্বিত। তারা নিজেদেরকে বিজয়ী জাতি হিসাবে প্রকাশ করতে লাগল আর বিজিত দেশগুলিকে নিকৃষ্ট জাতি হিসাবে গণ্য করতে লাগল। আরবরা বিজিত দেশগুলোর জনতাকে অপরিসীম ঘৃণার চোখে দেখল। কখনো তাদেরকে আরবদের সমকক্ষ মনে করত না। এমনকি বিজিত দেশের যারা ইসলাম গ্রহণ করে আরবরা তাদেরকে পর্যন্ত ইসলামের যে সার্বজনীন সৌভ্রাতৃত্বের নীতি আছে তা থেকে বঞ্চিত করল।

কথিত আছে, এক ইরানি মুসলমান হয়ে আরব গোত্র বানু সুলায়ম গোত্রের আশ্রিত হন। সেই ইরানি বানু সুলায়ম গোত্রের এক মহিলাকেও বিবাহ করেন। এ-সংবাদ শোনার পর ওই গোত্রের একজন, মুহাম্মদ বিন বশির মদিনাতে গিয়ে শাসনকর্তা ইব্রাহিম বিন হিশাম বিন আল মুগিরার কাছে ইরানির বিরুদ্ধে নালিশ করেন। মদিনার শাসক এক প্রতিনিধি পাঠালেন। সেই প্রতিনিধি ইরানিকে দুইশত বেত্রাঘাত করে মস্তক, মুখ ও ভ্রুমুণ্ডণ করে দিল। তারপর ইরানিকে জোরপূর্বক তার স্ত্রীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়া হল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুহাম্মদ বিন বশির এক গীতিকবিতা রচনা করেন। গীতিকবিতাটি 'কিতাব আল-আগানি'[৯১] (*Ketab ol-Aghani* গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে। সেই গীতিকাব্যের কয়েকটি লাইন এখানে অনুবাদ করে দেয়া হল :

আপনি আমাদের রীতিনীতির সম্মান করেছেন, করেছেন ন্যায় বিচার।

আপনি কোনো বিদেশির কাছ হতে শাসন ক্ষমতা পাননি।

এই জন্য ওই আশ্রিত অনারব পেল দুইশত বেত্রাঘাত

এবং তার মাথা মুণ্ডন করা হল।

এই হচ্ছে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।

তাদের জন্যে রয়েছে খসরুর[৯২] *কন্যারা*

এর পরেও কি ওই আশ্রিত বেশি পেতে চায়?

এই আশ্রিতের জন্য কি আছে?

ক্রীতদাসের সাথে ক্রীতদাসীর বিবাহ হয়।

আব্দুল্লাহ বিন কুতায়বা[৯৩] লিখিত 'আইন আকবর' গ্রন্থ থেকে আরও একটা তথ্য জানা যায় : 'এক আরব কাজির কাছে গিয়ে বলেন : 'আমার পিতা মারা গেছেন। তাঁর উইলে লেখা আছে তাঁর সম্পত্তি আমার ভ্রাতা, আমার মাতা, আমি এবং এক হাজুন, আমাকে জানান কে কী পরিমাণ সম্পত্তি পাবেন?' ('হাজুন' একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে ইতর। তৎকালীন সময়ে কোনো অনারব মহিলার গর্ভের সন্তান বোঝাতে তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হত)। কাজি উত্তর দিলেন : 'এখানে কোনো সমস্যা নাই। প্রত্যেকে পাবে এক তৃতীয়াংশ।' আরব ব্যক্তি বলল: 'আপনি আমাদের সমস্যা বুঝেননি। আমরা দুই ভাই এবং একজন হাজুন।' কাজি উত্তর দিলেন: 'সম্পত্তিতে প্রত্যেকের সমান অধিকার আছে।' আরব ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন: 'এক হাজুন কেমন করে আমাদের সমান হয়?' কাজি বললেন: 'এ আল্লাহর আদেশ।'

ইসলামের অতীত শতাব্দী থেকে এ-ধরনের শতশত উদাহরণ পাওয়া যায়। এই উদাহরণগুলি প্রমাণ করে ক্ষমতা দখল ও অন্য জাতির উপর প্রাধান্য বিস্তারের প্রয়োজনে ইসলামকে ব্যবহার করা হয়েছে। কোরানে যেসব ক্ষমাশীল এবং দয়াপূর্ণ আয়াত আছে সেগুলি কোনোদিন মেনে চলার ব্যবস্থা করা হয়নি। পৌত্তলিক আরবে যেভাবে আরবেরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভ দেখাতেন সেই মানসিকতারই নিশ্চয়তা পাওয়া গেল এ-যুগেও। তথাপি অনারব মুসলিমরা ইসলামের মহান শিক্ষার প্রতি অনুরক্ত থাকেন। তাঁরা স্মরণ করেন কোরানের এই আয়াতটি: 'তোমাদের মধ্যে সে-ই আল্লাহর কাছে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন যে বেশি সাবধানি। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব খবর রাখেন।' (সুরা হুজুরাত : আয়াত ১৩)। আরবদের দাম্ভিক আচরণের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ইরানে শুরু হয় সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন। জাতীয়তাবাদী-ঘরানার এ গণআন্দোলনকে বলা হয় 'শোবিয়া' আন্দোলন। এ-ধরনের আন্দোলনের কোনো প্রয়োজন

থাকত না, যদি নবি মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ যে ইসলাম প্রচার করেছিলেন এবং যে ইসলামের পথ ধরে আবু বকর, ওমর এবং আলি চলেছিলেন, সেই ইসলামের ধারা অব্যাহত থাকত।

গনিমতের মাল

পাশ্চাত্য অনেক পণ্ডিত ইসলামকে একটি আঞ্চলিক বিষয় বলে মনে করেন। তাঁরা ইসলামের অনেক শাস্ত্রীয় নির্দেশকে আধুনিক বিশ্বের উপযোগী বলে মানতে চান না। এ-নির্দেশের মধ্যে রয়েছে: নামাজের পূর্বে অজু করা, দৈনিক পাঁচবার নামাজ পড়া যা মসজিদে গিয়ে পড়াই উত্তম, চন্দ্রবর্ষ অনুযায়ী বার মাস গণনা করা, এবং রমজান মাসে উপবাস করে সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রধান কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা - তা বিশ্বের যে কোনো স্থানেই হোক। মনে রাখা দরকার, বিশ্বের যেসব স্থান উচ্চ অক্ষাংশে অবস্থিত সেখানে সূর্য অস্ত যায় না এবং সর্বদাই দিবস থাকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মনে করেন যে সপ্তম শতাব্দীতে রমজান মাসের উপবাসের প্রথা করা হয়েছিল হেজাজের জন্য। কারণ ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বের অন্যান্য স্থান সম্বন্ধে অজ্ঞাত ছিলেন। ইসলামে সুদের ব্যবসা নিষিদ্ধ। এই নিষেধাজ্ঞা পুঁজি বিনিয়োগের এবং অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য ক্ষতিকর। ইসলামে দাসত্ব প্রথার মাধ্যমে মানুষকে পশুতুল্য ব্যবহারকে আইনসঙ্গত করা হয়েছে। নারীরা প্রায়শ অর্থনৈতিক কাজকর্মে তেমন অবদান রাখে না। তাই পুরুষদের চেয়ে তাদের বেশি অর্থের প্রয়োজন। ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে নারীদের প্রতি অসমতা রয়েছে। নারীরা পুরুষদের থেকে কম পান। তাই ইসলামের অসম উত্তরাধিকার আইনকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অযৌক্তিক মনে করেন। ইসলামে নারীর সাক্ষ্যকে পুরুষদের অর্ধেক ধরা হয়। এই ব্যবস্থা হচ্ছে মানবাধিকারের লঙ্ঘন। কোরানের আদেশ অনুযায়ী একবার চুরির অপরাধে হাতকাটা এবং চুরির পুনরাবৃত্তির জন্য পা কেটে ফেলা একেবারেই অসামাজিক প্রথা। কারণ এরূপ শাস্তির ফলে অপরাধী অক্ষম, বিকলাঙ্গ হয়ে যায়। যার ফলে তার কাজকর্ম করার কোনো ক্ষমতা থাকে না। ইসলাম পুরুষদের জন্য বহুবিবাহ প্রথা অনুমোদন করে। এক স্বামী একক সময়ে চার স্ত্রী নিতে পারে এবং অগুণিত ক্রীতদাসী উপপত্নী হিসাবে রাখতে পারে। আবার যুদ্ধবন্দিনী-এমন কী যাদের স্বামী জীবিত থাকে সেইসব যুদ্ধবন্দিনীদের সাথেও যৌন সঙ্গমের অনুমতি রয়েছে। ব্যভিচারের জন্য ইসলামে রয়েছে পাথর ছুঁড়ে হত্যার শাস্তি যা ইসলাম ধার করেছে ইহুদিদের শাস্তিব্যবস্থা থেকে। ইসলামে বিদ্যমান এই প্রথাগুলিকে পাশ্চাত্যে 'অমানবিক' বলে নিন্দা করে। ইসলামি নীতিতে বলা হয়েছে: 'কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি ও দেহের উপর তার নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ থাকবে।' নিজস্ব সম্পত্তি উইল করার ব্যাপারে যে সীমাবদ্ধতা আছে সেটা ইসলামের নীতির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। মোদ্দা কথা হল ধর্ম কোনোভাবে সর্বজনীন ও সর্বকালের জন্য নয়।

এটা সত্যি যে, আজকাল বেশিরভাগ মুসলিম দেশে ইসলামি আইন যেমন পাথর ছুঁড়ে হত্যা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কর্তন করা এবং 'চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত' উত্তোলন করা হয় না। সব মুসলিম দেশে সুদসহ ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এই তথ্যগুলো জানানো হলেও ইসলাম-সমালোচকেরা হজ নিয়ে কটাক্ষ করেন। হেজাজের পৌত্তলিকদের মূর্তিপূজার ঘরকে আল্লাহর ঘর বানানো, পৌত্তলিক-প্রথার মত কাবার কালো পাথরকে (হাজরে আসওয়াদ) চুম্বন করা, এবং হজ সংক্রান্ত অন্য সকল ধর্মীয় আচার। ইসলামের দাবি হচ্ছে, ইসলাম মানব সমাজকে পৌত্তলিকতা এবং কুসংস্কার থেকে মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু হজ সংক্রান্ত রীতিনীতি ইসলামের এ-দাবির সাথে পুরোপুরি খাপ খায় না।

এজন্য ইসলামকে একটি একক জাতির নিজস্ব চিন্তাধারা ও রীতিনীতির প্রকাশ হিসাবে ধরে নিতে হবে। যে ধর্ম কখনো বর্ণবৈষম্য ও অন্ধ গোঁড়ামির উর্ধ্বে উঠেনি এবং সমগ্র মানবসমাজকে ভালোর দিকে পথ নির্দেশ দেয় না সে ধর্ম কখনো সার্বজনীন ও স্থায়ী হতে পারে না।

ইসলাম-সমালোচকেরা একটা বিষয় ভুলে যান, সবচেয়ে উত্তম আইন হবে সেই আইন যা মানুষের প্রয়োজন ও যা সমাজে উপস্থিত সকল ক্ষতিকর অবস্থার মোকাবেলা করে। তৎকালীন আরব সমাজে হত্যা, লুটতরাজ, অন্যের অধিকার ও সম্মানে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা ছিল সর্বত্র বিরাজমান। এ-রকম অস্থির সমাজে একমাত্র কঠোর আইনই ফলপ্রসূ হবে। শাস্তি হিসাবে অঙ্গাদি কর্তন করা, পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা এবং রক্তের বদলে রক্ত-একমাত্র এসব বিধান ছাড়া কোনো কিছু ফলপ্রসূ ছিল না। ইসলামের পূর্বে এবং ইসলাম প্রচারের সমসাময়িককালেও দাসপ্রথার প্রচলন ছিল। ইসলামের পূর্বে রোমান, অসিরীয়ান, এবং ক্যালডিয়ান সভ্যতার সময়েও দাসপ্রথা চালু ছিল। ক্রীতদাসের মুক্তির বিনিময়ে অনেক পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ইসলামে আছে। এ নিয়ে তৃতীয় অধ্যায়ের 'ইসলামে নারী' পরিচ্ছেদে বেশকিছু মন্তব্য রয়েছে। পৌত্তলিক যুগে আরব-নারীদের অধিকার খুবই কম ছিল। মৃত স্বামীর স্ত্রীকে 'সম্পত্তি' হিসাবে গণ্য করা হত। যে ব্যক্তি মৃত স্বামীর সম্পদের উত্তরাধিকারী হত তার বিধবা স্ত্রীও তার ভাগে পড়ত। কোরানে নারীদের যে অধিকার দেওয়া হয়েছে তা সেই সময়ের নারী অধিকারের জন্য এক বিপ্লবাত্মক অগ্রগতি। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে মুহাম্মদ যেসব আদেশ দিয়ে গেছেন তা আজকের ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকের সমাজের মানদণ্ডে বিচার করা অযৌক্তিক। আব্রাহাম লিঙ্কন যেভাবে দাস প্রথার বিরুদ্ধে লড়েছিলেন সেভাবে নবি মুহাম্মদ লড়বেন, এটা আশা করা একেবারে অবাস্তব। ইসলাম-সমালোচকদের আরও অনেক সমালোচনার যথার্থ জবাব দেয়া যায়। ইসলামে চিন্তা এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতার প্রসঙ্গে বলা যায় যে মুসলিমরা বিজিত দেশের বাসিন্দাদের উপর দুইটি পছন্দের একটি বেছে নেবার সুযোগ দেবে-ইসলাম অথবা জিজিয়া কর।

এটাও সত্য যে, অনেক ক্ষেত্রে তরবারির লড়াইয়ে ইসলাম প্রসারিত হয়েছে। আজকের বিংশ শতাব্দীর মানদণ্ডে যাচাই করলে এভাবে ইসলাম প্রচার করা অনুচিত ও অন্যায় মনে হবে। আধুনিক বিশ্ব কোনোভাবেই এই ধারণা গ্রহণ করবে না যে, আল্লাহ একমাত্র আরবদেরকেই নির্বাচিত করেছেন সমগ্র মানব-সমাজকে পথ দেখাতে। আল্লাহ সত্যিই যদি চাইতেন সিরিয়া, মিশর, এবং ইরানের বাসিন্দারা মুসলিম হবে, তবে তিনি যুদ্ধের আশ্রয় না নিয়ে অনেক মার্জিত ও শান্তিময় ব্যবস্থা নিতে পারতেন। কারণ কোরানে বলা হয়েছে : '...তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন ও যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন।' (সুরা নাহল : আয়াত ৯৩)। কোরানে আরও বলা হয়েছে যে তরবারি দ্বারা কাউকে পথ দেখানো যায় না। '...প্রকৃত প্রমাণ দ্বারাই আল্লাহ যাদেরকে ধ্বংস করার তাদের ধ্বংস করেন, আর প্রকৃত প্রমাণ দ্বারাই যাদেরকে জীবিত রাখা প্রয়োজন তাদেরকে জীবিত রাখেন।' (সুরা আনফাল: আয়াত ৪২)। '...তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধর্ম আমার।' (সুরা কাফিরুন : আয়াত ৬)। এইরকম আরও ডজন খানেক কোরানের আয়াত উদ্ধৃত করা যায়।

এই বিষয়ের গভীরে গেলে বুঝা যায় ইসলাম গ্রহণ অথবা জিজিয়া কর প্রদান করার যে শর্ত ছিল তা করা হয়েছিল আরববাসীর জন্য। মুহাম্মদ এই নীতি অবলম্বন করেন খায়বার দখল করার পর এবং মক্কা বিজয়ের পর যখন কুরাইশরা মুহাম্মদের প্রতি তাদের অধীনতা স্বীকার করে নেয়। নবি মুহাম্মদের উদ্দেশ্য ছিল আরবদেশকে একটি একক রাজনৈতিক ধারায় নিয়ে আসা। হাদিস থেকে জানা যায় যে নবি বলেছেন: 'আরব উপদ্বীপে একের বেশি ধর্ম থাকবে না।' মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহ নবিকে পাঠালেন সুরা তওবা । এই সুরায় বলা হল যে, পৌত্তলিকরা

অবিশুদ্ধ। তাই তারা আর কাবার মসজিদ প্রাঙ্গণে আসতে পারবে না। এই সুরার অনেক আয়াত থেকে বুঝা যায় যে ইসলামের ছত্রছায়ায় একটি আরব-জাতীয় পরিচয়ের জন্য নবি ছিলেন বদ্ধপরিকর। তাই বেদুইনদের জন্য কঠোর পদক্ষেপ এবং শক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা এই সুরায় রাখা হয়। 'অবিশ্বাস ও কপটতায় মরুবাসী আরবরা (বেদুইন) বড় বেশি পোক্ত। আর আল্লাহ তাঁর রসুলের ওপর যা অবতীর্ণ করেছেন তার (ন্যায়নীতির) সীমারেখা না শেখার যোগ্যতা এদের বেশি।' (সুরা তওবা : আয়াত ৯৭)। সুরা শোআরাতে আল্লাহ বলেছেন: 'যদি এ কোনো অনারবের (ভিন্নবাসী) ওপর অবতীর্ণ করা হত।' (২৬:১৯৮)। এ-আয়াত থেকে বুঝা যায় আল্লাহ জানতেন যে আরবদের চাইতে অনারবরা দ্রুত কোরান বোঝে এবং সহজেই কোরানের বাণী মেনে নেয়।

ইউরোপের পণ্ডিতেরা ইসলাম প্রসঙ্গ অনেক মন্তব্য করেছেন। তার মধ্যে দুটি প্রসঙ্গের উত্তর দেয়া যায় না। একটা হচ্ছে আল্লাহ শুধুমাত্র হেজাজের লোকদেরকে নিয়োগ করলেন সমগ্র বিশ্বকে নৈতিকতা শিক্ষা দিতে এবং তরবারি দিয়ে লড়াই করে বিশ্বব্যাপী একেশ্বরবাদ প্রচার করতে। যেহেতু এই বক্তব্যটি বিশ্বাস করা কঠিন তাই এ-নিয়ে এখানে আলোচনা করা যাবে না। দ্বিতীয় হচ্ছে আরবদের অন্য দেশ দখলের পিছনে যে অর্থনৈতিক প্রেরণা ছিল তা নিয়ে।

এ অধ্যায়ের শুরুর দিকে বলা হয়েছে নবির মৃত্যুর পর নেতৃত্ব এবং রাজ্যশাসনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা রাজনৈতিক ইসলামের রূপরেখা তৈরি করেছে। আরব বেদুইন যে অন্যের ধনদৌলত কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জাতিকে পদানত করেছিল তার প্রচুর প্রমাণ আমরা পাই ইতিহাস থেকে। উষর, অনুর্বর, রৌদ্রতপ্ত আরব মরুভূমিতে বসবাস করত অতিশয় রুক্ষ যাযাবর বেদুইনরা। তারা অতিকষ্টে কোনোরকমে জীবিকা নির্বাহ করত। তারা জানতো তাদের সীমান্তের বাইরে আরও অনেক উর্বর, ধনী, এবং উন্নত রাষ্ট্র এবং নগর আছে। সেসব জায়গায় বিলাসিতা আছে প্রচুর এবং জীবিকা অর্জন সহজ। তবে দুঃখের বিষয় ছিল যে ওই জনবসতিপূর্ণ ভূখণ্ডগুলো প্রবল ক্ষমতাধর পারস্য ও রোমের অধীনে। বিচ্ছিন্নভাবে নিঃস্ব, সহায়হীন যাযাবরদের দ্বারা এই শক্তিমান রাজত্ব জয় করা সম্ভব ছিল না। যাযাবর আরব বেদুইন গোত্রের মাঝে পরস্পর ধ্বংসাত্মক হানাহানি তখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ইসলাম এই আন্তঃগোত্রীয় হানাহানির অবসান ঘটায়, তাদের মাঝে এনে দেয় দৃষ্টির প্রসারতা। দীর্ঘদিন ধরে বেদুইনদের শক্তি বিচ্ছিন্ন-বিভাজিত অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। ইসলাম সে শক্তিকে সুসংহত করে একত্র করে। ফলে আরব ভূখণ্ডে জন্ম হয় এক অতিশয় শক্তিধর জাতির, যা এতদিন অসম্ভব ছিল ইসলাম তাকে সম্ভাবনাময় করে দিল।

ইসলাম-পূর্ব যুগে আরব ভূখণ্ডে দরিদ্র বেদুইনরা তাদের লোভ চরিতার্থ করার জন্য দুর্বল গোত্রের উপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে দুশো থেকে তিনশ উট কুক্ষিগত করে নিয়ে যেত। যখন তাদের এই শক্তিকে একত্রিত করা হল তখন তারা দেখল তারা আরও প্রচুর মাল দখল নিতে পারে। দূর-দূরান্তের উর্বর জমি দখল করে নিতে পারে, বিদেশি সুন্দরী শ্বেতাঙ্গ নারীও পেতে পারে। আরব-বেদুইনদের বৈশিষ্ট্য ছিল লড়াই করে অন্যের মাল লুট করতে এবং কাম চরিতার্থ করতে তারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করতে কুণ্ঠিত হতো না। ইসলাম তাদের এই উৎসর্গীকৃত জীবনাচরণ ও পেশাদারী বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগাল। আর বেদুইনরাও বুঝল যুদ্ধ জয় হলে অগণিত ধনসম্পদই শুধু হস্তগত হবে তাই নয় শত্রুকে হত্যা করলে বেহেশত লাভ হবে কিংবা যুদ্ধের ময়দানে নিহত হলেও বেহেশতে যাবে। ইসলাম আরব বেদুইনদের লড়াকু জীবনাচরণের আধ্যাত্মিক প্রেরণা যোগান দেয়। ইসলাম গ্রহণের পর তামিম গোত্র দ্বারা তাগলিব গোত্রকে আক্রমণ, আউস গোত্র দ্বারা খাজরাজ, সাকিফ গোত্র দ্বারা গাতাফান গোত্রকে পরস্পর আক্রমণ করা সম্ভব হল না। তার বদলে আরব দৃষ্টিপাত করল সিরিয়া ও ইরাকের উপর।

তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে গনিমতের মাল লাভ করা ছিল মুসলিম সম্প্রদায়কে সুদৃঢ় করার অন্যতম হাতিয়ার। দ্বিতীয় হিজরি সালে মুহাম্মদ নাখলাতে কুরাইশদের মালবাহী কাফেলা আক্রমণ করে প্রচুর মালামাল হস্তগত করেন। ফলে মুসলিমরা নিজেদের একত্রিত শক্তি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেলেন। এরপর বানু কায়নোকা, বানু কুরাইজার ধনসম্পদও হস্তগত হয় তাঁদের। ফলে মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা শক্ত ভিত্তি লাভ করে। আরবদের যে গনিমতের মালের প্রতি আকর্ষণ রয়েছে তা কোরানেও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে: 'তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে তখন যারা ঘরে থেকে গিয়েছিল তারা বলবে, 'আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও।. . .' (সুরা ফাতাহ : আয়াত ১৫)। এই আয়াতে এক বেদুইনের কথা বলা হয়েছে। সেই বেদুইন কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে এবং এক বৃক্ষের তলে (হুদাইবিয়ার সফরের সময়) নবির পক্ষে সর্বদা জীবন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকার অঙ্গীকার নিতে অপরাগ ছিল। পরে যখন নবি খায়বারে ইহুদিদের বিরূদ্ধে অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন সেই বেদুইন সংবাদ পেল যে আল্লাহ মুসলিমদেরকে অগাধ গনিমতের মাল লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাই সে নবির অভিযানে যোগ দিতে চাইল। এদিকে গাতাফান গোত্র খায়বারের ইহুদিদের সাথে মিত্রতার চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। নবি যখন খায়বারে সামরিক অভিযান চালান তখন তিনি গাতাফান গোত্রকে খায়বারের গনিমতের মালের কিছু অংশ দেবার অঙ্গীকার করলেন যাতে তারা ইহুদিদের সাহায্যে এগিয়ে না যায়।

গনিমতের মালের প্রতি আরবদের যে কী অপরিসীম আকর্ষণ ছিল তার প্রচুর বিবরণ পাওয়া যায় হিজরির প্রথম দশকে। এর একটা বিশেষ উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। সেখানে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ হাওয়াজেন গোত্র থেকে পাওয়া গনিমতের মাল তাঁর কুরাইশ আত্মীয়দের মাঝে বিতরণ করে দিলেও আনসাররা কিছুই পেল না। ফলে আনসাররা নবির উপর গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এই বিবরণগুলি আরবদের বিশেষ মনোবৃত্তির প্রমাণ দেয়। আর এটাও প্রমাণ করে নবি তাঁর সমাজের লোকদের মানসিকতা খুব ভাল করে বুঝতেন। এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার। নবি যেসব পন্থা অবলম্বন করেছিলেন যেমন বাণিজ্য কাফেলায় আক্রমণ, ইহুদিদের উৎখাত করা বা তাদেরকে অধীনস্থ করা, এসবের পিছনে নবির এক উচ্চতর উদ্দেশ্য ছিল। যা আরবদের গনিমতের মালের প্রতি আকাঙ্ক্ষার চেয়ে ভিন্ন ছিল। মুহাম্মদ কেবল একজন ধর্মপ্রচারক নয়, একজন রাষ্ট্রনায়কও ছিলেন। রাষ্ট্রনায়কেরা মনে করেন তাঁদের উদ্দেশ্য সফলের জন্য যা দরকার তাই-ই করতে হবে। মুহাম্মদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের বীজ রোপণ করা, আরবদেশ থেকে দুর্নীতিপরায়ণ পৌত্তলিক, কপটাচারীদের নির্মূল করা, এবং ইসলামের পতাকায় এক সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের ভিত্তি তৈরি করা। তাই তাঁর এই সুউচ্চ লক্ষ অর্জনে তিনি যে কোনো পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত ছিলেন।

গনিমতের মাল মুহাম্মদ কখনো ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতেন না। সে-সময় মুসলিম সমাজ ছিল ছোট। তাই নবি গনিমতের মাল ব্যবহার করে এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নে সচেষ্ট হন। মুহাম্মদ তাঁর অতি সাদাসিধা জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। বানু কুরাইজার বিপুল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পর নবির স্ত্রীগণও তাঁর কাছ থেকে অধিক ভাতা দাবি করলেন। কিন্তু নবি তাঁর স্ত্রীদের দুটির মধ্যে একটি পছন্দ করতে আহবান করলেন-তাদের বর্তমান ভাতা অথবা বিবাহ বিচ্ছেদ। নবির সহচরেরা তাঁর মতই সাদাসিধে জীবন নির্বাহ করতেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁর কোনো সহচর লোভের বশবর্তী হননি। নবির মৃত্যুর পর মুসলমানরা অনেক দেশ জয় করেন। ফলে প্রচুর পরিমাণ গনিমতের মাল অর্জিত হয়। তখন নেতৃত্বের অনেকেই ধনদৌলতের প্রতি বশীভূত হন।

দ্বিতীয় খলিফা ওমর গনিমতের মাল বণ্টন কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করতেন। শুধু তাই নয় মুহাজির ও আনসার নেতাদের এবং অন্যান্য সুযোগ্য মদিনাবাসীদের বয়স্ক ভাতা ধার্যের সময়ও ন্যায়-নীতি মেনে চলতেন। সবাইকে নবির পথে রাখার জন্য ওমর নিজেও একান্ত অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। মুক্তক্রীতদাস সালেম (শুরুর দিকের হাদিস বর্ণনাকারী) এক হাদিসে জানিয়েছেন, খলিফা থাকাকালীন সময়ে ওমরের পাগড়িসহ সমস্ত পোশাক, এবং জুতার মূল্য চোদ্দ দিরহামের বেশি ছিল না। অথচ খলিফা হবার আগে এগুলির মূল্য ছিল চল্লিশ দিনার। ঐতিহাসিক এবং কোরানের তফসিরকারক আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরির আল তাবারি লিখেছেন যে, ওমরের মিতব্যয়িতা এতোই কঠোর ছিল যে তাঁর শাসনের শেষের দিকে প্রচুর অসন্তোষ সৃষ্টি করে। ওমর তা জানতে পেরে মসজিদের প্রচারবেদি থেকে ঘোষণা করলেন: ‘আমি ইসলামের পরিপালনের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছি। ইসলাম এখন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। কুরাইশরা এখন চাইছে আল্লাহর দান (গনিমতের মাল) তাঁর ইবাদতকারীদের মুখ থেকে কেড়ে নিতে। আমি এই ব্যাপারে সতর্ক আছি। কুরাইশরা সহজ পথ (ইসলাম) থেকে বিচ্যুত হয়ে নরকের পথে পা বাড়ালে আমি তাদেরকে বাধা দিব।’ তাবারি আরও বলেছেন যে, খলিফা ওমরের অনুমতি ছাড়া নবির বিশিষ্ট সাহাবিদের পর্যন্ত মদিনার বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। ওমর কখনো অনুমতি দিলেও তা সীমাবদ্ধ থাকত শুধুমাত্র স্বল্পসময়ের জন্য, তাও শুধুমাত্র হেজাজ অঞ্চলে ভ্রমণের জন্য। বিশিষ্ট সাহাবিরা বিজিত দেশে ভ্রমণ করলে মুসলমানরা ভাগ হয়ে যেতে পারে -এই চিন্তা নিয়ে ওমর সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকতেন। কখনো কোনো বিশিষ্ট কুরাইশ বিদেশিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করতে চাইলে ওমর বলতেন: ‘নবির সময়ে আপনি যে যুদ্ধে গিয়েছিলেন তাই আপনার জন্য যথেষ্ট। আপনি বিদেশ না দেখলেই ভাল, আর বিদেশিরা আপনাকে না দেখলেই ভাল।’

খলিফা ওমরের কঠোরতা প্রসঙ্গে মিশরীয় লেখক তাহা হোসেন[১৪] তাঁর ‘ফেৎনাত আল কুবরা’ (২য় খণ্ড, কায়রো ১৯৪৭ এবং ১৯৫৩) বইয়ে লিখেছেন : ‘ক্ষমতা ও মুনাফার উপর কুরাইশদের প্রবল লোলুপতা ছিল। কুরাইশদের এই গোষ্ঠীগত মনোভাব খলিফা ওমর ভাল করে জানতেন। তাই ওমর কুরাইশদেরকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। সে-সময় কাবা ছিল আরবদের মূর্তিপূজা এবং তীর্থযাত্রার প্রধান কেন্দ্র। কুরাইশদের উপর ন্যস্ত ছিল কাবাঘর ও তীর্থযাত্রীদের দেখাশোনার ভার। এটাই একমাত্র কারণ যে, কুরাইশরা তাদের গোত্রের আভিজাত্যের দাবিদার ছিল। অর্থাৎ আরবদের ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার, প্রথা-রীতিনীতির সুযোগ নিয়ে কুরাইশরা গোটা আরবের মধ্যে সবচেয়ে ধনী হয়ে উঠে। কুরাইশদের সৌভাগ্য যে, ধর্মীয় কারণে মক্কা এবং এর প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল নিরাপদ। তাই কুরাইশরা পূর্ণভাবে বাণিজ্যে মনোনিবেশ করতে পারতেন। তারা হেজাজের সবচেয়ে প্রভাবশালী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। কুরাইশরা ছিল ওমরের গোত্রের লোক। তাই ওমরও জানতেন কুরাইশদের সব আভিজাত্য, সম্মান এবং ধনদৌলত সব কিছুর পিছনে রয়েছে ছিল কাবা ও এর মূর্তিগুলো। তা না হলে কুরাইশরা কোনোদিনই মূর্তি পূজা করত না। ওমর আরও জানতেন কুরাইশরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেননি। মক্কা বিজয়ের পর নবি তাদের উপর ইসলাম চাপিয়ে দিয়েছিলেন। কুরাইশরা মুসলমানদের ভয়ে পেত। তাছাড়া কুরাইশরা জানত যে, দীর্ঘদিনের বংশের ঐতিহ্য ভেঙে ইসলাম গ্রহণ তাদের জন্য এক ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল। সেজন্যে ওমর ভাবলেন এই ধনসম্পদ লোলুপ, সুযোগসন্ধানীদের যথেচ্ছার ভার দেওয়া বিপদজনক হবে।

ওমর যে আসলেই বিচক্ষণ ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর মৃত্যুর পর অনেক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। ওমরের উইলে লিখে গিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর পরে যিনি খলিফা হবেন তিনি যেন ওমর নিয়োগকৃত শাসনকর্তাদের এক বছর তাদের পদে বহাল রাখেন। উসমান ওমরের ইচ্ছা পালন করলেন। এক বছর পর উসমান সরকারি পদগুলি থেকে নিয়োগকৃতদের রদবদল করেন। শাসনের শুরু হতেই উসমান মুহাজির ও আনসারদের সরকারি কোষাগার থেকে প্রচুর

টাকা পয়সা দেয়া শুরু করেন। একবার উসমান বয়স্ক ভাতা শতকরা একশ ভাগ বাড়িয়ে দিলেন। উসমান ছিলেন তৃতীয় খলিফা। পূর্বগামীদের অনুরূপ ব্যক্তিগতভাবে উসমান সাধারণ জীবন নির্বাহ করতেন। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উসমান কখনো সরকারি তহবিল তছরুপ করেননি। কিন্তু তিনি অযোগ্য ব্যক্তিদের অনেক দান, উপহার দিয়েছিলেন। এ কারণে অনেকের মাঝে পরশ্রীকাতরতা এবং লোভের জন্ম হয়, বাতিল হয়ে যায় আত্মসংযমী হবার প্রয়াস।

পূর্বেই বলা হয়েছে খলিফা ওমর অতি সাধারণ পোশাক পরিধান করতেন এবং সাধাসিধে জীবনযাপন করতেন। ইসলামের ইতিহাসে ওমর ছিলেন অন্যতম শক্তিশালী খলিফা। তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম খলিফা যার উপাধি ছিল 'বিশ্বাসীদের নৃপতি'। আলিও ছিলেন কঠোর আত্মসংযমী ব্যক্তি। এ-ব্যাপারে আলির শক্রমিত্র উভয়েই একমত। আলির পোশাক ভর্তি ছিল তালিতে। বার বার তাঁর পোশাক সেলাইয়ের জন্যে আলি তাঁর দর্জির কাছে লজ্জিত থাকতেন। একবার আলির ভাই আকিল তাঁর ঋণ পরিশোধের জন্য আলিকে অনুরোধ করলেন সরকারি তহবিল থেকে টাকা দিতে। আলি কঠোরভাবে তিরস্কার করলেন আকিলকে। পরে আকিল চলে যান আলির প্রতিপক্ষ মুয়াবিয়ার কাছে। এ-ঘটনা থেকে বুঝা যায় আরবদের মানসিকতায় আর্থিক বিষয় কত গুরুত্বপূর্ণ।

এ-প্রসঙ্গে নবির অন্যতম প্রসিদ্ধ সাহাবি সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা দরকার। মক্কায় নবুওতির প্রথম দিকে সাদ ইসলাম গ্রহণ করেন। নবি যে দশজনকে বেহেশতের নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন সাদ ছিলেন তাঁদের একজন। হিজরি ১৬ সালে (৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ) ওমরের খেলাফতে সাদ কুদসিয়ার যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন এবং ইরানিদের পরাজিত করে তাদের রাজধানী কুটাসফন (অথবা তাসিবন) দখল করে নেন। এই জন্য সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসকে 'ইসলামের বীর' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এরপর সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস কুফার প্রথম শাসক নিয়োজিত হন। হিজরি ২৩ (৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ) সালে ওমরের মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ওমর নতুন খলিফা মনোনীত করার জন্য যে ছয় সদস্য বিশিষ্ট পরিষদ গঠন করেন তাতে সাদকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর ফলে সাদও নতুন খলিফার জন্য একজন প্রার্থী হয়ে যান। হিজরি ৫৫ (৬৭৪-৫ খ্রিস্টাব্দ) সালে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস মদিনা শহরের নিকটবর্তী আল-আকিক উপত্যকায় অবস্থিত তাঁর বিশাল বাসভবনে মারা যান। মৃত্যুকালে তিনি প্রচুর ধনসম্পত্তি রেখে যান যার পরিমাণ ছিল আনুমানিক দুই থেকে তিন লক্ষ দিরহাম।

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের পুত্র ওমর বিন সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের কথাও বাদ দেয়া যায় না। হিজরি ৬১ সালে (৬৮১ খ্রিস্টাব্দ) ইরাকের শাসনকর্তা ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ, ওমর বিন সাদ বিন ওয়াক্কাসকে এক শর্তে ইরানের রায়ি অঞ্চলের শাসনকর্তা নিয়োগের প্রস্তাব দেন। শর্ত ছিল প্রথমে ওমর বিন সাদকে এক অভিযানের নেতৃত্ব দিতে হবে যাতে তিনি হোসেন বিন আলিকে ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার খেলাফত স্বীকার করাতে বাধ্য করেন। হোসেন এতে রাজি না হলে তার পরিণতি হোসেনকে বহন করতে হবে। অর্থাৎ হোসেনকে মেরে ফেলতে হবে। প্রথমে ওমর বিন সাদ এই শর্ত মানতে রাজি হলেন না। এক রাতে ওমর বিন সাদ তাঁর আত্মীয়দের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর আত্মীয়রা একমত হলেন তাঁর উচিত হবে না নবির দৌহিত্রের সাথে যুদ্ধ করা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ সফল হলেন। ওমর বিন সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস হোসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাত্রা করলেন। যখন ওমর বিন সাদ হোসেনের সম্মুখীন হলেন তখন তিনি চাইলেন হোসেনের সাথে আপোষ করে নিতে। তিনদিন ধরে ওমর বিন সাদ হোসেনের সাথে কথাবার্তা চালিয়ে বোঝাতে চাইলেন হোসেন যেন আত্মসমর্পণ করে ইয়াজিদের প্রতি তাঁর আনুগত্য ঘোষণা করেন। এই দীর্ঘস্থায়ী আলোচনার কথা শুনে ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ভাবলেন ওমর বিন সাদ হয়ত হোসেনের ইসলামি ভাবাবেগে পড়ে যাবেন এবং তাঁর পক্ষে চলে যাবেন।

সে-জন্য ওবায়দুল্লাহ তাঁর সামরিক কর্মকর্তা শেমর বিন দিল-জোওশানকে বার্তা পাঠালেন যে, ওমর বিন সাদ যদি গড়িমসি চালাতে থাকেন তবে তিনি যেন সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব নিয়ে নেন। এই খবর শোনা মাত্র ওমর বিন সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ভুলে গেলেন ইসলামের জন্য তাঁর পিতার অবদানের কথা। তিনিই হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি নবির নাতিকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়ে মারেন। ধর্ম, সম্মান এবং নৈতিকতার চেয়ে ওমর বিন সাদের কাছে প্রাধান্য পায় পারস্যের রায়ি রাজ্যের শাসন ক্ষমতা লাভ করা।

তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ ছিলেন নবির অন্যতম সাহাবি। যে দশ জন সহচরকে নবি বেহেশতের নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন তালহাও তাঁদের অন্যতম। খলিফা ওমর যে ছয় সদস্যের পরিষদ গঠন করেছিলেন তালহাও তাতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আবার তালহা নিজেই খলিফা পদের প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু তালহা মদিনার বাহিরে থাকায় পরিষদের সভায় যোগ দিতে পারেননি। ফলে তালহার মতামত না জেনেই পরিষদ খলিফার মনোনয়ন দিয়ে দেন। মদিনায় ফিরে আসার পর তালহা খলিফার ব্যাপারে অনীহা দেখালেন এবং উসমানের প্রতি তাঁর আনুগত্য জানাতে অস্বীকার করলেন। শেষে উসমান ব্যক্তিগতভাবে তালহার বাসগৃহে যান এবং খলিফার পদ ছেড়ে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তালহা বিব্রতবোধ করলেন এবং উসমানকে তাঁর আনুগত্য দিয়ে দিলেন। পুরস্কারস্বরূপ উসমান সরকারি তহবিল থেকে তালহাকে ৫০ হাজার দিরহাম দিয়ে দিলেন এবং জানিয়ে দিলেন এই অর্থ পরিশোধ করতে হবে না। এরপর থেকে তালহা হয়ে গেলেন উসমানের কাছের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এরপরও তালহা উসমানের সাহায্যে আরও অনেক অর্থের লেনদেন করেন। যেমন একবার তালহা ইরাকের কিছু জমি বিনিময় করতে চাইলেন হেজাজ অথবা মিশরের সাথে। উসমান সাথে সাথে তৈরি হয়ে গেলেন তাঁর শাসিত ইসলামি সাম্রাজ্যের যে কোনো স্থানে উচ্চপদস্থ কর্মচারী পাঠিয়ে দিতে যাতে তালহা যা চান তা পেয়ে যান। এ-ব্যাপারে অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। প্রথমে তালহা উসমানকে সমর্থন জানালেন। যখন অসন্তোষের কণ্ঠ উচ্চ হতে লাগল তখন তালহা বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন নিজের জিহবা সংবরণ করে। যখন বিদ্রোহীরা উসমানের গৃহ-অবরোধ করে ফেলে তখন তালহা তাড়াতাড়ি বিদ্রোহীদের পক্ষ নিলেন। হিজরি ৩৬ (৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ) সালে জামালের যুদ্ধে (উটের যুদ্ধ) তালহা নিহত হন। একটি তথ্য অনুযায়ী উসমানের চাচাত ভাই মারোয়ান বিন আল-হাকাম এক তীর নিক্ষেপ করে তালহাকে হত্যা করেন। এরপর মারোয়ান বিন আল-হাকাম বলেন, ‘উসমানের খুনের প্রতিশোধের জন্য তালহার রক্তই যথেষ্ট।’ (মারোয়ান ছিলেন আলির বিপক্ষে। হিজরি ৬৪ (৬৮৪-৮৫ খ্রিস্টাব্দ) সালে মারোয়ান উমাইয়া খলিফা নিযুক্ত হন।) উল্লেখ্য তালহা যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি মোটেও অর্থবিত্তের মালিক ছিলেন না। ওমরের সময়ও তালহা মধ্যবিত্ত পর্যায়ের ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুকালে তাঁর সম্পত্তির মূল্য ছিল ত্রিশ লক্ষ দিরহাম। এর মধ্যে নগদ ছিল ২ লক্ষ দিনার আর বাকি ছিল দালানকোটা, কৃষিভূমি, ও অস্থাবর সম্পত্তি। ইবনে সাদে ‘তাবাকাত’ গ্রন্থের বর্ণনায়, তালহার নগদ অর্থের পরিমাণ ছিল ১০০টি চামড়ার বস্তা, প্রত্যেক বস্তায় ছিল ১০০ কিলোগ্রাম বিশুদ্ধ স্বর্ণ।

ওমরের উত্তরাধিকার নিয়োগের জন্য যে ছয়জনকে মনোনীত করা হয়েছিল তাদের মধ্যে আরও একজন ছিলেন জুবায়ের বিন আল-আওয়াম। তিনি নবির ফুফুর পুত্র। এছাড়াও নবির সাথে তাঁর অন্য আত্মীয়তাও ছিল। জুবায়ের বিন আল-আওয়াম ছিলেন প্রথম দিকের ইসলাম গ্রহণকারী। তিনিও সেই দশজনের একজন, যাকে বেহেশতের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিল। জুবায়ের নবির সঙ্গে অনেকগুলি যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন। নবি জুবায়েরকে আখ্যা দিয়েছিলেন ‘আমার শিষ্য’। তাই তিনি ছিলেন নবির সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত। অনেকে বলেন যে ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমান জুবায়েরকে সরকারি তহবিল থেকে ছয় লক্ষ দিরহাম দেন। জুবায়ের ভেবে পেলেন না এত বিপুল অর্থ দিয়ে তিনি কি করবেন? তাঁর বন্ধুরা যা পরামর্শ দিলেন জুবায়ের তাই-ই করলেন। বিভিন্ন নগরীর আশেপাশে

তিনি অনেক বাড়ি, কৃষিজমি ক্রয় করেন। তাঁর মৃত্যুকালে ফোসতাত (পরবর্তীকালে কায়রো), আলেকজান্দ্রিয়া, বসরা, কুফায় প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক বনে যান। মদিনাতে জুবায়ের এগারটি বাড়ির মালিক ছিলেন এবং এই বাড়িগুলি ভাড়া দিয়ে দেন। অনুমান করা হয় তাঁর সমগ্র ভূ-সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৩৫,২০০,০০০ থেকে ৫২,০০০,০০০ দিরহাম। ইবনে সাদ তাঁর তাবাকাত বইয়ে লিখেছেন জুবায়ের অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। তিনি কারো কাছ থেকে কোনো কিছু গচ্ছিত রাখতে চাইতেন না। তাঁর ভয় ছিল যে কোনো মুহূর্তে তিনি চরম দুর্দশায় পতিত হতে পারেন। ফলে ওইসব গচ্ছিত মাল বা ধনসম্পদ হারিয়ে যেতে পারে অথবা নষ্ট হতে পারে। কিন্তু কেউ তাঁকে ঋণ দিলে তা গ্রহণ করতেন। এবং সেই অর্থ নিজের মনে করে লাভজনক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতেন। তবে শর্ত ছিল তিনি মারা গেলে ওইসব ঋণের অর্থ তাঁর উত্তরাধিকারীরা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন। সত্যি বলতে মৃত্যুকালে তিনি প্রায় বিশ লক্ষ দিরহাম ঋণ রেখে যান যা তাঁর পুত্ররা পরিশোধ করে দেন।

আব্দুর রহমান বিন আউফ নবির আরেকজন নিকটতম সাহাবি। তিনিও দশজনের মধ্যে একজন যে বেহেশতের নিশ্চয়তা পেয়েছিলেন নবির কাছ থেকে। এই সাহাবি অতিশয় বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী এবং খলিফা আবু বকর ও খলিফা ওমরের বিশ্বস্ত উপদেষ্টা। খলিফা নির্বাচনের জন্য ওমরের ছয় সদস্য বিশিষ্ট কমিটির একজন তিনি। আব্দুর রহমান কখন দারিদ্রতা দেখেননি। তাই বদান্যতায় ছিলেন সর্বাগ্রে। তিনি যে বিপুল পরিমাণ সম্পদ-সম্পত্তি রেখে যান তা কোনোক্রমেই শুধুমাত্র মদিনার বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা অর্জন করা সম্ভব ছিল না। মৃত্যুকালে তিনি চারজন স্ত্রী রেখে যান। প্রত্যেক স্ত্রী পান ৫০ হাজার স্বর্ণের দিনার, ১ হাজারটি উট এবং ৩ হাজার মেষ। আব্দুর রহমান উইলে তাঁর স্ত্রীদেরকে এই ধনসম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার নির্দেশ দিয়ে যান। খলিফা উসমানের আমলে হাকাম বিন হিজামের মতো গুণসম্পন্ন ব্যক্তি খুব কম ছিলেন। তিনি সরকারি তহবিল থেকে এক কপর্দকও নিতেন না। যখন সরকারি কোষাগার থেকে মুহাজির এবং আনসারদের মাঝে বয়স্ক ভাতার ব্যবস্থা করা হলো তখন তিনি সে ভাতা নিতে অস্বীকার করলেন।

আবুজর গিফারি[৯৫] প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করে নবির ঘনিষ্ঠ সাহাবি হয়ে যান। গিফারি অতিশয় ধার্মিক এবং কঠোর আত্মসংযমী বলে পরিচিত ছিলেন। অনেক হাদিসেরও বর্ণনাকারী। তিনি প্রায়ই বলতেন, সুরা তওবা'র ৩৪ আয়াতে যে বলা হয়েছে: '...যারা সোনা ও রুপা জমা করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মারাত্মক শাস্তির খবর দাও।' (৯:৩৪)। এই আদেশ দেয়া হয়েছে সমগ্র মুসলিম সমাজকে যেন তারা সম্পদ কুক্ষিগত না করে তা দান করে দেয়। আবুজর গিফারি সিরিয়াতে থাকাকালীন শাসনকর্তা মুয়াবিয়াকে কোরানের ওই আদেশ লঙ্ঘন করার জন্য ভর্ৎসনা করেন। শাস্তিস্বরূপ মুয়াবিয়া আবুজরকে সিরিয়া থেকে নির্বাসিত করে হেজাজে পাঠিয়ে দেন। মদিনাতে এসে আবুজর একই কথা বললেন। ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমান তা শুনে আবুজরকে প্রহার করলেন এবং মদিনা থেকে বহিষ্কার করে দিলেন।

যাহোক এটা সত্যি যে, নবির কিছুসংখ্যক সাহাবি ধনসম্পত্তির লোভ সংবরণ করতে না পেরে তা হাসিল করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যান। অবস্থা এমন হয়ে উঠে যে, অদক্ষ এবং যারা নবি বা খলিফার সাথে জড়িত ছিল না তারাও পর্যন্ত নানা পন্থা অবলম্বন করে টাকা বানাতে লাগলেন। কথিত আছে জান্নাব নামে একজন দিনমুজুর মক্কায় বার্তাবাহক ভৃত্য হিসেবে কাজ করতেন, তিনিও কুফায় মৃত্যুকালে নগদ ৪০ হাজার দিরহাম রেখে যান।

যুদ্ধে যোগদানকারীরা গনিমতের মালের ভাগ পেয়ে এবং পরে বয়স্ক ভাতা পেয়ে অনেকে ধনী হয়ে যায়। যেসব অশ্বারোহী সৈনিক ইফ্রিকিয়ায় (বর্তমানে তিউনিসিয়া) আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছিল

তারা প্রত্যেকে ৩ হাজার মিথকাল (১ মিথকাল ৪.৭ গ্রামের সমান) পরিমাণ বিশুদ্ধ স্বর্ণ পায়। একজন পদাতিক সৈন্য পায় ১ হাজার মিথকাল।

ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগের এইসব অজস্র নির্ভরযোগ্য উদাহরণে এটা পরিষ্কার হয়ে আসে যে, গনিমতের মালের ভাগ পাওয়া, অন্যের ভূমি জোরপূর্বক দখল করা, এবং অন্যের নারীদের অপহরণ করে তাদের দাসী বানিয়ে রাখা-এসবই ছিল আরব যোদ্ধাদের জন্য বড় আকর্ষণ। এজন্য তাদের সাহসের কোনো অভাব ছিল না। নির্মমতা দেখাতেও তারা কোনোপ্রকার কুণ্ঠা বোধ করতেন না। নবির আদর্শ, আদেশ-নিষেধকে অগ্রাহ্য করে ইসলামের ছত্রছায়ায় থেকে তাঁরা ক্ষমতা, ধনদৌলত, প্রভাবপ্রতিপত্তি হাসিলে ব্যস্ত ছিলেন। তারা ভুলে গেলেন ইসলামের সেই মহান বাণী, কোরানে যেমন বলা হয়েছে : 'তোমাদের মধ্যে সে-ই আল্লাহর কাছে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন যে বেশি পরহেজগার।' (সুরা হুজুরাত : আয়াত ১৩)। তবে এই ধরনের অসদাচরণের প্রতিক্রিয়াও অচিরেই শুরু হয়ে যায়। বিদেশিরা, বিশেষ করে ইরানিরা এই ধরনের অনৈতিক আচরণ-অত্যাচার মানতে চাইল না। তারা ইসলামের আধ্যাত্মিক এবং দয়ালু নীতিগুলো গ্রহণ করে। কিন্তু আরবদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের দাবি মানতে অস্বীকার করে। ইরানিরা আরবদের শোষণের স্বীকার হতে চাইল না। আরবদের জাত্যাভিমান আর শ্রেষ্ঠত্বের দাবির উত্তরে ইরানিরা তাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন 'শোবিয়া' গড়ে তুলে। এমন কী অনেকে ইসলামের বিরুদ্ধে (জিন্দিক) গিয়ে ধর্মবিরোধী হয়ে যান।

এই বইয়ের লেখক মিশর থেকে প্রকাশিত *Al-zandaqa wa-l-su'ubiyya fi-l-'asr al-"Abbasi al-awwal* শিরোনামের একটি বই পড়েছিলেন। বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক। তিনি সেখানে দাবি করেন, 'ইরানিদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (শোবিয়া) পুরোপুরি ইসলামি নীতি-আর্দশের বিরোধী। এটি ধর্মবিরোধী।' কিন্তু বইটিতে দেখানো হয়নি যে আরবেরাও কোরান লঙ্ঘন করেছে। অন্তত এই আয়াতটি : 'আল্লাহ অবশ্যই ন্যায়পরায়ণতা, সদাচারণ ও আত্মীয়স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন। আর তিনি অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালঙ্ঘন নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।' (সুরা নাহল : আয়াত ৯০)।

যেসব খলিফাকে 'বিশ্বাসীদের নৃপতি' (আমিরুল মুমেনিন) উপাধি দেয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকেই এতো ভ্রষ্টাচারী ছিলেন যে, কথিত আছে তারা 'মদের নদী'তে স্নান করতেন। নবি তাঁর মহান আদর্শ সততা এবং উৎকর্ষতাকে মানবতার মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই খলিফারা নবির সেই মহত্ত্বের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপই করেননি। উমাইয়া খলিফারা অনারব মুসলমানদের উপর আরব মুসলমানদের কর্তৃত্ব এবং অন্য আরবদের উপর উমাইয়া গোত্রের আরবদের কর্তৃত্ব বহাল রাখতে সচেষ্ট থাকলেন।

আলি ছিলেন নবির সহচরদের মধ্যে অন্যতম ধর্মপ্রাণ এবং জ্ঞানী ব্যক্তি। তথাপি এই 'বিশ্বাসীদের শাহজাদা'রা মসজিদের প্রচারবেদি থেকে আলি বিন আবু তালিবের মৃত্যুর পরও তাঁকে নিয়ে গালিগালাজসহ কটুক্তি করতেন। বিশিষ্ট পণ্ডিত আব্দুল্লাহ বিন আল-আব্বাস ছিলেন নবির চাচাতো ভাই। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের বংশধর ছিলেন খলিফা মুতাওয়াক্কিল (২৩২-২৪৭ হিজরি; ৮৪৭-৮৬১ খ্রিস্টাব্দ)। নিজের দরবারে উপস্থিত গণ্যমান্যদের চিত্তবিনোদনের জন্য তিনি এক ভাঁড়কে নিয়োজিত করলেন যে আলির বেশ ধারণ করে নর্তন-কুর্দন করতো। এছাড়াও খলিফা মুতাওয়াক্কিল নবির নাতি হোসেন বিন আলির সমাধিতে লাঙ্গল চালিয়ে দেন এবং সেচ করতে থাকেন যাতে করে ওই সমাধির কোনো চিহ্ন পাওয়া না যায়; লোকজনের মন থেকে যেন নবির দৌহিত্রের স্মৃতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাই ইরানিরা সঠিকভাবেই বিবেচনা করেছিল যে যারা এতো অসচ্চরিত্র এবং নবির আদর্শের প্রতি সীমাহীন

উদাসীন তারা কোনোক্রমেই ‘বিশ্বাসীদের শাহজাদা’ বা ‘নৃপতি’ (আমিরুল মুমেনিন) খেতাবে ভূষিত হতে পারেন না।

পাদটীকা

৮৮. ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমরকে ২৬ জুলহজ হিজরি ২৩ (৩ নভেম্বর ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ) সালে আবু লুলু ছুরিকাহত করেন। আবু লুলু ছিলেন একজন ইরানি ক্রীতদাস। অনেক ঐতিহাসিক তাকে খ্রিস্টান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে ওমর এক পরিষদ গঠন করেন খলিফা নির্বাচনের জন্য। এই পরিষদ উসমানকে ওমরের পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করে।

৮৯. আবুজর গিফারি নবি মুহাম্মদের ধর্মপ্রচারের শুরুর দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি একজন কঠোর তপস্বী, সমালোচক এবং হাদিস-বর্ণনাকারী। উসমানের খেলাফতের সময় সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া তাঁকে সিরিয়া থেকে বহিষ্কার করেন। আবুজর গিফারি হিজরি ৩২ সালে (৬৫২ খ্রিস্টাব্দ) সালে মারা যান। আবুজর গিফারি, আল মিকদাদ বিন আমর, এবং সালমান আল ফার্সিদেরকে প্রথমদিককার ‘শিয়া’ বলা হয়।

৯০. আম্মার বিন ইয়াসিরও ধর্মপ্রচারের শুরুর দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি নবির সাথে অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। খলিফা ওমরের সময় তিনি কুফার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং খুজিস্থান দখলে অনেক অবদান রাখেন। খলিফা উসমান তাঁকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করেন। নবির স্ত্রী আয়েশার বিরুদ্ধে জামালের যুদ্ধে আম্মার বিন ইয়াসির খলিফা আলির পক্ষে লড়াই করেন। তবে সিফিফনের যুদ্ধে আলির পক্ষ নিয়ে লড়াই করার সময় মৃত্যুবরণ করেন।

৯১. আরবি ভাষায় প্রাক-ইসলামি যুগ থেকে ইব্রাহিম আল মুয়াসেলির সময়কালের কবিতার সংকলন-গ্রন্থ। আব্বাসিয়া খলিফা হারুন আল-রশিদের আমলে ইব্রাহিম আল মুয়াসেলি ছিলেন রাজসভার সংগীতবিশারদ (হিজরি ১৭০ বা ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ-হিজরি ১৯৩ বা ৮০৯ খ্রিস্টাব্দ)। গ্রন্থটির সংকলক ছিলেন আবুল ফরজ আলি আল-ইসফাহানি (হিজরি ২৮৪ বা ৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ-হিজরি ৩৫৬ বা ৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ) উমাইয়া বংশের আরব। বসবাস করতেন পারস্যের ইসফাহানে।

৯২. ফার্সি শব্দ খাসরাও-এর আরবি উচ্চারণ হচ্ছে ‘খসরু’। এটি ইরানের এক রূপকথার রাজার নাম ছিল। পরবর্তীতে এই নামের দুজন সাসানিদ সম্রাট পারস্য শাসন করেন। প্রথমজন খসরু-১ অনুশিরবন (৫৩১-৫৭৯ খ্রিস্টাব্দ) এবং দ্বিতীয়জন খসরু-২ পারভেজ (৫৯১-৬২৮ খ্রিস্টাব্দ)।

৯৩. আব্দুল্লাহ বিন কুতায়বা (হিজরি ২১৩ বা ৮২৮ খ্রিস্টাব্দ-হিজরি ২৭৬ বা ৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ) ইরানি বংশোদ্ভূত। তিনি সরকারি কাজে নিয়োজিত ছিলেন বাগদাদে। সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর রচিত ‘আইন আল-আকবর’ আধ্যাত্মিক সত্য কাহিনির এবং কবিতার সংকলন। এ ছাড়াও এই গ্রন্থে আছে সচিবসংক্রান্ত কলাবিদ্যা ও অন্যান্য আরবি রচনা।

৯৪. তাহা হোসেন (১৮৮৯-১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ) শৈশবকাল থেকে অন্ধ ছিলেন। কোরান অধ্যয়ন করেন মাদ্রাসা থেকে। পরে মিশরের আল-আজহার ধর্মীয় কলেজে পড়াশোনা করেন। সেখান থেকে ফ্রান্সে পড়াশোনা করতে যান এবং প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর ডক্টরেট গবেষণার শিরোনাম ছিল : '*La philosophie sociale d'lbn Khaldoun*'। প্রাক-ইসলামি যুগের কবিতার উপর তাহা হোসেনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা কায়রো থেকে প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে '*Fi'sh-she'r el-jaheli*' নামে। দীর্ঘ বিতর্কের মধ্য দিয়ে কায়রো দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয় নবি মুহাম্মদের জীবনী (*Ala luimesh es-sira*) ১৯৩৩ এবং ১৯৩৮ সালে। এই জীবনীগ্রন্থটিই তাহা হোসেনের অতিগুরুত্বপূর্ণ কাজ। মিশরীয় জাতীয়তাবাদে তিনি উদারনীতির অনুসারী ছিলেন। ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত 'মিশরীয় সংস্কৃতির ভবিষ্যত' (*Mostaqbal oth-theqafafi Mesr*) নামের বইয়ে তাহা হোসেন মিশরের সাথে ভূমধ্যসাগরীয় অন্যান্য দেশের সহযোগিতার আহ্বান জানান। ১৯৫০ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৫২ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি মিশরের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। সর্বোপরি তাঁকে স্মরণ করা হয় মাদ্রাসায় থাকাকালীন সময়ে কোরান অধ্যয়ন ও আজহার মহাবিদ্যালয়ে তাঁর ছাত্রজীবনের দিনগুলির উপর ভিত্তি করে 'আল আয়াম' গ্রন্থের জন্য। কায়রো থেকে ২ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯২৯ ও ১৯৩৯ সালে। ইংরেজিতে প্রথম খণ্ডের অনুবাদক E. H. Paxton এবং বইটির শিরোনাম '*An Egyptian Childhood*' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩২ সালে লন্ডন থেকে। দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদক H.Wayment, প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪৮ সালে লন্ডন থেকে। বইটির শিরোনাম '*The Stream of Days*'।

৯৫. দ্রষ্টব্য : পাদটীকা ৮৯।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সারাংশ

বিশ্ব-ইতিহাসে ইসলামের উত্থান এবং বিস্তার এক অদ্বিতীয় ঘটনা। অতীত পর্যালোচনা করা অনেক ক্ষেত্রেই খুব দুরূহ বিষয়, কেননা প্রকৃত বিষয় জানতে প্রচুর তথ্য-উপাত্ত প্রয়োজন, যা সহজে প্রাপ্ত নাও হতে পারে। তাই প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রয়োজন ব্যাপক গবেষণার। সে-তুলনায় ইসলামের ইতিহাস জানা অনেক সহজ কারণ এই ইতিহাসের সমর্থনে পাওয়া যায় অনেক নির্ভরযোগ্য তথ্য। সচেতন এবং পক্ষপাতমুক্ত ঐতিহাসিকদের পক্ষে ইসলামের ইতিহাস তুলে ধরা অনেক সহজ। ভবিষ্যত গবেষকদেরও উচিত ইসলাম নিয়ে গবেষণায় আগ্রহী হলে তাঁদের মনে কোনো ধরনের পূর্বধারণা, অন্ধবিশ্বাস বা বিদ্বেষ থাকলে সেগুলি থেকে আগে মুক্ত হতে হবে। আমার এই ছোট বইটি সুগভীর গবেষণার ফসল নয়। তথাপি যথাসম্ভব যে কোনো ধরনের অন্ধআবেগ থেকে নির্মোহ থেকে অতিসংক্ষেপে এই বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে হজরত মুহাম্মদের তেইশ বছরের নবুওতি জীবন। এই অধ্যায়ে সে বিষয়গুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

(এক) মুহাম্মদ ছিলেন একজন অনাথ শিশু। ছয় বছরের পিতৃমাতৃহীন অসহায় শিশু লালিত-পালিত হন আত্মীয়ের গৃহে। ওই বয়সের শিশুরা সাধারণত যেসব সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে লালিত-পালিত হত, মুহাম্মদ তা থেকে বঞ্চিতই ছিলেন। খুব ছোট বয়স থেকেই মুহাম্মদ মক্কার নিকটস্থ উষর মরুভূমিতে উটের চারণ করে সময় কাটাতেন। তাঁর দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ এবং মন ছিল কল্পনাপ্রবণ। পাঁচ থেকে ছয় বছর তিনি মরুভূমিতে অতিবাহিত করেন। মরুভূমির নিজস্ব নির্জনতা ও একাকীত্ব মুহাম্মদের মনে জন্ম দেয় ভাবাবেগ এবং দূরদর্শিতা। প্রতিবেশিদের ধনদৌলতের সাথে নিজের কর্পদকশূন্য অবস্থার তুলনা করে মুহাম্মদের মনে ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয় এক মানবিক বিরাগ। এই জটিল মানসিকতার প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাঁর শিশুকালের খেলার সাথীদের সাথে এবং নিকট আত্মীয়দের সাথে। তারপর ধনী পরিবারের সদস্যদের সাথে এবং সবশেষে ওই সমস্ত ধনদৌলতের উৎসের উপর। সে উৎস ছিল কাবা ঘরের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন। মুহাম্মদের জন্মের বহুপূর্ব থেকেই কাবা ছিল মূর্তিপূজার এক বিশাল মন্দির এবং আরব সমাজের ধর্মীয় কেন্দ্রভূমি। বাল্যকালে মুহাম্মদ কাবায় অনেক প্রার্থনা-অর্চনা করেছেন, পরবর্তীতে তাঁর কাছে এগুলো সব বৃথা মনে হয়, একেশ্বরবাদে একনিষ্ঠ হওয়ায়। সেজন্য বোধ করি তাঁর মনে মূর্তিপূজার প্রতি অগাধ ঘৃণা এসে যায়। [একটি হাদিসের বর্ণনানুযায়ী : (৫৯৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে) নবি মুহাম্মদ তখন পৌত্তলিক দেবদেবীর উপাসনা করতেন, একদা কাবা ঘরের দেবতাকে উৎসর্গ করা কোরবানির মাংস রান্না করে একেশ্বরবাদী হানিফ দলের প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট আরবি কবি জায়েদ বিন ওমরের (খলিফা ওমরের চাচা) জন্য নিয়ে যান তাঁর সাথে খাওয়ার জন্য, তখন জায়েদ মুহাম্মদকে তিরস্কার করেন এবং পৌত্তলিকতা থেকে বিরত থেকে একেশ্বরবাদ চর্চার পরামর্শ দেন। দ্রষ্টব্য : বুখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬৭, নম্বর ৪০৭। -অনুবাদক]। মূর্তিপূজা-বিরোধী চিন্তা কেবল মুহাম্মদের একার ছিল না। এ-সময় মক্কার অনেক বাসিন্দার কাছে খ্রিস্টান ও ইহুদি ধর্মপুস্তক ছিল। এছাড়াও অনেক চিন্তাশীল মক্কাবাসী ছিলেন যারা নিষ্প্রাণ মূর্তিগুলো পূজা করাকে অসার মনে করতেন। তাঁদের কেউ কেউ 'হানিফ' নামে পরিচিত ছিলেন। এই ব্যক্তিগুলোর সংস্পর্শে আসায় মুহাম্মদের চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। এ-সময় তিনি একবার সিরিয়ায় বাণিজ্য ভ্রমণে যান। বাইরের জগতের সাথে নিজের অঞ্চলের লোকজনের সংস্কার-কুসংস্কার-প্রথা-

নিয়ম-নীতি পালনে বিশাল পার্থক্য মুহাম্মদের কাছে দৃশ্যমান হয় এই সফরের সময়। ধর্মপুস্তকপ্রাপ্ত (ইহুদি ও খ্রিস্টান) লোকদের উপাসনালয় দেখে এবং যাজক-পুরোহিতদের সাথে আলাপ করে মুহাম্মদ তাঁদের নবি এবং ধর্ম সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারেন। এরপর মুহাম্মদ নিজের ধারণায় প্রত্যয়ী হন।

(দুই) যখন একেশ্বরবাদ এবং ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কাছ থেকে পাওয়া মতবাদ মুহাম্মদের জীবনের প্রধান চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছিল, ঠিক সে-সময় তিনি মক্কার এক ধনী নারীকে (খাদিজা) বিয়ে করেন। ফলে মুহাম্মদ বস্তুজীবনের বিড়ম্বনা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যান। মুহাম্মদের স্ত্রী খাদিজার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন-নওফল ছিলেন একেশ্বরবাদী। তাঁর সাথে ঘন-ঘন সাক্ষাত মুহাম্মদের আসক্তিতে পরিণত হয়। মুহাম্মদের মন সর্বদা আচ্ছন্ন হয়ে থাকতো এক সর্বশক্তিমান এবং ঈর্ষাপরায়ণ স্রষ্টার উপর। তাঁর মনে গভীর বিশ্বাস হলো যে, এই স্রষ্টা নিশ্চয়ই চান না, হেজাজের লোকজন অন্য দেবদেবীর পূজা করুক। ইহুদি-খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থে এবং লোককাহিনিতে বর্ণিত, 'পৌত্তলিকতা উপাসনার অপরাধে সর্বশক্তিমান এক ঈশ্বর আদ ও সামুদ জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন' – এই বর্ণনা পাঠে মুহাম্মদের মনে আশংকার সৃষ্টি করে। তিনি চিন্তা করলেন যে তাঁর নিজের লোকজনও একইভাবে দেবদেবীর উপাসনায় নিয়োজিত। এ-অপরাধে তাই স্রষ্টা হয়তো খুব শীঘ্র তাদের এক ঘোরতর সাজা দিবেন। এ-অবস্থায় তাঁর নিজের জরুরি কর্তব্য লোকজনদের পথ দেখানো। মুহাম্মদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তাঁর আশংকা মিলে যায়। তিনি দাবি করতে শুরু করেন যে স্রষ্টা (পরে 'আল্লাহ' হিসেবে সম্বোধন করেন) তাঁকে দৈববাণী পাঠাচ্ছেন মক্কাবাসীকে হুঁশিয়ার করতে। বিবি খাদিজা এবং ওয়ারাকা বিন-নওফল মুহাম্মদের ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের দাবির সত্যতা মেনে নেন। তাঁরা জানালেন আল্লাহ-ই মুহাম্মদকে অনুপ্রাণিত করেছেন। নিজের ঘর থেকে সমর্থন পেয়ে মুহাম্মদ উৎসাহী হয়ে উঠলেন। তাঁর মনে গভীর বিশ্বাস জন্ম নিল যে আল্লাহ তাঁকেই মনোনীত করেছেন হেজাজের জনগণকে সাবধান বাণী জানানোর জন্য। যেমন করে স্রষ্টা হুদ এবং সালেহকে নবি হিসেবে পাঠিয়েছিলেন যথাক্রমে আদ ও সামুদ জনগোষ্ঠীকে সাবধান করার জন্য। মুহাম্মদ আরও বিশ্বাস করতে শুরু করলেন যে, নবি শুধুমাত্র ইহুদিদের মধ্য থেকেই আবির্ভূত হবেন তা নয়। আরব এবং ইহুদিরা একই বংশের লোক। তাই নবি আরবদের মধ্য থেকেও আসবে। এই বিশ্বাস আর আধ্যাত্মিক সন্ধিক্ষণে আচ্ছন্ন অবস্থায় মুহাম্মদ চল্লিশ বছরে পদার্পণ করলেন এবং নিজের আত্মীয়-স্বজনদের নিকট তাঁর নতুন মতবাদ প্রচার শুরু করেন।

(তিন) মুহাম্মদ ওই সময়ের যতো চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সাথে আলাপ করেছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই একমত ছিলেন যে, মানুষের হাতে তৈরি প্রস্তর-মূর্তির উপাসনা করা আসলে অকার্যকর। তিনি আশান্বিত হয়ে গেলেন যে, অতি সহজেই তিনি তাঁর লোকজনকে তাঁদের উদাসীনতা থেকে মুক্ত করতে পারবেন। শুরুতেই কয়েকজন ব্যক্তি মুহাম্মদের মতবাদ মেনে নিলেন। ফলে হতাশ হবার কোনো কারণ থাকল না। মুহাম্মদ জোরেশোরে চালাতে থাকলেন তাঁর প্রচার কাজ। এ-সময় ওহি আসে : 'তুমি তোমার আত্মীয়স্বজনকে সতর্ক করে দাও।' (সুরা শোআরা : আয়াত ২১৪)। কিন্তু এবার মুহাম্মদের ভাবনার সাথে পরিস্থিতি অনুকূল হলো না। তাঁর লোকজন তাঁকে উপহাস আর অবজ্ঞা করল। মুহাম্মদ ছিলেন সরল মনের ব্যক্তি। তিনি ভেবেছিলেন উপকারী বক্তব্য এবং যুক্তিপূর্ণ বাণী দিয়ে অতি সহজে তাঁদের মনে রেখাপাত করতে পারবেন। কিন্তু তা হলো না। আরবেরা যে তাদের সনাতন ধর্মের প্রতি এতোই অনুরক্ত থাকবে, মুহাম্মদ তা শুরুতে ধরতে পারেননি। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর নতুন ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে পুরানো ধর্মকে উৎখাত করতে। কিন্তু পুরনো ধর্মব্যবস্থা ছিল কুরাইশ নেতাদের প্রচুর ধনসম্পদ এবং খ্যাতি ও যশের ভিত্তি। তাই মুহাম্মদের মতাদর্শ শুনে তারা প্রমাদ গুণলেন এবং নিজেদের অবস্থান বজায় রাখতে মুহাম্মদের চরম বিরোধিতায় নামলেন। মুহাম্মদের চাচা আবু লাহাব ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি তাঁর সাথে প্রকাশ্যে বৈরিতা ঘোষণা করেন। একদা

কুরাইশ প্রধানদের সভায় আবু লাহাব ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠেন : 'তুমি ধ্বংস হও, মুহাম্মদ! আমাদের কি এইসব আবোল-তাবোল শোনানোর জন্য ডেকেছ?'

(চার) ওই সময় মাখজুম গোত্র এবং আবদে মনাফের বংশধরদের মধ্যে বিরোধ বাধে। আল আখনাস বিন আবু শারিকের কাছে মাখজুম গোত্রের ভবিষ্যত নেতা আবু জেহলের এক উক্তি থেকে তৎকালীন নেতাদের মনোবৃত্তির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মাখজুম গোত্র তখন অবস্থা-প্রতিপত্তি-সহায়-সম্পদে বেশ ভালো অবস্থায় ছিল। তাই আবু জেহেল আবদে মনাফ গোত্রকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তারা ইচ্ছেকৃতভাবে অতীতের অবস্থান ফিরে পাবার জন্য মুহাম্মদকে নবি হিসেবে সাজিয়েছে।' এই ঘটনার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া হোসেন বিন আলিকে উদ্দেশ্য করে এক কবিতা রচনা করেন। এই কবিতায়ও একই মনোভাব প্রকাশ পায়। ইয়াজিদ তাঁর কবিতায় লিখেছিলেন : 'হাশেমিরা ক্ষমতার জুয়া খেলে। কিন্তু কোনো বার্তা আসেনি, কোনো দৈববাণীও আসেনি।' কী উদ্দেশ্যে কুরাইশরা মুহাম্মদের বিরোধিতা করেছে তা আল আখনাস বিন আবু শারিকের কাছে আবু জেহেলের উক্তি থেকে পরিষ্কার। মুহাম্মদ ছিলেন গরীব অনাথ। জীবনযাত্রার জন্য নির্ভরশীল ছিলেন স্ত্রীর সম্পদের উপর। এহেন দুঃস্থ ও নির্ভরশীল ব্যক্তির সাথে সামাজিক এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে উন্নীত পদমর্যাদার অধিকারী ও ধনী কুরাইশ নেতাদের কোনো তুলনা হবার নয়। মুহাম্মদের ধর্মপ্রচার সফল হলে এই নেতাদের অবস্থান হয়ে পড়বে দুর্বল। এমনও হতে পারে যে, তাঁরা নিজেদের এতোদিনের সম্মানের আসন থেকে পড়ে যেতে পারেন। সত্য হচ্ছে যে, আবদুল মোতালেবের গোষ্ঠী কখনো মুহাম্মদের সমর্থক ছিলেন না। এমন কি আবু তালেব ও নবির অন্য চাচারা চান নাই কুরাইশ বংশের উপগোত্রের মধ্যে ফাটল ধরুক। নবুওতির দাবির পর মুহাম্মদ তের বছর মক্কায় বসবাস করেন। ক্রমে তিনি দূরদর্শিতার মাধ্যমে বুঝতে পারেন কুরাইশরা তাঁকে অবজ্ঞা করবে এবং তাঁর বিরোধিতা করে যাবে। শেষমেশ তাই-ই হল। দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে মুহাম্মদ ভাবলেন, প্রস্তুতি না নিয়ে তাঁর হয়তো উচিত ছিল না নবুওতির দাবিতে আত্মোৎসর্গ করা। ওয়ারাকা বিন-নওফল, ওমায়া বিন আবু-সালাত, এবং কাস বিন সায়েদা'র মতো একেশ্বরবাদীরা নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেই চুপচাপ থাকতেন। পরে তাঁরা নিজ নিজ পথে চলে যান। মুহাম্মদ একবার চিন্তা করলেন যে তাঁরও হয়তো এ-রকম করা উচিত। মুহাম্মদের নবুওতির কর্মজীবন পর্যালোচনা করে বুঝা যায় যে, তিনি তাঁর বিশ্বাসে শেষমেশ এতোই অটল হলেন যে কোনো কিছুতেই তিনি আর ভীত বা নিরুৎসাহ হতেন না। কাজেই তাঁর লক্ষ থেকে তিনি পিছপা হলেন না। সকল বাধা সত্ত্বেও একবিশ্বাসে নিবিষ্ট হয়ে এগিয়ে যেতে থাকলেন। হেজাজের জনগণকে নিজের বিশ্বাসে চালিত করার দায়িত্ব তিনি পালন করে গেলেন প্রায় ত্রিশটি বছর। শুধু বিশ্বাসের শক্তি নয়, মুহাম্মদের বাকপটুতা ছিল অসাধারণ। একজন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-বঞ্চিত ব্যক্তির পক্ষে এই গুণ থাকা সত্যি ভীষণ আশ্চর্যের ব্যাপার। তিনি আবেগপূর্ণ ভাষায় জনতাকে সুনীতিসম্পন্ন, সৎ এবং দয়াশীল হতে বলতেন। শোভন ব্যবহার, ন্যায়পরায়ণতা, এবং কর্তব্যনিষ্ঠতা যে মুক্তির পথ, তা প্রমাণের জন্য জন্য ভূরিভূরি উদাহরণ দিলেন অতীতের নবিদের কাহিনী থেকে।

(পাঁচ) অতীত ইতিহাস গবেষণা থেকে এটা এখন প্রমাণিত যে, মক্কার আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। মূর্তি-পূজার বিরোধিতাকারী হানিফসহ বিভিন্ন একেশ্বরবাদীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়তির দিকে ছিল। মক্কায় ধনী এবং ক্ষমতাশালী লোকদের চেয়ে অভাবী-দরিদ্র, বিত্তহীন লোকের সংখ্যা বেশি ছিল। ইসলাম প্রচারের শুরু থেকেই এই অভাবী-নিঃস্ব মানুষের পক্ষ হয়ে কথা বলতে লাগলেন তিনি। পৃথিবীর যাবতীয় বিপ্লবের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সকল বিপ্লবের আসল সৈনিক হচ্ছে বঞ্চিত এবং অত্যাচারিত জনগণ। স্বাভাবিকভাবে মক্কার ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা অলস হয়ে বসে ছিলেন না। অসহায়, গরীব মানুষ যারা মুহাম্মদের বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে ধর্মান্তরিত

হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন, তাদেরকে নিয়ত নির্যাতন এবং হয়রানি করা হতে লাগল। কিন্তু ক্ষমতাসীনরা মুহাম্মদ এবং সদ্য ধর্মান্তরিত মুসলিম, মক্কার প্রভাবশালী পরিবারের সদস্য যেমন আবু বকর, ওমর, হামজাকে কোনো প্রকার উৎপীড়ন করতেন না। নিঃস্ব মুসলমানদের প্রায়শ ভয়ভীতির সম্মুখীন হতে হতো। তারাই ছিল নতুন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভিত্তি, যেমন করে পিরামিডের ভিত্তি থাকে। এ-অবস্থায় তের বছর ধরে মুহাম্মদ তাঁর প্রচারণা চালিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর ভক্তের সংখ্যা একশ'র বেশি হলো না। আশ্চর্যের ব্যাপার হলেও এখান থেকে একমাত্র উপসংহার টানা যায় : মুহাম্মদের সব নির্ভুল প্রচার, বাকপটুতা, কঠোর সংযম, এবং দোজখের ভয় দেখানো কোনোটাই কাজে আসল না। মক্কায় ইসলাম প্রচারে মুহাম্মদের যে নিরলস পরিশ্রম ছিল, তার প্রাপ্য তিনি পেলেন না।

(ছয়) শেষ পর্যন্ত নবিকে অস্ত্র তুলে নিতে হলো ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য। এছাড়া তাঁর আর কোনো গত্যন্তর ছিল না। তাঁর লক্ষ্য অর্জন করতে তিনি অস্ত্রের ব্যবহার, যুদ্ধ, বলপ্রয়োগ সবই তিনি করলেন। এখানে একটি বিষয় আমাদের স্মরণে রাখা উচিৎ, কার্য সম্পাদনের জন্য শক্তি প্রয়োগ শুধু নবি একাই করেননি। শক্তি প্রয়োগ আরব জাতির এক পুরনো অভ্যাস। হেজাজ এবং নেজদের মরুভূমির কঠোর পরিবেশে আরবদের কৃষিকাজের তেমন কোনো সুযোগ ছিল। তাঁরা তখন মনুষ্য-রচিত বা ঈশ্বর-প্রদত্ত দাবিকারী কোনো আইনের অধীনে বাস করত না। সাধারণত আরব বেদুইনদের জীবন চলত অন্য দলের উপর লুটতরাজ এবং হানাহানি করে। এই অবিরাম হানাহানি থেকে কিছুসময় বিশ্রাম নেবার জন্য তাঁরা বছরের চারটি মাস নির্ধারণ করেছিলেন যখন কেউ কারো উপর আক্রমণ করবেন না। এই চারটি মাসকে তাঁরা পবিত্র মাস হিসাবে গণ্য করতেন। বছরের অন্য সময়ে এক গোত্রের সাথে অন্য গোত্রের এই লুটতরাজ, খুনোখুনি এবং নারীদের অপহরণের হাত থেকে দূরে থাকার একটি উপায় ছিল সদা সতর্ক থাকা এবং নিজেদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা। যখন মদিনায় বসবাসকারী আউস এবং খাজরাজ গোত্রের লোকেরা মুহাম্মদের জীবন-রক্ষার আশ্বাস প্রদান করেন তখন তিনি মদিনাতে গমন করেন। মদিনায় তখন মুহাম্মদের মাতা আমিনার বংশের লোকেরা বসবাস করতেন। মদিনায় গিয়ে মুহাম্মদ হাতে তুলে নিলেন অস্ত্র। মুহাম্মদ জীবনে যতো যুদ্ধ, সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন বা বাধ্য হয়েছিলেন তার প্রায় সবই হয়েছে মদিনাতে আসার পর। এখানে নবির প্রধান লক্ষ ছিল মদিনা এবং এর আশেপাশে বসবাসকারী ইহুদি সম্প্রদায়গুলো। ইহুদি গোত্রগুলোর সাথে সংঘর্ষ থেকে নবি তাঁর ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গতি পেলেন। এই ইসলামি রাষ্ট্রের আইনকর্তা, রাষ্ট্রের প্রধান কার্যনির্বাহক এবং সামরিক প্রধান হলেন মুহাম্মদ নিজেই। এবার নতুন এই রাষ্ট্রের উন্নতি এবং পরিসরে বিস্তৃতিতে মুহাম্মদ পূর্ণমাত্রায় মনোনিবেশ করতে পারলেন।

(সাত) প্রাক-ইসলামি যুগে আরববাসী ছিল একইসাথে বাস্তববাদী এবং আবেগপ্রবণ। একটি আবেগময় কবিতা শুনে তাঁদের মন হয়ে যেত আন্দোলিত আবার কোনো কদর্য কবিতা শুনলে তাঁরা হত্যা করতেও উদ্যত হয়ে যেত। তাঁদের চিন্তাভাবনা ছিল সবসময় বৈষয়িক বিষয়াবলী এবং দৈনিক অভিজ্ঞতার উপরে। কোনো রকম আধ্যাত্মিক, অতীন্দ্রিয় বা অলৌকিক বিষয় তাঁদের ধর্তব্যের বাইরে ছিল। সহিংসতা তাদের জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আইন ও বিচারের প্রতি তাঁদের কোনো ভ্রূক্ষেপ থাকত না। লুটের মাল হস্তগত করতে যা কিছু করা প্রয়োজন তার সবই করতে প্রস্তুত ছিল তাঁরা। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেছেন, আরব বেদুইন কোনো সময়ে ভিন্ন দলের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হলে সে শত্রুদলে যোগদান করতে দ্বিধা করত না। তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, আরব বেদুইনদের এই ব্যবহার ছিল ব্যতিক্রমী। যে সমাজে কোনো সংগঠিত সরকার ছিল না, ছিল না কোনো শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা, সেই সমাজকে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হতো ক্ষমতার ভারসাম্য এবং ভীতির উপর।

আরবরা দম্ভ এবং আত্মপ্রশংসা করতে ভালবাসে। তাঁরা যে শুধুমাত্র নিজেদের ব্যক্তিগত ও গোত্রগত গুণাবলী অতিরঞ্জিত করত তা নয়, তাঁরা তাদের দোষত্রুটির জন্য পর্যন্ত গর্বিত থাকত। আত্মসমালোচনা করা তাঁদের অভ্যাসে ছিল না। ভোরবেলায় অপহরণ করা নারীকে ধর্ষণ করার পর তাঁরা কবিতা রচনা করত। এ-কবিতায় নিজেরা নিজেদের হিম্মতের বড়াই এবং সাহস প্রকাশ করত আবার ভুক্তভোগী নারীকে অশ্লীল ভাষায় গালি দিত। যেভাবে বেদুইন কবিরা তাঁদের আদিম সহজাত মনোবৃত্তি প্রকাশ করত তা সভ্যতার কোনো পর্যায়েই তা পড়ে না। বেদুইনদের আধ্যাত্মিক এবং অলৌকিক ধারণা বলতে যা কিছু ছিল তা মূলত পার্থিব জগত থেকে নেয়া কোনো মনগড়া চিত্র। একই রকম মানসিক চিন্তার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখি ইসলামি-যুগেও, বিশেষ করে হানবলিদের মধ্যে। হানবলিরা যে কোনো রকমের যৌক্তিক এবং বিশ্লেষণী চিন্তাভাবনাকে 'ধর্মবিরোধী' বলে মনে করে। [সুন্নি ধর্মতাত্ত্বিক আহমদ ইবনে হানবলের (৭৮০-৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ) অনুসারীদের 'হানবলি' বলা হয়। হানবলিরা ধর্মীয় বিষয়াবলীতে চরমপন্থা এবং মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। সৌদি আরব, কাতার, আবুধাবি, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ সিরিয়া এবং ইরাকে হানবলিদের প্রভাবশালী অবস্থান রয়েছে। আধুনিক ইসলাম-গবেষকরা হানবলিদের কট্টরপন্থী ওয়াহাবিবাদ, সালাফি মতাদর্শের পূর্বসূরি বলে অভিহিত করে থাকেন। -অনুবাদক]।

(আট) হিজরি সনের প্রথম দশ বছরের ঘটনা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি মুহাম্মদ আরবদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলীর সুযোগ নিয়েছিলেন ইসলামের সাফল্য এবং শক্তি প্রয়োগের জন্য। অনেক ক্ষেত্রে নবি পরাজয়ের ভারসাম্য রক্ষার জন্য অন্য দুর্বল গোত্রকে আক্রমণ করতেন। ফলে আরবের সাধারণ জনগণ সর্বদা আতঙ্কে থাকত। কোনো দুর্বল গোত্রের পরাজয় ইসলামের জন্য এনে দিত সফলতা নয়ত, আক্রমণ না-করার চুক্তি। ইসলামের বিস্তারের পিছনে রয়েছে আরবদের গনিমতের মালের প্রতি আকর্ষণ। গনিমতের মালের অংশ পাবার জন্য অনেকে জিহাদে যোগদানের আগ্রহ দেখায়। যারা জিহাদে যাবে তাদেরকে আল্লাহ গনিমতের মালের প্রতিশ্রুতি দিলেন। হুদায়বিয়ার শান্তিচুক্তির পর আল্লাহ বললেন : 'আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তোমরা যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের অধিকারী হবে। তিনি তোমাদের জন্য এ ত্বরান্বিত করবেন। তিনি তোমাদেরকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন যেন বিশ্বাসীদের জন্য এ হয় এক নিদর্শন আর আল্লাহ তোমাদেরকে এ দিয়ে সরল পথে পরিচালনা করেন।' (সুরা ফাতহ্ : আয়াত ২০)। এছাড়া বেহেশতের অশেষ সুখের উৎসাহ দিয়ে বলা হলো : 'যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার নিচে নদী বইবে। এ-ই মহাসাফল্য।' (সুরা বুরুজ : আয়াত ১১)। নবির অনুসারীদের মধ্যে কতজন সুযোগ-সন্ধানী ছিলেন তাঁর কোনো বিশ্বাসযোগ্য পরিসংখ্যান আজ পর্যন্ত কেউ সংকলন করেন নাই। তথাপি অনুমান করা যায় যে, নবির মৃত্যু অব্দি যত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের একটা বেশ বড় অংশই ভীতি অথবা সুবিধা আদায়ের কৌশল হিসেবে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। এর প্রমাণ হিসেবে আমরা দেখতে পাই যে, নবির মৃত্যুর পরপরই বিপুল সংখ্যক আরব ইসলাম ত্যাগ করে আবার পূর্বের ধর্মে ফিরে যায়, যার জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধও চালাতে হয় খলিফাদের।

মদিনা ছিল ইসলামি রাষ্ট্রের রাজধানী এবং ইসলামের প্রাণকেন্দ্র। এখানেও হজরত আলি বিন আবু তালেব, আম্মার বিন ইয়াসির এবং আবু বকর আস-সিদ্দিকদের মতো ত্যাগী ও সৎ লোকের সংখ্যা ছিল অতি-নগণ্য। বেশির ভাগই ইসলাম গ্রহণ করেছিল গভীর বিশ্বাস থেকে নয়। বরং বিভিন্ন সুবিধা পাবার আশায়। নবির মৃত্যুর পরে ক্ষমতা দখল নিয়ে সংঘটিত ঘটনাবলী এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। নবির মৃত্যুর পরে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে বিরোধ লাগে ক্ষমতা দখল নিয়ে। এই বিরোধ-হাঙ্গামার জন্য নবির শবদেহ সৎকারে বিলম্ব ঘটে যায় তিন দিন পর্যন্ত। হজরত আলি, তালহা এবং জুবায়ের থেকে গেলেন ফাতেমার ঘরে। তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিয়ে যে ঝগড়া চলছিল তার সম্বন্ধে

কিছুই জানলেন না। আবু বকর, ওমর, আবু উবায়দাসহ[৯৬] আরও কয়েকজন সাহাবি বিবি আয়েশার ঘরে ছিলেন। এ-সময় মদিনার আনসাররা খাজরাজ গোত্রের নেতা সাদ বিন ওবায়দার নেতৃত্বে এক গৃহে সমবেত হন। একজন ব্যক্তি বিবি আয়েশার গৃহে এসে আবু বকর এবং ওমরকে জানালেন, ক্ষমতা আনসারদের হাতে চলে যাচ্ছে। এটা থামাতে হবে। আনসাররা কী করছিলেন তা জানার জন্য সাথে সাথে হজরত আবু বকর এবং ওমর সেখানে উপস্থিত হলেন। তখন সাদ বিন ওবায়দা তাঁদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'আমরা হচ্ছি আনসার। আমরাই ইসলামের আসল সৈনিক। আমরা ছিলাম নবির সমর্থক। আমাদের পেশিবহুল বাহুর জন্য ইসলামের শক্তি এসেছে। আর মক্কাবাসী তোমরা হচ্ছ মুহাজির। তোমরাও সাহায্য করেছ। তাই এসো, তোমরা আমাদের সাথে যোগদান কর।' এ-কথা শোনার সাথে সাথে ওমর ক্ষুব্ধ হয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। কিন্তু আবু বকর ওমরের হাত ধরে তাঁকে থামালেন। এরপর আবু বকর তাঁর স্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠস্বরে সাদ বিন ওবায়দাকে বললেন : 'আনসারদের সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন তা আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু ক্ষমতার আইনসম্মত অধিকার আছে শুধুমাত্র কুরাইশদের। কারণ কুরাইশরা অন্যান্য আরব গোত্রের ঊর্ধ্বে।' তারপর আবু বকর করমর্দন করলেন ওমর এবং আবু উবায়দার সাথে এবং আনসারদের উদ্দেশ্যে বললেন : 'আপনারা তাঁদের যে কোনো একজনের প্রতি আনুগত্য প্রদান করুন।'

ওমর ছিলেন বাস্তব ও দূরদর্শী ব্যক্তি। তিনি এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে গা ভাসাতে চাননি। ওমর বুঝলেন ক্ষমতা দখলের এই যে পরিস্থিতি, তার একমাত্র সমাধান হচ্ছে আবু বকরকে সবাই নেতা হিসাবে গ্রহণ করে নেয়া। কারণ আবু বকরই ছিলেন সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ মুহাজির এবং তিনি নবির সাথে একই গুহায় বিপদসংকুল অবস্থায় বাস করেছিলেন। নবি যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন নবি আবু বকরকে নামাজের ইমামতি করতে আদেশ দিয়েছিলেন। এসব কারণ চিন্তা করে ওমর উঠে দাঁড়ালেন এবং আবু বকরের সাথে করমর্দন করে তাঁর প্রতি নিজের আনুগত্যের ঘোষণা জানালেন। এভাবে ওমর এক ধাক্কায় নেতৃত্বের সমস্যার সমাধান করে ফেললেন। ওমরের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেউ তর্ক করার অবকাশ পেলেন না। স্বাভাবিকভাবেই মুহাজিররা ওমরের আদেশ অনুসরণ করলেন তবে আনসাররা তাৎক্ষণিকভাবে কিংকতর্ব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। কিছু সময় পরে তাঁরাও আবু বকরের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। কথিত আছে যে, ওমর মদিনার খাজরাজ গোত্রের বয়োবৃদ্ধ ও রোগাক্রান্ত নেতা সাদ বিন ওবায়দার ক্ষমতা দখলের ইচ্ছা দেখে এতোই ক্রোধান্বিত হন যে, তিনি তাঁকে সভাকক্ষের বাইরে টেনে নিয়ে আসেন এবং কয়েকজনের সাহায্যে বেদম প্রহার করেন। কথিত আছে, এ-প্রহারেই সাদ বিন ওবায়দা[৯৭] ঘটনাস্থলেই মারা যান। হজরত আলি বিন আবু তালিব প্রথমে আবু বকরের খেলাফতের প্রতি আনুগত্য জানালেন না। কিন্তু ওমর ভালোভাবেই জানতেন, আলি সমর্থন না দিলে অচিরে হাশেমি গোত্রের অনেকেই আলির পথ অনুসরণ করবেন। অর্থাৎ আবু বকর হাশেমি গোত্রের পূর্ণসমর্থন হারিয়ে ফেলবেন। ফলে আবু বকরের খেলাফত নিরাপদ থাকবে না। সে-জন্য ওমর প্রতিনিয়ত আলির সাথে দেখা করতে লাগলেন, আলাপ-আলোচনা, তর্ক চালালেন। শেষ পর্যন্ত ছয় মাস পরে আলি আবু বকরের প্রতি তাঁর আনুগত্য ঘোষণা দেন।

(নয়) মক্কার তের বছর বাদ দিলে ইসলামের ইতিহাসে বিশাল স্থান জুড়ে রয়েছে যুদ্ধ এবং ক্ষমতার লড়াই। নবি জীবিত থাকাকালীন সময়ে শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছিল ইসলামের প্রসারের জন্য। পৌত্তলিকদের ইসলাম মেনে নিতে বল প্রয়োগও হয়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে। কিন্তু নবির মৃত্যুর পর যে বারংবার বিরোধ আর সহিংস পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তার কারণ ছিল ক্ষমতা আর নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে আবু বকরের ক্ষমতা দখল সম্ভব হয়েছে ওমরের দক্ষতার জন্য। মৃত্যুকালীন সময়ে আবু বকর ইচ্ছা প্রকাশ করেন ওমর হবেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত। কোনো সমস্যা ছাড়াই আবু বকরের মৃত্যুর পর ওমর খলিফা হয়ে যান। কেউ তাঁর বিরোধিতা করেননি। দশ বছর

পর ওমর তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তে ছয় সদস্য বিশিষ্ট এক পরিষদ গঠন করেন তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচন করার জন্য। এই পরিষদের সদস্যরা ছিলেন: আলি, উসমান, আব্দুর রহমান বিন আউফ, তালহা, জুবায়ের এবং সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস। এই পরিষদ যখন বৈঠকে বসে তখন কেউই খলিফার পদের জন্য কারো নাম প্রস্তাব করেননি। কারণ প্রত্যেকেই চেয়েছিলেন খলিফা হতে। আব্দুর রহমান বিন আউফ খলিফা পদের প্রার্থী হওয়া থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিলেন। কেউ কোনো মন্তব্য করলেন না। তখন আব্দুর রহমানের প্রস্তাবে পরিষদের বৈঠক তিনদিনের জন্য মুলতুবি রাখা হল। এমনটি করা হলো মুহাজির ও আনসারদের মনোভাব বোঝার জন্য। এই তিনদিন আব্দুর রহমান ব্যক্তিগতভাবে পরিষদের প্রত্যেক সদস্যদেরকে প্রশ্ন করে জেনে নিলেন তাদের কী ধারণা অন্যদের সম্পর্কে। শোনা যায় আব্দুর রহমান হজরত উসমানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন উসমান যদি খলিফা মনোনীত না হন, তবে তিনি কাকে প্রস্তাব করবেন খলিফা হবার জন্য। উসমান জবাব দিলেন, খলিফা পদের জন্য আলিই হচ্ছেন সবচেয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি। আব্দুর রহমান তখন আলিকে একই প্রশ্ন করলেন। আলিও উত্তর দিলেন খলিফা পদের জন্য উসমানই হবেন যোগ্যতম ব্যক্তি। এ-থেকে সবাই বুঝতে পারলেন, পরবর্তী খলিফা হবেন আলি অথবা উসমান।

এই দুজনের (আলি এবং উসমানের) চরিত্রে অনেক পার্থক্য ছিল। উসমান ছিলেন আয়েশি, বিনয়ী, নিরহঙ্কার এবং উদার। আলি প্রসিদ্ধ ছিলেন তাঁর সাহস, অনুরক্ততা এবং ধর্মীয় ব্যাপারে কঠোরতার জন্য। ওমর ছিলেন ভীষণ কঠোর এবং প্রচণ্ড মিতব্যয়ী। তাই ওমরের দশ বছরের শাসন ছিল অনেকের কাছে অসহনীয়। ভোগবাদী ব্যক্তিদের কাছে ওমরের শাসন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তাই তাঁরা চাচ্ছিলেন না আলির শাসন আসুক। কারণ তাঁরা জানতো আলির শাসনও হবে ওমরের মতোই কঠোর এবং আত্মসংযমী। কোরানের বিশিষ্ট সুন্নি তফসিরকারক এবং পারস্যের মুসলিম পণ্ডিত আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরির আল-তাবারি’র (৮৩৮-৯২৩ খ্রিস্টাব্দ) মতে, ‘এই ব্যক্তিরা কুরাইশ বংশের বানু সাহম গোত্রের আমর ইবনে আল-আসকে নিয়োগ করলেন মধ্যস্থতার জন্য। একদিন আমর আলির সাথে দেখা করলেন এবং তাঁকে জানালেন যে আব্দুর রহমান বিন আউফ প্রথমে আলিকে খলিফার পদ নিতে প্রস্তাব করবেন। কিন্তু আলির মতো উচ্চাসনের ব্যক্তির উচিত হবে না, সাথে সাথে আব্দুর রহমানের প্রস্তাবে রাজি হওয়া। খলিফার পদের মর্যাদা এবং সুনাম অক্ষুণ্ন রাখার জন্য দ্বিতীয়বার যেন আব্দুর রহমান আলিকে এই পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। যে দিন পরিষদের বৈঠক বসার কথা ছিল, সেদিন আব্দুর রহমান মসজিদের প্রচারবেদিতে দাঁড়িয়ে আলির দিকে মুখ করে বললেন : তিনিই (আলি) হচ্ছেন একত্রে নবির চাচাতো ভাই এবং জামাতা, প্রথম মুসলিম এবং ইসলামের জন্য নিবেদিত সৈনিক। আলি যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি আল্লাহর কিতাব মেনে চলবেন, নবির আদর্শ পালন করবেন, এবং আগের দুই খলিফাদের (আবু বকর ও ওমর) উদাহরণ অনুকরণ করবেন তবে তিনি (আব্দুর রহমান বিন আউফ) আলিকে খলিফা মেনে আলির প্রতি তাঁর আনুগত্য ঘোষণা করবেন। আলি উত্তর দিলেন, তিনি আল্লাহর কিতাব মেনে চলবেন, নবির রীতি-নীতিতে থাকবেন এবং যা উত্তম মনে করবেন তাই করবেন। এরপর আব্দুর রহমান উসমানকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আলির পর তিনিই হচ্ছেন খলিফা পদের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি। উসমান যদি অঙ্গীকার করেন, তিনি আল্লাহর কিতাব মেনে চলবেন, নবির আদর্শকে অনুসরণ করবেন এবং পূর্ববর্তী দুই খলিফার উদাহরণ গ্রহণ করবেন তবে তিনি (আব্দুর রহমান বিন আউফ) উসমানের প্রতি তাঁর আনুগত্য জানাবেন। উসমান একইভাবে অঙ্গীকার করলেন এবং আলিকে বাদ দিয়ে আব্দুর রহমান বিন আউফ উসমানের প্রতি আনুগত্য জানালে উসমান খলিফা হয়ে গেলেন।’ এটা হচ্ছে তাবারির বক্তব্যের সারাংশ। যদিও এখানে পুনরাবৃত্তি দেখাবে তবুও তাবারির বই থেকে বালামির[৯৮] ফার্সি অনুবাদ তুলে দেয়া হলো। এখানে আমরা

দেখতে পাই, ওমরের খেলাফতে জনগণ বিরক্ত হয়ে উঠলে নবির কয়েকজন সাহাবির মনে প্রাধান্য পায় ক্ষমতার প্রতি আকাঙ্ক্ষা আর উচ্চাভিলাষ।

‘হজরত ওমর মারা গেলে মরুভূমির বেদুইনরা ওমরের জন্য শোক-বিলাপ করতে মদিনায় আসেন। আব্দুর রহমান তাঁদের সাথে আলাপ করলেন। তাঁদের প্রত্যেকে বললেন, উসমান হবেন খলিফার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি। এক সন্ধ্যায় আবু সুফিয়ান আমর ইবনে আল-আসের সাথে দেখা করলেন। আবু সুফিয়ান আমরকে জানালেন যে, ওই সন্ধ্যায় আব্দুর রহমান তাঁর সাথে দেখা করে বলেছেন, যে খলিফা পদের জন্য দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছেন, তাঁরা হলেন উসমান এবং আলি। আবু সুফিয়ান বললেন, তিনি উসমানকে পছন্দ করেন। আমর ইবনে আল-আস বললেন, ইতিমধ্যে আব্দুর রহমান তাঁর সাথেও এই ব্যাপারে দেখা করেছেন। এরপর আমর বললেন, আবু সুফিয়ানের মতো তিনিও উসমানকে খলিফা হিসাবে পছন্দ করবেন। এরপর আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করলেন: ‘আমরা কি করতে পারি? উসমান হচ্ছেন আয়েশি; তাই হয়ত অনেক ব্যাপারে অমনোযোগী হয়ে তাঁর কর্তব্য অন্যের উপর বর্তে দিতে পারেন। কারো অনুপস্থিতে হয়তো আলি খলিফা হয়ে যেতে পারেন।’ আবু সুফিয়ান আমরের গৃহে সেই রাত কাটালেন এবং আমরকে বারবার জিজ্ঞাসা করলেন কী উপায়ে উসমানকে খলিফা নিশ্চিত করা যায়। সে রাত্রে আমর আলির গৃহে গেলেন এবং আলিকে বললেন : ‘আপনি জানেন যে আমি আপনার বন্ধু। সেই পুরনো দিন থেকেই আপনি আমার কাছে প্রিয়। খলিফা পদের প্রার্থীর জন্য অন্য সবাই সরে গেছেন। এখন শুধু আপনি আর উসমান রয়েছেন এই পদের জন্য। আজ সন্ধ্যায় আব্দুর রহমান সব বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। অনেকে আপনাকে চায়, আবার অনেকে উসমানকে চায়। এখন আব্দুর রহমান আমার সাথে আলাপ করলেন। আমি তাঁকে জানিয়েছি, আমি আপনাকে খলিফা হিসাবে দেখতে চাই। আপনি যদি আমার কথায় মত দেন তবে আমি বলতে পারি, আগামীকালই আপনি খলিফার পদ পেয়ে যাবেন।’ আলি উত্তর দিলেন : ‘আপনি যা বলবেন আমি তা মানব।’ আমর বললেন : ‘প্রথমে আপনাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে আমাদের এই কথোপকথন আপনি কাউকে জানাবেন না’। আলি এই ব্যাপারে আমরকে অঙ্গীকার দিলেন। আমর বললেন : ‘আব্দুর রহমান একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি আপনাকে চাইবেন যখন তিনি দেখবেন যে আপনি সংশয়ী এবং খলিফার পদ নিতে বিলম্ব করছেন। তিনি যদি দেখেন যে আপনি খলিফার পদের জন্য অধীর এবং পদটা পেলে সাথে সাথে নিয়ে নিবেন তখন তিনি আপনার বিরুদ্ধে চলে যাবেন’। আলি উত্তর দিলেন : আমি আপনার কথামত চলব’। পরে, ওই রাতে আমর উসমানের গৃহে গিয়ে উসমানকে বললেন : ‘আগামী কালই আপনি খলিফা হয়ে যাবেন যদি আপনি আমার কথা শোনেন। আর আপনি যদি আমার কথায় মন না দেন তবে আলি আপনার কাছ হতে খলিফার পদ কেড়ে নিবেন। উসমান বললেন : ‘আমি আপনার কথায় কান দিচ্ছি, আপনি বলুন।’ এরপর আমর বললেন: ‘আব্দুর রহমান একজন সৎ এবং অকপট ব্যক্তি। কেউ কিছু সতর্কভাবেই বলুক বা স্পষ্টভাবেই বলুক, আব্দুর রহমান তার কোনো তোয়াক্কা করেন না। তাই আগামীকাল আপনাকে খলিফার পদের জন্য আহ্বান করা হলে আপনি অনিচ্ছা দেখাবেন না। কোনো শর্ত দেয়া হলে তাতেও অসম্মতি জানাবেন না। তিনি যা বলবেন আপনি সাথে সাথে তার সাথে রাজি হয়ে যাবেন’। উসমান উত্তর দিলেন: ‘আপনি যে পরামর্শ দিলেন আমি তা মেনে চলব।’ এরপর আমর উঠলেন এবং নিজের গৃহে ফিরে গেলেন।

‘পরের দিন আমর মসজিদে গেলেন। ভোরের নামাজে আব্দুর রহমান ইমামতি করলেন। তারপর আব্দুর রহমান প্রচারবেদিতে দাঁড়িয়ে বললেন: ‘আল্লাহ ওমরকে আশীর্বাদ করুন। আপনারা সবাই জানেন যে ওমর তাঁর উত্তরাধিকারীর নাম বলে যাননি। তাঁর স্থলাভিষিক্তের নাম বলে গেলে তিনি যে পাপ বা পুণ্যের মালিক হতেন তার প্রতি তাঁর কোনো

আকর্ষণ ছিল না। তাই তিনি তা না করে আমাদের পাঁচ জনের উপর এই দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে গেছেন। এঁদের মধ্যে সাদ এবং জুবায়ের তাদের মতামতের ভার আমার উপর ন্যস্ত করে দিয়েছেন। আর আমি খলিফা পদের প্রার্থী থেকে আমার নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছি। এখন পছন্দের জন্য দুইজন রয়েছেন, আলি এবং উসমান। আপনারা কাকে চান? আমি কার প্রতি আমার আনুগত্য দেখাব? আপনারা এই নামাজের পর গৃহে ফেরার আগে আমাকে জানান কে হবে 'বিশ্বাসীদের শাহজাদা?' কেউ কেউ চাইলেন আলিকে, আবার কেউ চাইলেন উসমানকে। এই নিয়ে উভয় পক্ষে চলল হট্টগোল। সাদ বিন জিয়াদ তখন আব্দুর রহমানকে বললেন: 'আমরা আপনাকে সবচেয়ে পছন্দ করি। আপনি নিজেই আপনার উপর আনুগত্য জানান, কেউই তাতে আপত্তি জানাবে না। আব্দুর রহমান বললেন: ; এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। বিতর্ক বন্ধ করুন। ভালোভাবে চিন্তা করুন, এই দুজনের মধ্যে কে আপনাদের জন্য সবচেয়ে ভালো হবেন। আম্মার বিন ইয়াসির বললেন : 'বিরোধ এড়াতে চাইলে আপনি আলির উপর আনুগত্য দিয়ে দিন।' মেকাদা[৯৯] বললেন : 'আম্মার সঠিক বলেছেন। আপনি আলির প্রতি আনুগত্য দেখালে কেউ তার বিরোধিতা করবেন না।' আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবু সারাহ[১০০] (তিনি হজরত উসমানের দুধ-ভাই। ইসলাম ত্যাগ করে পরবর্তীতে নবির মক্কা বিজয়ের পর প্রাণভয়ে আবার ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তীতে খলিফা উসমানের আমলে মিশরের গর্ভনর নিযুক্ত হন) জনতার মাঝে উঠে দাঁড়ালেন এবং আব্দুর রহমানকে উদ্দেশ্য করে বললেন : 'আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে আপনি উসমানের উপর আনুগত্য না দেখালে কিছু লোক আপনার বিপক্ষে যাবে।' আব্দুল্লাহকে অভিশাপ দিয়ে আম্মার বললেন : 'ওহে ধর্মত্যাগী! তুমি এখানে কেন? আমাদের জন্য কে হবেন 'বিশ্বাসীদের শাহজাদা' তা তোমার মতো মুসলিমের বলার প্রয়োজন নাই।' মাখজুম গোত্রের এক ব্যক্তি আম্মারকে উদ্দেশ্য করে বললেন : 'ওহে ক্রীতদাস এবং ক্রীতদাসের সন্তান। তুমি এখানে কুরাইশদের বিষয়ে নাক গলাচ্ছ কেন?'

উপস্থিত মুসলমানরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেলেন। তাদের মধ্যে শুরু হল তুমুল বিবাদ। সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস উঠে দাঁড়িয়ে আব্দুর রহমানকে বললেন : 'এখনি এই বিষয়টি নিষ্পত্তি করুন। নয়তো খুনোখুনি লেগে যাবে।' আব্দুর রহমান আবার উঠে দাঁড়ালেন, এবং জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন : 'আপনারা শান্ত হোন। আমি যেভাবে ভাল বুঝি সেভাবে সমাধান করছি।' এবার জনতা চুপ হল। আব্দুর রহমান আলিকে ডাকলেন : 'আলি, আপনি দাঁড়ান।' আলি দাঁড়ালেন এবং আব্দুর রহমানের কাছে গেলেন। আব্দুর রহমান তাঁর বাম হাত দিয়ে আলির ডান হাত ধরলেন। নিজের ডান হাত উত্তোলন করে আলির ডান হাত করমর্দনের প্রস্তুতি নিলেন এবং আলিকে জিজ্ঞেস করলেন: 'আপনি কি আল্লাহর নামে শপথ নিবেন যে আপনি মুসলমানদের জন্য কোরান, নবির সুন্নাহ এবং আগের দুই খলিফার উদাহরণ মেনে নিষ্পত্তি করবেন?' আলি স্মরণ করলেন রাত্রে আমরের দেয়া উপদেশ। আলি উত্তর দিলেন : 'এই সব শর্তে কাজ করা দুরূহ হবে। আল্লাহ যেসব আদেশ দিয়েছেন তার সবগুলো আদেশ কেউ কি জানেন? আর নবির সকল সুন্নাহ কি কেউ জানেন? তবে আমার জ্ঞান, সাধ্য, এবং শক্তি অনুযায়ী আমি আমার দায়িত্ব পালন করে যাব। আমি আল্লাহর কাছে সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করছি।' আব্দুর রহমান তাঁর বাম হাত থেকে আলির হাত ছেড়ে দিলেন, এবং তখনও তাঁর নিজের হাত উত্তোলিত রেখে আলিকে বললেন : 'আপনার শর্তে চললে শিথিলতা ও দুর্বলতা এসে যাবে।' তারপর আব্দুর রহমান উসমানকে বললেন : 'আপনি এখানে আসুন।' উসমান দাঁড়ালেন এবং আব্দুর রহমানের কাছ গেলেন। আব্দুর রহমান আগের মতো তাঁর বাম হাত দিয়ে উসমানের ডান হাত ধরলেন এবং বললেন : 'আপনি কি আল্লাহর নামে শপথ নিবেন যে আপনি মুসলমানদের জন্য কোরান, নবির সুন্নাহ এবং আগের দুই খলিফার উদাহরণ মেনে নিষ্পত্তি করবেন?' উসমান উত্তর দিলেন: 'হ্যাঁ, আমি তা করব।' আব্দুর রহমান

এবার তাঁর ডান হাত দিয়ে আলির বাম হাত ধরে উসমানের হাতের উপর রাখলেন; এবং আব্দুর রহমান উসমানের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে বললেন: 'আল্লাহ আপনাকে যে কাজের ভার দিয়েছেন তার জন্য আল্লাহ আপনাকে আশীর্বাদ করুন।' উপস্থিত সবাই তখন উসমানের নিকটে গিয়ে উসমানের প্রতি তাঁদের আনুগত্য জানাল। আলি বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আব্দুর রহমানকে উদ্দেশ্য করে আলি বললেন : 'আপনি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন।' আলি ভাবলেন আমর ইবনে আল-আস তাঁকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তা আব্দুর রহমান, উসমান, জুবায়ের এবং সাদের সাথে যোগসাজশ করেই দিয়েছেন।

হতাশ হয়ে আলি ঘুরে দাঁড়ালেন এবং চলে যাবার প্রস্তুতি নিলেন। আব্দুর রহমান আলিকে বললেন : 'আপনি কি আনুগত্য দেখাতে নারাজ?' আল্লাহ বলেছেন : 'যারা তোমার কাছে আনুগত্যের শপথ নেয় তারা তো আল্লাহর আনুগত্যের শপথ নেয়। আল্লাহ ওদের শপথের সাক্ষী। সুতরাং যে তা ভাঙে ভাঙার প্রতিফল তারই. . .।' (সুরা ফাতহ্ : আয়াত ১০)। আপনি কি জানেন না, আমি নিজেই এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে গিয়েছিলাম যেহেতু আমার ধারণা ছিল আমি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না কেন আপনি তা মেনে নিবেন? ওমর কি বলেননি যে আব্দুর রহমানের সিদ্ধান্ত মেনে নিবে না, তাঁকে মেরে ফেলতে হবে?' এ-কথা শোনার পর আলি ফিরে গেলেন এবং উসমানের প্রতি তাঁর আনুগত্য দিয়ে দিলেন। শপথ অনুষ্ঠান শেষ হলো ওই দিনেরই অপরাহ্নের নামাজের আগে। এরপর উসমান ইমাম হলেন।'

এ-হল তাবারির পূর্ণ বিবরণ। বিবরণ থেকে বুঝা যায় আলি খলিফা হলে কী হবে তা নিয়ে আবু সুফিয়ান উৎকণ্ঠিত ছিলেন। তাই উসমানের খলিফা হওয়া নিশ্চিত করতে আবু সুফিয়ান আমর ইবনে আল-আসের সাথে যোগসাজশ করছিলেন। ১২ বছর আগে যখন আবু বকর খলিফা হন তখন আবু সুফিয়ান এতোই ক্রুদ্ধ ছিলেন যে, তিনি আলিকে প্ররোচিত করেছিলেন যেন আলি আবু বকরের প্রতি আনুগত্য না দেখান। এছাড়াও আবু সুফিয়ান বলেছিলেন প্রয়োজন পড়লে তিনি মদিনা ভরে দিবেন কুরাইশ সৈন্য দিয়ে। কিন্তু যখন সময় আসল আলি এবং উসমানের মধ্যে পছন্দের তখন আবু সুফিয়ান নিলেন উসমানের পক্ষ। তার কারণ ছিল আবু সুফিয়ান জানতেন উসমানের শাসন তাঁর জন্যে ভালো হবে। আবু সুফিয়ান আলিকে ভয় করতেন কারণ আলি ছিলেন অতিশয় ধর্মপ্রাণ, যা আবু সুফিয়ানের জন্য বিপদসংকুল।

এটা এখন বলা যায়, ওমরের পর যদি আলি খলিফা হতেন তবে ইসলামের উজ্জ্বল দিনগুলি আরও অনেক দিন থাকত এবং ইসলামের প্রধান নীতিগুলো থেকে বিচ্যুত হবার সম্ভাবনা থাকত না। উসমানের স্বার্থপর আত্মীয়স্বজনেরা সুযোগ পেতেন না প্রধান প্রধান সরকারি পদগুলো কুক্ষিগত করতে। এছাড়া যেসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মুয়াবিয়া এবং উমাইয়া বংশের উত্থান হয় সেগুলোও এড়িয়ে যাওয়া যেত।

(দশ) নবির মৃত্যুর পর তাঁর সহচরেরা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যান। এক দল তাঁকে সত্যি সত্যি 'আল্লাহর নবি' হিসাবে গ্রহণ করেন আর আরেক দল তাঁকে গ্রহণ করেন এক নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে। এই দ্বিতীয় দলের সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে ইসলামি রাষ্ট্রের উত্থানে অবদান রাখেন। তাঁরা মনে করতেন যে, তাঁরাই হচ্ছেন এই রাষ্ট্রের উত্তরাধিকারী এবং এর সংরক্ষণ ও প্রতিরক্ষার জন্য তাঁরা বাধ্য। কিন্তু উভয় দলই নবির প্রতি ভীষণ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। দ্বিতীয় দলে যারা ছিলেন তাঁদের মধ্যে ওমর ছিলেন সবচেয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তি। রাষ্ট্রের সংরক্ষণের প্রতি উদ্বেগ থেকে ওমরকে শক্তভাবে তরবারি ধরতে হয়। এই তরবারি উঁচিয়েই তিনি নবির গৃহের দরজা থেকে বের হয়ে নবির মসজিদে আসেন এবং জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন : 'নবি মুহাম্মদ মরেননি, নবি মুসার মতো তিনি চল্লিশ দিন

অনুপস্থিত থাকবেন।' আবু বকর ওমরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন কোরানের বাণী : 'তোমার মৃত্যু হবে, এবং তাদেরও।' (সুরা জুমার : আয়াত ৩১)। এরপর আবু বকর মসজিদের প্রচারবেদিতে দাঁড়িয়ে বললেন : 'তোমরা যদি ব্যক্তি মুহাম্মদকে উপাসনা করে থাকো তবে সেই মুহাম্মদ মৃত। কিন্তু তোমরা যদি আল্লাহর উপাসনা করো তবে জেনে রাখো আল্লাহ কোনোদিন মারা যান না।' তারপর আবু বকর এই আয়াত আবৃত্তি করলেন : 'মুহাম্মদ রসুল ছাড়া আর কিছুই নয়, তার পূর্বে বহু রসুল গত হয়েছে। সুতরাং সে যদি মারা যায় বা নিহত হয় তবে কি তোমরা পিঠ ফিরিয়ে পিছু হটবে? আর যে পিঠ ফিরিয়ে সরে পড়ে সে কখনও আল্লাহর ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন।' (সুরা আল-ইমরান : আয়াত ১৪৪)। নবির মৃত্যুর পর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয় শেষ পর্যন্ত তা ওমরের বিচক্ষণতা, দক্ষতা এবং কুশলতার জন্যই এড়ানো গেল। সে-জন্য ওমরের প্রশংসা অবশ্যই করতে হয়। ওমরের প্রচেষ্টার জন্যই আবু বকর খলিফা হয়ে যান। আর ওমরের নির্দেশেই আবু বকর ইসলামত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং কঠোর হস্তে বিদ্রোহী গোত্রদের দমন করেন।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে যে ওমরের মনে কোন বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে, ইসলাম ধর্ম না ইসলামি রাষ্ট্র? যা-হোক, একটি ইসলামি রাষ্ট্র যখন গঠিত হয়েছে তখন তাকে রক্ষা করতেই হবে। মুহাম্মদের প্রতিষ্ঠিত নতুন সরকার আরবদের মাঝে বিরাজমান অজ্ঞানতা এবং বর্বরতার অবসান ঘটায়। এই অবস্থানকে সুদৃঢ় করা অতীব প্রয়োজন ছিল। বেদুইনদের মধ্যে যে অনন্তকাল ধরে যুদ্ধ-বিগ্রহ বিরাজমান ছিল তা নির্বাপিত করে ইসলামের ছায়ায় এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন ছিল। ওমর ছিলেন খুবই বাস্তববাদী ব্যক্তি। তিনি আরবদের চরিত্র ভালো করে জানতেন। ইসলামত্যাগীদের বিরুদ্ধে (রিদ্দা যুদ্ধ) যুদ্ধের পর যে সৈন্যরা ফিরে এলো ওমর তাদেরকে রোম এবং ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠিয়ে দিলেন। এই ধরনের যুদ্ধের কথা আগে কেউ চিন্তাই করতে পারতেন না। ওমর জানতেন যে মরুভূমির বেদুইনরা কোনো দিন কৃষি কাজ অথবা শিল্পে মন দিবে না। কারণ এইসব বিষয়ে বেদুইনরা একেবারে অজ্ঞ। তাদের মধ্যে যে সুপ্তশক্তি আছে তার বহিঃপ্রকাশ দরকার। আরবের সীমান্তের বাইরে যে বিপুল ধনসম্ভার আছে তা দখল নেবার জন্য এই অশান্ত, টগবগে বেদুইনদের প্রস্তুত করার চেয়ে আর ভালো কাজ কি হতে পারে? ইতিহাস প্রমাণ করে, হজরত ওমরের এই সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল।

(এগারো) ইরান এবং রোমানদের মধ্যে যুদ্ধ চলেছে দীর্ঘদিন ধরে। [অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেমস ডগলাস হওয়ার্ড জনসনের মতো ঐতিহাসিকদের মতে গ্রিক-রোমান বনাম পারস্য সাম্রাজ্যের ধারাবাহিক যুদ্ধ খ্রিস্ট পূর্ব ৯২ অব্দ থেকে শুরু হয়ে ৬২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। -অনুবাদক]। কয়েক শতাব্দী ব্যাপী চলমান যুদ্ধে দুই সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক-সামাজিক কাঠামো এমনিতেই দুর্বল হয়ে পড়ে। এছাড়া একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল, ওই দুই সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে প্রচুর আরব বসবাস করতো। দুই থেকে তিন শতাব্দী ধরে উত্তর আরব অঞ্চল থেকে আগত আরবেরা জর্দানের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং সিরিয়া ও ইরাকে অনুপ্রবেশ করেছিল। রোমান ও ইরানের কর্তৃত্বতায় তারা একাধিক রাজ্য গঠন করেছিল। তারা (আরব সম্প্রদায়) অথবা তাদের চাইতে নিচু-সম্প্রদায়ের লোকেরা আরব খলিফার সৈন্যদের সাথে ভ্রাতৃত্ববোধ করত। ফলে এদের সহায়তা নিয়ে ওমরের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া। সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ছিটিয়ে থাকা আরবেরাই ওমরকে প্রেরণা দেয় সৈন্য-সামন্ত নিয়ে অগ্রসর হতে; কারণ তখন ইসলাম আরব জাতীয়তাবাদকে একটি সুসংঘটিত শক্তিতে পরিণত করেছে। এই যুদ্ধগুলি জয় ছিল একেবারে মহাকাব্যের কাহিনীর মতো, বিজয়ী হওয়ায় লব্ধ গনিমতের মাল আরবদের প্রভাব বিস্তার করতে সহায়তা করে। একে একে সামরিক বিজয় তাদের মনে দীর্ঘদিনের বিদেশিদের বশ্যতার যে কলঙ্ক ছিল তা দূর করে দিল।

(বারো) এটা সত্যি যে অনেকে আন্তরিক বিশ্বাস নিয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সিরিয়া এবং ইরাকে যখন আক্রমণ চালানো হয় তখনো অনেকেই ইসলামের আদেশ মান্য করে এই ধর্মযুদ্ধে (জিহাদ) যোগ দেন। কিন্তু ইতিহাস থেকে এটাও পাওয়া যায় যে গনিমতের মালের লোভেও অনেকে এই আক্রমণে শরিক হয়েছিলেন। কঠোর সংযম, তপস্যা, এবং পার্থিব ধনদৌলতের প্রতি অনীহা সীমিত সংখ্যক মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। নবির অনেক সাহাবিও যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত গনিমতের মাল থেকে প্রচুর ধনদৌলতের অধিকারী হন। এরকম দুজন হচ্ছেন হজরত তালহা এবং হজরত জুবায়ের। নবি একসময় তাদেরকে বেহেশত গমনের নিশ্চয়তাও দিয়েছিলেন। খলিফা ওমর তাঁর উত্তরাধিকারী নির্ণয়ের জন্য যে পরিষদ গঠন করেছিলেন তার সদস্যও ছিলেন তাঁরা উভয়ে। তাঁরা উভয়ে মৃত্যুর সময়ে মক্কা, মদিনা, ইরাক, এবং মিশরে বিশাল ধনসম্পদ রেখে যান যার পরিমাণ ছিলো তিন থেকে চার কোটি দিরহাম। উসমানের হত্যার পর এরা দুজনেই আলির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁরা যখন দেখলেন যে আলি পূর্বের খলিফা উসমানের মতো অপচয়ের পথ ধরবেন না এবং সরকারি তহবিলে অবৈধ হস্তক্ষেপ করবেন না, তখন আলির উপর থেকে তাঁরা আনুগত্য প্রত্যাহার করে নিলেন।

নবির স্ত্রী আয়েশা হলেন ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম সম্মানিত নারী। নবি তাঁর স্ত্রী আয়েশাকে গভীর ভালোবাসতেন। কোরানে আয়েশার ছিল অগাধ জ্ঞান এবং নবির উক্তি ও কর্ম সম্পর্কে তিনি অনেক নির্ভরযোগ্য হাদিস বলেছেন। আলি যখন খলিফা মনোনীত তখন আয়েশা হজরত উসমানের হত্যাকাণ্ডের বিষয় ধরে জনতার রায়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপ দেখালেন। বিবি আয়েশা মুসলমানদেরকে প্ররোচিত করলেন আলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে। এটি জামালের যুদ্ধ (উটের যুদ্ধ) নামে পরিচিত। কিন্তু আয়েশার এরকম পদক্ষেপের পিছনে প্রধান কারণ ছিল খলিফা উসমান সরকারি কোষাগার থেকে তাঁকে যে ভাতা দিতেন আলি খলিফা হবার পর সেই ভাতা বন্ধ করে দেন। আর একটি কারণ হতে পারে, যখন আয়েশার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা হয়েছিল তখন হজরত আলি বিবি আয়েশার বিরুদ্ধে অপ্রীতিকর মন্তব্য করেছিলেন। যদিও হজরত আলির এই মন্তব্য পরে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল। জামালের যুদ্ধ, সিফিফনের যুদ্ধ, নাহরাবানের যুদ্ধ, এসব যুদ্ধের মূল কারণ ছিল, খলিফা উসমানের আমলে যে শিথিলতা চলছিল, আলি তা আর চলতে দিলেন না। খলিফা ওমরের শাসনামলে যারা কঠোর সীমাবদ্ধতার মাঝে ছিলেন, তাঁরা উসমানের সময় বিলাসিতা ও আরামের সাথে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত হয়ে গেলেন। আলি খলিফা হবার পর কৃচ্ছতা সাধনের নীতি অবলম্বন করলেন। আলির এই নীতিতে অনেকেই বিরাগ হলেন। মুয়াবিয়াসহ অনেকেই নিজেদের ব্যক্তিগত অবস্থান শক্তিশালী করার জন্য উঠেপড়ে লেগে গেলেন।

(তের) নবি জীবিত থাকাকালে আত্মিক-বিষয়ে উদাসীন, যোদ্ধা বেদুইন গোত্রের মধ্যে ইসলাম প্রচার করেছিলেন। কিন্তু তিনি তা করেছিলেন প্রথমত কোরানের বাণী ও কূটনৈতিক দক্ষতা দিয়ে। শক্তি ব্যবহার করেছেন একেবারে শেষ অস্ত্র হিসেবে। নবির মৃত্যুর পর খলিফারা এই অবস্থান ধরে রাখতে পারেননি। খলিফারা নবির নাম ভাঙ্গিয়ে আরব জাতীয়তাবাদী সাম্রাজ্য কায়েমে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এ-সময়েই নবিকে 'অতিমানব' হিসেবে পরিচিত করানো শুরু হয়। অনেক অবাস্তব বর্ণনাকে নবির অলৌকিক ঘটনা দাবি করে তাঁকে এক 'রহস্যময় অতিমানবে' পরিণত করা হয়। যে নবি জীবিতকালে নিজেকে সাধারণ আল্লাহর দাস বলে পরিচিত করেছিলেন মৃত্যুর পরে তাঁকে মানুষের স্তর থেকে উঠিয়ে ফেরেশতা-রূপ দেয়া হয়। একজন মহামানবের মৃত্যুর পর তাঁর চরিত্রকে কেন্দ্র করে এ-ধরনের গুজব বা অবাস্তব-বর্ণনা রচনা করা একটা বহুল প্রচলিত অভ্যাস। সত্য এই যে, দুনিয়ার সব মহামানবের তাঁদের মহানুভবতা, তাঁদের যুগান্তকারী ভূমিকা, তাঁদের অনন্যসাধারণ কর্ম থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষদের মতোই তাদেরও নানা দুর্বলতা ছিল। তাঁরাও বিভিন্ন সময় ভুল করেছিলেন। তাঁদের ক্ষুধা পেয়েছে, পিপাসার্ত হয়েছেন, শীত-গ্রীষ্মে

কষ্ট পেয়েছেন। তাঁদেরও যৌন-কামনা ছিল, যা হয়তো সাধারণ আচরণের বাইরে চলে যেত। তাঁরা পথ চলতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছেন। তাঁরা বিরোধিতা সহ্য করেননি। এমনকি অনেক সময় তাঁরা পরশ্রীকাতর হয়েছেন। যা-হোক মহামানবদের মৃত্যুর পর অন্যান্যদের সাথে যে তাঁদের বিরোধ, তাঁদের ব্যর্থতা, তাঁদের দুর্বলতা জনসাধারণ ভুলে যায়। দেখা যায় যে জনতা কেবল মহামানবদের উৎকৃষ্ট কাজগুলিকেই মনে রাখে। এ-জন্য আমরা আবু আলি সিনা (হিজরি ৩৭০ বা ৯৮০ খ্রিস্টাব্দ- হিজরি ৪২৮ বা ১০৩৭ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর রচিত 'আল কানুন' (আরবিতে) এবং দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ের উপর লেখা 'আশ শেফা' (আরবিতে) ও 'দানেশনামা-ই আলাই' (ফার্সিতে) বইগুলির কথা মনে রেখেছি। এছাড়াও আমরা মনে রেখেছি তাঁর ঝুঁকিপূর্ণ কর্মজীবনের কথা। কিন্তু তাঁর জীবনের ব্যর্থতাকে আমরা গোপন রেখেছি অথবা কৌশলে ঢেকে রেখেছি। দুনিয়ার কোটি কোটি লোক গভীর বিশ্বাস নিয়ে ধর্ম পালন করে থাকেন। ফলে ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাদের নিয়ে 'অতিমানবীয় চরিত্র' দাঁড় করানো খুব প্রচলিত ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়।

পরিখা যুদ্ধের (আহজাবের যুদ্ধ) সময় কুরাইশ প্রধান ওয়ায়না বিন হোসেন নামের গাতাফান গোত্রের এক ব্যক্তিকে তাদের প্রতিনিধি করে নবির কাছে পাঠাল। সে নবিকে প্রস্তাব দিল, নবি যদি মদিনার সে বছরের সমস্ত খেজুর দিতে রাজি হন, তবে তারা তাদের সম্মিলিত অবরোধকারী সৈন্য সরিয়ে নিবে। নবি রাজি হলেন না। তখন সেই প্রতিনিধি বলল, তারা মদিনার এক-তৃতীয়াংশ খেজুরে রাজি আছে। অর্থাৎ এ-পরিমাণ খেজুর পেলে তারা তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করে নিবে। এর আগে নবি মদিনা রক্ষার জন্য পরিখা খনন করেছিলেন। তিনি জানতেন, এই সব গোত্রের সাথে মৈত্রীর বন্ধন স্থাপন করা তাঁর জন্য এক বিরাট বিপদ। তথাপি নবি গাতাফান গোত্রের প্রতিনিধির প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন। যুদ্ধ-বিরতির চুক্তি লেখার সময় সাদ বিন মুয়াজ (আউস গোত্রের একজন নেতা) নবির কাছে জানতে চাইলেন তাঁর এই সিদ্ধান্ত আল্লাহ প্রদত্ত কি না? নবি বললেন, 'এ আল্লাহ প্রদত্ত নয়; কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নিলে অবরোধকারীদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে এবং তাদের ও ইহুদিদের সাথে যোগসাজশের যে ঝুঁকি আছে, তাও ভেঙে দেয়া যাবে, পরবর্তীতে ইহুদিদেরকে দেখে নেয়া যাবে।' সাদ বিরক্তিভরে উত্তর দিলেন তাঁদের পৌত্তলিক আমলে কেউ সাহস করত না, একটা খেজুরও তাদের কাছ থেকে জোরপূর্বক আদায় করতে। এখন তারা মুসলিম হয়েছে ঠিকই। কিন্তু তারা মৈত্রীচুক্তি করার নামে অপমানিত হতে চায় না। গাতাফান গোত্রের অপমানের একমাত্র সঠিক জবাব হবে তরবারি।' এ-বক্তব্য শোনার পর নবি তাঁর ভাবনা পরিবর্তন করলেন। তিনি সাদের কথা মেনে নিয়ে গাতাফান গোত্রের সাথে চুক্তি সই করা থেকে সরে আসলেন। এ-ধরনের অনেক ঘটনা নবির তেইশ বছরের নবুওতির সময়কালে ঘটেছিল। অনেক সময় নবির কোনো সহচর তাঁর সাথে কোনো বিষয়ে আলাপ করে পরামর্শ নিতেন, আবার অনেক সময় নবিও তাঁর সহচরদের উপদেশ গ্রহণ করতেন। সহচররা অনেক সময় নবিকে জিজ্ঞাসা করতেন আল্লাহর সিদ্ধান্ত কী হতে পারে আর নবিও অনেক সময় সিদ্ধান্তের ভার সহচরদের উপর ছেড়ে দিতেন। যা-হোক নবির মৃত্যুর পর তাঁর মানুষসুলভ চরিত্রের কথা সবাই ভুলে যান। নবির প্রত্যেকটি কর্ম-আদর্শ এবং পূর্ণাঙ্গ বলে বিবেচিত হতে লাগল। তাঁর প্রত্যেক কাজকেই 'আল্লাহর ইচ্ছা' মনে করা হতে লাগল। সরকারি এবং বিচারবিভাগীয় কর্তারা নবির প্রত্যেক কাজকে অতীতের উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করতে লাগলেন। তখনকার দিনের সরল মনের সাধারণ নবি যা ছিলেন তারচেয়েও অনেক উঁচু আসনে বসিয়ে দিলেন। যে কেউ দাবি করত, সে নিজে নবির মুখ হতে কিছু শুনেছে তখন সে পেয়ে যেত অশেষ মর্যাদা ও কদর। কোরানে যে-সব আদেশ এবং আইনের কথা বলা হয়েছে তা পরিষ্কার এবং পূর্ণাঙ্গ নয়। সে-জন্য বিশ্বাসীদেরকে খুঁজতে হতো নবির উদাহরণ। যেমন কোরানে মুসলমানদের দৈনিক নামাজের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কিভাবে এই নামাজ পালন করতে

হবে তার বিশদ কিছু নেই। তাই নামাজ পড়ার নিয়ম ও পদ্ধতি নবির উদাহরণ থেকে নিতে হলো। এ-জন্যে প্রয়োজন পড়ল নবির জীবনকালের কাজ-কর্মের রীতিনীতি সঙ্কলনের। একে সুন্নাহ বলা হয়। তাঁর বাণীগুলিকে হাদিস হিসাবে সঙ্কলন করা হতে লাগল। ফলে হিজরি ৩-৪ (খ্রিস্টাব্দ ৯-১০) শতাব্দীর মধ্যে সুন্নাহ ও হাদিসের সংখ্যা হাজার হাজার হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, শতশত অনুসন্ধান হতে লাগল সমগ্র মুসলিম বিশ্বজুড়ে। ফলে এক শ্রেণীর পেশাদার হাদিস-সংকলকের আবির্ভাব হতে লাগল যারা প্রচুর সম্মানের অধিকারী হলেন। তাঁরা হাজার হাজার হাদিস এবং সুন্নাহ মুখস্ত করে ফেললেন। তাঁদের একজন হলেন ইবনে ওকদা (মৃত হিজরি ৩৩২ বা খ্রিস্টাব্দ ৯৪৩)। বলা হয়ে থাকে তিনি আড়াই লক্ষ হাদিস জানতেন। সেইসাথে হাদিস বর্ণনাকারীদের ধারা।

পারস্যের এক প্রবাদে বলা হয় : ‘কেউ যদি একটি বিশাল প্রস্তর হাতে নেয়, তবে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, সে কখনো ওই প্রস্তর নিক্ষেপ করবে না।’ সাধারণ জ্ঞান থেকে আমরা বলতে পারি এই যে, বিশাল হাদিস সঙ্কলন করা হল সেগুলোর সবই নির্ভরযোগ্য নয়। এর চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এইসব হাদিস সংকলনে যারা সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন তাঁদের উদ্দেশ্য কী ছিল? ইবনে তায়মিয়া (হিজরি ৬৬১ বা খ্রিস্টাব্দ ১২৬৩ - হিজরি ৭২৮ বা খ্রিস্টাব্দ ১৩২৮) বলেছেন : ‘নবি মুহাম্মদের কাছ থেকে আসা ব্যতীত আর কিছুই সত্য নয়।’ শোনা যায় যে হাসান বিন মুহাম্মদ আল-আরবিলি (মৃত হিজরি ৬৬০ বা খ্রিস্টাব্দ ১২৬১) নামে আর একজন মুসলিম পণ্ডিত বলেছেন : ‘আল্লাহ আমাদেরকে সত্য জানিয়েছেন কিন্তু ইবনে সিনা আমাদেরকে মিথ্যা বলেছেন।’

(চৌদ্দ) নবির মৃত্যুর পর যতই দিন যেতে লাগল এবং হেজাজ থেকে দূরত্ব যত বেশি হলো নবিকে নিয়ে অলৌকিক দাবি ততোই বেশি হতে লাগল। এভাবেই একজন মানুষ যিনি ইতিহাসের বিশাল মোড় ঘুরিয়ে ছিলেন নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা, স্বকীয়তা, ধৈর্য, সাহস, কৌশলের সাথে, তাঁকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে এক উপকথার নায়কে রূপান্তরিত করা হলো।

(পনের) আরবদের আক্রমণে ইরান সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। হিজরি ১৫-১৬ সালে (৬৩৬-৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ) কাদেসিয়ার যুদ্ধে বারবার পরাজয় এবং হিজরি ২১ সালে (৬৪২ খ্রিস্টাব্দ) নেহাবন্দে পরাজয়ের গ্লানি আলেকজান্ডার এবং মঙ্গোলদের কাছে পরাজয়ের গ্লানির চাইতে বেশি ছিল। ইরানের দীর্ঘ দুর্দশার ইতিহাস থেকে দেখা যায়, এই জাতি করুণভাবে পরাজিত হয়, কারণ এখানে কোনো যোগ্য নৃপতি অথবা নেতা অথবা রাষ্ট্রনায়ক, অথবা সেনাপতি ছিলেন না। ইরান পরাজিত হয় স্বল্পসংখ্যক, অদক্ষ আরব সেনাবাহিনীর হাতে। শহরের পর শহর, প্রদেশের পর প্রদেশ আরব সৈন্যদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তারপর এসব স্থানের বাসিন্দারা আরবদের ধার্য করা শর্ত যেমন ইসলাম গ্রহণ অথবা জিজিয়া কর প্রদান করতে বাধ্য হয়। যারা জিজিয়া করের আশ্রয় নিল তারা পেল অতি নিম্নমর্যাদা। জিজিয়া কর এড়ানোর জন্য অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে। আবার অনেকে অগ্নিউপাসক জরথুস্ত্র পুরোহিত মবেদের হাত থেকে মুক্তির জন্য ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ খুব সহজ। শুধু দরকার আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করা এবং মুহাম্মদের নবুওতি মেনে নেওয়া। ধীরে ধীরে ইসলাম জনসাধারণের মাঝে বিস্তার লাভ করে। সেই সাথে যুদ্ধের ময়দানে তরবারির লড়াইয়ে বিজয়ী হয়ে ইসলাম প্রচারিত হয়।

অতীতে ইরানিদের জাতীয় চরিত্র ছিল এই রকম, যখন কেউ তাদেরকে যুদ্ধে পরাজিত করত তখন ইরানিরা বিজয়ী শাসকের অনুগ্রহভাজন হবার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে যেত। তারা নতুন শাসকদের আজ্ঞাপালন, সেবা পরিচর্যায় নিয়োজিত হতো। এছাড়া কৃপা পাবার জন্য ইরানিরা তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি নতুন প্রভুদের হাতে সমর্পণ করে দিত। তাই আরবরা যখন ইরান দখল নেয়, তখন ইরানিরা আরবি ভাষা রপ্ত করে নেয়। আরবদের আদব-কায়দা অনুকরণ করা শুরু

করে। অবশ্য ইরানিরাই আরবি ব্যাকরণ এবং বাক্যগঠনবিধি নিয়মাবদ্ধ করে। ইরানিরা তাদের নতুন প্রভুদের অধীনে চাকুরি পাবার জন্য যে কোনোভাবে আজ্ঞানুবর্তী হতে কুণ্ঠা বোধ করত না। ক্ষেত্রবিশেষে ইরানিরা ইসলামি রীতিনীতি পালনে আরব শাসকদেরও ছাড়িয়ে যায়। আর নিজেদের হাজার বছরের পারস্য সংস্কৃতি, ধর্ম, রীতিনীতি, প্রথা, কৃষ্টির প্রতি অবজ্ঞা আর অবহেলা প্রদর্শন করে। আরব জাতি এবং আরব বীরদের উচ্চপ্রশংসায় তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শুধু তাই-ই নয় ইরানিরা প্রমাণ করতে চাইল বীরত্ব, বদান্যতা, এবং নেতৃত্ব শুধুমাত্র আরবদের মধ্যেই আছে। প্রাক-ইসলামি যুগের আরবের বেদুইন কবিদের কবিতাগাঁথা আর সাধারণ উক্তিকে পাণ্ডিত্যের রত্নভাণ্ডার এবং আচার আচরণের আদর্শ হিসাবে গণ্য করল ইরানিরা। তারা আরব গোত্রের আশ্রিত ব্যক্তি এবং আরব নেতাদের (আমির) ভৃত্য হয়ে নিজেদের ধন্য মনে করত। বিবাহের জন্য তাদের কন্যাদেরকে আরবদের হাতে তুলে দিলে যারপরনাই খুশি হতো। আরও খুশি হতো যখন তারা আরবি ভাষার নাম দিয়ে নিজেদের ভূষিত করত। স্বকীয়তা, সাহিত্য, কৃষ্টি ত্যাগ করে পরাজিত জাতি হিসেবে ইরানিরা শীঘ্রই আরবি সাহিত্য, হাদিস সংকলন, ইসলামি আইনের পেছনে নিজেদের মেধা-শ্রম-সময় ব্যয় করে। ইসলামি সাহিত্য নিয়ে যত মুখ্য কাজ হয়েছে, তার বেশির ভাগই করেছেন ইরানের জনগণ। যদিও প্রথমদিকে ইরানে ইসলাম গৃহীত হয়েছে ভীতি থেকে এবং আরব শাসকদের প্রচারণায়। তবে দুই-তিন প্রজন্ম পর চিত্র পাল্টে যায়। খোদ আরব-মুসলমানদের চেয়ে ইরানে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি হয়ে যায়।

তোষামোদ এবং মিষ্টিকথা দিয়ে নতুন শাসকদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে ইরানিরা এতোই সুদক্ষ হয়ে উঠে যে, কথিত আছে একজন প্রসিদ্ধ উজির আয়নায় কখনো নিজের চেহারা দেখতেন না, পাছে তিনি এক ইরানির চেহারা দেখে ফেলেন এই লজ্জায়। প্রথমদিকে ইরানিরা তাদের নতুন শাসকদের আজ্ঞাবহ হয়ে সেবা করত, মনোরঞ্জনের যথাসাধ্য চেষ্টা করত, কারণ তারা মনে করেছিলেন আরবরা ফিরে গেলে তারা নিজেরা শাসক হয়ে যাবে এবং গনিমতের মালের ভাগ পাবেন। কিন্তু সময় যতই যেতে লাগল তারা নিজেদের পরিচয় নিয়ে দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেল। হিজরি তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীর (নবম-দশম খ্রিস্টাব্দ) দিকে ইরানে প্রচুর লোক ছিল, যারা নিজেদের ভূখণ্ড ছেড়ে হেজাজকেই মানবজাতির জন্য স্রষ্টার আশীর্বাদ হিসেবে মনে করতো। ইরানের এই জাতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে বুঝা যায়, কেমন করে এ ভূখণ্ডে কুসংস্কার আর অতিলৌকিক বিশ্বাস মানুষের মনে বিস্তার লাভ করেছিল। নবির নবুওতি লাভের পর প্রথম তের বছরের মক্কা জীবন আর পরের দশ বছরের মদিনা জীবনে যে ভয়াবহ বিপদসংকুল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন হেজাজে, সে-সম্পর্কে বাস্তব তথ্য জানা থাকলে ইরানের জনগণ এতো সহজে আরবের বশ্যতা স্বীকার করে নিত না। ধর্মও প্রতিষ্ঠা পেত না।

এ-প্রসঙ্গে মুহাম্মদ বাকের মাজলেসির[১০১] (হিজরি ১০৩৭ বা খ্রিস্টাব্দ ১৬২৭-হিজরি ১১১০ বা খ্রিস্টাব্দ ১৬৯৯) লেখা ‘বেহার আল-আনোয়ার’ বইয়ের কথা আবার উল্লেখ করা যেতে পারে। পারস্যের সাফাবিদ শাসনকালের শেষের দিকের এই লেখক ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ মুজতাহিদ (শিয়া ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামি আইনবিশারদ)। তিনি তাঁর বইয়ে লিখেছেন : ‘কথিত আছে একদা ইমাম হাসান এবং হোসেন তাঁদের পিতামহের (নবি মুহাম্মদ) কাছে রোজা ভাঙার দিনে নতুন পোশাক উপহার চাইলেন। এ-সময় জিবরাইল ফেরেশতা এসে গেলেন এবং প্রত্যেকের জন্য একটি করে সাদা পোশাক দিয়ে দিলেন। নবি বললেন, এই দুই বালক রঙিন পোশাক পরতে পছন্দ করে, কিন্তু জিবরাইল নিয়ে আসলেন সাদা পোশাক। নবির কথা শুনে জিবরাইল বেহেশত থেকে একটি টব এবং একটি জগ নিয়ে আসলেন। এরপর জিবরাইল বালকদের বললেন, ‘তিনি টবটি এক বিশেষ ধরনের তরল পদার্থ দিয়ে পূর্ণ করে দিবেন। তারপর বালকেরা তাদের নিজস্ব পোশাক ওই টবে ডুবিয়ে দিলে তাঁরা যে রং চাইবেন তাই পাবেন। ইমাম

হাসান সবুজ রং চাইলেন এবং ইমাম হোসেন চাইলেন লাল রং। যখন পোশাকদ্বয় রঞ্জিত হচ্ছিল তখন জিবরাইল কেঁদে উঠলেন। নবি জিবরাইলকে তাঁর কাঁদার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, কেননা বালকেরা তাদের পোশাকে রং পেয়ে খুশি হয়েছে। জিবরাইল বললেন, 'হাসানের সবুজ রঙ পছন্দের অর্থ হলো তিনি বিষপানে শহীদ হবেন, এতে তাঁর দেহ সবুজ হয়ে যাবে। আর হোসেনের লাল রং পছন্দের অর্থ হল তিনি শহীদ হবেন যখন তাঁর রক্তে তাঁর পোশাক ভিজে যাবে।' উল্লেখ্য এই কাল্পনিক বক্তব্য বাহাই মতাবলম্বী লেখক মির্জা জানি তাঁর 'নক্তাত আল-কাফ'[১০২] বইয়েও উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বাহাইরা নিজেদের শিয়া ইসলামের সংস্কারক এবং এক নতুন শিয়া-ধর্মের প্রবক্তা হিসেবে দাবি করে থাকেন। কিন্তু তাদের এই অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপে মনে হয়, মুখে দাবি করলেও কুসংস্কার এই সংস্কারবাদী শিয়াদের মন থেকে বিদায় হয়নি।

মদিনায় হিজরত করার পর প্রথম বছর নবি মুহাম্মদ এবং সাহাবিরা নিদারুণ আর্থিক অনটন আর অসহায় অবস্থার মধ্যে দিন যাপন করেন। নাখলাতে যুদ্ধের পর এই পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন হয়। নবির সাহাবির মধ্যে আব্দুর রহমান বিন আউফ ছাড়া আর কারো ব্যবসা-বাণিজ্য করার মতো তেমন অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা ছিল না। মদিনায় আসার পর আব্দুর রহমান আউফ মদিনার বাজারে একটি ব্যবসা স্থাপন করেন। এই ব্যবসায়ে তাঁর কিছু মুনাফা আসে। নবির আরও কয়েকজন সাহাবি মদিনার ইহুদি বাসিন্দাদের তালবাগানে চাষাবাদ এবং কূপখননের কাজ পান। অবশ্য এই সাহাবিরা খেজুর বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ বা চাষের কোনো কিছুই জানতেন না। ফলে বাগান রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া তাঁদের অন্যকিছু করার সুযোগ ছিল না। নবির ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করার মানসিকতা অসম্ভব রকমের দৃঢ় ছিল। মদিনায় গিয়ে তিনি যখন অসহায় অবস্থায় পড়েন তখন ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য প্রায়ই দুই-একটি খেজুর খেয়ে বিছানায় যেতেন। অনেক সময় তাঁর কপালে রাতের আহারও জুটতো না। নবির প্রতি অসম্মান না দেখানোর জন্য এই সত্য প্রকাশ করা হয় না। এর পরিবর্তে শুধু নবির কীর্তি ও অবদানের কথা প্রকাশ করা হয়। নবির লক্ষ্য ছিল সমগ্র আরবে তাঁর নেতৃত্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। তিনি দরিদ্রতা এবং অসঙ্গতিকে কোনো সময়ই তাঁর লক্ষের অন্তরায় হিসাবে দেখেননি। ইতিহাসে এই ধরনের মানসিক শক্তিতে বলীয়ান পুরুষের উদাহরণ পাওয়া বিরল।

মুহাম্মদের ঘটনাবহুল জীবন থেকে বোঝা যায়, তিনি মনুষ্য সমাজেরই একজন মানুষ ছিলেন। তিনি কোনো অতিমানব বা আলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন না। অলৌকিক শক্তির সাহায্যও তিনি কখনো লাভ করেননি। বদর যুদ্ধে মুসলমানরা জয়ী হয়েছিলেন, তার কারণ যে তাঁরা সাহসী এবং অবিচল থেকে লড়াই অব্যহত রেখেছিলেন। আর কুরাইশদের মাঝে দেখা দিয়েছিল অবহেলা আর শিথিলতা। ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের কারণ ছিল, তাঁরা নবির যুদ্ধ-কৌশলের প্রতি অনুগত ছিলেন না। সৃষ্টিকর্তা যদি সর্বদাই মুসলমানদের সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকতেন তবে মুসলমানদের শত্রুর সাথে ভয়ঙ্কর লড়াই, যুদ্ধ, হানাহানি, সংঘর্ষে লিপ্ত হবার প্রয়োজন পড়ত না, কিংবা মদিনার রক্ষার জন্য পরিখা খননেরও দরকার ছিল না। এমন-কী বানু কুরাইজা গোত্রকে হত্যার প্রয়োজন পড়ত না। কোরানে রয়েছে : 'আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতাম।' (সুরা সিজদা : আয়াত ১৩)। বুঝা যায়, এটা অনেক যৌক্তিক যে আল্লাহ ইচ্ছা করলেই দুনিয়ার সকল অবিশ্বাসী ও ভণ্ডদের হৃদয় ইসলাম দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ চান নাই বলে এমনটা হয়নি।

নবি একপক্ষ কালব্যাপী মদিনার ইহুদি গোত্র বানু কায়নোকার বাসস্থানে সামরিক অবরোধ দেন এবং তাদের খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে কায়নোকা গোত্রের ইহুদিরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। নবি তাঁদেরকে হত্যা করতে চাইলে তাদের পুরানো বন্ধু আব্দুল্লাহ বিন উবায় এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করেন।

তিনি সতর্ক করে দেন, যদি ইহুদি বানু কায়নোকা গোত্রকে হত্যা করা হয়, তবে তিনি এর বিরোধিতায় নেমে পড়বেন এবং নবির সঙ্গ ছেড়ে দিবেন। আব্দুল্লাহ বিন উবায়ের এ-বক্তব্যে নবির মুখ ক্রোধে কালো হয়ে যায়। তথাপি তিনি চিন্তাভাবনা করে তাঁর পূর্বের সিদ্ধান্ত বদল করেন। হত্যার বদলে তিনদিনের সময় দেয়া হলো মদিনা ত্যাগ করার জন্য। এই ধরনের আরও ডজন-খানেক ঘটনা থেকে আমরা নবি মুহাম্মদের জীবনী এবং ইসলামের উত্থানের ইতিহাস জানতে পারি। এই ঘটনাগুলি চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করে, নবির জন্য কোনো অলৌকিক শক্তি আসলে কাজ করেনি। ইতিহাসের অন্যান্য ঘটনার মতোই মুহাম্মদের জীবনে যা ঘটেছিল তার পিছনে ছিল প্রাকৃতিক কারণ। কোনো দৈবের হাত নয়। এই বিশ্লেষণ বা দৃষ্টিভঙ্গি নবি মুহাম্মদকে কোনোভাবেই হীন বা দুর্বল করে না। বরং ইতিহাসের একজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তি হিসেবে নবি মুহাম্মদের দক্ষতা, বিচক্ষণতা, সাহস, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি চারিত্রিক গুণাবলীকে আরও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলে।

দুঃখের বিষয় হচ্ছে মানুষ অনেক সময় সবকিছুর বিশদ অনুসন্ধান বা বিশ্লেষণ করে যাচাই করতে অভ্যস্ত নয়। মানুষের কাল্পনিক মন সবকিছুর পিছনে অলৌকিক ঈশ্বরের হাত দেখে। আদিমযুগের লোকেরা বজ্রপাত এবং বিদ্যুতকে স্রষ্টার কণ্ঠস্বর এবং ঝলক বলে মনে করত। তারা বিশ্বাস করত ওই নৃপতি মানুষের অবাধ্যতার জন্য ক্ষেপে গিয়ে এই ধরনের কার্যকলাপ প্রদর্শন করেন। আমাদের চারপাশের অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও অনেক সময় ভুলে যান যে প্রত্যেক ঘটনার পিছনে কার্যকারণ রয়েছে। ফলে তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে তুচ্ছ ঘটনার পিছনেও স্বর্গীয় হস্তক্ষেপ আবিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা মনে করেন ওই সর্বশক্তিমান নৃপতি তাদেরই মতো। যেসব ব্যক্তি এই ধরনের চিন্তা করেন তাঁরা বিশ্বাস করতে পারেন যে, এই মহাবিশ্বের পালনকর্তা আল্লাহ বেহেশত থেকে নবির দৌহিত্র হাসান এবং হোসেনের জন্য পোশাক পাঠিয়ে দেন এবং স্রষ্টার বার্তাবাহক পোশাক দুটিকে সবুজ এবং লাল রঙে রঞ্জিত করে দেন।

এটা সত্য যে মাজলেসির লেখা ‘বেহার আল আনোয়ার’ কোনো ব্যতিক্রমী বই নয়। আর এটাই একমাত্র বই নয় যে, কারকারা নামে এক মাছ যে সারসারার পুত্র, যে সারসারা আবার ঘারঘারার পুত্র, সে আলি বিন আবু তালিবকে জানায় কোথায় দিয়ে তাঁকে হেঁটে পার হতে হবে ফোরাত নদী, যাতে তিনি সিফিফনের যুদ্ধের ময়দানে যেতে পারেন। এই ধরনের শতশত বই ইরানের বাজারে পাওয়া যায়। যেমন কয়েকটা বইয়ের নাম হচ্ছে : হেলায়াল আল-মোল্লাকিন[১০৩], জান্নাল আল-কলুব, আনোয়ার-ই নোমানি, মেরসাদ আল-ইবাদ[১০৪]। এছাড়াও রয়েছে নবি ও ওলামাদের কাহিনি সংকলন করে লেখা প্রচুর বই। একটা জাতির মানসিকতাকে বাস্তব-বুদ্ধি-চিন্তাশক্তি এবং যুক্তিবোধকে বর্জন করে কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে ফেলতে এই ধরনের যে কোনো একটি বই-ই যথেষ্ট। অলৌকিক গল্প ছড়িয়ে দেয়া আসলে মাদকদ্রব্য ব্যবসার পর্যায়েই পড়ে। এই মাদকে আসক্ত নারী-পুরুষ উভয়েই যুক্তি-চিন্তার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন।

মুহাম্মদ তাঁর নবি জীবনে যা আয়ত্ত করেছেন, যা প্রচার করেছেন, যা প্রয়োগ করেছেন তার সবই লোকেরা জানে। লোকেরা আরও জানে যে তাঁর ক্ষুধা পেত, তিনি খাবার খেতেন, এবং সাধারণ জনগণ যেভাবে তাদের সহজাত প্রবৃত্তির বশে চলে নবিও সেইভাবে চলেছেন। তাঁর চরিত্রকে অতিমানব হিসাবে দেখিয়ে, জনতাকে বিভ্রান্ত করা কোনো মতেই মানবজাতির জন্য মঙ্গলকর নয়।

পাদটীকা

৯৬. আবু উবায়দা বিন আব্দুল্লাহ্ বিন আল জারাহ নবির ইসলাম প্রচারের শুরু দিকেই ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি সাময়িকভাবে আবিসিনিয়ায় দেশান্তরী হন। যে দশজনকে বেহেশত গমনের নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন আবু উবায়দা তাঁদের একজন। তিনি সিরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন হিজরি ১৫ (৬৩৬ খ্রিস্টাব্দ) থেকে হিজরি ১৮ (৬৩৯ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত। প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান হিজরি ১৮ সালে। তিনি হুম, আলেপ্পো এবং আন্তিওক (Antioch) দখল করেন।

৯৭. ভিন্নমতে আহত সাদ বিন ওবায়দা অসুস্থ অবস্থায় মারা যান চার-পাঁচ বছর পর।

৯৮. আবু আলি মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বালামি (মৃত্যু হিজরি ৩৬৩ বা ৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ)। সামানিদ বংশের শাসনামলে (আমির আবদুল মালেক-১ এবং মানসুর-১-এর আমলে) তিনি বোখারার উজির ছিলেন। (উল্লেখ্য পারস্যে সামানিদ বংশের শাসনকাল ধরা হয় ৮১৯-৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।) আমিরদের অনুরোধে তিনি আল-তাবারির লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ 'History of the Prophets and Kings' ফার্সিতে অনুবাদ করেন 'Tarikh-e Bal'ami' নামে। নব্যফার্সি গদ্য লেখার মধ্যে এই লেখা বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এই অনুবাদ তাবারির মৌলিক আরবি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভাষ্য। অনুবাদটিতে অনেক সম্পূরক বিষয় স্থান পেয়েছে। এগুলো হচ্ছে প্রধানত ইরানের বিষয়াবলী। এই গ্রন্থের ফরাসি সংকলন হচ্ছে : H. Zotenberg, Chronique de…Tabari traduite sur la version persane de…Belami, 4 vols. Paris 1876 1874, reprinted 1948.

৯৯. আম্মার বিন ইয়াসির এবং আল মিকদাদ বিন আমর ছিলেন ইসলাম প্রচারের শুরুর দিকের মুসলমান। নবির উল্লেখযোগ্য সাহাবি এবং আলির বিশিষ্ট সমর্থক। আম্মারের মাতা ছিলেন একজন ক্রীতদাসী, যার মালিক ছিলেন কুরাইশ গোত্রের মাখজুম বংশের এক ব্যক্তি। ওমরের আমলে আম্মার কুফার শাসক নিয়োজিত হন এবং খুজেস্তান জয় করেন। হিজরি ৩৭ (৬৫৭ খ্রিস্টাব্দ) সালে আলির পক্ষ নিয়ে সিফিফনের যুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে আম্মার প্রাণ হারান। আম্মার, মিকদাদ, আবুজর গিফারি এবং সালমান আল-ফার্সিদেরকে প্রথম 'শিয়া' মতাবলম্বী হিসাবে ধরা হয়।

১০০. দ্রষ্টব্য : তৃতীয় অধ্যায়ে আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবু সারাহ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে।

১০১. 'বেহার আল-আনোয়ার' হচ্ছে আরবি ভাষায় রচিত ১০২ খণ্ডের হাদিসের এক বিশাল সংকলন। মুহাম্মদ বাকের মাজলেসি ফার্সি ভাষায় আরও জনপ্রিয় গ্রন্থও রচনা করেছেন। এর মধ্যে আছে নবি এবং বারো ইমামের জীবনী। তিনি ক্ষমতায় এসে ইরানের সুন্নি, সুফি, ইহুদি এবং অগ্নিউপাসক জরথুস্ত্রপন্থীদের উপর নিপীড়ন চালান। এর ফলে পারস্যের সাফাবিদ রাজতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে। পরিণতিতে হিজরি ১১৩৫ (১৭২২ খ্রিস্টাব্দ) সালে আফগান সুন্নিরা এই রাজত্বের অবসান ঘটায়।

১০২. দ্রষ্টব্য : পাদটীকা ৩।

১০৩. মুহাম্মদ বাকের মাজলেসি লিখিত ফার্সি গ্রন্থ।

১০৪. শায়খ নাজিম উদ্দিন দায়া'র (মৃত হিজরি ৬৫৪ বা ১২৫৬ খ্রিস্টাব্দ) লিখিত পুস্তক। তিনি সুফিবাদের বিশিষ্ট প্রবক্তা। তাঁর লেখা মেরশাদ আল ইবাদ গ্রন্থে ওমর খৈয়ামের প্রথম উল্লেখ দেখা যায়, যেখানে খৈয়ামকে দার্শনিক এবং 'নাস্তিক' আখ্যা দিয়ে ভর্ৎসনা করা হয়েছে।